প্রথম প্রকাশ □ বৈশাখ ১৩৬৭ / এপ্রিল ১৯৬০

প্রকাশিকা □ লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম/১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

মুদ্রাকর □ তরুণ মণ্ডল / মোনালিসা প্রিন্টার্স/৮৩/৬, বেলগাছিয়া রোড, কল-৩৭

বিদেশী ছোটগল্প প্রসঙ্গে

শুধু বৃহত্তর ইউরোপে নয়, সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্যানুরাগীদের কাছে মৌলিক, সহৃদয় ও বুদ্ধিদীপ্ত এক বিশ্লেষণে দস্তয়েভ্স্কিকে উপস্থিত করেছিলেন অঁদ্রে জিদ্। বলা যেতে পারে, পরবর্তীকালের দস্তয়েভ্স্কি ও রুশ সাহিত্যের ব্যাপক চর্চার মূলে আছে জিদের ওই অসাধারণ স্টাডি।

'দস্তয়েভ্স্কি'-শীর্ষক গ্রন্থে সংকলিত বক্তৃতামালার এক জায়গায় জিদ্ বলেছেন: আমরা অর্থাৎ ফরাসীরা ফর্মুলা শুনতে ও প্রয়োগ করতে ভালবাসি। একজন লেখককে মার্কা দিয়ে শো-কেসে সাজিয়ে রাখার এটি একটি সহজ পথ। সহজে মনে রাখা যায় এমন তথ্যই আমরা চাই। আলাদা করে মাথা খাটাতে কে আর পছন্দ করে। ফর্মুলাগুলি এইরকম—। নীৎশে? দাঁড়াও বলছি, নীৎশে হল 'দি সুপারম্যান। বি রুথলেস। লিভ ডেঞ্জারাসলি।' তলস্তয় 'নন-রেজিসটান্স টু ইভিল।' ইবসেন? 'নর্দার্ন মিস্ট্স।' ডারউইন? 'বাঁদর থেকে মানুষ এসেছে।'

ফরাসীদের স্বভাব নিয়ে জিদ্ যা বলেছেন তা বোধহয় পৃথিবীর যে-কোনো এলাকার মানুষদের সম্পর্কেই খেটে যায়। শুধু নীৎশে, তলস্তয়, ইবসেন এবং ডারউইনই নন, ভুবনবিখ্যাত সব ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্যে এই ধরনের এক-এক লাইনের ফর্মুলা চালু আছে।

বর্তমান সংকলনের বত্রিশজন লেখকও এইসব ফর্মুলার হাত থেকে রেহাই পাননি। কিন্তু ফর্মুলা শেষ পর্যন্ত ফর্মুলাই। সাহিত্যরস বা প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। একজন প্রকৃত সাহিত্যপাঠক 'এক-কথার' অর্ধসত্য এইসব ফর্মুলাকে এক কথাতেই নাকচ করে দেন। কারণ, সাহিত্য আর যাই হোক না কেন পরের মুখে ঝাল বা মিষ্টি খাওয়া নয়। সুসাহিত্যের পঠন ও পুনর্পঠনে নতুন-নতুন মাত্রা বেরিয়ে আসে ক্রমাগত।

এই জন্যেই বোধহয় দস্তয়েভ্স্কির সঙ্গে রেমব্রাণ্টের তুলনা টেনেছেন জিদ্। আগাগোড়া মজার ঘটনায় ঠাসা হলেও গোগলের 'পাগলের দিনলিপি' হয়তো এই কারণেই কারও-কারও কাছে আশ্চর্য এক করুণ কাহিনী। কয়েকজন সমালোচকের মতে চেকভের 'ডার্লিং' এক আদর্শ সুখী মেয়ের গল্প, কিন্তু তলস্তয় এর মধ্যেই আবার 'অ্যাণ্টি-ফেমিনিস্ট' তত্ত্ব খুঁজে পেয়েছেন। সাহিত্য বহুমাত্রিক, নানা কোণে তার নানা দ্যুতি। পাঠকমাত্রই এখানে আবিষ্কারক হতে পারেন!

সাহিত্যে শুধু মানুষই নয়, স্থান ও বস্তুও সজীব চরিত্র হয়ে ওঠে অনেক সময়। সেণ্ট পিটার্সবুর্গ এইরকমই এক শহর। রহস্যময় এই শহরকে নানা চেহারায় দেখেছেন পুশকিন, গোগল, দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়, চেকভ প্রমুখ লেখক। পুশকিনের কাছে পিটার্সবুর্গ অলৌকিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কহীন এক শহর। গোগলের কাছে এটি 'স্বপ্নের কবরখানা'। এই শহরের মায়াময় স্পর্শহীনতা, কুয়াশা আর চাঁদনি রাত থেকেই দস্তয়েভস্কি গড়ে তুলেছেন তাঁর রচনার বিচিত্র পরিমণ্ডল। নিছক পরিপ্রেক্ষিত নয়, বিভিন্ন রুশ লেখকের হাতে শহর পিটার্সবুর্গ আলাদা-আলাদা চরিত্র হয়ে উঠেছে।

জেমস জয়েস একবার বলেছিলেন, 'আমি শুধু ডাবলিন নিয়েই লিখতে চাই। কারণ, ডাবলিনের হৃদয় স্পর্শ করতে পারলে আমি পৃথিবীর সব শহরের হৃদয় স্পর্শ করতে পারব।' কথাটির মর্মে আছে সর্বজনীন এক সত্য। এক শহর আর এক শহরের হৃদয়ের ভাষা বোঝে। এই ভাবেই বোধহয় পিটার্সবুর্গের মনের কথা বুঝতে পারে ডাবলিন। ডাবলিনের কথা আবার পৌঁছে যায় লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, নিউ ইয়র্ক ইত্যাদি শহরে। শহরে-শহরে কথা বিনিময় হয়। শেষে সব কথা ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বে। শহর আর গ্রামের মধ্যে তখন আর কোনো ভেদরেখা থাকে না। শেষ সত্য সেই সাহিত্য ও তার রসিক। ভৌগোলিক সীমারেখা, ভাষা ও কালের ব্যবধান কোনো বাধা হয়ে উঠতে পারে না এখানে।

গল্প শুনতে ভালবাসে না—এমন মানুষ বোধহয় পৃথিবীতে কখনো ছিল না, আজও নেই। গল্পকথাই বোধহয় পৃথিবীর প্রাচীনতম আর্ট। সুপ্রাচীন মিশর, গ্রীস, রোম ও ভারতের উপকথা, লোকগাথা ইত্যাদি তো গল্পের উৎসভূমি। পারস্য বা আরব্য রজনীর মায়া তো ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর সব প্রান্তের রজনীতে। বাইবেলের এক-একটি কাহিনী তো এক-একটি অপরিস্রুত ছোটগল্প। মধ্যযুগের ইতালীয় নভেলা তো নতুন এক আর্টফর্মের দিকে যাত্রা শুরু করেছিল। সেই পথেই পড়েছে চসারের ক্যাণ্টারবেরি টেল্‌স। গল্পের আদিভূমি থেকে যাত্রা শুরু করে উনিশ শতকী সুনির্দিষ্ট ছোটগল্প হয়ে আজকের ছোটগল্পে এসে পৌঁছনো আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য একটাই—তা হল, ছোটগল্পের পথ-পরিক্রমা, এবং এ-ক্ষেত্রে স্পষ্টত বিদেশী ছোটগল্পে।

গল্প 'ছোটগল্প' হয়েছে কতদিন? বড়জোর দুশো বছর। অন্যান্য আর্টফর্মের তুলনায় এই আর্টফর্মটি একেবারেই নবীন। নবীন কিন্তু ব্যাপক, অপ্রতিরোধ্য এবং সর্বগ্রাসী।

ছোটগল্পের যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণের কম চেষ্টা করা হয়নি। কিন্তু কোনো সংজ্ঞাই সম্পূর্ণ নয়, সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবও নয় বোধহয়। সংজ্ঞাগুলি ছোটগল্প সম্পর্কে সামান্যকিছু আভাস ও ইঙ্গিত দিয়েছে মাত্র। একজন ভাল ছোটগল্প-লেখকের পরিচয় দিতে গিয়ে স্যার ফিলিপ সিডনি বলেছেন: এঁর গল্প

শিশুদের খেলা ভুলিয়ে দেয় এবং বৃদ্ধদের চিমনি-কর্নার থেকে টেনে আনে।

অর্থাৎ সিডনিবর্ণিত ভাল ছোটগল্পলেখকের গল্পের আকর্ষণ দুর্নিবার। শ্রোতা কিংবা পাঠক এই গল্পের টানে আর সবকিছু ভুলে যায়। গল্প, গল্পই সব। গল্পের বিচিত্র কাহিনী নিয়ে যে কৌতূহল ও রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, গল্প শেষ হওয়ার আগে তার থেকে মুক্তি নেই। এই অবস্থায় শিশুরা তাদের খেলা ভুলে এবং শীতকাতুরে বৃদ্ধরা আগুনের ধার থেকে উঠে এসে গল্পের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে। আর তাই যদি হয়, সিডনির মতে ওই ছোটগল্পলেখক হচ্ছেন আদর্শ ছোটগল্পলেখক এবং তাঁর ওই ছোটগল্পটি আদর্শ ছোটগল্প।

ছোটগল্পের এই ধারণাটি উনিশ শতকী ছোটগল্প সম্পর্কে খেটে যায় অনেকটা। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও গত শতাব্দীতে ছোটগল্পলেখকের প্রধান ভূমিকা ছিল কাহিনীকারের। বাইরের জগতের বিচিত্র ঘটনা, মানবচরিত্রের স্পষ্ট সঙ্গতি বা অসঙ্গতি, প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্তির ব্যবহারিক দ্বন্দ্ব, ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যাযোগ্য সংকট সংক্ষিপ্ত ও সুসংবদ্ধ কাহিনীর আশ্রয় নিয়ে দেখা দিয়েছিল ছোটগল্পে।

তবু সংশয় দেখা দেয় এক সময়।

বিদ্যুদ্‌গতি চিন্তার তরঙ্গকে মুখের ভাষায় ধরা যায় না। কী ভাবে আমরা আমাদের নায়কের বিশেষ ওই মানসিক অবস্থার কাছাকাছি পৌঁছতে পারব? এই সংশয় ও অন্বেষণ দস্তয়েভ্‌স্কির। বলা যেতে পারে, গল্প-উপন্যাসে আধুনিকতার বীজ এখান থেকেই এসেছে।

বাইরের পৃথিবীর রহস্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষিপ্ত মনোজগতের দিকে লেখকরা অবশ্য এর আগেও তাকিয়েছিলেন। তবে তা ছিল নেহাতই আকস্মিক ঘটনা। এবং ওই দেখার মধ্যে শৃঙ্খলা আর নিরবচ্ছিন্নতা থাকার ফলে বিক্ষুব্ধ ভাবনার প্রকাশ হয়ে উঠেছিল ধারাবাহিক ও সুসংবদ্ধ। নিছক পাগলামো মধ্যেও ছিল প্রাসঙ্গিকতা ও যুক্তির সূত্র। ব্যর্থ, হতাশ ও মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধ কিং লিয়রের পাগলামো তাই বোধহয় পারম্পর্যহীন হয়ে উঠতে পারেনি।

গোগল ও দস্তয়েভ্‌স্কির কিছু চরিত্রের মধ্যেও এলোমেলো চিন্তার ঝড় বয়ে গিয়েছে, তবে সেখানেও ছিল ক্ষীণ একটি যুক্তির সূত্র। চরিত্রগুলির ভেতরেই ছিল পাগলামো। স্বভাবে পাগলামো থাকলে আচরণে তার ছাপ তো পড়বেই। লেখকরা এখানে আবার ন্যারেটরের উর্ধ্বে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি।

ফ্লবের বলেছিলেন সৃষ্টির জগতে একজন শিল্পীর ভূমিকা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মতো। সৃষ্টকর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে অনুভব করা যায়, কিন্তু দেখা যায় না কখনোই। আজকের লেখকরা আর নিজেদের ঈশ্বরের ভূমিকায় রাখতে চান না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরা সীমাবদ্ধ শক্তির সাধারণ মানুষ।

চিন্তারাজ্যের এলোমেলো ঝড়কে প্রকাশ করার জন্যে গল্পের চরিত্রকে পাগল সাজাবার চেষ্টা করেননি তাঁরা। বিশ্বাস করেন স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতা একইসঙ্গে একজন সুস্থ মানুষের মধ্যে থাকতে পারে।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে লেখকরা বিচিত্র মানসিক অভিজ্ঞতার প্রবাহকে ধরার প্রথম সচেতন চেষ্টা করেন। এই পথে জেমস জয়েস নিজেই একটি ধারা। বাইরের জগতের চাইতে ঢের বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল মনোজগৎ। যন্ত্র-সভ্যতা বহির্জগতের প্রায় সব রহস্যের আবরণ খুলে দিয়েছে, মনের দিকে মুখ ফেরানোর এটিও একটি বড় কারণ।

যাত্রা শুরু হল মানুষের মনের গভীর থেকে আরো গভীরে, শেষে বিশুদ্ধ অবচেতনায়। এই রাজ্যের অভিজ্ঞতা অনন্ত এবং অসম্পূর্ণ। সেকেলে প্লট কিংবা মোটা দাগের গল্পের রূপরেখা এখানে একেবারেই অকেজো। একান্ত এই অন্তর্জগৎকে শিল্প-সাহিত্যে যিনি তুলে আনছেন তিনিও আবার সাধারণ মানুষ।

যাঁরা সমাজের ধ্বংস কামনা করেছিলেন সেই ক্রুদ্ধ ডাডাইস্টরা এসে বললেন, ওই সাধারণ মানুষের জায়গায় যন্ত্র থাকলেই বা ক্ষতি কী! শিল্পে আদিমতা আনতে চেয়েছিলেন ডাডারা। চেয়েছিলেন, শিল্প আবার নতুন করে শুরু হোক 'শূন্য' থেকে। তথাকথিত শিল্পের শত্রু ডাডারা প্রকৃতির মতো প্রত্যক্ষ ও অচেতন হতে চেয়েছিলেন। 'স্বয়ংক্রিয় ছবি' এবং 'কথ্য ভাবনা'র প্রবক্তাদের গন্তব্যস্থল ছিল অন্তর্জগতের গভীরতর প্রদেশ।

প্যারিসে ডাডার অবসান ১৯২২-এ। ঠিক দু-বছর পরে, অর্থাৎ ১৯২৪ সালে অঁদ্রে ব্রেতো প্রথম স্যুররিয়েলিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেন। ওই বছরেই মারা যান ফ্রান্‌জ কাফ্‌কা। স্বপ্ন ও বাস্তবের সংমিশ্রণে নির্মাণ করা হল প্রকৃত বাস্তবতা বা স্যুররিয়েলিটি এবং সেই সঙ্গে এলো শিল্প-সাহিত্যে প্রবল এক জোয়ার। স্যুররিয়েলিস্টরা বললেন, স্বাভাবিকতা ও যুক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকার ফলে মানুষের স্বাধীনতা খর্ব হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কল্পনা-শক্তির পূর্ণ বিকাশও হচ্ছে না এর ফলে। আর যুক্তি নয়, আর ছকবাঁধা পথ নয়, এবার যেতে হবে মগ্নচৈতন্যে। কেননা ওখানেই আছে প্রকৃত মুক্তি।

ফ্রয়েড এবং স্যুররিয়েলিস্টদের পথ আপাতদৃষ্টিতে এক হলেও মত ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। অবচেতনার সাহায্যে শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন ফ্রয়েড। কিন্তু স্যুররিয়েলিস্টদের স্বপ্ন ছিল অবচেতনায় লুপ্ত হয়ে শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিকতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া।

মগ্নচৈতন্যে ডুব দিলেন শিল্পী-সাহিত্যিকরা। ধীরে ধীরে চর্চা শুরু হল 'সম্মোহক নিদ্রা' বা 'স্বতঃপ্রণোদিত ঘুমের'। বিচিত্র ওই ঘুমের মধ্যে এলো স্বগতোক্তি ও ছবি। কিন্তু মগ্নচৈতন্যে এই ভাবে আত্মবিসর্জনের পথও পরিত্যক্ত

হল শেষে। আজকের লেখক বোর্হেসও অন্তর্জগতের মানুষ, তবে অবচেতনাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে তাঁর আটকায়নি। বলেছেন, মগ্নচৈতন্য আসলে আমাদের 'দুঃখপীড়িত পুরাণকথা': আজকের গল্পে অকপট ভঙ্গিতে সবকিছু আসতে পারে। উপকথা, কল্পবিজ্ঞান, রহস্যকাহিনীর উপাদান, আত্মকথার অংশবিশেষ. ছদ্ম-পাণ্ডিত্য—সবকিছুই আসুক না পাশাপাশি।

আধুনিক লেখকদের কাছে ছোটগল্প কাহিনী বা ঘটনার চেয়ে বেশিকিছু। চূড়ান্ত কোনো পরিস্থিতি এঁদের অনেকের কাছেই প্রিয় বিষয়। পরিস্থিতি চূড়ান্ত হলেও গল্পের পরিণতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত নয়। গল্প যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকেই হয়তো আর একটি গল্প শুরু হতে পারে। পুরনো দিনের জমাট বিষয়ের প্রতিও আগ্রহ হারিয়েছেন আজকের লেখকরা। ঘটনার সামান্য আভাস, তুচ্ছ প্রসঙ্গ, অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা, অবসেশান, অন্তর্জীবনের মৃদু আলোড়ন আধুনিক গল্পের প্রধান অবলম্বন। প্রাচীন কাঠামোর বদলে কিছু-কিছু ক্ষেত্রে এসেছে যৎসামান্য জ্যামিতিক রেখা। গল্পের সেই স্থির সময়কালের চেতনাও পালটে গেছে। দীর্ঘ বিবৃতির জায়গা নিয়েছে সামান্য সংকেত। স্ন্যাপ-শট বা সিংগল ফ্রেমের দিকেই বেশি করে ঝুঁকেছেন আধুনিক ছোটগল্পলেখকরা। তথাকথিত যুক্তির শৃঙ্খলকে ছিন্ন করেছে ফ্যান্টাসি। এই ফ্যান্টাসি ও বাস্তবতার মধ্যে সেকেলে বিরোধ আর নেই। আধুনিক ছোট-গল্পের এটি এক মস্ত দিক। অলৌকিক জগতে যাওয়ার জন্যে এখন আর চরিত্রের 'স্বপ্ন' দেখা বা 'মনে হওয়ার' প্রয়োজন হয় না। লেখক চাইলেই শক্ত মাটি আর শূন্য আকাশ একাকার হয়ে যেতে পারে।

॥ দুই ॥

আজকের এই গল্প আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়, এর পেছনে আছে দীর্ঘ ইতিহাস এবং ধারাবাহিকতা। ইংল্যাণ্ডের সেই রোমান্টিসিজম ও আধুনিক উপন্যাসের চেতনা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে। এদিকে ডিকেন্স ওদিকে ফরাসী রিয়েলিস্টিক স্কুল, আলোড়িত কে হননি তখন। তবে উপন্যাস ও গল্পের মান ও চর্চায় যে-দেশটি আর সব দেশকে ছাপিয়ে গেল সে-দেশটির তথাকথিত কোনো 'ঐতিহ্য' ছিল না। সম্বল ছিল সামান্য-কিছু লোকগাথা আর অল্পবিস্তর পশ্চিমী প্রভাব। এই ছিল রাশিয়া। কিন্তু দেশীয় উপকরণকে প্রধান অবলম্বন করে রুশসাহিত্যের নিস্তরঙ্গ আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিলেন পুশকিন ও লেরমনতভ। এঁদের ওপর বায়রনের গভীর প্রভাব ছিল, তবে এই প্রভাব তাঁদের অনুকরণের দিকে ঠেলে দেয়নি।

এর পরেই প্রায় অলৌকিক উপায়ে মাটির অনেক গভীরে আধুনিক রুশ-সাহিত্যের শিকড় ছড়িয়ে দিলেন নিকোলাই গোগল। উক্রেনিয়ান লোকগাথা ছিল তাঁর প্রধান সম্বল, আর ছিল পশ্চিমী সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা। স্টার্নের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন গোগল। স্টার্নের 'ট্রিসট্র্যাম শ্যান্ডি' রুশ ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল ১৮০৪-৭ সালে। উদ্ভট বিষয়কে আরো উদ্ভট ভঙ্গিতে পরিবেশন করার ব্যাপারে গোগল অনেকখানি ঋণী স্টার্নের কাছে। হফ্‌মানেরও প্রভাব ছিল গোগলের ওপর। তবে প্রভাব দোষের নয়, বিশেষ করে প্রকৃত অর্থে একজন শক্তিশালী লেখকের ক্ষেত্রে। স্থানীয় লোকগাথা, বিচিত্র বিষয়ের বাস্তবানুগ বর্ণনা, তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি গোগলকে মৌলিক করে তুলেছে। তাঁর 'ওভারকোট'-এর প্রকাশকাল ১৮৪২। পরবর্তীকালের সাহিত্যে অসাধারণ এই গল্পটির প্রভাব ব্যাপক। বেশ কয়েকজন সমালোচকের মতে রুশসাহিত্যে গভীর 'সামাজিক সহানুভূতির' সূত্রপাত ঘটে এই গল্পটি থেকেই। দস্তয়েভ্‌স্কি নাকি একদা বলেছিলেন: আমরা সবাই এসেছি 'ওভারকোট' থেকেই।

সাহিত্যের ইতিহাসে ১৮২১ সালটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিন বিস্ময়কর প্রতিভা—শার্ল ব্যোদ্‌লের, গুস্তেভ ফ্লবের এবং ফিওদর দস্তয়েভ্‌স্কি ওই বছরেই জন্মগ্রহণ করেন। উনিশ শতকের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই শুধু নয়, ওই শতককে যাঁরা বর্তমান শতকে পেঁছে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রবলভাবে আছেন এই তিনজন।

ফরাসী ইউতোপীয় সোশালিস্টদের ধারণা এবং পুশকিন, লেরমনতভ ও গোগলের রচনার প্রভাব ছিল দস্তয়েভ্‌স্কির ওপর। প্রভাব ছিল পশ্চিম ইউরোপীয় লেখকদেরও। শেকসপিয়র, ব্যোলতের, শিলার, সেরভানতিস, ডিকেন্স, জর্জ সাঁদ ও বালজাক তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। দস্তয়েভ্‌স্কির প্রায় সব রচনাতেই আছে 'পুশকিন মোটিফ'। কাঁদিদ ও ডন কুইক্সোটও ছায়া ফেলেছে নানা ভাবে।

মানবচরিত্রের নিখুঁত বিশ্লেষণ করেছেন বালজাক, তলস্তয় এবং টমাস মান। কিন্তু একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ হিসেবে এঁদের সঙ্গে দস্তয়েভ্‌স্কির পার্থক্য ঠিক কোথায়? পার্থক্য অন্তর্জগতের অভিঘাতে। বহির্জগতের আঘাত মনের ওপর পড়ে। তারপর? তার পরেরটুকু দস্তয়েভ্‌স্কির নিজস্ব দর্শন। ওই আঘাতে আত্মা পরিবর্তিত, এমনকি কলুষিত পর্যন্ত হতে পারে।

গোগলের চরিত্রদের এই মনস্তাত্ত্বিক স্তর নেই, তারা বাইরের জগতের ঘটনা ও বর্ণনাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তাদের চারধারের পৃথিবীও তৈরি হয়েছে লেখকের চোখে-দেখা এলাকা থেকে। পটভূমিকা হিসেবে সেণ্ট পিটার্সবুর্গ এসেছে বেশ কয়েকবার। 'ওভারকোট', 'নাক' এবং 'পাগলের দিনলিপি'র

পশ্চাদ্‌পট এই শহরটিই। পিটার্সবুর্গ সম্পর্কে লেখকের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। তিনি তাঁর মাকে একবার জানিয়েছিলেন : এ এক ভুতুড়ে জায়গা, এখানকার লোকগুলোকে কেমন যেন মৃত বলে মনে হয়। অর্থহীন কাজকর্মের ভেতর দিয়ে অর্থহীন জীবন কাটায় এরা।

'পাগলের দিনলিপি'তে এই শহরটি তার অপদার্থ মানুষজন নিয়ে উঠে এসেছে নিখুঁতভাবে। সঙ্গে আছে পাগলামো। পাগলের এই জগতে কুকুর কথা বলে, চিঠি লেখে, আধপাগলা নায়কের জীবনে প্রেমের সঞ্চার হয়। তবে ওই পর্যন্তই। তারপর সর্বঅর্থে যৎসামান্য নায়কটি তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নিষ্ঠুর এক পীড়নের শিকার হয়। গল্পে সমাজব্যবস্থার মৃদু সমালোচনা আছে, তবে ঢের বেশি করে আছে উদ্ভট এক জগতের কাণ্ডকারখানা। বাস্তব জগতের যুক্তিবুদ্ধি কাজ করে না এখানে, যা আছে তা মায়া ও মতিভ্রম। যুক্তিহীন, উদ্ভট এক জগতের প্রতি গোগলের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাঁর 'ভ্লাদিমির থার্ড ক্লাস'-শীর্ষক নাটকটির বিষয়ও পাগলামো। কিন্তু ঘটনা যতই মজার হোক না কেন, তার ওপর দীর্ঘ যে ছায়াটি নেমে আসে তা গভীর বিষাদের।

গোগলের এই জগতের সঙ্গে দস্তয়েভ্‌স্কির জগতের তফাত আছে অনেকখানি। দস্তয়েভ্‌স্কি বিশ্বাস করতেন, নিপীড়ন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুই অবস্থার মধ্যে নিয়ে যায় মানুষকে। তার ফলে মানুষ হয় বোধহীন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়, নয় বিষণ্ন ও একাকী হয়ে ওঠে। নিপীড়িত মানুষের প্রতি শুধুমাত্র বেদনাবোধ সঞ্চার করেই থামতে পারেননি দস্তয়েভ্‌স্কি, তিনি আরো কিছু চেয়েছিলেন। আসলে মানবাত্মার যন্ত্রণা তাঁর মধ্যে গভীর এক দর্শনের জন্ম দিয়েছিল।

দস্তয়েভ্‌স্কি লিখেছেন : আমাকে মনস্তাত্ত্বিক বলা হয়, কিন্তু আমি তা নই। ব্যাপক অর্থে আমি একজন রিয়েলিস্ট, মনুষ্যচরিত্রের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন পর্যায়গুলি তুলে ধরি আমি।

'ক্রিস্‌মাস ট্রী এবং সেই বিবাহ-অনুষ্ঠান' গল্পটিতে চরিত্রের সংখ্যা খুব বেশি নয়, কিন্তু সামান্য কিছু কথায় এবং ইঙ্গিতে তিনি বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর আসল চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের মাস্তাকোভিচ বিচিত্র এক চরিত্র, কিন্তু মানী অতিথি। গৃহস্বামী তাকে বাড়তি খাতির দেখাচ্ছিল, কিন্তু এই মানুষটি আবার নজর দিচ্ছিল বড়লোক বাবার মেয়ের দিকে। অল্প সময়ের মধ্যে মাস্তাকোভিচ মারাত্মক এক হিসেব কষে ফেলে, গৃহস্বামী পরিচয় দেয় কূটবুদ্ধির। সবশেষে শিকার হয় পরীর মতো সুন্দরী মেয়েটি।

নীৎশেই সম্ভবত প্রথম ইউরোপীয় যিনি 'মাস্টার' বলে মেনে নিয়েছিলেন দস্তয়েভ্‌স্কিকে। লেখকের সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে আছেন ফ্রয়েড, আঁদ্রে

জিদ এবং টমাস মান। 'নোটস ফ্রম আণ্ডারগ্রাউণ্ড'-এর নায়ক টমাস মানের বিচারে হিরো বা অ্যান্টি-হিরো।' আধুনিক সমাজ তাকে ধ্বংস করে ফেলতে চাইছে, কিন্তু বায়রনীয় কায়দায় প্রতিবাদ জানাবার ভাষা তার জানা নেই। 'ক্রিসমাস ট্রী এবং সেই বিবাহ-অনুষ্ঠান'-এর সুন্দরী মেয়েটিও আধুনিক সমাজের ব্যবসাবুদ্ধির শিকার। আশ্চর্য সুন্দরী মেয়েটিও প্রতিবাদ জানাতে পারেনি, তার মুখ শুধু বিবর্ণ ও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল।

তলস্তয়ের 'থিয়োরি অব সিম্প্লিসিটি'র সঙ্গে দস্তয়েভ্স্কির অমিল অনেকখানি। অমিল ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণাতেও। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ চর্চার যুগেও তলস্তয় ছিলেন গভীরভাবে ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ। এই বিশ্বাস তিনি অর্জন করেছিলেন পরিণত বয়সে। প্রথম জীবন ছিল একেবারে উলটো ধরনের। ঝোড়ো জীবনযাপনে তিনি একাধিকবার লড়াই বাধিয়েছিলেন চার্চের সঙ্গে। এই লড়াইয়ের শেষে প্রবল এক নীতিবাদ মিশে গিয়েছিল তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে। ধর্ম, নীতি এবং ঈশ্বরপ্রীতি মিলিয়ে আর এক শুদ্ধ জীবন নির্মাণ করেছিলেন তলস্তয়। 'ঈশ্বর সত্যকে দেখেন, তবে দেরিতে' গল্পটি গভীর এই বিশ্বাসবোধ থেকেই উঠে এসেছে।

বিনা দোষে দোষী আকসিওনভকে যখন তার স্ত্রীও খুনী হিসেবে সন্দেহ করে বসল তখন লোকটির পুরনো ধ্যানধারণা টলে গেল পুরোপুরি। সে বিশ্বাস করতে শুরু করল কেবলমাত্র ঈশ্বরই প্রকৃত সত্য জানেন। সুতরাং অন্য কোথাও অনুরোধ-উপরোধ না জানিয়ে ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা জানানো উচিত। একমাত্র ঈশ্বরই তাকে করুণা করতে পারেন। সাইবেরিয়ায় দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের নির্বাসনে এই বোধ এমন এক মাত্রা পেয়েছে যার কাছে চরিত্রটির আগের সেই সুখী-জীবনও অসার। মেকারের স্বীকারোক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তির আদেশ যখন এলো তখন আকসিওনভের আত্মা তার দেহ থেকেই মুক্তিলাভ করে গেছে। 'ইভান ইলিচের মৃত্যু' এবং 'ক্রয়েটজার সোনাটা'য় তলস্তয় অবশ্য ভিন্ন মাত্রায় আরো ব্যাপক হয়ে উঠেছেন।

পরবর্তীকালে তলস্তয়ের এই জগৎ চেকভেরও জগৎ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু বেশিদিনের জন্যে নয়। শাখালিনে কয়েদীদের জীবনযাত্রা দেখে এসে চেকভ লিখলেন 'ওয়ার্ড নম্বর ৬'। তলস্তয়ের বিখ্যাত সেই 'নন-রেজিসটান্স টু ইভিল' তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে গল্পটি। তবে তত্ত্বের বিরোধিতার জন্য নয়, গল্পটি অসাধারণ হয়ে উঠেছে শিল্পগত কারণে।

তুর্গেনিভ এবং তলস্তয় অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভাবকে কখনোই পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারেননি, কিন্তু চেকভ পেরেছিলেন। তার প্রধান কারণ, চেকভ ছিলেন একজন মুক্ত সার্ফের সন্তান। শ্রেণী-সচেতনতা এবং শ্রেণী-চরিত্রের সংস্কার থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিলেন তিনি।

রুশসাহিত্যে চেকভই প্রথম লেখক যাঁর জগতে হিরো বা ভিলেন বলে কেউ নেই। অধিকাংশ গল্পই গড়ে উঠেছে সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা বা তুচ্ছ ঘটনাকে আশ্রয় করে। বড় মাপের উত্থান-পতন বা ধাক্কাও নেই এইসব কাহিনীতে। চরিত্রগুলির দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বেদনা, অসহায়তা, নিঃসঙ্গতা, ভুল-বোঝাবুঝি যৎসামান্য প্রাপ্তি কখনো খুব সহজ ভঙ্গিতে কখনো মৃদু নাটকীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই উজ্জ্বলতার রঙ আলাদা এবং একান্ত ভাবেই তা চেকভের। ছোটগল্পের জগতে 'চেকভিয়ান ম্যানার' বলতে স্বতন্ত্র একটি পরিমণ্ডল বোঝায়।

চেকভের 'ডার্লিং' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে, এবং আজ, প্রায় একশো বছর বাদেও গল্পটি অতিমাত্রায় আধুনিক। গল্পের সাদাসিধে, আবেগপ্রবণ নায়িকার স্বভাব ঠিক পরগাছার মতো। বাঁচবার জন্যে তার একটি অবলম্বন দরকার। এই অবলম্বন কখনো তার বাবা, কখনো নাট্যকার এবং কাঠগোলা-মালিক, কখনো পশুচিকিৎসক, কখনো আবার ছোট্ট সেই ছেলেটি। নায়িকার একান্তই ব্যক্তিগত ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা বলে কিছু নেই; কাছের মানুষের ইচ্ছে ও স্বপ্নকে সে একেবারে নিজের করে নেয়। আর কাছের মানুষ কাছে না থাকলেই সবকিছু তার ফাঁকা হয়ে যায়, অসহায় বোধ করে; বেঁচে থাকার একটাও ভাল কারণ খুঁজে পায় না তখন।

এই গল্পটি তলস্তয়ের এত ভাল লেগেছিল যে এটি পর-পর চার রাত্রি তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে পড়ে শুনিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল এটি তাঁর 'অ্যান্টি-ফেমিনিস্ট' তত্ত্বকে সমর্থন করেছে। চেকভ মারা যাওয়ার দু-বছর বাদে গল্পটির পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন তলস্তয়, এবং প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিলেন: গল্পটি অসাধারণ, তার কারণ এটি পূর্বনির্ধারিত কোনো পথে এগোয়নি। চেকভ ডার্লিংকে একটু ছোট মাপের বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু লেখকের ইচ্ছের বিরুদ্ধে সে মাথা উঁচু করে উঠে এসেছে অনেকখানি।

ছোটগল্পের জগতে চেকভের আসন অনেক উঁচুতে। তাঁর অন্য সব বিখ্যাত ছোটগল্পের তালিকায় আছে 'তিন বছর', 'আমার জীবন', 'কৃষক', 'দুর্ভাগ্য' এবং 'মহিলা ও কুকুর।'

॥ তিন ॥

একটি দেশের বিশেষ কোনো কালের সমগ্র সামাজিক দৃশ্যকে উপন্যাসে প্রথম সার্থকভাবে ব্যবহার করেন সম্ভবত বালজাক। ব্যোদলেরের বিচারে বালজাক মুখ্যত একজন 'ভিশনারি' এবং তাঁর সৃষ্ট বেশ কয়েকটি চরিত্রের ওপর লেখকের নিজের ছায়া পড়েছে অনেকখানি। 'সোশাল রিয়েলিজম'-এর

প্রবক্তা বালজাকের সঙ্গে রোমান্টিকদের মিল আছে কিছুটা।

'মরুভূমিতে এক ভালবাসা' গল্পটিতে রোমান্টিকদের এই প্রভাব লক্ষ্য করার মতো। আরবদের হাত থেকে পালানো ফরাসী এক সৈনিক নির্জন মরুভূমিতে ভয়ংকর চিতার প্রেমে পড়েছিল। সে এক বিচিত্র প্রেম। বিশাল মরুভূমির মায়ায় ওই প্রেমে দ্বিধা, সংশয়, আলোড়ন, আচ্ছন্নতা এবং চক্রান্ত কাজ করে গেছে অদ্ভুতভাবে। আতঙ্কিত হয়ে চিতাকে শেষে হত্যা করে সৈনিক। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, মরার মুখে চিতার চোখে প্রতিহিংসার কোনো ছাপ ফুটে ওঠেনি। চিতাকে হত্যা করে তাই নিরপরাধ এক মানুষকে খুন করার কষ্ট পেয়েছিল সৈনিক। এই ছোটগল্পটি গল্পের জগতে নতুন এক ধারা নিয়ে এসেছিল। মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে হৃদয়গত সম্পর্ক স্থাপন করে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন পরবর্তীকালের লেখকরা। উনিশ শতকের ফরাসী লেখকদের মধ্যে বালজাকই প্রথম উপলব্ধি করেন যে, প্রেমকাহিনীর বদলে অহংকার, অর্থলিপ্সা, লোভ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নিয়ে শক্তিশালী গল্প-উপন্যাস লেখা সম্ভব।

সম্ভবত বালজাকই নিচুতলার কেরানিদের ফরাসী সাহিত্যে তুলে এনেছিলেন প্রথম। এইসব কেরানি এবং কম-মাইনের আমলাদের চরিত্রের স্বল্পালোকিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন নানা দিক ছিল মপাসাঁর গল্পের প্রিয় বিষয়। নর্মাণ্ডির কৃষক ও জেলেদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি বেশ খুঁটিয়ে দেখেছিলেন মপাসাঁ। প্যারিসে সরকারি চাকরি করার সময় সহকর্মী এবং উঁচু ও নিচু পদের মানুষদের তিনি স্টাডি করতেন। এদের প্রত্যেকেই এসেছে তাঁর লেখায়। প্রকৃতিবাদী স্কুল এবং বিখ্যাত জোলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ গভীর ছিল। মনুষ্যচরিত্রের ভালর চাইতে মন্দের দিকে বেশি ঝোঁক দিতেন তিনি। 'বেল-আমি'র লেখকের কাছে হতাশা, লোভ, নীতিহীনতা, অন্তঃসারশূন্য দাম্ভিকতা বিষয়বস্তু হিসেবে বেশ গুরুত্ব পেয়েছে; তবে তিনি বিখ্যাত তাঁর ছোটগল্পের বিখ্যাত সেই 'হুইপল্যাশ এণ্ডিং'-এর জন্য। গল্পের শেষে সম্পূর্ণ অভাবিত এক চমক, যা মপাসাঁর নিজস্ব রীতি হিসেবে সুপরিচিত ও নানা দেশের ছোটগল্পে চর্চিত হয়েছে দীর্ঘদিন। কিন্তু বর্তমান সংকলনে গৃহীত 'জনৈক বৃদ্ধ' গল্পটি অন্য ধাঁচের। মঁসিয়ে দারোঁ নামে এক বৃদ্ধের সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার আকুলতা এই গল্পে চমকহীন নতুন এক জগৎ সৃষ্টি করেছে।

মপাসাঁকে খুব ভালবাসতেন ফ্লবের, এবং বিখ্যাত এই লেখকের কাছে, লেখার ব্যাপারে দীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন মপাসাঁ। ফ্লবের বলতেন, গদ্য রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে তৈরি করতে হবে দেখার চোখ। তুচ্ছ, সাধারণ বস্তুও শুধুমাত্র দেখার গুণে অসাধারণ হয়ে ওঠে। ফ্লবেরের এই উপদেশটি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন মপাসাঁ।

লেখক হিসেবে আর্থিক সাফল্য অর্জন করার পরেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন মপাসাঁ। তারপর সরে এসেছিলেন জোলার কাছ থেকে। শোপেনহাওয়ারের ভক্ত এই লেখক বেঁচেছিলেন মাত্র বিয়াল্লিশ বছর, কিন্তু তাঁর শেষের এগারো বছরের সাহিত্যজীবনটি হয়ে উঠেছিল ব্যাপক, বিচিত্র ও সুদূরপ্রসারী। এই সময়ের মধ্যে তিনি ছটি উপন্যাস এবং প্রায় তিনশো ছোটগল্প লিখেছিলেন। উপন্যাস নয়, বিখ্যাত সব ছোটগল্পের জন্যেই আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন মপাসাঁ।

ফরাসী সাহিত্যে উদারনৈতিক মানবতাবাদের যে ধারাটি গড়ে উঠেছিল সেই ধারার একজন বিশিষ্ট লেখক আনাতোল ফ্রঁস। আশাবাদী ফ্রঁস ছিলেন জোলা-স্কুলের 'জান্তব বাস্তবতার' বিরোধী।

তাঁর 'মাতা মেরীর বাজীকর' গল্পের প্রধান চরিত্র বারনাবাস একজন গরিব বাজীকর। কিন্তু ধর্মভীরু, সরলপ্রাণ এই মানুষটি বিশ্বাস করত, যতই দুর্ভোগ আসুক না কেন জীবনের পরবর্তী পর্যায়টি ভাল হবেই। জনসাধারণের প্রিয় বাজীকরটি গভীর এক বিশ্বাসবোধ থেকে কী ভাবে মাতা মেরীর নিজস্ব বাজীকর হয়ে উঠেছিল—তাই নিয়েই গল্প।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লেখক এডগার অ্যালেন পো-র হাতে ছোটগল্প সূচনাপর্বেই একটি স্থায়ী মাত্রা পেয়েছে। মানবিক অভিজ্ঞতার বিচিত্র ক্ষেত্রের চর্চা, 'স্বপ্নের অন্তর্জগৎ', মায়া ইত্যাদির নির্মাণে তিনি ছিলেন অনন্য। তাঁর বাস্তবতা তথাকথিত বাস্তবতার হিসেব মেনে তৈরি হয়নি। নাথানিয়েল হথর্ন এবং হেরমান মেলভিলের সমসাময়িক লেখক পো ডিফোর 'অবস্থাঘটিত বর্ণনাত্মক ভঙ্গিকে' ব্যবহার করেছেন নতুন ভাবে।

মাত্র চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন পো, এবং জীবদ্দশার শেষের সতেরো বছরে তাঁর গল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল আনুমানিক সত্তরে। 'হৃদ্‌পিণ্ডের ধুকধুক' গল্পে বিচিত্র এক পাগলামোর কথা শুনিয়েছেন লেখক। গল্পের উত্তমপুরুষের চরিত্রটি গল্পের এক বুড়োকে খুন করে। খুন করার একমাত্র কারণ—ওই বুড়োর ছানিপড়া, শকুনের মতো চোখটাকে সে সহ্য করতে পারত না কিছুতেই। কিন্তু নিখুঁত খুনের ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরে হৃদ্‌পিণ্ডের কাল্পনিক একটানা শব্দে বিরক্ত ও ভীত চরিত্রটি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে খুনের কথা কবুল করে ফেলে পুলিশের কাছে। অবসেশানের উদ্ভট এই জগৎ নিয়ে পো 'কালো বেড়াল,' 'উইলিয়াম উইলসন' ইত্যাদি গল্পও লিখেছেন। শুধু এই ধরনের কাহিনীই নয়, আধুনিক গোয়েন্দা-গল্পের জনক পো-এর গল্পের বিষয় ছিল বিচিত্র। দস্তয়েভ্‌স্কি, কোনান ডয়েল, এচ. জি. ওয়েলস এবং রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল অল্পবিস্তর।

মার্কিন কথ্যভাষাকে মার্ক টোয়েনই প্রথম মার্কিন সাহিত্যে নিয়ে এলেন

ব্যাপকভাবে। এদিক থেকে তিনি ছিলেন হেনরি জেমসের পরিশীলিত ভাষা ব্যবহারের ঠিক উলটো দিকে। তথাকথিত বিচারে মার্ক টোয়েনের ভাষা সব সময় ব্যাকরণনিষ্ঠ বা সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকে মার্কিন গদ্যসাহিত্যে তাঁর প্রভাব ছিল গভীর। বিশ শতকের শেরউড অ্যান্ডারসন, হেমিংওয়ে প্রমুখ লেখকও মার্ক টোয়েনের কাছে ঋণী।

ব্রেট হার্টের ধারণায় প্রথমদিকে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন মার্ক টোয়েন, কিন্তু নিজস্ব কণ্ঠস্বর খুঁজে পেতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি। আর্টিমাস ওয়ার্ডের উৎসাহেই লিখেছিলেন 'ক্যালাভিরাস জেলার বিখ্যাত লাফারু-ব্যাঙ'। ক্যালিফোর্নিয়ার পটভূমিতে লেখা গল্পটি ১৮৬৫ সালে নিউ ইয়র্ক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরেই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন লেখক। এই গল্পের জিম স্মাইলি ছিল রাম-জুয়াড়ি, যে-কোনো ধরনের বাজি ধরাই ছিল তার একমাত্র নেশা। বিচিত্র এই চরিত্রটির ড্যানিয়েল নামের পোষা ব্যাঙের কাণ্ডকারখানাতেই তৈরি হয়েছে গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্ত। ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সাহায্যে সরস গল্পটি শুনিয়েছেন লেখক। মিসিসিপি নদীর স্মৃতিবিজড়িত পটভূমিতে টম স্যয়ার ও হাকলবেরি ফিনের অমর অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী রচনাই শুধু নয়; স্নিগ্ধ, সরস ও নানা উদ্ভট বিষয়ের ছোটগল্পেও নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করেছেন মার্ক টোয়েন। তাঁর অন্যান্য বিখ্যাত গল্পের তালিকায় আছে 'বিদেশে ভবঘুরে,' 'টম কোয়ার্টর্জ', 'কুকুরের গল্প' ও 'ঘোড়ার গল্প'।

প্রাদেশিক ঘটনাবলী ও নির্দিষ্ট কোনো এলাকার বৈশিষ্ট্য মার্কিন ছোটগল্পে আসতে শুরু করেছিল ধীরে ধীরে। এবার এলো নিখুঁত কাঠামোর গল্প, এবং সবশেষে প্রবল একটি ধাক্কা। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই ধারার চূড়ান্ত ব্যবহার দেখা যায় ও. হেনরির গল্পে। মুখ্যত অধিক-প্রচারিত সংবাদপত্র এবং পত্রিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্যেই লেখা হয়েছিল গল্পগুলি।

মাত্র আটচল্লিশ বছরে মারা যান ও. হেনরি, কিন্তু ওই সময়ের মধ্যেই তাঁর ছোটগল্পের সংখ্যা ছশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অসম্ভব জনপ্রিয় এই লেখক খবরের কাগজ ও পত্রিকার চাহিদা মেটাতে গিয়ে বেশির ভাগ গল্পকেই করে ফেলেছিলেন তরল ও ছকে-বাঁধা। কিন্তু তার বাইরেও তাঁর গল্প ছিল, আর সেগুলি অসাধারণ। সেইসব গল্পের জন্যেই মার্কিন ছোটগল্পের গ্রেটেস্ট মাস্টারদের সারিতে সসম্মানে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন ও. হেনরি। তাঁর বিখ্যাত সব গল্পের মধ্যে আছে 'মিউনিসিপাল রিপোর্ট', 'একটি অসমাপ্ত গল্প', 'যাজকের উপহার' ইত্যাদি।

মধ্য আমেরিকা, নিউ অরলিন্স এবং টেকসাসকে বহু গল্পের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে ব্যবহার করেছেন ও. হেনরি। নিউ ইয়র্কের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাসিন্দাদের তিনিই প্রথম ছোটগল্পের চরিত্র হিসেবে নিয়ে আসেন। 'ব্যস্ত

শেয়ার-ব্যবসায়ীর প্রেম'-শীর্ষক গল্পের শেয়ার-ব্যবসায়ীটিও নিউ ইয়র্কের মানুষ। এইসব ব্যবসায়ীর প্রতিটি মুহূর্তই কাজে ঠাসা। কাজ বলতে শুধু স্টক আর বণ্ড। মানুষ কিংবা প্রকৃতির কোনো জায়গা নেই এখানে। তবু এখানেই প্রকৃতি তার খেলা খেলেছে। অতিব্যস্ত শেয়ার-ব্যবসায়ীর প্রেম ও বিয়ের ঘটনাটি লেখক এই গল্পে উপস্থিত করেছেন চমকপ্রদ ভঙ্গিতে। ও. হেনরির অধিকাংশ গল্পের ঘটনা ছিল আকস্মিক এবং সমাপ্তি চমকপ্রদ। এ-জন্যেই অনেকে তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ইয়াঙ্কি মপাসাঁ'।

শুধু আমেরিকাতেই নয় ইংল্যাণ্ডেও একজন লেখককে মপাসাঁ বলে ডাকা হত, তাঁর নাম সমারসেট মম। মম তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই 'দি সামিং আপ'-এর এক জায়গায় লিখেছেন, 'আমি যখন লিখতে শুরু করি তখন গি দ মপাসাঁর বিরাট এক প্রভাব ছিল আমার ওপর।'

সেই সময় প্যারিসে গেলে বইয়ের দোকানেই মমের সময় কেটে যেত অনেকটা। মপাসাঁর শস্তা দামের বইগুলি তিনি কিনেছিলেন। কিন্তু বেশি দামের বইগুলো কেনার সঙ্গতি না থাকায় দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পড়ে ফেলতেন গল্প-উপন্যাসের অংশবিশেষ। এই ভাবে বছর-কুড়ি বয়েসের মধ্যে মম তাঁর প্রিয় লেখকের অধিকাংশ লেখাই পড়ে ফেলেছিলেন। তারপর ঝুঁকেছিলেন স্তাঁদাল, বালজাক, ফ্লবের এবং আনাতোল ফ্রাঁসের দিকে।

'দি সামিং আপ' বইটির আর এক জায়গায় মম এমন একটি মন্তব্য করেছেন যেটি এই প্রসঙ্গে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। মম জানিয়েছেন, তিনি যখন ছোটগল্প লেখায় খুব মন দিয়েছিলেন তখন চেকভের ছোটগল্পের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। রুশ দুঃখবোধ, রুশ দর্শন, রুশ মৃত্যুচিন্তা, রুশ অসহায়তা, রুশ উদ্দেশ্যহীনতা চেকভের গল্পের মাধ্যমে আমদানি করা হয়েছিল সারে অথবা মিশিগানে, ব্রুকলিন কিংবা ক্ল্যাপহামে।

মন্তব্যটির মধ্যে সত্য আছে অনেকখানি। মমের মধ্যে অবশ্য চেকভ ততখানি নেই যতখানি আছেন মপাসাঁ। তবে এঁদের সরিয়ে রেখেই মম আস্তে আস্তে মম হয়ে উঠেছিলেন। সমালোচকদের একটি বড় অংশ কিন্তু মমের প্রতি নির্মম ছিলেন, আর মমের আত্মকথায় তার প্রতিচ্ছায়া আছে। মম বলেছেন, 'আমি যখন কুড়ির কোঠায় সমালোচকদের বিচারে তখন আমি পাশবিক, ত্রিশের কোঠায় বাচাল, চল্লিশের কোঠায় বিশ্বনিন্দুক, পঞ্চাশের ঘরে শক্তিশালী লেখক, কিন্তু এখন এই ষাটের কোঠায় পৌঁছে তাঁদের বিচারে হয়ে গেলাম পল্লবগ্রাহী।'

দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন মম, তবে তাঁর প্রথম এবং মধ্যবয়সে লেখা গল্পগুলির প্রতিই আজকের পাঠকদের আকর্ষণ বেশি। স্বচ্ছ, সরল ভঙ্গিতে গল্প ফাঁদার ক্ষমতা ছিল তাঁর। সংকলনে গৃহীত মমের 'স্বপ্ন' গল্পের পটভূমিকা রাশিয়ার এক রেস্টুরেন্টে। গল্পের বিপত্নীক এক চরিত্র তার পরলোকগত স্ত্রীর বিচিত্র

স্বপ্ন ও করুণ পরিণতির কথা এমন ভঙ্গিতে শুনিয়েছে যার মধ্যে রহস্যের উপাদান মিশে আছে অনেকখানি। মমের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্পের তালিকায় আছে 'বন্ধ দোকান', 'সম্পদ', 'জেন' ইত্যাদি।

মমের চাইতে বছর-দশেকের বড় আর একজন ইংরেজ লেখক ওই সময় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর নাম উইলিয়ম উইমার্ক জেকব্‌স। মজার গল্প, উদ্ভট ও অলৌকিক কাহিনী রচনায় তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন, রাতের পাহারাদার এবং ডক-এলাকার বাসিন্দারাই ছিল এই লেখকের গল্পের প্রধান সব চরিত্র। 'দি স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন'-এর নিয়মিত লেখক একটিমাত্র গল্পের জন্যেই জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। সংকলিত এই গল্পটির নাম 'বাঁদরের থাবা'। গল্পের মন্ত্রপূত একটি বাঁদরের থাবার তিনটি ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু ফল নাকি শুভ হয় না। নিছক এক কৌতূহল থেকে গল্পের শুরু। তারপর সংস্কার, সংশয়, আচ্ছন্নতা ও বিস্ময়কে অবলম্বন করে গল্পে ভয়াবহ এক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

॥ চার ॥

অনেকের বিচারে জার্মান সাহিত্যে গ্যয়টের পরেই টমাস মানের স্থান। 'বুড্‌ডেন্‌ব্রুক্‌স' উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র সমাদৃত হয়েছিলেন মান। অবশ্য এই উপন্যাসটির সঙ্গে জন গলসওয়ার্দি'র 'ফরসাইট সাগা'র কিছু সাদৃশ্য আছে। মানের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা 'ভেনিসে মৃত্যু' ও 'জাদু পাহাড়'-এ। শোপেন-হাওয়ার এবং নীৎশের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ মান মানবচরিত্রের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন নিজস্ব ভাষায়। সঙ্গীতের অন্তর্ভেদী বিস্তারকে তিনি নানা ভাবে ব্যবহার করেছেন সাহিত্যে। তাঁর বিচারে পতন, অবক্ষয়, ব্যাধি, বিপদ ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গীতের গভীরতম যোগ আছে। মানুষের জীবনে এই সঙ্গীতের বহুমাত্রিক প্রকাশ। 'বিস্ময়-বালক' গল্পে কঠিন বাস্তবজগতের পরিপ্রেক্ষিতে একজন বালক-শিল্পীর বোধ, বিস্ময় ও নিঃসঙ্গতা তুলনারহিত ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে। মানের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্পের মধ্যে আছে 'ছোট্ট হের ফ্রিডমান', 'ওয়ার্ডরোব', 'ক্ষুধার্ত', 'রেল-দুর্ঘটনা' ইত্যাদি।

মানের চাইতে বয়সে মাত্র দু-বছরের ছোট আর একজন জার্মান লেখক হেরমান হেসের সুতীব্র আগ্রহ ছিল রহস্যানুভূতির প্রতি। মানের গভীর প্রভাবকে অতিক্রম করে হেস তাঁর নিজস্ব পথ আবিষ্কার করেন। কবিতা দিয়ে সাহিত্যজীবনের শুরু, তারপর চলে এলেন উপন্যাস ও গল্পের জগতে। দর্শনে অনুরাগী এবং মানবতাবাদে বিশ্বাসী হেসের ভাষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য

গীতিময়তা। ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিমানুষ ও শিল্পীর কথা লিখতে গিয়ে স্বচ্ছন্দ হতেন লেখক। তাঁর বিখ্যাত 'কবি' গল্পের চীনে কবি হ্যান ফুকের একমাত্র আকাঙ্ক্ষাই ছিল নিখুঁত এক কবি হওয়ার। কবিতার রহস্য ছাড়া আর কোনো রহস্যের প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু জীবনের নিজস্ব কিছু চাহিদা আছে, সেই চাহিদা থেকে সংঘাত ও সংকট তৈরি হয়; তার মধ্যে পড়তে হয়েছিল এই কবিকে। হেসের শ্রেষ্ঠ গল্পের সংগ্রহে 'কবি'র সঙ্গে আছে 'অগাসটাস', 'অন্য জগতের বিচিত্র খবর', 'ফ্যালডাম' ইত্যাদি।

জার্মান লেখক ব্রেখ্ট বিশ শতকের প্রথম ভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। থিয়েটার-প্রফেটদের ভবিষ্যদ্বাণীকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাতারাতি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ব্রেখ্টের 'থ্রিপেনি অপেরা'। এই অপেরা-জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল পুরো বার্লিন। বিতর্কেরও কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন ব্রেখ্ট। তাঁর বিরুদ্ধে প্লেজিয়ারিজমের অভিযোগ এনে কেউ-কেউ বলেছিলেন, তিনি মার্লো, শেকসপিয়র থেকে শুরু করে কিপ্‌লিং, গোর্কি প্রমুখের রচনা নিজের বলে চালিয়ে দিয়েছেন নির্বিচারে। অ্যারিস্টটলের তত্ত্বে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস ছিল বিশেষ এক রাজনৈতিক ধারণায়। মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত ব্রেখ্ট পথ-চলতি মানুষের ভাষা থেকে নিজের ভাষা তৈরি করেছিলেন। শুধু নাটক নয়, কবিতা ও ছোটগল্পের প্রতিও তাঁর বেশ আগ্রহ ছিল।

'বেয়াড়া বুড়ী' গল্পের ঠাকুমা পর-পর দুটি জীবন যাপন করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি মেয়ে, স্ত্রী আর মা। পরের জীবনে শুধুই মিসেস বি। শেষের জীবনটির আয়ু মাত্র দু-বছরের, কিন্তু এই সামান্য সময়ের মধ্যেই প্রগাঢ় এক মুক্তির স্বাদ পেয়েছেন তিনি।

এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক ফ্রান্‌জ কাফ্‌কা ব্যক্তিমানুষের বিক্ষত আত্মার অনুসন্ধান চালিয়েছেন তাঁর প্রতিটি রচনায়। লেখকের যন্ত্রণা, হতাশা ও নিঃসঙ্গতা আলাদা মাত্রা পেয়েছে প্রগাঢ় এক উপলব্ধির জগতে। আত্মপ্রকাশের প্রকৃত মাধ্যম আবিষ্কারের জন্য লেখক বেদনাদায়ক, অন্তহীন একটি পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর অন্তর্জগৎ রহস্যময় এবং সেখানকার কোনো রহস্যেরই তথাকথিত সমাধান নেই। 'মেটামরফোসিস' গল্পের গ্রেগর সামসা এক সকালে উঠে দেখল যে, সে এক বিশাল পোকায় পরিণত হয়েছে। সত্যি-সত্যি পোকা, কোনো স্বপ্ন নয়। শেষে সংসারের মানুষদের চূড়ান্ত এক ঔদাসীন্যের শিকার হল গ্রেগর। অসাধারণ এই গল্পটির নির্মম এক সমালোচক ছিলেন কাফ্‌কা নিজেই। ডায়েরির এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'মেটামরফোসিস যাচ্ছেতাই লাগছে। শেষ অংশটা তো অপাঠ্য। যাকে বলে প্রায় মজ্জায় মজ্জায় অপরিণত।'

তাঁর ডায়েরির পাতায় 'একজন স্কুলশিক্ষক' গল্পটির প্রসঙ্গও এসেছে একাধিকবার। গল্পটি তিনি নাকি তেমনকিছু না ভেবেই শুরু করেছিলেন, কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি সহজে। বারবার ধরার পরেও গল্পটি নাকি অর্ধসমাপ্তই থেকে গিয়েছিল বেশ কিছুদিন। সেই সময় 'একজন স্কুলশিক্ষক'-এর পাশাপাশি অসমাপ্ত রচনার তালিকায় ছিল 'বিচার', 'কালডা রেলওয়ের দিনগুলি', 'সহকারী অ্যাটর্নি" ইত্যাদি। লেখা শেষ না হলে কষ্ট পেতেন কাফ্‌কা, আর লেখা শেষ হওয়ার পরে তাঁর কষ্টের মাত্রা নাকি আরো বেড়ে যেত। শতাব্দীর অবিস্মরণীয় প্রতিভা কাফ্‌কা মারা গিয়েছিলেন মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে।

'একজন স্কুলশিক্ষক' সম্পূর্ণ নতুন ধারার একটি গল্প। গল্পের মধ্যে সে-অর্থে কোনো কাহিনী নেই। আছে শিক্ষকের কথা, আছে মূষিকের কথা, আছে আবিষ্কার-কাহিনী ও বইয়ের প্রসঙ্গ। এবং এ-সব নিয়েই প্রথাবিরোধী গল্পটি সম্পূর্ণ অন্য চরিত্রের হয়ে উঠেছে। কাফ্‌কার অন্যান্য বিখ্যাত গল্পের মধ্যে আছে 'পেনাল কলোনিতে', 'চীনের মহাপ্রাচীর', 'পাশের গ্রাম', 'একটি পুরনো পাণ্ডুলিপি' ইত্যাদি।

কাফ্‌কার সমসাময়িক জেমস জয়েস। 'মহান অস্পৃশ্য' জয়েস তাঁর ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি, স্বগতভাষণ, চেতনাপ্রবাহরীতি ইত্যাদির জন্য সাহিত্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ আলাদা একটি জায়গা পেয়েছেন। প্রতীকধর্মী উপন্যাস তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। দর্শন, ব্রহ্মবিদ্যা এবং বিদেশী ভাষায় ছিল তাঁর অগাধ অধিকার। ইংরেজি ভাষায় তিনি নতুন ফর্ম ও অর্থ আনতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন, প্রচলিত শব্দ ও শব্দাংশ নতুন সমাহারে নতুন আবহ তৈরি করুক।

স্যামুয়েল বেকেট তাঁর 'আমাদের বিচার' নিবন্ধের এক জায়গায় জয়েসের রচনাপদ্ধতি সম্পর্কে লিখেছেন : এখানে ফর্ম বিষয়, আবার বিষয়ও ফর্ম। আপনি অভিযোগ তুলেছেন যে, এটি ইংরেজিতে লেখা নয়। না, এটি লেখাই হয়নি আদপে। পড়ার জন্যে নয় এটি, অথবা বলা যেতে পারে যে, এটি শুধুমাত্র পড়ার জন্যে নয়। এর দিকে তাকাতে হবে, এর কথা শুনতে হবে। তাঁর লেখা কোনো-কিছু নিয়ে নয়, সব নিয়েই লেখাটি কিছু-একটা হয়ে উঠেছে। ...বিষয় যখন ঘুম, তখন শব্দগুলিই ঘুমিয়ে পড়ে ; বিষয় যখন নৃত্য, তখন শব্দগুলিই নেচে ওঠে।

ইভ্‌লেইন গল্পের ইভ্‌লেইন বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে যায় প্রেমিক ফ্রাঙ্কের সঙ্গে। একদিকে সুখের জীবনের ডাক, অন্যদিকে একঘেয়ে জীবনযাত্রার ক্লান্তি। তবু দোটানায় পড়ে মেয়েটি। অতীতের বহু কথা তার মনে পড়ে যায় একসঙ্গে। মনে পড়ে মৃত মায়ের কথা, পিকনিকের ঘটনা, বাবার আগের ও আজকের চেহারা। সংশয় দানা বাঁধে একটু-একটু করে। শেষে তীব্র এক

অনিশ্চয়তার মধ্যে শেষ হয় গল্পটি। জয়েসের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গল্পের তালিকায় আছে 'একটি সংঘর্ষ,' 'দৌড়ের শেষে,' 'একটুকরো মেঘ,' 'একজন মা,' 'মৃত' ইত্যাদি।

দুই বিশিষ্ট মার্কিন লেখক আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এবং উইলিয়ম ফকনারের বিশাল এক অবদান আছে আজকের ছোটগল্পে। এঁদের জীবনদর্শন, গল্প-সম্পর্কিত ধারণা, বিষয়, বর্ণনাত্মক ভঙ্গি পরবর্তীকালের লেখকদের প্রভাবিত করেছে অনেকখানি।

টোরোন্টো সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হিসেবে প্যারিসে থাকার সময় হেমিংওয়ের সাহিত্যজীবনে এসেছিলেন গারট্রুড স্টেইন এবং এজরা পাউন্ড। কথ্য ভাষার ব্যবহার, খুব সহজ শব্দনির্বাচন, সংক্ষিপ্ত ও স্বচ্ছ বাক্যনির্মাণ এবং পুনরুক্তির ক্রমাগত ব্যবহারে হেমিংওয়ে হয়তো শেরউড অ্যাণ্ডারসনের কাছে অল্পবিস্তর ঋণী। কিন্তু এই ঋণের বোঝা তাঁকে বেশিদিন টানতে হয়নি, এ-সবই তাঁর নিজস্ব স্টাইলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল আশ্চর্যভাবে। প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিতেন লেখক। তাঁর গল্প-উপন্যাসের চরিত্রদের মধ্যে বারবার এসেছে মদ্যপ, শিকারী, সৈনিক এবং মুষ্টিযোদ্ধা: লেখকের ব্যক্তিগত জীবন-যাত্রা পদ্ধতিও নাকি ছিল এইসব কল্পিত মানুষের কাছাকাছি। নিজের জীবনের বহু ঘটনাই তিনি সরাসরি তুলে এনেছেন সাহিত্যে। ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া থাকা বা না-থাকা বড় কথা নয়, শুদ্ধ শিল্পের শর্তেই অসাধারণ সব গল্প লিখেছেন হেমিংওয়ে। এইসব গল্পের মধ্যে আছে 'ডাক্তার এবং ডাক্তারের স্ত্রী,' 'ফ্রান্সিস মেকমবারের ছোট্ট সুখী জীবন,' 'কিলিমান্‌জারোর তুষার' ইত্যাদি।

হেমিংওয়ে বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিগত জীবনে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার চর্চা থাকলেই একজন মানুষ যে-কোনো প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও অবিচল থাকতে পারে। রিক্ত জীবনও সম্পূর্ণ নতুন এক তাৎপর্য নিয়ে উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। এই প্রসঙ্গে 'জুয়াড়ি, সন্ন্যাসিনী ও রেডিও' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষ ওই দিকটির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে 'একটি পরিচ্ছন্ন, ভালো-আলোকিত ঠাঁই' গল্পে। গল্পের বৃদ্ধ চরিত্রটি কাফেতে বসে শেষরাত পর্যন্ত মদ খায়। বৃদ্ধ নাকি আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। একে নিয়ে কথা শুরু হয় কাফের তরুণ ও বয়স্ক ওয়েটারের মধ্যে এবং এদের কথোপকথনের মধ্যেই গল্প এগিয়ে যায় অনেকখানি।

বয়স্ক ওয়েটারটি নিঃসঙ্গ ওই বৃদ্ধের দুঃখ বুঝতে পেরেছিল। দুজনের মধ্যে কোথায় যেন বেশ মিলও আছে। দুজনেই জানে জীবনের অর্থ শূন্যতা, মানুষ মানেও শূন্যতা। একজন শূন্য মানুষ যখন এটা জেনে ফেলে তখন তার ভাবনার জগতের অন্ধকার দূর করার জন্যে একটি পরিচ্ছন্ন ও আলোকিত জায়গার দরকার হয়। কাফের ওই বুড়ো মানুষটির জীবনে আরও একটি

সত্য আছে—তা হল, এইরকম অবস্থার মধ্যেও আত্মনিয়ন্ত্রণ হারাতে নেই। বৃদ্ধ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিতেই মদ্যপান করে। ওয়েটারের কথা থেকেই জানা যায়, শেষ রাতের কাফে থেকে বেরুবার সময় বৃদ্ধের পা টলে গেলেও মর্যাদার ভাব নষ্ট হয় না। এটি বোধহয় লেখক হেমিংওয়ের 'কোড,' যা তাঁর 'অন্য দেশে' গল্পেও আছে।

উইলিয়ম ফকনারের আবির্ভাব কবিতা নিয়ে। কবিতাগ্রন্থ 'দি মার্বেল ফন'-এ কীটস এবং সুইনবার্নের সুস্পষ্ট প্রভাব আছে। বইটির প্রকাশকাল ১৯২৪। ফকনার পরের বছরের কয়েক মাস কাটান নিউ অরলিন্সে, এখানেই শেরউড অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। তারপরেই গদ্য রচনার দিকে মন দেন ফকনার। নিউ অরলিন্সের সাহিত্যপত্রিকা 'ডবল ডিলার'-এ তাঁর স্কেচধর্মী কিছু লেখা ছাপা হয়, 'নিউ অরলিন্স টাইমস'-এ প্রকাশিত হয় ষোলোটি গল্প।

গল্পগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসিক পাঠকদের চোখে পড়েছিলেন লেখক, কিন্তু বিদগ্ধ সমালোচকদের প্রশংসা পান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। 'স্যাংচুয়ারি'র তারিফ করে উল্লেখযোগ্য একটি ভূমিকা লেখেন অঁদ্রে মালরো। সার্ত্র্ লিখলেন ফকনারের ওপর সুদীর্ঘ এক নিবন্ধ, যা লেখকের বৈশিষ্ট্যকে বোঝার ব্যাপারে সাহায্য করে নানাভাবে।

ফকনারের লেখার অন্যতম প্রধান বিষয় দক্ষিণ আমেরিকার অভিজাত সম্প্রদায়ের পতন। লেখক দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন মিসিসিপিতে, ওই এলাকার জীবনযাত্রা থেকেও তিনি তাঁর লেখার উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

ফকনারের 'কালেকটেড স্টোরিজ' প্রকাশিত হয় ১৯৫০-এ, কিন্তু এর অনেক আগেই তাঁর ছোটগল্প লেখা ধরতে গেলে থেমে গিয়েছিল। সংকলনের অধিকাংশ গল্পেরই রচনাকাল ত্রিশ এবং চল্লিশের দশক। তাঁর বিখ্যাত গল্পের তালিকায় আছে 'বিচার,' 'ভালুক শিকার,' 'নিচে যাও মোজেস,' 'ওয়াশ' ইত্যাদি।

'ওয়াশ' গল্পের মূল কাঠামোটি লেখক তাঁর পরবর্তীকালের বিখ্যাত উপন্যাস 'আবসালম, আবসালম'-এ ব্যবহার করেছেন। 'ওয়াশ'-এর কর্নেল সাটপেনের বয়েস ষাট। আশ্রিত ওয়াশ জোন্সের মেয়ে মিলির গর্ভে জন্মায় সাটপেনের সন্তান। ওয়াশের মনে কর্নেলের আলাদা একটি ছবি ছিল—সেটি বীরত্বের এবং মর্যাদার। কাল্পনিক ওই ছবিটি নিয়ে গোপন এক অহংকারও ছিল ওয়াশের। কিন্তু সাটপেন যখন মিলি এবং তার সন্তানের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব দিল ঘোড়া ও ঘোড়ার সদ্যোজাত বাচ্চার দিকে তখন ওয়াশের সেই কাল্পনিক ছবিটি মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। এই মোহভঙ্গের পরেই ঘটনাক্রম বাঁক নিল আচমকা। সেই বাঁকে শুধু সাটপেনই নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হল ওয়াশ এবং মিলিও।

॥ পাঁচ ॥

ফকনারের কঠোর সমালোচকদের একজন ছিলেন ভ্লাদিমির নবোকভ। শুধু ফকনারই নন, তাঁর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন ফ্রয়েড এবং মান্‌ও।

'লোলিটা'র লেখক হিসেবে নবোকভ সারা পৃথিবীতে প্রচারিত হলেও তাঁর আর একটি উজ্জ্বল দিক আছে। এটি সমালোচনার দিক। বিশ্বসাহিত্যের বেশ কিছু মাস্টারপিসের অসাধারণ বিশ্লেষণ করেছেন নবোকভ সম্পূর্ণ নতুন এক দৃষ্টিকোণ থেকে।

নবোকভের বিচারে 'মহৎ উপন্যাস আসলে মহৎ রূপকথা।' লেখকের তিনটি রূপ। কখনো তিনি নিছক গল্পবলিয়ে, কখনো শিক্ষক, কখনো জাদুকর। সত্যিকারের একজন বড় লেখকের মধ্যে এই তিনটিরই সমন্বয় ঘটে থাকে, তবে তিনটির মধ্যে জাদুকরী মায়াই প্রধান। একজন বড় লেখক প্রকৃত অর্থে একজন বড় ইন্দ্রজালিক।

নবোকভ বলেছেন, সাহিত্য আসলে আবিষ্কার। কোনো গল্পকে সত্য-কাহিনী বলার অর্থ সত্য এবং গল্প উভয়কেই অপমান করা। প্রত্যেক বড় লেখকই একজন বড় প্রবঞ্চক। কথাটি হয়তো ধাক্কা-দেওয়া, কিন্তু লেখক এই ভাবেই রসগ্রহণের পথের হদিশ দিয়েছেন। বলেছেন, সাহিত্যের জন্ম সেদিনই হয়েছে যেদিন সেই রাখালবালক মিথ্যে-মিথ্যে বাঘ বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। শিল্প-সাহিত্যের মায়া ছিল বাঘের ওই কল্পিত ছায়ায়, ছায়া নির্মাণ করেছিল বালকটি। গল্প ছিল বাঘের স্বপ্নে, বালকের কৌশল জমিয়ে দিয়েছিল গল্পটিকে। বালকটির সত্যি-সত্যি বাঘের কবলে পড়া নেহাতই একটি দুর্ঘটনা। ঘন ঘাসের আড়ালের সত্যি বাঘ আর ঘনবুনট গল্পের মিথ্যে বাঘের মধ্যিখানের প্রিজম্‌টিই সাহিত্য-শিল্প।

মিথ্যে কথা বলে রাখাল-বালকের বাঘের পেটে যাওয়ার গল্পটি শিক্ষাপ্রদ। এর থেকে শিক্ষা নিতে পারে অনেকে। কিন্তু ওই বালকটির আসল পরিচয় সে জাদুকর, আবিষ্কারক ও সাহিত্যস্রষ্টা।

'ইশারা ও প্রতীক' গল্পে পাগল ছেলেকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ যৎসামান্য ঘটনা, স্মৃতিচারণ, পুরনোদিনের ফোটোগ্রাফ, টুকরো-টুকরো সংলাপ ও টেলিফোনের হঠাৎ-হঠাৎ বেজে ওঠাকে আশ্রয় করে অনিশ্চিত ও বিস্ফোরক এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। গল্পের পরিবেশ শীতল ও ঝিমধরা। গল্প-নির্মাণে ইঙ্গিত ও আভাসের মস্ত এক ভূমিকা আছে। 'মহৎ ভাবনা' নয়, সুসংবদ্ধ গঠন, সুনির্বাচিত শব্দ ও গীতিময়তার সাহায্যে অন্তরাত্মার রহস্য উন্মোচন করতে চেয়েছেন নবোকভ। 'ইশারা ও প্রতীক' প্রথম ছাপা হয়েছিল 'নিউ ইয়র্কার'-এ। নবোকভের অন্যান্য বিখ্যাত গল্পের তালিকায় আছে 'একজন

বিস্মৃত কবি', 'সহকারী প্রযোজক,' 'প্রথম প্রেম,' 'মেঘ, দুর্গ, হ্রদ' ইত্যাদি।

হোর্হে লুইস বোর্হেস একেবারে ভিন্ন ধারার লেখক। তাঁর গল্পে তিনি ফ্যান্টাসি, কল্পবিজ্ঞান, গোয়েন্দা-গল্প, নিবন্ধ ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন অনবদ্য ভঙ্গিতে। টাইম পত্রিকার বিচারে 'স্প্যানিশ ভাষার জীবিত লেখকদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ।' আধুনিক ক্লাসিকের অন্যতম প্রধান সম্পদ বোর্হেস অবশ্য গত বছর মারা গেছেন।

দর্শনের একান্ত অনুরাগী বোর্হেসের লিটারারি কোনো স্কুলের প্রতি আস্থা ছিল না। তাঁর মতে ভাষা একটি ঐতিহ্য, প্রতীকের যথেচ্ছ ব্যবহার নয়। এই ঐতিহ্যের ছায়ায় একজন সৃষ্টিশীল লেখক তাঁর পথ আবিষ্কার করেন শুধু। শিল্প সম্পর্কে অনড় কোনো ধারণা ছিল না বোর্হেসের। বিশ্বাস করতেন, একজন লেখকের কল্পনার প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া উচিত। তথাকথিত 'বাস্তবতা' নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো দরকার নেই। করণীয় বিষয় কী হবে. সে সম্পর্কে শিল্পীর আগে থেকে কিছুই জানা সম্ভব নয়।

বোর্হেসের প্রিয় লেখকদের তালিকায় আছেন সুইফ্‌ট, পো, এচ. জি. ওয়েলস প্রমুখ। ব্রাউনিংয়েরও অনুরাগী ছিলেন তিনি। তাঁর ওপর কোন্‌ কোন্‌ লেখকের প্রভাব আছে জানাতে গিয়ে বোর্হেস লিখেছেন—যাঁদের লেখা তিনি পড়েছেন তাঁদের লেখার প্রতিধ্বনি তাঁর লেখায় পাওয়া যায়, আবার যাঁদের লেখা তিনি কখনোই পড়েননি তাঁরাও আছেন তাঁর মধ্যে।

শেষের এই কথাটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। যে-কোনো লেখকই বোধহয় না-পড়া কোনো লেখকের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারেন নিজের অজান্তে, সজ্ঞানে মিশে যেতেও বাধা নেই। অতীতের অমর কোনো কাহিনী একজন লেখক সৃষ্টি করতে পারেন আবার। ডন কুইকজোট নতুন করে লিখতেই বা বাধা কোথায়!

বোর্হেসের গল্পগুলি একেবারে অন্য ধাঁচের। গল্পের চেহারা আপাত-দৃষ্টিতে বেশ সহজ-সরল, কিন্তু পঠন ও পুনর্পঠনে এই গল্পেরই নতুন-নতুন মাত্রা বেরিয়ে আসে। গল্পের মধ্যে প্রশ্ন তোলেন লেখক, সময় ও বাস্তবতা নিয়ে জিজ্ঞাসা দেখা দেয়, তারপরেই হয়তো দানা বেঁধে ওঠে ফ্যান্টাসটিক কোনো প্লট।

নিজের রচনাপদ্ধতি নিয়ে পরিষ্কার মন্তব্য করেছেন বোর্হেস। লিখেছেন—ফর্মের সামান্য একটি আভাস অবলম্বন করে লেখা শুরু করেন তিনি। লেখাটি গল্প কিংবা কবিতা হতে পারে। শুরুতে শুধু লেখার প্রথম এবং শেষটা চোখে পড়ে, কিন্তু মাধ্যখানে কী থাকবে সে-সম্পর্কে কোনো ধারণাই তাঁর থাকে না! মধ্যবর্তী অংশটা ধীরে ধীরে নিজের খেয়ালে তৈরি হয়। সৃষ্টিধর্মী কাজের এই অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে বোর্হেস নাক গলাতে চাননি কখনো।

লিখেছেন, নিজের মতামতকে জোর করে চাপিয়ে দিয়ে লেখার স্বাভাবিক প্রবাহকে তিনি নষ্ট করেন না।

'বোর্হে'স এবং আমি' গল্পের 'আমি' ও 'বোর্হে'স' আলাদা দুই ব্যক্তিত্ব। এই দুই ব্যক্তিত্ব আবার এক হয়ে যায়। তবে আলাদা ও এক হওয়ার মধ্যে রহস্য ও বিভ্রম থেকে গেছে। গল্পের পাতাটি কার লেখা—তা নিয়েও সংশয়।

গল্পটির মধ্যে বোর্হে'সের একটি প্রিয় তত্ত্বকে আবিষ্কার করা যেতে পারে। তত্ত্বটি হল, যা-কিছু ভাল তা কখনোই ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হতে পারে না। সবই আসলে ভাষা ও ঐতিহ্যের অন্তর্গত। বোর্হে'সের বিখ্যাত সব গল্পের মধ্যে আছে 'অন্য,' 'আরো জিনিস আছে,' 'আয়না ও মুখোশ' এবং 'ঘুষ'।

'নির্বাচিত কয়েকজন' কিংবা 'জনসাধারণ'—এই দুই সম্প্রদায়ের কারো জন্যেই বোর্হে'স লেখেননি। কারণ, ওই দুই সম্প্রদায় বলতে ঠিক কী বোঝায়—তা তাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। কেন লেখেন, কাদের জন্যে লেখেন—এইসব প্রশ্নের উত্তরে লেখক জানিয়েছেন: আমি নিজের জন্যে লিখি, বন্ধুদের জন্যে লিখি, ভালভাবে সময় কাটানোর জন্যে লিখি।

এই ধরনের প্রশ্নের সামনে অনেক লেখককেই পড়তে হয়েছে। জঁ পল সার্ত্র্ তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'ওয়ার্ড্‌স'-এ মজা করে লিখেছেন—'একজন মানুষ হয় প্রতিবেশী নয় ভগবানের জন্যে লেখে। আমি আমার প্রতিবেশীদের বাঁচাবার ইচ্ছেতেই ভগবানের জন্যে লিখব বলে ঠিক করেছিলাম।'

মাত্র পাঁচ বছর বয়েসে সার্ত্রের নাকি প্রথম মৃত্যুদর্শন হয়, আর এই মৃত্যুর প্রেমেই তিনি মজে ছিলেন আমৃত্যু। সার্ত্র্ লিখেছেন, 'মৃত্যু আমাকে নেশার মতো টানত, কারণ জীবনকে আমি কখনো পছন্দ করিনি।' নিজেকে তিনি মৃত ভাবতেন। কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল 'একমাত্র মৃত ব্যক্তিরাই অমরত্ব লাভ করে।' যুক্তিবাদী লেখক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না, তবে বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরবিশ্বাসীদের।

সার্ত্রের প্রথম উপন্যাস 'নসিয়া' প্রকাশিত হয় ১৯৩৮-এ। কয়েকজন সমালোচকের মতে এটি শতাব্দীর সবচাইতে বেশি প্রভাববিস্তারকারী ফরাসী উপন্যাস। 'নসিয়া' যে-বছর প্রকাশিত হয় সেই বছরেই উপন্যাসটির সমালোচনা করেন কামু আলজিয়ার্স রিপাবলিকান-এ। এটি নিছক কোনো গ্রন্থ-সমালোচনা নয়, প্রধান এক লেখকের মূল বৈশিষ্ট্যকে চিনিয়ে দিয়েছেন আর এক প্রধান লেখক।

বইটির সমালোচনা করতে গিয়ে কামু লিখেছেন—'উপন্যাস দর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়, এই দর্শন আসে বিভিন্ন চিত্রকল্পের আধারে। এবং একটি ভাল উপন্যাসে এই দর্শনটুকু চিত্রকল্পে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু দর্শন যদি চরিত্র ও কার্যক্রমকে ছাপিয়ে ওঠে, এবং তার ফলে তা যদি ওই সৃষ্টকর্মের ওপর

ছাপমারা গোছের দেখায়, তাহলে বিষয় প্রামাণ্যতা হারায় ও উপন্যাসটি প্রাণহীন হয়ে পড়ে।'

সমালোচক বলেছেন, সুগভীর ভাবনার অভাব থাকলে কোনো সৃষ্টিই কালজয়ী হতে পারে না। অভিজ্ঞতা ও ভাবনা, জীবন ও তার অর্থের প্রতিচ্ছায়ার গোপন মিশ্রণ ঘটে একজন বড় ঔপন্যাসিকের হাতে।

কামুর বিচারে নসিয়ায় এই নিখুঁত ভারসাম্য বজায় থাকেনি, তত্ত্বের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জীবন। বইটি যতখানি স্বগতভাষণ ততখানি উপন্যাস নয়। এতে কাফ্‌কার ছায়াও দেখেছেন সমালোচক, কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও নসিয়া অসাধারণ। চমৎকার বিচার-বিশ্লেষণে কামু জানিয়েছেন, সার্ত্র খুব বড় মাপের লেখক।

পরের বছর সার্ত্রের 'দি ওয়াল'-শীর্ষক ছোটগল্পের বইটি বার হয়, এবং এটিরও সমালোচনা করেন কামু ওই আলজিয়ার্স রিপাবলিকান-এ। কামুর মতে সার্ত্রের নসিয়ার বিচিত্র ও তিক্ত বিষয়ই নতুন ফর্মে দেখা দিয়েছে এই গল্পের বইটিতে, চরিত্রগুলির মধ্যে আছে পাগল ও পাগল-হতে-চাওয়া মানুষ, উৎকেন্দ্রিক, সমকামী, অপরাধী ইত্যাদি। কামু বলেছেন, একজন বড় লেখক সবসময় তাঁর নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে থাকেন। সার্ত্র গল্পগুলিতে নিঃসন্দেহে তাঁর জগৎ নির্মাণ করেছেন, সঙ্গে আছে তাঁর একান্ত বার্তা।

ইরসট্র্যাটাস গল্পটি উত্তমপুরুষে লেখা। গল্পের এই জটিল ও অস্থির চরিত্রটি ধরাবাঁধা সব হিসেবের বাইরে। হোটেলের ঘরে একটি বেশ্যাকে উলঙ্গ অবস্থায় ক্রমাগত হাঁটতে বাধ্য করা, অকারণে একজনকে গুলি করা, বিচিত্র পদ্ধতিতে আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যহীন ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে যদি কিছু থেকে থাকে তার নাম শূন্যতা। সার্ত্রের এই চরিত্রদের প্রত্যেকেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। নিঃসঙ্গ মানুষটি আবার বিচিত্র এক স্বাধীনতার জালে জড়ানো, নিজের শিকল নিজেই বানায়। আধুনিক জীবনের অবক্ষয়, বিষাদ ও ঔদাসীন্যের অবধারিত শিকার সে।

জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা সার্ত্র তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এটিই তাঁর শেষ কথা নয়! বামপন্থী রাজনৈতিক ধারণা এবং তাঁর অস্তিবাদী দর্শনের মিশ্রণ শেষ পর্যন্ত তাঁকে আশাবাদী করে তুলেছিল।

ইরসট্র্যাটাস ছাড়া সার্ত্রের অন্যান্য বিখ্যাত গল্পের তালিকায় আছে 'দেওয়াল,' 'অন্তরঙ্গতা', 'একজন নেতার ছেলেবেলা' ইত্যাদি।

জেমস জয়েসের অন্যতম প্রধান ভাবশিষ্য আইরিশ লেখক স্যামুয়েল বেকেটও দর্শনের গভীর অনুরাগী ছিলেন। ট্রিনিটি কলেজের পড়াশুনো শেষ করার পরে এই দর্শনের দিকে আলাদা করে ঝুঁকে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল দর্শনের সুশিক্ষা যে-কোনো বড় লেখকের পক্ষেই অত্যন্ত জরুরি।

বেকেটের এই ধারণার সঙ্গে পৃথিবীর অধিকাংশ বড় লেখকের চিন্তার আশ্চর্য মিল।

প্রথমে দেকার্তের পাঠ নিলেন বেকেট। ব্যাকরণ মেনে নিয়মনিষ্ঠ পাঠ। এ-ভাবে দর্শন পড়ার জন্যে বছর-ছয়েক নিজের লেখাপত্তর থামিয়ে রেখেছিলেন। দর্শনের পাঠ নেওয়া তো এক অর্থে জীবনেরই পাঠ নেওয়া। জীবনের রহস্য, জটিলতা ও প্রবাহের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া তো সহজ কাজ নয়। জীবনরসিক, সৃষ্টিশীল একজন লেখক তাই চলার পথে মাঝেমধ্যে থমকে দাঁড়ান। দর্শন নবতর চিন্তাতরঙ্গ তোলে তাঁর জীবনে।

একজন চিন্তাশীল মানুষের বোঝা উচিত যে, প্রকৃত স্বাধীনতা শুধুমাত্র মানসিক জগতেই পাওয়া সম্ভব। বোঝা উচিত, নিজের মানসিক অবস্থা ছাড়া আর কোনো কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। সুতরাং বাইরের জগতের কোনো বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সময় ও শক্তির অপব্যবহার করা উচিত নয়। বাইরের এই জগতের মধ্যে নিজের শরীরকেও ধরা উচিত। কারণ, নিজের শরীরও তো অনেক সময় মনের কথা শুনতে চায় না। একজন বিবেচক, বোধসম্পন্ন মানুষ কামনার বিরুদ্ধাচরণ করে না, কিন্তু এ-সম্পর্কে উদাসীন থাকে। অধীত এবং অনুভূত এই দর্শন বেকেটের সারা জীবনের সঙ্গী। বেকেটের 'মারফি'তে এই বোধ সঞ্চারিত হয়েছে প্রগাঢ়ভাবে।

ফরাসী ঔপন্যাসিক এবং ডায়েরিস্ট জুল রেনারের প্রভাব ছিল বেকেটের ওপর। বেকেটের মতে এই রেনারই জীবনকে সঠিক ভাবে নেওয়ার গোপন পথটি আবিষ্কার করেছেন। তিনিই দেখিয়ে দিয়েছেন কী ভাবে নিজের একান্ত অন্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকা যায়, কী ভাবে নিজেকে বিচার করা যায় নিখুঁতভাবে; কী ভাবে নিজের প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রেখে বাস করা যায় বাইরের জগতে। জীবনের যে-কোনো ঘটনা, তা সে যত জটিলই হোক না কেন, উদাসীন ভাবে গ্রহণ করাই হল বেঁচে থাকার সঠিক পথ। বেকেটের 'মেলোন ডাইজ'-এর মেলোন এই ভাবেই জীবনকে দেখেছিল।

এই চিন্তা থেকে একদা কিছু তিক্ততাও এসেছিল বেকেটের মধ্যে। ধারণা হয়েছিল, মানুষ একেবারেই একা। গূঢ় চিন্তা ও গভীর অনুভূতির আদানপ্রদান অসম্ভব। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ঘৃণা করা বা ভালবাসা যায় না। জীবনের অর্থহীনতা এবং ক্লান্তি সত্য, তবে আরো বেশি সত্য বোধহয় অনির্দিষ্ট কোনো ঘটনার জন্যে অপেক্ষা করা।

'বিয়িং' এবং 'নাথিংনেস'-এর সমস্যায় বেকেটও ভাবিত, কিন্তু সার্ত্রের মতো এগ্‌জিস্‌টেনশিয়ালিস্ট হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করা যায় না। প্রথাসিদ্ধ সাহিত্যের অনুসরণ করেননি তিনি, আবার অ্যান্টি-নভেল বা অ্যান্টি-প্লে রচনার মধ্যেও যাননি কখনো। তাঁর পথ একেবারেই আলাদা। ভাষা-ব্যবহারে জয়েসের

কাছে তিনি কিছুটা ঋণী, বিভীষিকার চিত্রণে কাফ্‌কার অল্পবিস্তর প্রভাব পড়েছে তাঁর ওপর, মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটির অন্বেষণে তাঁর মধ্যে দস্তয়েভ্‌স্কির ছায়া দেখেছেন কেউ-কেউ ! তবে এ-সবই বাইরের ব্যাপার। বেকেট বিস্ময়কর ভাবে স্বতন্ত্র।

বেকেটের 'কল্পনা করুন, কল্পনা মৃত' গল্পের অশনাক্ত দুটি চরিত্রের শরীরে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। তবে তাতে কিছু এসে যায় না, কল্পনা তো বেঁচে আছে। কিন্তু কল্পনা যদি মৃত হয়! এবং কল্পনা করেই যদি সেই মৃত কল্পনার কথা জানা যায় ! গল্পটি দাঁড়িয়ে আছে বিচিত্র এক জ্যামিতিক গঠন, বোধ ও বোধহীনতাকে অবলম্বন করে। নিস্তব্ধ এই পরিবেশে একমাত্র সত্যই বুঝি অনন্তকাল ধরে অনির্দিষ্ট কিছুর জন্যে অপেক্ষা করা।

গল্পটিতে সভ্যতা ও মানুষের জায়গা নিয়েছে কিছু মাপজোখ, যার ফল গভীর এক শূন্যতা। প্রাণবন্ত পরিবেশ রূপান্তরিত হয়েছে নিছক এক 'পরিস্থিতি বিবরণে।' মানবিক বোধের জায়গায় এসেছে শৈত্য ও রেখা। বেকেটের অন্যান্য বিখ্যাত গল্পের তালিকায় আছে 'দান্তে এবং গল্‌দা-চিংড়ি,' 'ডিং - ডং', 'ভেজা রাত', 'কী দুর্ভাগ্য' ইত্যাদি। এ-সব গল্প তাঁর প্রথম জীবনের রচনা, কিন্তু এগুলির মধ্যেই বীজাকারে আছে তাঁর পরবর্তীকালের বিখ্যাত তিনটি উপন্যাস।

নিঃসঙ্গতা বেকেটের একটি প্রিয় বিষয়, কিন্তু এর অতি সরলীকৃত রূপকে ঠাট্টা করেছেন তিনি। নিঃসঙ্গতা কামুর কাছেও শৌখিন কোনো বিষয় নয়। কামু তাঁর নোটবুকের এক জায়গায় লিখেছেন, 'নিঃসঙ্গতার কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার কৌশল তোমার যদি জানা থাকে তুমি নিঃসঙ্গতা নিয়ে খুব বেশি লিখবে না।'

এই কথাটি দারুণভাবে সত্যি 'পতন'-এর জঁ-বাপাতিস্ত প্রসঙ্গে। চরিত্রটি তার নিঃসঙ্গতা নিয়ে আলাদা করে কিছুই বলেনি, কিন্তু তার তীব্র নিঃসঙ্গতা পাঠকদের আচ্ছন্ন করে ফেলে আস্তে আস্তে।

বাধাবন্ধনহীন কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন কামু। সেইসঙ্গে সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কেও ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। তাঁর লেখা পড়ার সময় পাঠকদের কখনো-কখনো আলজিরিয়া কিংবা অন্য দেশের মুক্তিসংগ্রামের কথা মনে পড়বে, কখনো মনে পড়বে এগ্‌জিস্‌টেন্‌শিয়ালিস্ট বা রেজিস্টান্স লেখকদের ভূমিকা, কখনো মনে পড়বে ফ্রান্সের নন-কমিউনিস্ট লেফ্‌ট প্রসঙ্গ, দুঃখবাদ এবং নাইহিলিজমের কথাও মনে পড়ে যেতে পারে তবে কামুর রচনায় প্রধান বিষয় হল মানব-চরিত্রের সমীক্ষা ও মানবাত্মার অন্বেষণ। এবং প্রায় সর্বত্রই প্রগাঢ় ভাবে আছে জীবনের দার্শনিক সমস্যা।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পথ ছেড়ে দার্শনিক জিজ্ঞাসার দিকেই বেশি করে

ঝ‍ুঁকেছিলেন কামু। এই ঝোঁক শুধু কামুরই নয়—অঁদ্রে মালরো, সার্ত্র এবং বেকেটেরও ছিল। তবে পথ অবশ্যই আলাদা-আলাদা।

বিমূর্ত ভাব সম্পর্কে কামুর ধারণাটি ছিল অন্যরকম। এই বিমূর্ত চিত্রের একদিকে সুখের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে যন্ত্রণাক্লিষ্ট প্রকৃত জীবন। বিনা প্রশ্নে কিছুই মেনে নেননি লেখক। বিদ্রোহে তাঁর বিশ্বাস ছিল, তবে এটি রাজনৈতিক বিদ্রোহ নয়।

কামুর 'নির্বাসন ও রাজ্য' নামের ছোটগল্পের বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। ওই বছরেই তিনি নোবেল পুরস্কার পান। গল্পগুলিতে রাজনৈতিক ও দার্শনিক সমস্যার আড়ালে স্থান পেয়েছে একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়। সংকলনের পাঁচটি গল্পের চারটিরই পটভূমি মরুভূমিপ্রান্তিক আলজিরিয়া। উল্লেখযোগ্য গল্পের মধ্যে আছে 'দলত্যাগী,' 'নীরব মানুষেরা,' 'অতিথি', 'ব্যভিচারিণী' ইত্যাদি।

'ব্যভিচারিণী' গল্পের জানিন আর মার্সেল এক সুখী দম্পতি। উত্তাপে, ভালবাসায় কেটে গেছে তাদের বেশ কয়েকটি বছর। কিন্তু সুন্দরী জানিন তেমন ভাবে জানতে পারেনি তার সুগভীর নিঃসঙ্গতা আর ভীতির কথা। জানতে পারল মরুভূমির প্রান্তে এসে। আরব বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করতে এসেছিল তার স্বামী মার্সেল। সঙ্গে ছিল জানিন। মুক্তি তাকে পেতেই হবে, কিন্তু কী ভাবে! এমন সময় নিঃশব্দ সেই ডাক কানে এলো তার। নিশুতি রাত, পাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে স্বামী। ঘর ছেড়ে অলৌকিক এক প্রকৃতির মধ্যে এসে হাজির হল জানিন। দীর্ঘ যন্ত্রণা আর মৃত্যুভীতি থেকে সে ক্ষণিকের জন্যে মুক্তি পেল তার বোধের জগতে। গভীর রাতের তারা-ঝলমলে আকাশ ঠিক প্রেমিকের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে জানিনের ওপর। তবু তাকে ফিরে আসতে হয় স্বামীর কাছে।

॥ ছয় ॥

বলা যেতে পারে, ১৯১৭-র সাহিত্য-আন্দোলন থেকেই আধুনিক চৈনিক সাহিত্যের জন্ম। ধ্রুপদী কবিতা ও গদ্যের জায়গা নিল কথ্য ঢঙের রচনা। লু সুনও কথ্য ভঙ্গির লেখক, নতুন ধাঁচের মর্মস্পর্শী ছোটগল্প লিখে তিনি রসিকজনের স্বীকৃতি পান দ্রুত। চীনে প্রকৃত অর্থে তিনিই প্রথম আধুনিক গল্প লেখেন। শুধু ছোটগল্পেই নয়, সাহিত্যের নানা শাখাতেই তাঁর বিচরণ ছিল সহজ ও সাবলীল। লু সুন লেখকের ছদ্মনাম, ছদ্মনামের আড়ালের মানুষটি একজন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক নেতা হিসেবেও সম্মানিত হয়েছিলেন। পশ্চিমী সাহিত্যের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। ইউরোপীয় ও জাপানি

সাহিত্যের বেশকিছু উল্লেখযোগ্য রচনার অনুবাদ করেছেন তিনি। গোগল ও চেকভের কিছু প্রভাব ছিল তাঁর ওপর।

জনগণের নেতৃস্থানীয় লেখক লু সুনের রচনায় উজ্জীবিত হয়েছেন অনেকেই, কিন্তু তাঁর প্রথমদিকের গল্পে বিপ্লবাত্মক আশাবাদের স্থান নেই তেমন। এই সব গল্পের বেশির ভাগের পটভূমিকা গ্রাম এবং চরিত্ররা গ্রামের মানুষ। একান্তই ব্যক্তিগত অনুভূতি স্থান পেয়েছে বেশকিছু গল্পে। এই শ্রেণীর একটি অসাধারণ গল্প 'আমার পুরনো বাড়ি'। তীব্র এক বেদনাবোধ থেকে উঠে এসেছে 'নববর্ষের বলি'। শ্লেষাত্মক রচনাতেও লু সুনের হাত ছিল চমৎকার, এই ধারার একটি শক্তিশালী গল্পের নাম 'সাবান'।

লু সুনের 'একটি ঘটনা'র ঘটনাটি খুবই তুচ্ছ, কিন্তু এর মধ্যেই আভাসিত হয়েছে রিকশাওলার মহত্ত্ব ও রিকশাযাত্রীর ক্ষুদ্রতা। সঙ্গে আছে তুচ্ছতা থেকে মুক্তি পাওয়ার সংকেত। লজ্জাজনক ব্যাপারে লজ্জা পাওয়া এবং নতুন আশা ও সাহসে বুক বাঁধা—লু সুনের অন্যতম প্রধান এই বার্তাটি স্থান পেয়েছে এখানে।

য়ুকিও মিশিমা আধুনিক জাপানি সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। উপন্যাস, নাটক এবং গল্পে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল। পুরো সময়ের লেখক হওয়ার জন্যে অর্থমন্ত্রকের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি। নৈতিক বা আধ্যাত্মিক দীপ্তিহীন যুদ্ধোত্তর জাপানের ছবি তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে বারবার। প্রেমের গল্প যে একেবারেই লেখেননি তা নয়, তবে তাঁর লেখার মধ্যে মানবচরিত্রের অস্বাভাবিক দিকগুলি জায়গা পেয়েছে বেশি করে। নোবেল পুরস্কারের সম্ভাব্য প্রাপক হিসেবে খ্যাতিমান এই লেখকের নাম শোনা গিয়েছিল দু-একবার। কিন্তু পুরস্কার-কমিটি তাঁর নাম বিবেচনা করার জন্যে বেশি সময় পাননি, অনুরাগী পাঠকরাও তাঁকে ব্যাপকভাবে পড়ার সুযোগ পাননি দীর্ঘকাল। মিশিমা দেশীয় রীতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মবিসর্জন দেন মাত্র প'য়তাল্লিশ বছর বয়সে।

মিশিমার 'শিশুর কাঁথা' বিখ্যাত এক অভিনেতার স্ত্রী তোশিকোর নিঃসঙ্গ জীবনের করুণ কাহিনী। নার্সের জারজ সন্তানের জন্মবৃত্তান্ত অভিনেতা-স্বামীর কাছে তুচ্ছ একটা মজার ঘটনা, কিন্তু এটিই তোশিকোর মনোজগতে প্রবল এক আলোড়ন তুলেছিল। সেই আলোড়ন অন্ধকার রাতে চেরিফুলের বাগানে চূড়ান্ত মুহূর্তে পে'ছৈ যায়।

মেক্সিকান মডার্নিস্ট অকতাভিও পাজ স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় স্পেনেই ছিলেন। ওই যুদ্ধ তাঁর লেখক-ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করেছিল অনেকখানি। পরবর্তীকালে শিল্প-সাহিত্যের নানা প্রবাহের মিশ্রণ ঘটেছে তাঁর মধ্যে। এর ভেতর আছে ফরাসী স্যুররিয়েলিজম, নতুন ধারার মার্কিন কবিতা, জার্মান রোমান্টিসিজম এবং মার্ক্সীয় দর্শন। সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে অতিমাত্রায়

সচেতন পাজ গল্প-কবিতার বাইরেও নানা বিষয় নিয়ে লিখেছেন। সে-সবের মধ্যে আছে মেক্সিকোর উপন্যাস, ইউরোপের কবিতা, প্রাচ্য ভাবনা, সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক নিবন্ধ, তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতি ইত্যাদি।

বড়-বড় পদে সরকারি চাকরি করেছেন পাজ। মেক্সিকোর প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন ইউনেসকোতে। ষাটের দশকের শেষের দিকে ভারতে এসেছিলেন রাষ্ট্রদূত হয়ে। ওই সময় প্রাচ্যের দর্শন ও তন্ত্রের প্রতি তাঁর খুব আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। ভাঙের নেশা করে দেখতে চেয়েছিলেন প্রতিদিনের বাস্তবতার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় কি না! কিন্তু বরাবরের জন্যে এই মিথ্যে জগতের বাসিন্দা হওয়ার ইচ্ছে ছিল না তাঁর। পৃথিবীর মানুষের দুঃখকষ্টে বিচলিত হয়েছেন, সুস্থ এক নাগরিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছেন বারবার। ১৯৬৮ সালে মেক্সিকো সিটিতে ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলিচালনার প্রতিবাদে রাষ্ট্রদূত পদে ইস্তফা দেন তিনি।

হিস্পানি জগতে কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন পাজ। তাঁর কবিতায় স্যুররিয়েলিজম এবং ঐতিহ্যানুসারী প্রতীকী প্রয়োগ মিশেছে। এই মিশ্রণ তাঁর ছোটগল্পেও দেখা যায়।

পাজের 'নীলরঙের ফুলের তোড়া' গল্পটি কবিতার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। বান্ধবী নীল চোখের তোড়া চায়, তাই তার প্রেমিক রাতের অন্ধকারে বেরিয়েছে নীল চোখের সন্ধানে। কিন্তু শিকারের চোখদুটি খয়েরি, নীল নয়। ছুরির ফলার সামনে দেশলাইয়ের আলোয় চোখের মণির রঙ পরীক্ষা করা হল। ভয়ংকর পরীক্ষা। পরীক্ষার শেষে বেঁচে গেল খয়েরি চোখের মানুষটি। ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট কোনো সংকট নয়, পরিবেশই এখানে গল্পের চূড়ান্ত মুহূর্ত তৈরি করেছে।

॥ সাত ॥

ছোটগল্প দিয়েই হাইনরিষ ব্যোলের প্রথম আত্মপ্রকাশ। গল্পের নাম 'বার্তা'। গল্পটি ছাপা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। গল্পের সৈনিক চরিত্রটি যুদ্ধের পরে এক সৈনিকবন্ধুর মৃত্যুর খবর পৌঁছে দিতে গিয়েছিল তার স্ত্রীর কাছে। পৌঁছবার পরে সে দেখতে পেল বন্ধুর স্ত্রী বাস করছে আর একজন লোকের সঙ্গে। পরলোকগত বন্ধুর বিয়ের আংটি, ঘড়ি আর পে-বুক তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিতেই মহিলা ভেঙে পড়ল কান্নায়। ব্যোল লিখেছেন: পুরনো দিনের স্মৃতি তাঁকে যেন তরোয়াল দিয়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলছিল। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, যুদ্ধ যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার থেকে যতদিন রক্ত ঝরবে ততদিন

এই যুদ্ধ শেষ হবে না, কিছুতেই না।

গল্পের এই বিশেষ বার্তাটি লেখকের জীবনে ফিরে এসেছে বারবার। যুদ্ধ তাঁর লেখার একটি বড় বিষয়, বিষয়টি যখনই এসেছে তখনই যুদ্ধসম্পর্কিত ওই ধারণার প্রক্ষেপ পড়েছে রচনায়। যুদ্ধ জার্মানির আমূল পরিবর্তন এনেছে, কিন্তু রাজনৈতিক ও সামাজিক রূপান্তরের কথা বেশির ভাগ জার্মান ভুলে যেতে চান। যাঁরা চান না তাঁদের মধ্যে আছেন ব্যোল। যুদ্ধ থেমে যাবার বছর-পঁচিশ বাদে লেখা 'মহিলার সঙ্গে গ্রুপ পোর্ট্রেট'-এও যুদ্ধ সম্পর্কে ওই ধারণা ফিরে এসেছে। ব্যোলের গল্প-উপন্যাসের বেশির ভাগ চরিত্র হয় বিধবা নয় বিপত্নীক, যুদ্ধ তাদের শেষ করতে না পারলেও বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

'পোস্টকার্ড' গল্পে ব্যোলের এই চেতনাই আভাসিত হয়েছে। ডাকঘরের সামান্য একটি রেজিস্ট্রেশন স্টিকার গল্পের প্রধান চরিত্রের বিষণ্ণ অতীতস্মৃতিকে জাগিয়ে রাখে। মায়ের কথা, ভ্যানিলা পুডিংয়ের সুগন্ধ, তার ভেতরেই সেনাবিভাগের ডাক—বেদনাবাহী ওই স্মৃতির অনুষঙ্গ। এ-সবই আজকের সফল এক সহকারী ম্যানেজারের জীবনে ক্লান্তি, একঘেয়েমি ও শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। ব্যোলের অন্যান্য বিখ্যাত গল্পের মধ্যে আছে 'দুঃস্বপ্নের মতো,' 'আমার ফ্রেডকাকা,' 'অবাঞ্ছিত অতিথিরা' ইত্যাদি।

যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে ব্যোল আলোচিত হতে শুরু করেছিলেন 'গ্রুপ অব ৪৭' নামক সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরেই। সংস্থাটির জন্ম ১৯৪৭ সালে, মুখ্যত বামপন্থী লেখকরা এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংস্থার মুখপত্র 'সোশালিস্ট হিউম্যানিজম' প্রচার করতে চেয়েছিল। সংশ্লিষ্ট লেখকরা মার্কিনদের 'কালেকটিভ গিল্ট' তত্ত্ব এবং রুশদের 'ডগমাটিক কমিউনিজম'-এর বিরোধী ছিলেন। ব্যোলের লেখায় এইসব ভাবনার ছায়া পড়েছে। ১৯৫১ সালে এই সংস্থা থেকে পুরস্কৃত হন তিনি। পুরস্কারপ্রাপকদের তালিকায় অন্যান্যদের সঙ্গে আছেন আর একজন বিশিষ্ট জার্মান লেখক গুন্টর গ্রাস।

কিছুকাল আগে কলকাতায় এসেছিলেন গ্রাস। দুবার তাঁর সঙ্গে ঘরোয়া পরিবেশে গল্প করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। প্রথম আড্ডাটি ছিল অসাধারণ। এই আড্ডায় গ্রাস তাঁর সাহিত্যজীবনের নানা কথা শুনিয়েছিলেন। কথায়-কথায় গ্রুপ অব ফর্টিসেভেন-এর কথাও উঠেছিল। লেখক জানান—ওই সংস্থাটি ছিল তরুণ লেখকদের কাছে প্রেরণার উৎসভূমি। দেশের নানা প্রান্ত থেকে তাঁরা ছুটে আসতেন সংস্থার সাহিত্য-সম্মেলনে যোগ দিতে। গ্রাস একবার এসেছিলেন সারা পথ হিচ-হাইকিং করে। সম্মেলনে লেখকরা তাঁদের পাণ্ডুলিপি পড়তেন, তারপর শুরু হয়ে যেত সেই লেখার সমালোচনা। সমালোচনা করতেন উপস্থিত লেখক এবং পেশাদার সমালোচকরা। এই সভারই একটি অনুষ্ঠানে গ্রাস তাঁর 'দি টিন ড্রাম'-এর অংশবিশেষ পড়েছিলেন।

গ্রাসের মতে বিষণ্ণতা এখন আর ব্যক্তিমানুষের বোধ নয়, এটি বড়লোকদের এক ধরনের বিলাস। বিষণ্ণতা উঁচু মহলে নিষ্ক্রিয়তার জন্ম দিয়ে থাকে। বেদনাবিলাসের সাহায্যে শিল্পসৃষ্টি হতে পারে কখনো-কখনো, তবে এর একটি মারাত্মক সীমাবদ্ধতা আছে। তা ছাড়া অনেক সময় স্বভাবগত বিষণ্ণতার মূলে থাকে শারীরিক অসুখবিসুখ।

আত্মজৈবনিক লেখার প্রসঙ্গে গ্রাস জানিয়েছেন, ওই পদ্ধতিতে একজন লেখক একটি-দুটির বেশি বড় লেখা লিখতে পারেন না। পদ্ধতিটি দীর্ঘদিনের জন্যে ধরে রাখলে লেখকের মধ্যে নার্সিসিজম তৈরি হয়। তখন শুধু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার নিজের মুখ দেখা। পাঁচজনের সুখদুঃখের ভাগ নিতে হবে লেখককে। গ্রাস গভীরভাবে রাজনীতিসচেতন, মানবতাবাদে বিশ্বাসী। পশ্চিম জার্মানির ১৯৬৯ সালের রাজনৈতিক নির্বাচনে সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির হয়ে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন দিনের পর দিন। সমাজ এবং রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন গ্রাসের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র গণহত্যার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তাঁর জগতের সঙ্গে ফ্যাণ্টাসির কোনো বিরোধ নেই। গ্রাসের লেখায় ফ্যাণ্টাসি চলে আসে অক্লেশে। কেউ-কেউ তাঁকে 'ফেবুলিস্ট'ও বলে থাকেন।

জন আপডাইকের 'বাস্তবতা' তাঁর পছন্দ নয়, বরং মার্কেজের সঙ্গে তাঁর মনের মিল অনেকখানি। বোর্হেসের ক্র্যাফ্‌ট্‌স্‌ম্যানশিপ তাঁর ভাল লাগে, তবে ওই পর্যন্তই। সিংগার যদিও স্টোরিটেলার তবুও ভাল লাগে তাঁকে। অবশ্য সিংগারের প্রগাঢ় ওই অধ্যাত্মজগতের প্রতি গ্রাসের কোনো আকর্ষণ নেই। ঈশ্বর-প্রসঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে বলেছেন : ঈশ্বরের কোনো কাজে আসি না আমি, আমারও ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই।

সংকলনে গৃহীত 'তিরিশ' 'দি টিন ড্রাম' উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদ। তিরিশে পা দিয়েছে অস্কার। এই তিরিশেই নাকি জীবন শুরু হয়। জন্মদিন পালিত হয়েছে অস্কারের। তার বিচারে বিশেষ এই জন্মদিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ত্রিশের মধ্যে আছে তিন ও ষাটের আভাস। তবে এই বয়েসে বোধহয় কাঁদবার অধিকারও চলে যায়। প্যারিসে পালিয়ে এসেছে অস্কার, সঙ্গে আছে তার বিচিত্র এক কাল্পনিক জগৎ।

'তিরিশ' টিন ড্রামের এক অপরিহার্য অংশ, কিন্তু আলাদা ভাবে এটি পড়লে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পপাঠের স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। গ্রাসকে এ-কথা আমি বলেছিলাম এবং এই সংকলনে ছোটগল্প হিসেবে এটি রাখার ব্যাপারে তাঁর অনুমোদনও পেয়েছি।

মার্টিন এসলিন লিখেছেন, গ্রাস তাঁর নাটক, কবিতা ও উপন্যাসে নগ্ন সত্যকে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেননি কখনো। উপন্যাসে তাঁর নিজের জীবনের

নিছক ঘটনা নয়, সঙ্গে আছে স্মৃতিকাতরতা এবং তীব্র এক বোধের জগৎ। লেখক বলেছেন, তাঁর জীবনের এক 'ডুবন্ত সুতো' তাঁর প্রায় প্রতিটি লেখাকেই ধরে রেখেছে।

মেপল-দম্পতিকে নিয়ে আপডাইক বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন। এরা একে অপরকে বেশ পছন্দ করে, কিন্তু এদের মধ্যে বিচিত্র এক রহস্যের ব্যবধান থেকেই যায়। মেপলদের নিয়ে লেখা গল্পগুলির মধ্যে 'গ্রিনিচ ভিলেজে তুষারপাত,' 'রোমের জোড়া বিছানা,' 'ধাতুর স্বাদ,' 'নগ্নতা', 'বিচ্ছেদ : এক পর্ব'' ইত্যাদি। গল্পগুলিকে পর-পর সাজালে দম্পতির তরঙ্গসংকুল জীবনের প্রায়-সম্পূর্ণ একটি ছবি পাওয়া যেতে পারে। আলাদা-আলাদা করলেও ছবি, সেই ছবিটি তখন আবার ছোটগল্পের পক্ষে মানানসই। 'বিচ্ছেদ : এক পর্ব'' বিচ্ছেদেরই সাংকেতিক কাহিনী।

ফরাসী সাহিত্যে সার্ত্র্ এবং কামুর পরে যে দু-তিনজন গুরুত্বপূর্ণ লেখকের দেখা পাওয়া গেছে তাঁদের মধ্যে একজন নিঃসন্দেহে আলাঁ হ্রোব্-গ্রিয়ে। 'নুভো রোমাঁ' আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা এই হ্রোব্-গ্রিয়েই। নতুন ধারার রচনার বিকাশে তাঁর সঙ্গে ছিলেন নাতালি সারোত, বুতর, মার্গেরিত দুরা প্রমুখ লেখক-লেখিকা। সাহিত্যান্দোলন জোরদার করার জন্যে বেশ কয়েকটি ম্যানিফেস্টো বার করেছিলেন হ্রোব্-গ্রিয়ে। এইগুলিই একত্রিত করে পরবর্তী-কালে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'নতুন উপন্যাসের দিকে' গ্রন্থটি।

সাইকোপ্যাথলজিকাল বিষয়বস্তুতে হ্রোব্-গ্রিয়ে খুব আগ্রহী। তাঁর গল্প-উপন্যাসের স্টাইল ও গঠনপদ্ধতি একেবারেই অন্য ধরনের। এখানে ন্যারেটরের চোখ ঠিক ক্যামেরার চোখের মতো। ক্যামেরা যেমন দৃশ্যবস্তুর যথাযথ ছবি তোলে, তাঁর লেখাও ঠিক তেমন। বস্তুর বর্ণনা আলোকচিত্রের মতোই নিখুঁত ও আবেগহীন। সম্ভবত এটিই লেখকের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

হ্রোব্-গ্রিয়ের 'দি ভোইয়র' একজন স্যাডিসটিক স্কিটজোফ্রেনিকের গল্প, অপরাধের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে কল্পনার জগতে বিচিত্র সব যুক্তি তৈরি করে সে। 'ঈর্ষা'র বক্তা একজন ঈর্ষাপরায়ণ স্বামী। এই দুটি উপন্যাসেই গল্পের গতি-প্রকৃতি, চরিত্রের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ আলাদা ধাঁচের। 'ঈর্ষা'র প্রধান চরিত্রটিকে 'অনুপস্থিত প্রথম পুরুষ' বলা যেতে পারে। বক্তা এখানে 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করেনি কখনো, আত্মপরিচয় দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতিও গ্রহণ করেনি। বস্তুরূপের সাহায্যে চরিত্রের মানসিক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। পাঠকদের ওপর প্রকারান্তরে একটি দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন তিনি। দায়িত্বটি আবেগরহিত শূন্যস্থান স্বনির্মিত আবেগের দ্বারা পূরণ করার।

চরিত্রদের মানসিক চিত্রকল্পের প্রতিরূপ দৃশ্যমান বস্তুর সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা হ্রোব-গ্রিয়ের একটি প্রিয় কৌশল। তাঁর তৈরি চিত্রনাট্য 'মারিয়েনবাদে

গত বছর'-এ এই পদ্ধতিটি নতুন এক মাত্রা পেয়েছে। বাস্তবতা সম্পর্কে লেখকের ধারণাটি অভিনব। একবার তিনি তাঁর একটি লেখায় সামুদ্রিক পাখির নিখুঁত এক বর্ণনা দিয়েছিলেন। পরে দেখলেন বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। এটা জানার পরেও তিনি সামুদ্রিক পাখির বর্ণনার সংশোধন দেওয়ার কথা ভাবেননি। কেননা তাঁর নিজস্ব বাস্তবতার জগতে ওই 'অবাস্তব' পাখিটিই বাস্তবসম্মত। লেখকের বাস্তবতা এবং কল্পনার মধ্যে কোনো বিরোধও নেই। এক-এক জায়গায় এই দুটি জগৎ মিশে গেছে অদ্ভুতভাবে।

আজ থেকে বছর-ষোলো আগে প্রকাশিত হ্রোব্-গ্রিয়ের গল্পগ্রন্থ 'স্ন্যাপশটস'-এ লেখকের গোটা জগৎটাই ধরতে গেলে উঠে এসেছে নানা আভাসে-ইঙ্গিতে। 'তিনটি প্রতিফলিত দৃশ্য', 'পোশাকনির্মাতার ডামি', 'দৃশ্য', 'ফেরার পথে,' 'সমুদ্রবেলা' ইত্যাদি গল্পে মুখ্য বিষয়বস্তু হিসেবে এসেছে প্রেক্ষাপট, চিত্রকল্প, বর্ণনাত্মক বিভ্রান্তি ও অবক্ষয়। এ-সব গল্পের 'সময়'ও সব সময় ঘড়ির সময়ের হিসেব মেনে চলেনি।

'সমুদ্রবেলা' গল্পে কোনো কাহিনী নেই। একটিমাত্র ছবি আছে এখানে, এবং এটিই গল্পের একমাত্র বিষয়। তিনটি অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে সমুদ্রতীর ধরে হাঁটছে। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে হলুদ বালি। ছেলেমেয়ে-তিনটি হেঁটেই যাচ্ছে, তাদের সামনে হাঁটছে ও উড়ছে একঝাঁক সামুদ্রিক পাখি। পায়ের ছাপ পড়েছে ভেজা বালিতে। দূরের সমুদ্র নীল, কাছে ঢেউ ভাঙছে কেমন যেন মাপা বিরতিতে। গল্পের শেষের দিকে ছেলেমেয়েদের দু-তিনটি ছোট-ছোট সংলাপে আর এক গল্পের আভাস। শুধু তাঁর নিজের দেশে নয়, হ্রোব্-গ্রিয়ের এইসব গল্প অল্পবিস্তর আলোড়ন ফেলেছে সারা পৃথিবীতেই।

॥ আট ॥

কাফ্‌কা একবার বলেছিলেন—'বালজাক একটা ছড়ি নিয়ে ঘুরতেন, সেই ছড়ির গায়ে খোদাই করা ছিল একটি প্রবাদবাক্য: আমি প্রতিটি বাধাই চূর্ণবিচূর্ণ করি। আমারও একটি প্রবাদবাক্য আছে, তা হল: প্রতিটি বাধাই আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে।'

লঘুচ্ছলে বলা এই কথাটির মধ্যে ভয়ংকর এক সত্য লুকিয়ে আছে। কাফ্‌কার জীবনে বাধার অন্ত ছিল না, এইসব বাধা আবার মুখ্যত অন্তর্জীবনের। নির্মিত বিপত্তি এবং কল্পিত পাপবোধ ছিল কাফ্‌কার অবসেশান। আত্মোপলব্ধির শুদ্ধ মুহূর্তে কাফ্‌কা জানিয়েছেন, প্রতিটি বাধাই তাঁকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলে। শুধু এটুকু বলেই তিনি থামেননি, সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তের এক দৃষ্টান্ত

হিসেবে হাজির করেছেন বালজাককে। এই বালজাকের কাছে কোনো বাধাই বাধা নয়, সবকিছুকেই তিনি অতিক্রম করে যান অক্লেশে।

সব বাধাকে যিনি অতিক্রম করে যেতে পারেন তিনি শক্তিমান এবং নমস্য। কিন্তু অতীতের এই শক্তিমান লেখকের প্রতি শুধু শ্রদ্ধা জানিয়েই কি থেমে গিয়েছেন কাফ্‌কা, না কি তাঁর কথার ফাঁকে আরো কিছু কথা আছে!

এমনও তো হতে পারে, কাফ্‌কা এই ভাবেই প্রাচীন এবং আধুনিক লেখার প্রকৃতিগত পার্থক্যটুকু বুঝিয়ে দিয়েছেন। সে-যুগের গল্পে বাইরের বাধা দূর হত, সব সমস্যার সমাধানও হত; কিন্তু আজকের গল্পে তা আর হয় না। কখনো-কখনো লেখক নিজেই ওই বাধা ও সমস্যার চাপে অসহায়তায় নিমজ্জিত হন।

নাতালি সারোত সাহিত্যের সঙ্গে রিলে রেসের তুলনা টেনেছিলেন একবার। এই রেসে আগের লেখক পরের লেখকের হাতে তাঁর স্টিক পেঁছে দেন। পরের লেখক আবার তাঁর পরের লেখকের হাতে। এই দৌড় চলতেই থাকে। সাহিত্যের ইতিহাস ধারাবাহিকতার ইতিহাস। একজন লেখক হঠাৎই মাটি ফুঁড়ে জন্মান না। তাঁর আবির্ভাবের একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন পূর্ববর্তী লেখকরা। তাঁর দায়িত্ব তখন একটিই, তা হল স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর অর্জন করার। নিছক পুনরাবৃত্তির মধ্যে কোনো লেখক বেঁচে থাকতে পারেন না। স্বতন্ত্র জগৎ সৃষ্টি করতে হলে আগের সৃষ্ট জগৎগুলি অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। নিজের জগৎ শুধু লেখকরাই নন, পাঠকরাও তৈরি করে থাকেন। এই দুই সম্প্রদায় আবার কোথাও-কোথাও এক। ছোটগল্পের লেখকমাত্রই তো ছোটগল্পের পাঠক।

ইংরেজি ভাষায় রচিত বা অনুবাদিত ছোটগল্পের যে-সব সংকলন সাধারণত আমাদের হাতে আসে সেগুলি একটু অন্য ধরনের। ব্রিটিশ, মার্কিন রুশ, ফরাসী, জার্মান ছোটগল্পের বইগুলি নিজের-নিজের ভূখণ্ডের বাইরে যেতে চায় না সহসা। মার্কিন ছোটগল্পের সংকলনে সবাই মার্কিন লেখক, রুশদের বইতে সবাই রুশী—এইরকম। নানা দেশের ছোটগল্প অল্পসংখ্যক যে-সব বইতে আছে সেগুলিতেও আবার সংক্ষিপ্ত একটি সময়কালকে ধরার চেষ্টা থাকে। তার ফলে কোনো বইতে শুধুই কয়েকজন প্রাচীন লেখক, কোনো বইতে শুধুই নির্বাচিত নবীনরা। ওইসব দেশের মধ্যেও আবার আমাদের প্রিয় কিছু দেশ ও লেখক অনুপস্থিত। বর্তমান সংকলনটি ভাবার পেছনে এই অভাববোধ কাজ করেছে অনেকখানি। অন্য অভাবও ছিল।

বাংলা ভাষায় বিদেশী ছোটগল্পের এমন একটি অনুবাদগ্রন্থ চাইলাম যেখানে গল্প বাছা হয়েছে গল্পের উৎসভূমি থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত। গল্পগুলি সাজানো হবে কালক্রম মেনে, এবং তাতে অবশ্যই সেই সব গল্প থাকা দরকার যেগুলি ছোটগল্পের ধারা ও নানা উল্লেখযোগ্য বাঁক চিনতে সাহায্য

করবে। আর খুবই ভাল হয় যদি সেই গল্পগুলি অনুবাদের দায়িত্ব নেন পেশাদার বা শৌখিন অনুবাদকের বদলে সৃষ্টিশীল লেখকরা।

এইসব চিন্তাভাবনাই রূপ পেয়েছে বর্তমান শ্রেষ্ঠ বিদেশী ছোটগল্পের সংকলনে। এখানে নির্বাচিত বত্রিশটি গল্প অনুবাদ করেছেন বত্রিশজন লেখক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদককে তাঁর প্রিয় লেখকের গল্প অনুবাদ করতে দেওয়া হয়েছে। এর একটি সুবিধে আছে, প্রিয় লেখককে অনুবাদ করার সময় অনুবাদক বাড়তি আনন্দ পেয়ে থাকেন। তার ফলে অনুবাদ আরো ভাল হয়। এই নিয়ম যেখানে মানা সম্ভব হয়নি সেখানেও অনুবাদক তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন চমৎকারভাবে। কয়েকটি গল্প মূল ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজি গল্পের সরাসরি অনুবাদ। বাকি সব ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ। এই প্রসঙ্গে ইতালির একটি প্রবাদের কথা মনে পড়ছে। সেটি হল—'অনুবাদকমাত্রই বিশ্বাসঘাতক।' কিন্তু এই 'বিশ্বাসঘাতক'ই তো আবার ভিন্ন ভাষাভাষীর ভাবের আদানপ্রদানে একমাত্র বিশ্বাসভাজন সহায়ক। সব ভাষা সবার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অনুবাদের ভাববহনক্ষমতায় অবশ্য কারো-কারো বেশ আস্থা আছে। মার্কেজ তো একবার বলেছিলেন তাঁর লেখা ইংরেজি অনুবাদে আরো আঁটোসাটো হয়েছে।

এই ধরনের সংকলনে একেবারে প্রথম দফার কাজ হল গল্প-নির্বাচন। নির্বাচনের পেছনে একটি স্থির উদ্দেশ্য থাকার ফলে কাজটি ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। তা ছাড়া আগে জানতাম না যে নিজের মধ্যেই এমন কয়েকজন সমালোচক আছে যাদের ভেতর কিছু-কিছু ব্যাপারে মতের মিল হতে চায় না সহজে। এই জন্যে একাধিক বাছাই গল্প বাতিল হয়েছে, কিছু বাতিল গল্প ফিরে এসেছে পুনর্বিবেচনায়; বারবার খোঁজ করেছি সেই গল্পের যেটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না কিছুতেই।

সংকলনের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সংগ্রহের বাইরে অন্যের বইয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছি, কেনা হয়েছে কিছু-কিছু বই, লাইব্রেরির বই থেকে জেরক্স করানো হয়েছে কয়েকটি গল্পের। আর, এ-সব কাজে আমাকে দারুণভাবে সাহায্য করেছে তরুণবন্ধু স্বপন সাহা। স্বপনের সাহায্য এবং অবিরাম উৎসাহ না থাকলে এই কাজটি শেষ হত কি না সন্দেহ।

এবার অবধারিত সেই দুটি প্রশ্ন।

কোনো সংকলন কি সব শ্রেণীর পাঠক ও সমালোচককে খুশি করতে পারে? কোনো সংকলন কি সেই সংকলককেই সন্তুষ্ট করতে পারে ষোলো আনা?

প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে না গিয়ে একটি নিবেদন রাখা যেতে পারে। এই সংকলনে আরো কয়েকজন লেখকের গল্প রাখতে পারলে আরো খুশি হতাম। কিন্তু সমস্যা তো একটাই। স্থানাভাব। সমস্যাটি বিরাট এবং এটি বোধহয়

কখনোই পুরোপুরি মেটানো যায় না।

সংকলনের কাজে হাত দেওয়ার পরে চার-চারটি বছর কী ভাবে যেন কেটে গেছে। এত সময় পেলে যা হয় তাও হয়েছে, পরিকল্পনায় ছোটখাটো সংশোধন ঘটেছে বেশ কয়েকবার। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে ব্যক্তিগত অন্য কাজও ঢুকে গেছে। দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ মাঝেমধ্যে থেমে গেলে ঢিলেমিও আসে, তার কবলেও পড়েছি। তবু শেষরক্ষা হল। যাঁদের অকৃপণ সহযোগিতা না পেলে কাজ শেষ হওয়া তো দূরের কথা, শুরুই করা যেত না—তাঁরা হলেন এই সংকলনের বত্রিশজন সজ্জন, সুশিক্ষিত লেখক-অনুবাদক। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

একেবারে গোড়ার দিকে এই সংকলনটি ছিল আমার ভালবাসার খাটুনি। এই খাটুনিতে কোনো কষ্ট নেই, কিন্তু নিছক ভালবাসা বা সদিচ্ছায় সাদা কাগজে ছাপার হরফ ফুটে ওঠে না। তার জন্যে দরকার একজন প্রকাশকের। এই প্রকাশনার দায়িত্ব নিলেন মডার্ন কলামের রুচিবান কর্ণধার শ্রীসহদেব সাহা। ছাপার কাজ কিছুটা এগোবার পরে অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, মুদ্রণ পারিপাট্যের দিকে অতিরিক্ত নজর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবীন এই প্রকাশক অনুবাদিত গল্পগুলির রসগ্রাহী পাঠক হয়ে উঠেছেন। এটি সুলক্ষণ। প্রকাশিত হওয়ার আগে অনুবাদগ্রন্থটির রসজ্ঞ পাঠক পাওয়া কম কথা নয়। আর কে না জানে, রসিক পাঠকের সংখ্যা যত বাড়ে সংকলক ততই উৎসাহিত হন।

শেখর বসু

ছোটগল্পের অনুরাগী পাঠকদের জন্য

সূচী

মরুভূমিতে এক ভালবাসা

ওনোরে দ বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০)

□ একটি অসাধারণ কাহিনীর সাধারণ গল্প □

কি সাংঘাতিক খেলা! মোঁসিয়ো মার্ত্যাঁর খোঁয়াড় থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠে।

বিজ্ঞাপনের ছবির মতো হায়েনার সঙ্গে সেই সাহসী ফাটকাবাজের ঘুরতে থাকার কথা সে তখনো ভাবছিল।

এইসব জন্তুর ভালোবাসা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেও, সে বলে চলল, কীভাবে যে ভদ্রলোক এদের পোষ মানিয়ে···

ব্যাপারটা তোমার কাছে একটা সমস্যা হয়ে উঠতে পারে, তাকে থামিয়ে দিয়ে জবাব দিলাম, তবু এটা কিন্তু খুব সাধারণ বিষয়··

ইশ্! চেঁচিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁটে অবিশ্বাসের হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

তুমি কি ভাবছ যে জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে একফোঁটাও আবেগ-অনুভূতি থাকতে পারে না? জিজ্ঞাসা করেই বুঝতে পারলাম এই সভ্য সমাজে জানোয়ারদের কেবল আমরাই সমস্ত রকমের অপবাদ দিতে পারি।

সে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু, এখন স্বীকার করছি, বলতে শুরু করলাম, প্রথম যখন মোঁসিয়ো মার্ত্যাঁকে দেখি, তোমার মতোই আশ্চর্য হয়ে গিয়ে আমিও প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। যাই হোক, আমার সঙ্গে ডান পা কাটা এক বুড়ো সৈনিক সেখানে ঢুকেছিল। আমি তার চেহারা দেখে খুব জোর ধাক্কা খেয়েছিলাম। সেইসব সাহসীদের মতো তার মাথা যেখানে যুদ্ধের দাগ রয়ে গেছে, সেইসব দাগ নাপোলেয়ঁর সময়কার। সেই বুড়ো সৈনিকের মধ্যে এমন এক খোলামেলা হাসি-খুশির ভাব ছিল যা আমি কোনোদিন আয়ত্তে আনতে পারিনি। সে ছিল সেইসব যুদ্ধফেরতাদের একজন যারা কোনো কিছুতেই অবাক হয় না। সঙ্গীর শেষ যন্ত্রণাবিকৃত মুখের ভাব দেখে যারা হাসতে পারে, হাসতে হাসতেই যারা তাকে ছুঁড়ে ফেলে বা পুঁতে দেয়, কর্তৃত্বের সঙ্গে কামানের গোলাকে আহ্বান

মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ : পার্থ গুহ বক্সী

করে আর বেশিক্ষণ আলাপ-আলোচনা চালাতে চায় না, একমাত্র তারাই শয়তানের সঙ্গে ভাই-ভাই সম্পর্ক পাতাতে পারে। খোঁয়াড়ের মালিক তার ঘর থেকে বেরোবার পরে আমার সঙ্গী অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর অপদার্থ অকেজো লোকদের দেখে ওপরওয়ালা যেরকম মুখভঙ্গি করে, ঠিক সেইভাবে ঠোঁটমুখ বেঁকাল। আমি যখন মোঁসিয়ো মার্ত্যাঁর সাহসের কথা বলতে বলতে প্রায় ফেটে পড়লাম, সে খানিকটা হেসে ঘাড় ঝাঁকিয়ে কেবল বলল—জানি।

কী রকম? জিজ্ঞাসা করলাম, দয়া করে রহস্যটা খুলে বললে বাধিত হব। কিছুক্ষণের মধ্যে কথাবার্তা জমে উঠলে আমরা খেতে বেরিয়ে সামনের প্রথম রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম।

খাওয়াদাওয়ার শেষে এক বোতল শ্যাঁপাইনের মদ সেই আশ্চর্য সৈনিকের পুরনো স্মৃতিকে আরো পরিষ্কার করে তুলল। তার গল্প শুনবার পরে বুঝতে পারলাম, হ্যাঁ, এই একটিমাত্র লোক চেঁচিয়ে বলতে পারে বটে—জানি!

২. □ মেয়েলি কৌতূহল □

মেয়েটির বাড়ি ফিরবার পরে অনুরোধে উপরোধে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে সৈনিকের গোপনীয় গল্পটি বলার প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে সে ছাড়ল। পরদিন সেই পুরনো দিনের গৌরবকাহিনী সে শুনল যখন ফরাসীরা ছিল ইজিপ্টে।

৩. □ মরুভূমি □

ইজিপ্টের উপরে জেনারেল দজের অধীনে অভিযান চলবার সময় প্রোভঁসের এক সৈনিক মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে। আরবরা নীলের জলপ্রপাত পেরিয়ে পিছনের বিশাল মরুভূমিতে তাকে নিয়ে যায়।

ফরাসী সেনাবাহিনীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার জন্য প্রাণপণে যতটা সম্ভব এগিয়ে গিয়ে রাত্রিবেলায় তারা থামল। যেসব তালগাছ ঘেরা কুয়োর কাছে তাঁবু গাড়া হল, সেখানে আগে থেকেই তারা কিছু-কিছু মালপত্র পুঁতে রেখেছিল। আরবদের মাথাতেই আসেনি যে তাদের বন্দী এখান থেকে পালাবার ফিকির খুঁজতে পারে, তাই তারা কেবল তার হাত বেঁধে রেখে নিশ্চিন্ত ছিল। ঘোড়াদের সব খাইয়ে আর নিজেরা খেজুর চিবিয়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

যখন সাহসী সৈনিক দেখল তাকে পাহারা দেওয়ার মতো অবস্থা কোনো দুশমনের নেই, সে দাঁত দিয়ে এক আরবী তরোয়াল টেনে এনে হাঁটু দিয়ে ফলা

বাগিয়ে ধরে হাতের দড়ি কেটে ফেলল। চটজলদি নিজেকে বাঁচানোর জন্য বন্দুক, ধারালো ছুরি, কিছু শুকনো খেজুর, যবের ছোট থলি আর গোলাবারুদ যোগাড় করে কোমরে তরোয়াল বেঁধে একটা ঘোড়ায় চেপে বসে কোন্‌দিকে ফরাসী সৈন্য আছে আন্দাজ করে নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে দিল।

ফরাসী তাঁবু দেখবার উৎসাহে অধৈর্য হয়ে সে এমন কষে ঘোড়া ছোটাল যে হতভাগ্য প্রাণীটি একটু পরে দম হারিয়ে সৈনিককে মরুভূমির মাঝখানে একা ফেলে রেখে লুটিয়ে পড়ল।

খানিকটা পথ খুব সাহস নিয়ে পায়ে হেঁটে এগোল সৈনিক, তারপর দিন ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে থমকে দাঁড়াতে হল। পূবদেশের সন্ধ্যাকাশের সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়েছে, তবু তার আর পথ চলবার শক্তি নেই। কপালজোরে সে এক উঁচু জায়গা পেয়ে গেল যেখানে কিছু তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে, অনেক দূর থেকে তাদের সবুজ পাতা এতক্ষণ ধরে তাকে আশা জুগিয়ে এসেছে। এতই ক্লান্ত লাগছিল যে এক টুকরো পাথরের ওপরে শুয়ে পড়ে কল্পনা করতে লাগল যেন সে শিবিরে শুয়ে আছে, ঘুমের সময় বিপদ আসতে পারে জেনেও জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, কোনো রকম সতর্কতা অবলম্বন না করেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। তার শেষ চিন্তা ছিল দুঃখে ভরপুর। এখন সে অনুতাপ করছিল কেন আরবীদের ছেড়ে এল, তাদের এলোমেলো জীবন দেখে হাসি পেলেও এখন সে তাদের থেকে কতদূরে নিরাপত্তাহীনভাবে পড়ে আছে।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে জেগে উঠতে হল, চড়া রোদ পাথরে পড়ে অসহ্য তাপ ছড়াচ্ছে। কোনো রকমে সে সবুজ লম্বা তালগাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়ে উঠল, এখন কেবল এইসব গাছকে একমাত্র সঙ্গী ভেবে সে কেঁপে ওঠে। লম্বা পাতার মুকুট পরা এই উঁচু-উঁচু গুঁড়ি যেন আর্লের ক্যাথিড্রালের পুরনো স্তম্ভ। তালগাছের দিক থেকে চোখ সরিয়ে যখন সে চারদিকে তাকিয়ে দেখে, এক বিশাল হতাশা বুকের ওপর চেপে বসে। সামনে এক দিগন্তহীন সমুদ্র। মরুভূমির লালচে বালি চারদিকে ছড়ানো, প্রখর আলোয় তারা যেন ইস্পাতের ঢেউয়ের মতো ঝলসাচ্ছে। এই দৃশ্য অনেকটা বরফের সমুদ্রের মতো কিংবা অনেক হ্রদ যেন জড় হয়ে এক বিশাল আয়না তৈরি করেছে। ঢেউয়ের ধাক্কায় চলন্ত জমি থেকে আগুনের বাষ্প পাক খেতে খেতে উঠছে, এই প্রাচ্যদেশের আকাশ নিষ্ফল আশার প্রতিমূর্তি নিয়ে তাকিয়ে আছে, সেখানে আর কিছু কল্পনা করবার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। আকাশে বাতাসে আগুন ধরে গেছে। বন্য আদিম ভয়ংকর এক নিস্তব্ধতার চেহারা ভয় ধরিয়ে দেয়। অনন্ত শূন্যতা চারদিক থেকে এসে টুঁটি চেপে ধরে, আকাশে মেঘের কোনো চিহ্ন নেই, বাতাসে কোনো শব্দ নেই, ছোট-ছোট ঢেউ-দোলানো বালির বুকে কোনো ঘটনা ঘটে না। অবশেষে দিগন্ত মুছে যায়, যেভাবে সমুদ্রের বুকে তরোয়ালের

ঝলকের মতো একফালি আলো ঝলসে উঠে ফুরিয়ে যায়।

সৈনিক তালগাছের গুঁড়ি ধরে পড়ে থাকল, যেন সে এক বন্ধুকে জড়িয়ে আছে। গ্রানাইটের সরু লম্বা ছায়ায় বসে কাঁদল, তারপর গভীর তৃষ্ণা নিয়ে দুচোখ ভরে সামনের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকল, নীরবতা ভাঙবার জন্য সে চেঁচাল। গলার স্বর অনেকদূর পর্যন্ত ক্ষীণভাবে ভেসে গেল, কোনো প্রতিধ্বনি হল না, প্রতিধ্বনি কেবল তার বুকের ভেতর ফিরে এল। বাইশ বছরের সৈনিক বন্দুকে গুলি ভরল। মাটিতে বাঁচবার হাতিয়ার রেখে মনে মনে বলল—এক সময় না এক সময় কপাল ফিরবেই!

৪. ☐ আধুনিক রবিনসন এক ফ্রাইডেকে খুঁজে পেল ☐

কালচে মরুভূমি আর নীল আকাশ দেখতে দেখতে সৈনিক ফ্রান্সের কথা ভাবছিল। পারীর নদীর স্মৃতি তাকে উৎফুল্ল করে তুলল, যেসব শহরের ভেতর দিয়ে সে হেঁটে গেছে, নানা বন্ধুর চেহারা, জীবনের সব থেকে হাল্কা মুহূর্ত-গুলি, সব তার মনে পড়ছিল। শেষে তার চিন্তা আরো দক্ষিণদিকে টেনে নিয়ে গেল যেখানে একঝলক দেখা গেল প্রিয় গ্রামের নুড়িপাথরের ওপর রোদের খেলা, সামনের মরুভূমির টেবল-ঢাকনার ওপর সেই রোদ যেন দুলছে।

বেশিক্ষণ মরীচিকা দেখলে বিপদ ঘটবে, এই কথা ভেবে সে টিলার উল্টোদিক দিয়ে নেমে এল, আগের দিন অন্য রাস্তা দিয়ে এখানে উঠেছিল। টিলার নিচে পাথরের ফাঁকে হঠাৎ প্রাকৃতিক এক গুহার সন্ধান পেয়ে সৈনিক আনন্দে দিশা-হারা হয়ে পড়ে। ধুলোর আস্তর থেকে বোঝা যায়, এখানে বহুদিন কেউ ডেরা বাঁধেনি। আবার কয়েক পা এগোতেই খেজুর গাছের পাতা দেখা গেল। তখন বেঁচে থাকার আশা আবার নতুন করে জেগে উঠল। বেঁচে থাকতে পারলে হয়ত মুসলমান পথিকেরা তাকে দেখতে পাবে কিংবা কে-ই বা বলতে পারে, কামান-গর্জনও হয়ত সে শুনতে পাবে, এইসময় স্বয়ং বোনাপার্ত সারা ইজিপ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এই চিন্তায় আবার নতুন করে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে কিছু পাকা খেজুরের থোকা পেড়ে এনে এই অভাবনীয় আবিষ্কারের ফল খেতে খেতে নিজেকে বোঝাতে লাগল, নির্ঘাত এই গুহার বাসিন্দারা খেজুরের চাষ করেছিল। সুস্বাদু টাটকা খেজুর তার পূর্বপুরুষদের শ্রমের ফসল। হতাশার ঘোর কাটিয়ে উঠে সে উদ্দাম আনন্দের জোয়ারে ভাসছিল। তারপর টিলার মাথায় উঠে সারাদিন ধরে একটা মরা তালগাছ কাটতে লাগল, যে গাছের আড়ালে সে আগেরদিন শুয়ে ছিল। আবছাভাবে মরুভূমির জন্তুজানোয়ারদের কথা মনে এল, পাথরের নিচে বালির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া তিরতিরে জল খেতে তারা আসতে পারে, তাই সে ঠিক করল গুহার মুখে কোনোরকমে একটা ঝাঁপ দাঁড় করাতে হবে। ঘুমন্ত অবস্থায়

জন্তুদের হাতে পড়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও চড়া রোদে একদিনের মধ্যে একটা গাছের গুঁড়ি টুকরো করা অসম্ভব, তবে সে গাছটাকে পেড়ে ফেলেছিল। সন্ধ্যার দিকে মরুভূমির সেই অধিরাজ লুটিয়ে পড়ল, তার আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেল, পড়বার শব্দে নিস্তব্ধতা যেন কাতরে উঠল, এই শব্দের ভেতরে কাদের কণ্ঠস্বর যেন দুঃসময় ঘোষণা করছে, এ-কথা ভেবে সৈনিক কেঁপে উঠল। কিন্তু একজন উত্তরাধিকারী যেমন নিকট জনের মৃত্যুতে বেশিক্ষণ দুঃখ করতে পারে না, সে-ও তেমনি নিজের কাজে নেমে পড়ল। গাছের ছালের বড় বড় টুকরো আর কবিতার অলংকারের মত বিশাল সবুজ পাতা দিয়ে তার বিছানা তৈরি হল।

একসময় গরম আর খাটাখাটুনির চোটে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে সে তার স্যাঁতসেঁতে গুহার লাল ছাদের তলায় ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝরাতে এক অদ্ভুত শব্দে তার ঘুম চটে যায়। মেঝের ওপর উঠে বসে, চারদিক এতক্ষণ নিঝুম হয়ে ছিল, টের পায় প্রচণ্ড শক্তিশালী কে যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাস ছাড়ছে, এত জোরে কোনো মানুষ নিশ্বাস নিতে পারে না। এক বিশাল ভয়, অন্ধকারের মধ্যে, নীরবতার ভেতরে দুশ্চিন্তায় আরো বিশাল হয়ে উঠে তার হাড় কাঁপিয়ে দেয়। নিজের অজান্তে ভয়ে ভাবনায় তার চুল খাড়া হয়ে ওঠে, বড়-বড় চোখে চারদিকে তাকাতে তাকাতে অন্ধকারে দেখা গেল একজোড়া হলদে ফ্যাকাশে আলোর বিন্দু। প্রথমে সে ভাবল হয়ত বাইরের আলোর কোনো প্রতিফলন এসে পড়েছে, ধীরে ধীরে অন্ধকার সয়ে আসতে গুহার ভেতরে সবকিছু চোখে পড়ছিল, এখন সে দেখতে পেল, দু পা দূরে বিরাট এক জন্তু শুয়ে আছে। সিংহ, বাঘ না কুমির? সৈনিক তার শত্রুকে কোন্ জাতে ফেলবে, বুঝতে পারছিল না, ভয়ের চোটে মনে হতে লাগল সব রকমের বিপদ সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। সামান্যতম নড়াচড়া না করে কান পেতে থেকে প্রতিটি শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিধি আঁচ করতে করতে সে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করছিল। শেয়ালদের থেকেও বিকট এক গন্ধে গুহা ভরে গেছে, দুর্গন্ধে আরো অস্থির হয়ে সে ভাবতে লাগল কোনোরকমেই এই সঙ্গীকে এখান থেকে তাড়ানো যাবে না, এই রাজকীয় গুহা নিশ্চয় তারই ডেরা। কিছুক্ষণের মধ্যে চাঁদ দিগন্তে ঢলে পড়লে আবছা আলোয় এক চিতার গায়ের গুটি-গুটি ছোপ জ্বলজ্বল করে ওঠে।

ইজিপ্টের এই সিংহ ঘুমোতে ঘুমোতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, যেন কোনো হোটেলের দরজার বাইরের চওড়া দালানে একটা বড় কুকুর শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। এক মুহূর্তের জন্য তার চোখ খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল, মুখ সৈনিকের দিকে ফেরানো।

হাজারো চিন্তা চিতার বন্দীর মনে খেলতে থাকে। প্রথমেই এক গুলিতে এটিকে খতম করে দেওয়া যায়। কিন্তু দেখা গেল, বন্দুক তাক করবার মতো যথেষ্ট জায়গা তাদের মধ্যে নেই, তার গুলি ফস্কে যেতেও পারে। আর তারপর

যদি ও জেগে ওঠে ? সেকথা চিন্তা করতেই সে নিথর হয়ে গেল। এই নিস্তব্ধতার মাঝখানে কেবল হৃদ্‌পিণ্ডের শব্দ শুনতে পেয়ে সে গালাগাল দিয়ে উঠল, এত দ্রুত রক্ত চলাচলের শব্দ যেন চিতার ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটায়। এই ঘুমের সুযোগে কোনো ভাল সমাধান খুঁজে নিতে হবে। পর-পর দুবার সে আরবী তরোয়ালে হাত রাখল, এই তরোয়ালে শত্রুর মাথা এক কোপে কেটে ফেলা যায়, কিন্তু শক্ত লোমে ঢাকা চওড়া মাথা এককোপে কাটবার অনিশ্চয়তাও আছে, তাই সে সাহসী চিন্তাও তাকে দূর করতে হল।

একবার ফস্কানো মানেই মৃত্যু। মনে মনে সে বলল।

পরে লড়াইয়ের সুযোগ নিতে হবে, এই ভেবে সে সূর্য ওঠার অপেক্ষা করতে লাগল।

ভোর হওয়ার কোন লক্ষণ নেই।

সৈনিক চিতাকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল, তার নাকে রক্তের ছাপ লেগে। —ভালই খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, ঘাবড়ে না গিয়ে সে ভাবল, যদি মানুষের মাংসে এরপর ভোজ সারতে হয় তবে জেগে উঠেই তাড়াতাড়ি অন্তত এর খিদে পাবে না।

৫. ☐ পশুদের কি হৃদয় থাকে ? ☐

চিতাটি মাদি। পেটের আর পায়ের সাদা চামড়া জ্বলজ্বল করছিল। ভেলভেটের মতো ছোট ছোট ছোপ থাবার চারদিকে চমৎকার এক বালার মতো ঘিরে আছে, ধবধবে ফর্সা কঠিন লেজ শেষ হয়েছে কালো চুলের বিনুনিতে। পোশাকের ওপরের অংশ সোনার পাতের মতো, কিন্তু মসৃণ নরম, সে পোশাক গোলাপের মতো ছোপে ভর্তি যা কিনা অন্যান্য শ্বাপদ থেকে চিতার চরিত্রকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।

এই শান্ত এবং সাংঘাতিক গৃহস্বামিনী এমন অভিজাত ভঙ্গিতে নিশ্বাস ফেলছিল যেন তুর্কী কেদারায় এক বেড়াল শুয়ে আছে। অস্বস্তিভরা সদাসতর্কিত রক্তমাখা থাবা শরীরের সামনে এগিয়ে, তার ওপরে সে মাথা রেখেছে, মাথা থেকে সামান্য খাড়া-খাড়া সুতোর মতো দাড়ি বেরিয়েছে। এইভাবে খাঁচার ভেতরে থাকলেও এই চিতাকে রানীর মর্যাদাসম্পন্ন ভাবভঙ্গি আর উজ্জ্বল বিপরীত রঙের জন্য তারিফ করতে হবেই, কিন্তু এখন ঐ চেহারা ভয় ধরিয়ে দেয়। লোকের ধারণা অনুযায়ী সাপের চোখ যেমন রোসিনোল পাখিকে চুম্বকের মতো টেনে রাখে, সৈনিকও তেমনি ঘুমন্ত চিতার সামনে সম্মোহিতভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। আগুন ওগরানো কামানের মুখের সামনে যেমন উত্তেজনা আসে, সেইরকম এই চরম বিপদের সামনে তার সাহস এক মুহূর্তের জন্য হারিয়ে ফেলে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে তার বুকে বল ফিরে এল, কপাল বেয়ে যে ঠাণ্ডা

ঘাম নামছিল, তা শুকোতে শুরু করল। যেসব মানুষ মৃত্যুর মুখে পড়েও পাঞ্জা ঠুকে আহ্বান জানায়, তাদের মতো সে-ও এই অভিযানে অন্তিম সময়ের কথা না ভেবে নিজের ভূমিকা শেষ অবধি সম্মানের সঙ্গে পালন করে যাবে বলে ঠিক করল।

—গত পরশু তো আরবেরা আমাকে মেরে ফেলতে পারত। মনে মনে সে নিজেকে বোঝাল। মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে সাহস আর অধৈর্য কৌতূহল নিয়ে সে শত্রুর ঘুম ভাঙবার অপেক্ষা করতে লাগল। সূর্যোদয়ের পরেই চিতার চোখ আচমকা খুলে যেতেই প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে থাবা বাড়াল, যেন জড়তা কাটাবার জন্য আড়মোড়া ভাঙা হচ্ছে, তারপর বড়-বড় দাঁত বের করে আর রুজনের মতো শক্ত জিভ দেখিয়ে হাই তুলল।

—ঠিক যেন রসে ভরা-রঙ্গিনী! আদরকাড়া ছেনালের মতো নড়াচড়া করতে দেখে সৈনিক ভাবল।

সে থাবা, নাকের রক্ত চেটে ধীরেসুস্থে বারবার মাথা ঘসাঘসি করল।

—বাঃ বেশ! এবার ছোটখাটো প্রাতঃকৃত্যাদির কাজ সেরে ফেলা হোক, সৈনিক সাহস ফিরে পেয়ে খুশিমেজাজে বলল, তাহলে আমরা সুপ্রভাত জানাতে পারি।

সঙ্গে সঙ্গে সে আরবদের কাছ থেকে সরিয়ে আনা ছোট্ট ছোরাখানাও স্পর্শ করে নিল।

ঠিক সেই সময় চিতা তার দিকে মাথা ঘোরাল আর এক পা-ও না এগিয়ে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল। তার ধাতব চোখের দৃষ্টি কঠিন আর প্রচণ্ড স্বচ্ছ, তা দেখে সৈনিক কেঁপে উঠল, বিশেষ করে যখন সে তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। তবুও সে শান্তভাবে চুম্বকের মতো তাকে কাছে আসতে দিল, তারপর খুব সন্তর্পণে যেন সবার সেরা সুন্দরীকে সোহাগ করছে, এইভাবে শরীরে হাত রেখে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত আঙুল বুলিয়ে দিল, নখ লেগে হলুদ পিঠের দুপাশের নমনীয় পেশীগুলো কুঁচকে উঠল।

বিলাসিনীর মতো সে লেজ তুলল, চোখের দৃষ্টি অনেক নরম হয়েছে, বার তিনেক তোষামোদ করার পরে আমাদের বেড়ালরা যেভাবে আদর পেয়ে আওয়াজ করে, ঠিক সেইভাবে 'রু রু' শব্দ তার গলা থেকে বের হল। কিন্তু সে ডাক এমনই গুরুগম্ভীর ভাবে বেরিয়ে এল যে গির্জার অর্গানের শেষ চড়া পর্দার গর্জনের মতো তা গুহার ভেতর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। সৈনিক তার আদর চালিয়ে যাওয়া কতখানি দরকারি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি সোনামুখির সোহাগের মাত্রা দ্বিগুণ করে দিল। ভাগ্যিস এর খিদের ব্যাপারটা গতকাল মিটে গেছে! মেজাজী সঙ্গিনীর স্বভাব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে বুঝতে পেরে সে উঠে গুহা থেকে বের হতে চাইল, চিতা চুপচাপ তাকে ছেড়েও দিল। কিন্তু টিলার ওপর উঠতেই চড়াইপাখি

যেমন এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে বসে, ঠিক তেমনি নিখুঁত হাল্কা লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে বিশাল ঘাড় দিয়ে সৈনিকের পা বেড়ালের মতো ঘষতে লাগল। তারপর এক পলকে অতিথিকে দেখে নিল, সেই চোখ এখন অনেক কমনীয়, এরপর সে এমন এক বিকট ডাক ছাড়ল যার সঙ্গে প্রকৃতিবিদেরা একমাত্র করাত-চেরাইয়ের শব্দের তুলনা করতে পারেন।

—এ তো মহা নাছোড়বান্দা! জোর গলায় হেসে ওঠে সৈনিক।

সে তার কান নাড়িয়ে দিল, পেটে হাত বুলিয়ে, নখ দিয়ে জোরে জোরে মাথা চুলকে দিয়ে নিজের সাফল্য দেখতে পেয়ে মাথার তালুতে ছোরার ডগা দিয়ে খানিক খেলাও করে নিল, এইভাবে তাকে খতম করে দেওয়া যায় কি না খতিয়ে দেখতে গিয়ে শক্ত হাড়ের জন্য যদি তার চেষ্টা ব্যর্থ হয় ভাবতেই কেঁপে উঠল।

মরুভূমির সুলতানা ক্রীতদাসের কাজকর্মের প্রতিভায় খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে কাঁধ বাড়িয়ে দেয়, শান্ত থাকলেও তার অধীরতা বোঝা যায়। বুনো রাজকুমারীকে একবারে শেষ করতে হলে বুকের মাঝখানে কোপ মারা দরকার, এই ভেবে সৈনিক যখন তরোয়ালের ফলা বাগিয়ে ধরল, তখন চিতা আশ্বস্ত হয়ে পা গুটিয়ে তার দিকে তাকাতে তাকাতে রাজকীয় চালে বসে পড়ল, সে দৃষ্টিতে আদিম উগ্রতা আর অভ্যর্থনার ভাষা একই সঙ্গে আঁকা।

বেচারা সৈনিক এক তালগাছে হেলান দিয়ে খেজুর খেতে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে সন্ধানীর দৃষ্টি নিয়ে মরুভূমিতে মুক্তিদূতের খোঁজ করা আর ভয়াবহ কামিনীর অনিশ্চিত দয়ার ওপর খেয়াল রাখার কথা ভোলে না। যেখানে সে প্রতিবার খেজুরের আঁটি ফেলছিল, চিতা সেই জায়গার দিকে তাকিয়ে ছিল আর তার চোখে এক অভাবনীয় অবিশ্বাস ফুটে উঠছিল। ব্যবসায়ীর দূরদৃষ্টির ভঙ্গীতে সে সৈনিককে দেখছিল, তবে শেষ পর্যন্ত এই পরীক্ষা তার অনুকূলেই গেল, কেননা জলখাবার শেষ হওয়ার পরে সে তার জুতো কর্কশ চঞ্চল জিভ দিয়ে চেটে চেটে আশ্চর্যভাবে ভাঁজের ভেতর থেকে ধুলো পরিষ্কার করে দিল।

—কিন্তু যখন এর খিদে পাবে? সৈনিক ভাবতে থাকে।

৬. ☐ সৈনিকের পরিকল্পনা ☐

পরিকল্পনার কথা ভেবে বুক কেঁপে উঠলেও সে কৌতূহলী হয়ে চিতার মাপজোক আন্দাজ করার চেষ্টা করে। এই চিতা প্রাণীদের মধ্যে সবথেকে সুন্দর, প্রায় এক মিটার উঁচু আর লেজ ছাড়া প্রায় সওয়া এক মিটার এর দৈর্ঘ্য। গদার মত বিশাল হৃষ্টপুষ্ট হাত-পা, সিংহীর মত বড় মাথা, নিখুঁত সৌন্দর্যের দুষ্প্রাপ্য প্রতিমূর্তি হিসাবে আলাদা হয়ে থাকে। মুখের ভাবভঙ্গিতে কখনো বাঘের হিমশীতল নিষ্ঠুরতা আবার কখনো ছলকলাভরা রঙ্গিণীদের ঢং। এই একাকিনী

রানীর শরীরে মাতাল নিগ্রোর মতো খুশির জোয়ার এসেছে, রক্ত দিয়ে পিপাসা মিটিয়ে সে খেলা করতে চায়।

সৈনিক এদিক-ওদিক যাওয়া-আসার চেষ্টা করলে চিতা তাকে ছেড়ে দিল, কেবল তাকে চোখে চোখে রেখেই সে খুশি। তার অবস্থা অনেকটা উদ্বিগ্ন খরগোশ কিংবা কোনো বিশ্বস্ত কুকুরের মতো যে তার মালিকের চালচলন সব সময় খেয়াল করে। টিলার পাশে ঘুরতেই চোখ পড়ল সেই মরা ঘোড়ার অবশিষ্টাংশ পড়ে, চিতা লাশটাকে এতদূর অবধি টেনে এনে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খেয়ে সাবাড় করেছে, দৃশ্যটা তাকে স্বস্তি ফিরিয়ে দিল। এবার তাহলে গুহাতে চিতার অনুপস্থিতি এবং পরে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে মান্য করবার কারণ বোঝা যাচ্ছে।

সৌভাগ্যের এই প্রথম চিহ্ন তাকে ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধতে বলল। সে চিতার সঙ্গে সারাদিন কাটাবার উদ্দাম কল্পনায় দুলতে থাকে। আন্তরিকতাকে মূল্য দিয়ে তার বিশ্বাস অর্জন করবার জন্য কোনো ত্রুটি সে রাখবে না। চিতার কাছে ফিরে এসে ধীরে ধীরে তাকে লেজ দোলাতে দেখে সে ভীষণ খুশি হয়ে ওঠে। নির্ভয়ে এসে পাশে বসে পড়ার পরে দুজনের খেলা শুরু হয়। সে চিতার থাবা নাক ছুঁয়ে কান টেনে ধরে, পিঠে গড়াগড়ি দিয়ে, জোরে জোরে দু পাশের সিল্কের মত গরম চামড়া ঘষাঘষি করতে লাগল। বিনা বাধায় চিতা সবকিছু মেনে নিল, তার শান্ত থাবার লোম পালিশ হল। সৈনিক কিন্তু এক হাতে সব সময় ছুরি ধরে রেখেছিল। আবার সে এই অতিসাহসী চিতার বুকে ছুরি ঢুকিয়ে দেওয়ার কথা ভাবল। কিন্তু তাহলে আবার মরণ খিঁচুনির মধ্যে পড়ে গিয়ে তার নিজের মারা যাওয়ার ভয় থাকে। তাছাড়া নিজের ভেতরে সে এক ধিক্কারের স্বর শুনতে পায়, সেই স্বর একজন নিরীহ প্রাণীকে শ্রদ্ধা করতে বলে। অনন্ত মরুর মাঝে সে যেন এক বান্ধবীকে খুঁজে পেয়েছে।

অজান্তেই তার প্রথম সঙ্গিনীর কথা মনে পড়ে, যাকে সে 'মোহিনী' বলে ডাকত কিন্তু তার চরিত্রই ছিল উল্টো ধরনের, যতদিন তাদের মধ্যে কামনা বাসনা জিইয়ে ছিল, সেই হিংসুটে মেয়ের ছুরির ভয়ে সৈনিক সবসময় কাঁটা হয়ে থাকত। কম বয়সের সেইসব স্মৃতির কথা ভাবতে ভাবতে তার মনে হল, এই যুবতী চিতাকে সেই নাম দিলে ভাল হয়. এখন তো সে তাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে, ভয় কমে এসেছে, অধীরতা কেটে গিয়ে কিছুটা মায়া পড়েছে।

দুশ্চিন্তার কথা নাড়াচাড়া করতে করতে দিনের শেষে বিপজ্জনক পরিস্থিতি প্রায় সয়ে আসে। শেষে উঁচুগলার 'মোহিনী' ডাকে সঙ্গিনীর তার দিকে বারবার ফিরে তাকানোর অভ্যাস হয়ে গেল।

সূর্যাস্তের সময় মোহিনী বারবার বিষণ্ণ ভরাট গলায় ডেকে উঠল। 'ভাল শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে।' খুশি সৈনিক ভাবল, 'এখন প্রার্থনা সেরে নেওয়ার পালা।'

কিন্তু এই তামাশা বেশিক্ষণ টিকে রইল না, সঙ্গিনীর শান্ত অবস্থা দেখে সে মন্তব্য করল, 'ছোট্ট সোনা, শুতে যাও, প্রথমে তোমাকে আমি ঘুমিয়ে পড়তে দেখতে চাই।' নিজের পায়ের ওপর তার যথেষ্ট আস্থা আছে। যখনই ও ঘুমিয়ে পড়বে, যত জোরে পারা যায়, ছুটে পালিয়ে গিয়ে রাত্তিরের মধ্যে অন্য আশ্রয় খুঁজে বের করে নিতে হবে।

৭. ☐ অবলা উপকারের মত একটি শিষ্টাচার ☐

সৈনিক অস্থিরভাবে পালানোর সঠিক মুহূর্তের অপেক্ষা করতে থাকে, তারপর সময় হলেই প্রাণপণে নীলের দিকে ছুট লাগায়। কিন্তু এক মাইলের সিকিভাগ পেরোনোর আগেই শুনতে পায় চিতা তার পিছু পিছু লাফিয়ে আসছে আর থেকে থেকে করাতচেরা গলায় হাঁক দিচ্ছে, সে ডাক তার ছুটে আসার আওয়াজের চেয়েও মারাত্মক!

নিজেকে সে বলল, 'নাও এবারে! এ তো আমার টানে পড়ে গেছে!··· তরুণী বাঘিনী বোধহয় অন্য কাউকে কোনোদিন দেখেনি, প্রথম প্রেম পেয়ে এবারে একেবারে গদগদ হয়ে উঠেছে।'

ঠিক সেই সময় যে জায়গা পথিকদের পক্ষে মৃত্যুকূপ এবং যেখান থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব, সেই চোরাবালির ঘূর্ণিতে সৈনিক পড়ে গেল। নিজের অবস্থা টের পেয়ে আর্তনাদ করে উঠতেই চিতা এসে পড়ে ভোজবাজির মতো সব বুঝে নিয়ে দাঁত দিয়ে প্রাণপণে কলার চেপে ধরে সেই খাদ থেকে তাকে টেনে তুলে আনল।

—ও মোহিনী, আনন্দের চোটে তাকে জড়িয়ে ধরে সৈনিক চেঁচিয়ে উঠল, এখন থেকে বাঁচা-মরার ব্যাপারটা নিজেরাই ভাগ করে নেব।

সে তার পিছু-পিছু ফিরে গেল।

তখন থেকেই মরুভূমি যেন জনবহুল হয়ে উঠল। এখানে কথা শোনানোর মতো একজনকে পেয়ে সে বাঁধা পড়ে গেল। চিতার হিংস্রতা তার চোখে অনেক কমে গেল যা না হলে এই অভাবনীয় বন্ধুত্ব ব্যাখ্যা করা যায় না। সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে জেগে থাকার ইচ্ছা যতই প্রবল হোক না কেন, একসময় সৈনিক ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে উঠে মোহিনীকে খুঁজে পাওয়া গেল না। টিলার ওপর উঠে দেখা গেল অনেকদূর থেকে সে লাফ দিয়ে ছুটে আসছে, সেই লাফের প্রচণ্ডতার কথা নরম মেরুদণ্ডী প্রাণীরা কোনোদিন ভাবতেও পারে না। ঘেমোঝুমো ঠোঁট নিয়ে মোহিনী এসে পৌঁছে সঙ্গীর কাছ থেকে যথাযোগ্য আদর খেতে খেতে ভরাট গলায় 'রু-রু' শব্দ করে বোঝাতে লাগল, সে কতটা খুশি হয়েছে। সৈনিকের ওপর তার শান্ত, কমনীয় চোখ আগের দিনের চেয়েও আরো মধুর কোমলভাবে ঘোরাফেরা

করছিল, সৈনিক যেন এক পোষা প্রাণীর সঙ্গে কথা বলছিল।

—ওগো মাদমোয়াজেল, তুমি তো লক্ষ্মী মেয়ে, তাই না? দেখছ তো? আমরা জড়াজড়ি করতে কত ভালবাসি। তোমার ভয় লাগছে না তো? কোনো মুসলমান খেয়ে এলে নাকি? বাঃ, বেশ, ওরাও তো তোমার মতো জানোয়ার! কিন্তু ফরাসীদের কক্ষনো গিলতে যেও না, তাহলে তোমাকে আর ভালবাসব না।

বাচ্চা কুকুর যেভাবে মালিকের সঙ্গে খেলে সে-ও তেমনি গড়াগড়ি, লাফঝাঁপ দিয়ে চারদি'ক লুটোপাটি খেতে লাগল আর কখনো-কখনো বন্ধুর মত সৈনিকের দিকে থাবা বাড়িয়ে দিয়ে খেলার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

৮. □ মুখচোরা বিশ্বস্ত মোহিনী □

এইভাবে কয়েকদিন কাটল।

সঙ্গিনী তাকে মরুর বিশাল সৌন্দর্য উপভোগ করতে দিত। একটি প্রাণীর কাছ থেকে ভয় আর নিশ্চিন্ততা মেশানো ভাবনার খোরাক পেয়ে তার মন দুধরনের আলাদা ভাবনায় তোলপাড় হয়ে উঠত, এ জীবন কেবল বৈপরীত্যে ভরপুর। নির্জনতা তার কাছে সমস্ত রহস্য উজাড় করে দিয়ে অপূর্ব সুখে তাকে ছেয়ে ফেলে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মানুষের অজানা সব দৃশ্য সে আবিষ্কার করত। মাথার ওপরে পাখির ডানা ঝাপটানোর মৃদু শব্দ শুনে সে রোমাঞ্চ অনুভব করে, ঐ বুঝি এক দুর্লভ অতিথি যায়। রঙ-বেরঙের পরিবর্তনশীল ভ্রমণকারী মেঘেরা পরস্পর মিলেমিশে থাকে। সারারাত ভরে সে দেখত চাঁদের আলোয় বালির সমুদ্র কীরকম হয়ে ওঠে, সেখানে ঘূর্ণিঝড়ে ঢেউ ওঠে, দোলে, ক্রমাগত চেহারা বদলায়। প্রাচ্যের দিনগুলির সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠে ধু-ধু প্রান্তরে ঝড়ের বিশাল দৃশ্য উপভোগ করত যেখানে উড়ন্ত বালি লাল শুকনো কুয়াশা তৈরি করে, কালান্তক মেঘ জমে, তারপর সুখী মনে তারিয়ে তারিয়ে সন্ধ্যা নামতে দেখত, তখন নক্ষত্রদের করুণা মধুরভাবে ঝরে পড়ত। আকাশে আকাশে অলৌকিক সুরের মূর্ছনা। নির্জনতা তার সামনে স্বপ্নের সম্পদ খুলে ধরত। বর্তমানের সঙ্গে পুরনো দিনগুলোকে তুলনা করে আকাশ পাতাল চিন্তায় তার সময় কাটত।

ভালবাসা দরকার বুঝতে পেরে সে চিতাকে ভালবেসে ফেলেছিল।

তার প্রভাবে সঙ্গীর চরিত্রের বদল হওয়ার জন্য কিংবা মরুভূমিকে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে প্রচুর খাবারের সন্ধান পাওয়ার জন্যই কি না কে জানে, মোহিনী সৈনিকের জীবনকে শ্রদ্ধা করত আর সে মোহিনীকে এত তাড়াতাড়ি পোষ মেনে যেতে দেখে আর অবিশ্বাস করত না।

বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটালেও জালে বসা মাকড়শার মতো তাকে খেয়াল রাখতে হত। মুক্তির মুহূর্ত যেন ফস্কে না যায়। যদি কেউ দূরে

আঁকা দিগন্ত দিয়ে চলে যায় ! এক ন্যাড়া তালগাছে পতাকা তুলে ধরবার জন্য তাকে গায়ের জামা বিসর্জন দিতে হয়েছিল, প্রয়োজনীয়তা থেকে মাঝে মাঝে লাঠি দিয়ে সে পতাকা নাড়াতে শিখেছিল, কেননা ভ্রমণকারীরা মরুর চারদিক চেয়ে দেখবার সময়টাতেই হয়ত বাতাস না পেয়ে পতাকা উড়বে না ।

এক এক সময় সব আশা ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সে চিতার সঙ্গে মজা করে কাটাত। শেষে সে তার বিভিন্ন মেজাজের ডাক, দৃষ্টির ভাবভঙ্গি বুঝে ফেলেছিল, সোনালি পোশাকের ওপরের ছাপগুলোর খেয়ালখুশিপনা দেখা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। যখন সে তার বিরাট লেজের ডগার সাদাকালো লোম ধরে দেখত, মোহিনী কোনো প্রতিবাদ করত না, সেসব লোম দূর থেকে সূর্যের আলোয় মণিমুক্তোর মতো ঝলসাত। সুন্দর নমনীয় রেখা, ধূসর কোমর, অভিজাত মাথার লাবণ্য দেখে তার প্রাণ পুলকে ভরে যেত। যখন সৈনিক নিজের খুশিমতো তাকে খেলা করাত, তার হৈ-হল্লা আমোদ করা বেড়ে যেত। তার চলাফেরার অস্থিরতা, অল্পবয়সী উদ্দামতা মুগ্ধ করে দেওয়ার মতো, তার খোশামোদির ঢঙ দেখে মজা পাওয়া যেত, তখন সে তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে লাফ-ঝাঁপ জুড়ে দিত, গুঁড়ি মেরে এগোত, গড়াগড়ি খেয়ে চারদিক হাতড়াত, কখনো নিজেকে চেপে ধরে ডিগবাজি খেত আবার কখনো বা টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে থেকে লাফ দিয়ে উঠত। যত জোরেই লাফালাফি করুক বা পাথরের গুঁড়ির দিকে যখনই এগিয়ে যাক না কেন, 'মোহিনী' ডাক শুনলেই সে চট করে থেমে যেত ।

একদিন প্রখর রৌদ্রে এক বিরাট পাখি শূন্যে ভেসে এল। সৈনিক চিতাকে এই নতুন অতিথির পরিচয় জানাতে গেল, কিন্তু একমুহূর্ত দেখে নিয়েই পরিত্যক্তা সুলতানা বিকট ডাক ছাড়ল ।

—ভগবান না করুন, মনে হচ্ছে এ তো ভীষণ হিংসুটে, তার কঠিন চোখ দেখে সে চেঁচিয়ে উঠল ; নির্ঘাত এর শরীরে কুমারীর আত্মা ঢুকে গেছে ।

ঈগল শূন্যে মিলিয়ে গেলে চিতার উদ্যত শরীরের পিছনে দাঁড়িয়ে সে প্রশংসা জুড়ে দিল। শরীরের রেখায় এত লাবণ্য আর যৌবনের দীপ্তি ! ঠিক কোনো রূপসীর মতো মনোলোভা ! ধূসরসাদা ছোপ দেওয়া সোনালি লোমের পোশাক ! মাস্তুলের মতো পা ! সূর্যের কড়া রোদে যেন জ্যান্ত সোনা চমকাচ্ছে, বাদামি ছোপ অবর্ণনীয় আকর্ষণ তৈরি করেছে !

সৈনিক ও চিতা পরস্পরের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকল যেন নিজেদের ভেতরটা তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। বন্ধুর নখ তার মাথায় বিলি কাটছে বুঝতে পেরে ছেনালের মতো চিতা কেঁপে উঠল, আলোর ফুলকির মতো উজ্জ্বল দুই চোখ জ্বলে উঠল, তারপর সজোরে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলল ।

—নিশ্চয়ই এর হৃদয় আছে, বালির বেগমের প্রশান্তি দেখে সে মন্তব্য করল,

বালির মতই এই চিতা সোনালি, তাদের মতো পরিচ্ছন্ন, একাকী এবং জ্বলজ্বলে···

৯. □ ভুল বোঝাবুঝি □

—বাব্বাঃ, বেশ! মেয়েটি বলল, জন্তুদের পক্ষে তোমার ওকালতি তো শুনলাম, কিন্তু এ তো বুঝতে পারার পরেও ওদের সম্পর্ক নষ্ট হল কী করে?

—আহ্, এ তো জানা কথা! যেভাবে ভুলবোঝাবুঝি থেকে সব কামনাবাসনা শেষ হয়, তাদেরও সেইভাবে বিচ্ছেদ ঘটল। আমরা একে অপরের তরফ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভাবতে পারি, কিন্তু জোর দিয়ে কোনো কিছু বলতে পারি না। একগুঁয়েমির ফলে নিজেরাই সব গোলমাল করে ফেলি···

—আর সব থেকে সুন্দর মুহূর্তে একটি দৃষ্টি বা একটি কথাই এর পক্ষে যথেষ্ট; মেয়েটি বলল, যাকগে, গল্পটা শেষ করো।

—শেষ করা খুবই কঠিন, যদি না তুমি নাপোলেয়ঁর আমলের সেই বুড়োকে বুঝতে পারো, যে বুক খুলে সব বলতে বলতে শ্যাঁপাইনের বোতল শেষ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল, জানি না আমি তার কী ক্ষতি করেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কেন যেন ক্ষেপে উঠে ও ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রথমে আমার পায়ের চামড়া কামড়ে ধরেছিল, অবশ্য খুবই হাল্কা ভাবে। আর আমি ভাবলাম, ও আমাকে খেয়ে ফেলবে, সঙ্গে সঙ্গে তার গলাতে ছুরি বিঁধিয়ে দিলাম। এমন ডাক ছেড়ে ও গড়িয়ে পড়ল যে আমার বুক হিম হয়ে গেল। আমার দিকে তাকিয়ে ছটফট করছিল, সে চোখে কোন রাগ ছিল না। সব মানুষের বদলে, ক্রুশের দিব্যি গেলে বলতে পারি, আরেকবার যদি ওর জীবন ফিরিয়ে দিতে পারতাম! যেন সত্যি সত্যি একটা মানুষ খুন করেছি। পতাকা দেখে বাঁচাবার জন্য সৈনিকরা দৌড়ে এসে আমাকে চোখের জলে ভাসতে দেখেছিল।

—যাই হোক মঁশিয়ো, একটু থেমে আবার সে শুরু করল, জার্মানি রাশিয়া, স্পেন ফ্রান্সের যুদ্ধে আমি গিয়েছি বটে, কিন্তু কেবল আমার ধড়টাই ঘুরে বেড়িয়েছে। সেই মরুর মতো আর কিছু চোখে পড়েনি। কী চমৎকারই না ছিল···

—কী মনে হত? জিজ্ঞাসা করলাম।

—তেমন কিছু নয়, বাবুমশাই। তাছাড়া আমি তো আর সব সময় খেজুরের গোছা কিংবা চিতার কথা ভেবে হা-হুতাশ করি না, যদিও সেজন্য আমার দুঃখ হওয়া উচিত। মরুভূমিতে সবকিছুই আছে, আবার কোনো কিছুই সেখানে তুমি পাবে না···

—কী রকম? আরেকবার বুঝিয়ে বলো···

ওহো, জানতে চাও বুঝি; অধৈর্যভাবে সে বলে উঠল; তা হল অনেকটা মানুষ ছাড়া ভগবানের মতো··

হৃদ্‌পিণ্ডের ধুক্‌ধুক্‌

এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯)

সত্যি!—নার্ভাস—খুব ; খুব সাংঘাতিকভাবে নার্ভাস হয়ে গেছিলাম। এখনো তাই আছি। কিন্তু আমাকে আপনারা পাগল ভাবছেন ? আমার অসুখ আমার ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলিকে নষ্ট করেনি। ভোঁতাও করেনি। বরং তীক্ষ্ণ করে তুলেছে। সবচেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আমার শ্রবণশক্তি। স্বর্গমর্তের অনেক কিছুই আমি শুনতে পাই। নরকেরও অনেক কিছু শুনি। তাহলে পাগল কী করে হলাম। শুনুন, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করুন, আমি কেমন সুস্থ মনে, কেমন শান্তভাবে আপনার কাছে আস্ত গল্পটা বলে যেতে পারছি।

বলা সম্ভব নয় কী করে মতলবটা প্রথম মাথায় এল। আর সেটা দানা বাঁধতেই আমাকে দিনরাত জ্বালাতন করতে লাগল। কারণ অবশ্য কিছুই ছিল না। আবেগও কিছুমাত্র না। বুড়ো লোকটাকে ভালই লাগত। কখনো ও আমার কোনো ক্ষতি করেনি, কোনো অপমানও করেনি। ওর সম্পত্তির ওপরও আমার কোনো লোভ ছিল না। আসলে ওর চোখ! হ্যাঁ চোখই কারণ। ওর একটা চোখ ছিল ঠিক শকুনের চোখের মতো—ফ্যাকাশে নীল, ছানিপড়া। যখনই চোখটা আমার ওপর পড়ত আমার রক্ত হিম হয়ে যেত। তাই যত দিন যায়—ক্রমে ক্রমে—একটু একটু করে—মন ঠিক করে ফেললাম বুড়োটাকে শেষ করে ফেলতেই হবে—এভাবেই ওর চোখ থেকে রেহাই পেতে হবে, চিরদিনের জন্য।

ব্যাপারটা এই। এতেই ধরে নিচ্ছেন আমি পাগল। পাগলে কি কিছু বোঝে ? কিন্তু আপনারা যদি তখন আমাকে দেখতেন তো বুঝতে পারতেন কী রকম বুদ্ধিমানের মতো এগিয়েছিলাম—সাবধানে—কতখানি দূরদৃষ্টি ছিল—কী রকম আত্মগোপন করে কাজে নেমে পড়েছিলাম। বুড়োটাকে খুন করার ঠিক আগের সাতদিন কী দারুণ ভালবাসা দেখাতে হয়েছিল যা আগে কখনো দেখাইনি। কিন্তু রোজ ঠিক মাঝরাতে আমি তার ঘরের দরজার হাতলটা ধরতাম ; তারপর দরজাটা খুলতে থাকতাম—আস্তে, খুউব আস্তে। আর যেই না মাথা গলে যাওয়ার মতো একটু ফাঁক হত, অমনি সেই ফাঁকে ঢুকিয়ে দিতাম একটা কালো লণ্ঠন—লণ্ঠনটার চারদিক এমন করে ঢাকা যে একটুও আলো ঠিকরোতে পারত না। তারপর লণ্ঠনের পেছন-পেছন আমার মাথাটাও গলিয়ে দিতাম।

অনুবাদ : বলরাম বসাক

কী কায়দাবাজি করে মাথাটা ঢোকাতাম তা দেখলে আপনারা হেসে ফেলতেন। খুব আস্তে—খুউব ধীরে ধীরে আমি মাথাটা গলাতাম—যাতে বুড়োর ঘুম না ভাঙে—এক ঘণ্টা লেগে যেত আস্ত মাথাটা দরজার ফাঁকে গলাতে। তখন আবছা-আবছা দেখতে পেতাম বিছানায় বুড়ো ঘুমোচ্ছে। হেহ্—পাগলের কি এতখানি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে? তারপর মাথাটা ওর ঘরে পুরোপুরি ঢোকানো হয়ে গেলে আমি খুব সাবধানে লণ্ঠনটার ঢাকনা খুলতে শুরু করি—খুউব সাবধানে। যেন লণ্ঠনটার কবজার 'ক্যাঁচ' শব্দটাও না হয়। ঢাকনাটা একটুখানি খুলতাম যাতে ছোট্ট একটা পাতলা আলোর রেখা ঐ শকুন চোখটার ওপর শুধু পড়ে। এ রকমটি করে গেছি সাত-সাতটি রাত—রোজ মাঝরাতে। কিন্তু রোজই দেখতাম ওর চোখটা সব সময় বোজা থাকত। আর সেজন্যেই আমার কাজ সারা সম্ভব হত না, কারণ বুড়োর ওপর তো আমার রাগ ছিল না, ছিল ওর ঐ অশুভ চোখটার ওপর।

তারপর সকাল হলেই আমি নিঃসংকোচে ওর ঘরে ঢুকি, সপ্রতিভ হয়ে কথা বলি, আন্তরিকতার সুরে তাকে নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করি রাতটা কেমন কাটল। তাহলে বুঝতেই পারছেন, বুড়োটা কতখানি ভালোমানুষ, ওর কোন রকম সন্দেহই হত না যে রোজ রাত বারোটায় ঘুমন্ত ওর ওপর নজর রাখি।

অষ্টম রাতে আগের বারের চাইতে আরো বেশি সতর্ক হয়ে দরজা খুললাম। আমার হাতের চাইতে ঘড়ির মিনিটের কাঁটা যেন অনেক দ্রুত চলছিল। আমার যে কতখানি ক্ষমতা—কতখানি বিচক্ষণতা—সে রাতের আগে কোনোদিনই উপলব্ধি করিনি।

জয়োচ্ছ্বাস যেন চেপে রাখতে পারছিলাম না। ভেবে দেখুন, আমি দরজাটা খুলছি, একটু একটু করে, আর ও স্বপ্নেও বুঝে উঠতে পারছে না গোপনে আমি কী করছি বা ভাবছি। মনে হতেই আমার বেশ হাসি পেল—আর ও হয়ত শুনতে পেল সেই হাসি। হঠাৎ যেন চমকে উঠল। নড়ে-চড়ে উঠল বিছানায়। এখন হয়ত ভাবছেন যে, আমি সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এলাম—মোটেই না।। ঘরে আলকাতরার মত জমাট অন্ধকার (চোরের ভয়ে সবকটা খড়খড়ি দারুণ নেই, আঁটা)। তাই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে দরজার ফাঁকটুকু ওর চোখে না। আস্তে আস্তে দরজাটাকে ঠেলে খুলতে লাগলাম। বেন কী

দরজার ফাঁকে মাথাটা ঢুকিয়ে যেই না লণ্ঠনটা খুলতে যাচ্ছিলাম শেষ বুড়ো-আঙুলটা ফসকে লণ্ঠনের টিনের গায়ে লাগল—আর বুড়োটা বিছানার উপর লাফিয়ে উঠে বসে, চেঁচিয়ে উঠল, 'কে—কে?'

স্থির দাঁড়িয়ে থাকলাম, কিছু বললাম না। সে সময় ওর শুয়ে পড়ার কোনো শব্দও কানে এল না। সে এখনও বিছানার ওপর বসে কান পেতে শুনছে—ঠিক যেমন করে আমি রাতের পর রাত সেই ঘরের দেয়ালে মৃত্যুর প্রহরা শুনেছি।

তক্ষুনি একটা অস্ফুট গুমরানি শুনতে পেলাম। আমি বুঝতে পারলাম

এ মৃত্যু-ভয়ের গুমরানি। এ আর্তস্বর কোনো বেদনা থেকে নয়, কোনো কষ্ট থেকে নয়—ওহ্ না—এ হল চাপা আর্তনাদ যা শুধু আতঙ্কতাড়িত আত্মার অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসে। এ শব্দ আমার চেনা। কতদিন ঠিক মাঝরাতে যখন সারা পৃথিবী ঘুমে মগ্ন আমার বুক থেকে উঠে আসত এই শব্দ, ভয়াল প্রতিধ্বনি তুলে গভীর করে তুলত আমার আতঙ্ক, আমি বিমূঢ় হয়ে পড়তাম। আমি চিনি, এ শব্দ আমার বেশ চেনা। বুঝতে পারছি বুড়োর মনের মধ্যে কী হচ্ছে, ওর জন্যে করুণা হচ্ছে, যদিও বুকটা খুশিতে ভরে উঠছে। প্রথমবারের মৃদু শব্দে জেগে উঠে যখন ওপাশ ফিরে শুল তখন থেকেই ও জেগে আছে। তখন থেকেই ওর ভয় ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। যতবারই ভাবতে চেয়েছে 'ও কিছু না, চিমনিতে বাতাস ঢুকেছে—নাকি মেঝের ওপর ইঁদুর ছুটছে' কিংবা 'একটা ঝিঁ ঝিঁ একবার মোটে ডাকল'। হ্যাঁ, এই সব কল্পনা করেই ও নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু বুঝতে পারল, সব বৃথা। সবই বৃথা। কারণ মৃত্যু ওর দিকে এগিয়ে আসছে, ওর সামনের কালো ছায়ার ওপর ওত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে জড়িয়ে ধরছে। সেই অদৃশ্য ছায়ার করুণ একটা প্রভাব ওর ওপর পড়েছে। ও উপলব্ধি করতে পারছে—যদিও না পেয়েছে কিছু দেখতে, না পেয়েছে কিছু শুনতে—তবু যেন উপলব্ধি করতে পারছে আমার মাথাটার অস্তিত্ব ওর ঘরের মধ্যে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম,—খুব ধৈর্য ধরে, ওর শোওয়ার শব্দ শুনতে
অ পেলাম না। ঠিক করলাম লণ্ঠনটা একটুখানি—সামান্য একটুখানি ফাঁক করব।
এক করলাম। ভাবতেও পারবেন না কত চুপিসাড়ে চোরের মতো তা করলাম যার
চোখফেলে লণ্ঠনটা থেকে মাকড়সার জালের সুতোর মতো সরু ক্ষীণ রশ্মি নিক্ষিপ্ত
ক্রমে ক্রল শকুনচোখটার ওপর।
ফেলতেই চোখটা খোলা—একেবারে ড্যাবডেবে খোলা,—আর ওটার ওপর আমার
ব্যাপ. পড়তেই আমার পিত্তি জ্বলে উঠল। সুস্পষ্ট দেখতে পেলাম—একটা
বোঝে? শে নীল তারা তার ওপর বিচ্ছিরি ছানি, যা দেখলে আমার হাড়ের মজ্জায়-
রকম বুদ্ধিমা কাঁপুনি ধরে যায়। অবশ্য বুড়োটার মুখ, গা কোনো কিছুই চোখে
রকম আত্মগো না শুধু চোখটা ছাড়া, কারণ আলোর রেখাটি সেই জঘন্য জায়গাটার
আগের সাতই রেখেছিলাম।
দেখাইনি

তারপ তবেই বুঝুন, আমি কি বলিনি যে পাগলামি বলতে আপনারা ভুল করেন, ওটা আসলে ইন্দ্রিয়ের অত্যুগ্রতা?—এসব বলছি কারণ কানে আসছিল একটা অতি মৃদু, একঘেয়ে একটানা শব্দ, তুলোয় জড়ানো ঘড়ি থেকে যেমন হয়। এই শব্দটাও আমার চেনা। এ হল ঐ বুড়োটার হৃদপিণ্ডের ধুক্-ধুক্। এই শব্দ আমার আক্রোশ বাড়িয়ে দিল যেভাবে ড্রাম বাজানোর শব্দ সৈনাদের সাহস বাড়িয়ে দেয়।

তবু আমি কিছুই না করে রুদ্ধশ্বাস স্থির দাঁড়িয়ে থাকলাম। লন্ঠনটাও স্থির ধরে রাখলাম—দেখা যাক সরু আলোটা ঐ চোখের ওপর কতক্ষণ স্থির ফেলে রাখতে পারি। এরই মধ্যে ওর হৃদপিন্ডের বীভৎস শব্দ বেড়ে যেতে লাগল। মুহূর্তে মুহূর্তে দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল। জোর থেকে আরও জোরে হতে লাগল। বুড়োটার আতঙ্ক নিশ্চয় চরমে উঠেছে।

হৃদপিন্ডের ধুক্‌ধুক্‌ ক্রমশ বাড়ছে, জোরে আরো জোরে, প্রত্যেকটা মুহূর্তে। আপনারা কি লক্ষ্য করেননি? আমি তো আগেই আপনাদের বলেছি আমি নার্ভাস ধরনের লোক। সত্যিই আমি তাই। এখন রাতের নিষ্প্রাণ মুহূর্তে পুরানো বাড়িটার ভয়ঙ্কর স্তব্ধতার মধ্যে কীরকম একটা অদ্ভুত শব্দ আর তাই শুনে আমি আমার আতঙ্ক দমাতে পারছি না, আমি প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়ছিলাম। তবু কয়েক মিনিট সামলে রাখলাম নিজেকে এবং স্থির দাঁড়িয়ে থাকলাম।

কিন্তু হৃদপিন্ডের ধুক্‌ধুক্‌ বেজে যাচ্ছে—জোরে—আরও জোরে—এত জোরে যে আমার মনে হল, এই বুঝি ওটা ফেটে চুরমার হয়ে যাবে। আর ঠিক তক্ষুনি একটা নতুন উদ্বেগ দেখা দিল আমার মধ্যে—তাই তো, শব্দটা যদি কোনো প্রতিবেশীর কানে যায়। প্রচন্ড জোরে চিৎকার করে, ঝাঁকুনি দিয়ে লন্ঠনটা পুরো খুলে ফেললাম এবং লাফিয়ে পড়লাম ঘরের মধ্যে। ও শুধু একবার আর্তনাদ করে উঠল—একবারই। মুহূর্তের মধ্যে ওকে মেঝের ওপর টেনে ফেলে দিলাম। তারপর ওর ওপর ভারী বিছানা চাপা দিয়ে রাখলাম। একটু হাসলাম। এ পর্যন্ত ভালভাবেই হল। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে ওর হৃদ্‌পিন্ডটা মৃদু হলেও ধুক্‌ ধুক্‌ করে যেতে লাগল। তাতে অবশ্য আমার কোনো ক্ষতি হচ্ছিল না, কারণ দেয়ালের বাইরে থেকে তো কেউ শুনতে পাচ্ছে না শব্দটা। শেষ পর্যন্ত শব্দটা থেমে গেল। বুড়ো মরেছে। আমি বিছানা সরালাম, মড়াকে পরীক্ষা করে দেখলাম। হ্যাঁ, ও পাথর হয়ে গেছে, নিষ্প্রাণ পাথর।

আমি ওর বুকের ওপর হাত রাখলাম। রাখলাম অনেকক্ষণ। স্পন্দন নেই, নিষ্প্রাণ পাথর। আর কখনোই ওর চোখ আমাকে যন্ত্রণা দেবে না।

এর পরেও কি আমাকে পাগল ভাবছেন? ভাবা সম্ভব নয় যখন দেখবেন কী রকম মাথা খাটিয়ে, কত সাবধানে মৃতদেহটা লুকিয়ে ফেলেছিলাম। রাত শেষ হয়ে আসছিল আর আমিও দ্রুত কাজ সারতে লাগলাম। তবে খুব নিঃশব্দে। প্রথমেই দেহটা টুকরো টুকরো করে ফেললাম। মুন্ডু, হাত আর পা আলাদা করে ফেললাম।

তারপর ঘরের মেঝে থেকে তিনটে তক্তা সরিয়ে ফেলে সেগুলো তলায় ফেলে দিলাম। তক্তাগুলোকে এমন নিখুঁত করে, এমন চমৎকার করে সাজিয়ে রাখলাম যে মানুষের চোখে—এমনকি সেই বুড়োর চোখেও—সন্দেহজনক কিছু ধরা

পড়বে না। ধোয়ামোছার কিছু নেই, কোনো চিহ্ন নেই, কোনো রকম রক্তের দাগ পর্যন্ত নেই। থাকবে কী করে, আমি খুবই সাবধানে করেছি—হুঃ হুঃ—সবই করেছি একটা গামলায়।

সব যখন চুকল তখন ভোর চারটে—তখনও অন্ধকার যেন মাঝরাত। ঘড়িতে যেই বাজল ঢংঢং···অমনি সদর দরজায় শব্দ হল ঠকঠক। দরজাটা খুলতে আমি হাল্কা মনে নেমে গেলাম—আর ভয় কিসের?

তিনজন ঢুকল। বেশ ভদ্রভাবে নিজেদের পরিচয় দিল যে তারা পুলিশ-অফিসার। রাতে আর্তনাদ শুনে কোনো প্রতিবেশী খারাপ কিছু সন্দেহ করে পুলিশে খবর দিয়েছে। তাই বাড়িটা খানাতল্লাশি করার জন্যে তাদের আসতে হয়েছে।

আমি হাসলাম—ভয় পাওয়ার কী আছে? ওদের স্বাগত জানালাম। বললাম যে, আর্তনাদটা আমারই, স্বপ্নের ঘোরে হয়ে গেছে। আর বুড়োর সম্পর্কে জানালাম যে সে নেই, দেশে গেছে। ওদের সারা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখালাম। ভালো করে খানাতল্লাশি চালাতে দিলাম। শেষ পর্যন্ত ওদের নিয়ে এলাম সেই বুড়োর ঘরে। তাদের দেখালাম বুড়োর যা কিছু ধনসম্পদ সবই ঠিকঠাক আছে, নড়চড় হয়নি।

নিজের ওপর আস্থা এতখানি হল যে প্রচণ্ড উৎসাহে কয়েকটা চেয়ার নিয়ে এলাম ঘরের মধ্যে এবং ওদের এখানেই বিশ্রাম করতে বললাম। আর আমার সাফল্য খুবই নিখুঁত হয়েছে দেখে উদ্দাম স্পর্ধার সঙ্গে ঠিক সেখানেই আমার চেয়ারটা পাতলাম যার তলায় লুকনো রয়েছে মৃতদেহ।

অফিসাররা সবাই সন্তুষ্ট। আমার আচরণে তাদের সন্দেহ কেটে গেছে। আমিও সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত। ওরা বসল। পরিচিত বিষয় নিয়ে বকবক শুরু করল। আমিও উত্তর দিলাম হাসিমুখে।

কিন্তু কিছুক্ষণ যেতেই আমার নিজেকে কেমন যেন ফ্যাকাশে মনে হতে লাগল। মন চাইতে লাগল, ওরা চলে যাক। মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা হতে লাগল, কানের মধ্যে কী একটা শব্দ বাজতে লাগল। কিন্তু এখনও ওরা বসে আছে আর বকবক করে যাচ্ছে। কানের মধ্যে সেই শব্দটা আরও স্পষ্ট হল—বেজেই চলল, ক্রমশ স্পষ্ট, স্পষ্টতর হতে লাগল। আমি এই অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাবার জন্যে আরও মন খুলে কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু শব্দ হতেই থাকল, আরো অনেক জোরালো হয়ে উঠল। শেষে বুঝলাম, শব্দটা আমার কানের মধ্যে হচ্ছে না।

আমি তখন আরও ফ্যাকাশে হয়ে পড়ছিলাম, নিঃসন্দেহে, তাই কথা বলতে লাগলাম আরো তাড়াতাড়ি, আরো চড়া গলায়, কিন্তু শব্দটা আরো বেড়ে গেল—ওটাকে এড়ানো যাচ্ছে না, কী যে করি! এ যে সেই অতিমৃদু একঘেয়ে একটানা

শব্দ—তুলোয় জড়ানো ঘড়ি থেকে ঠিক যেরকম হয়। হাঁপাতে-হাঁপাতে নিশ্বাস ফেললাম। পুলিশ অফিসাররা এখনো ওটা শুনতে পাচ্ছে না। আরো দ্রুত কথা বলতে লাগলাম আমি—আরো চেঁচিয়ে। কিন্তু শব্দটা আরো বেড়ে গেল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বিকট মুখভঙ্গি করে হাত-পা নেড়ে তর্ক জুড়ে দিলাম। কিন্তু শব্দটা বেড়েই চলল। ওহ্, লোকগুলো কেন যাচ্ছে না। ওদের কথায় আমি ভীষণ চটে গেছি বোঝানোর জন্যে আমি মেঝের ওপর লম্বা-লম্বা পা ফেলে গটমট করে পায়চারি করতে লাগলাম—কিন্তু শব্দটা কেবলই বেড়ে যাচ্ছে।

কী যে করি! আমি ফুঁসে উঠলাম, ক্ষিপ্ত হয়ে বকতে লাগলাম, কখনো দিব্যি গালতে লাগলাম। আর যে চেয়ারটায় বসেছিলাম সেটাকে সামনে-পেছনে দোলাতে-দোলাতে মেঝের তক্তার ওপর ঘষলাম—। তবু সব কিছু ছাপিয়ে শব্দটা আরো বেড়ে গেল। একটানা বেড়ে যেতে লাগল—ক্রমশ জোরে—আরো অনেক জোরে। এবং তখনো ওরা খোশমেজাজে গল্প করে চলেছে, হাসছে। এ কি সম্ভব? ওরা এখনো শব্দটা শুনতে পাচ্ছে না? ভগবান!

নাহ্। ওরা শুনেছে।—ওরা সন্দেহ করছে। ওরা সব বুঝতে পেরেছে ···আর মজা দেখছে, আমার ভীত-ত্রস্ত অবস্থা নিয়ে ঠাট্টা করছে—তাই তখন মনে হয়েছিল, এখনও তাই মনে হচ্ছে।

কিন্তু এরকম মানসিক যন্ত্রণার চেয়ে অন্য যে কোন কিছু ভালো। সব সহ্য হয় আমার, কিন্তু এরকম মর্মান্তিক উপহাস একেবারে অসহ্য। ঐ কপট হাসি-মুখগুলোকে আর সহ্য করতে পারছি না। বুঝতে পারছি প্রচন্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠতে হবে, নইলে মারা পড়ব।

ঐ যে শুনুন। আবার হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছেন না? কী প্রচন্ড জোরে শব্দটা, আরো জোরে, আরো জোরে, আরো ··!

'বদমাইশ,' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আর ভান করতে হবে না, আমি স্বীকার করছি অপরাধ, তক্তাগুলো তুলে ফ্যাল্—দ্যাখ্ এইখানে—হ্যাঁ, এইখানেই সেই জঘন্য হৃদপিন্ডটার ধুক-ধুক ধুক ধুক··· ।'

পাগলের দিনলিপি

নিকোলাই ভাসিলেভিচ গোগল (১৮০৯-১৮৫২)

□ অক্টোবর ৩ □

বড় অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল আজ। আমি একটু দেরি করে উঠেছিলাম। মাভ্রা যখন আমার জুতো পরিষ্কার করে নিয়ে ঘরে ঢুকল আমি তার কাছ থেকে কটা বাজে জানতে চাইলাম। সে যখন জানাল যে অনেকক্ষণ আগে দশটা বেজে গেছে তক্ষুনি আমি পোশাক পরার জন্যে লাফিয়ে উঠলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের বিভাগীয় প্রধানের কাছ থেকে কিরকম খারাপ ব্যবহার পাব এটা যদি আগে জানতাম তাহলে আমি অফিসেই যেতাম না। কিছুকাল যাবৎ লোকটা বলে আসছে : "তুমি সব সময়ে এত আনাড়ি কেন ? প্রায়ই তুমি পাগলের মতো কাজ করো এবং এমন কাজের খিচুড়ি পাকিয়ে তোলো যে কেউ তার মাথা-মুণ্ডু বুঝে উঠতে পারে না। তুমি ছোটো হরফে অনুচ্ছেদ শুরু করো, আর তাতে তারিখ বা প্রসঙ্গের বালাই থাকে না।" শয়তান কোথাকার! সেদিন আমাকে ডিরেক্টরের অফিসে পালকের কলম চোখা করতে দেখে ব্যাটার জ্বালা ধরেছে। কি আর বলব, ক্যাশিয়ারকে ধরে কিছু অগ্রিম টাকা নেবার উদ্দেশ্য না থাকলে আমি কখনোই অফিসে যেতাম না। ক্যাশিয়ারও এক অদ্ভুত লোক! তার কাছ থেকে মাসের মাইনেটা অগ্রিম হিসেবে পেতে যেন জীবনটাই দিয়ে দিতে হয়। শেষ কোপেক শেষ হয়ে মুখ ফ্যাকাসে মেরে গেলেও ঐ শয়তানটা কিছুই দিতে চায় না। আমি শুনেছি তার বাড়িতে তার নিজের পাচকই তাকে চড় মারে। দুনিয়াসুদ্ধ সবাই জানে। আমাদের অফিসে কাজ করার মধ্যে আমি কোনো লাভই দেখতে পাচ্ছি না। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। প্রাদেশিক অফিসে বা কোনো ভদ্র অফিসে বা সরকারি কোষাগারে সম্পূর্ণ অন্যরকম। আমাদের অফিসটার কেবল আভিজাত্যের ঠাট আছে। সত্যি বলছি, এটুকু না থাকলে আমি অনেক আগেই চাকরি ছেড়ে দিতাম।

বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি আমার পুরানো ওভারকোট পরে নিলাম এবং

অনুবাদ : অমল চন্দ

ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে কোনো ভদ্রশ্রেণীর লোক নেই, শুধু কিছু বয়স্কা কৃষক রমণী, কিছু রুশ ব্যবসায়ী এবং দু'একজন সংবাদবাহক। ভদ্রলোকের মধ্যে কেবল একজন কর্মচারি। আমি তাকে রাস্তার মোড়ে দেখতে পেলাম। তাকে দেখেই আমি নিজেকে বললাম : 'বন্ধু, তুমি অফিস যাচ্ছ না, একটি মেয়ের পেছনে ঘুরছ, বাজারের ভেতর মেয়েটির সাদা পা দুটো দেখে বেড়াচ্ছ। সরকারি কর্মচারিরা যে কি ধরনের জীব!' এমন সময়ে একটি গাড়ি এসে থামল। আমি দেখলাম গাড়িটা আমাদের ডিরেক্টরের। আমি দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়ালাম। একজন গাড়ির দরজা খুলে ধরল। ভেতর থেকে একটি ছোট্ট পাখির মত ডিরেক্টরের মেয়ে বেরিয়ে এল। সে এমনভাবে চোখ মেলে ডানে-বাঁয়ে তাকাল যে আমার মনে হল আমি যেন শেষ হয়ে গেলাম। সে আমায় চিনতে পারল না। আমিও নিজেকে আড়াল করে রাখলাম, কারণ আমার কোটটা ছিল অত্যন্ত পুরানো ফ্যাসানের।

রাস্তায় মেয়েটির ছোট কুকুরটা পেছনে পড়ে যাচ্ছিল। কুকুরটাকে আমি আগে দেখেছিলাম। তার নাম, সেজি। আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সেজি কথা বলতে পারে। সত্যি আমি মাতাল নয়, আমি ঠিক ঠিক তাকে কথা বলতে দেখলাম, তার কথা শুনতে পেলাম। এবং মানুষের মতই সে কথা বলছিল অন্য একটি কুকুরের সঙ্গে। আমি তাজ্জব বনে গেলাম। অবশ্য ব্যাপারটা খুব একটা অবাক হবার কিছু নয় এটা পরে বুঝলাম। কারণ, এরকম ঘটনা কয়েকবারই শোনা গেছে। শুনেছি ইংল্যাণ্ডে একটা মাছ সাঁতার কেটে ওপরে উঠে এসে দুটো অদ্ভুত শব্দে কথা বলেছিল। আবার কোথায় যেন কাগজে পড়েছিলাম, দুটো গোরু নাকি একটা দোকানে গিয়ে এক পাউণ্ড চা চেয়েছিল। কিন্তু আমি সব চেয়ে অবাক হলাম যখন সেজিকে বলতে শুনলাম, 'ফিডেল, আমি তোমাকে চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু পোলকান আমার চিঠিটা পাঠাতে পারেনি।' আমি একমাসের মাইনে বাজি রেখে বলছি আমি কথাটা শুনেছি। কুকুর লিখতে পারে এটা আমি কখনও শুনিনি। একমাত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই লিখতে জানেন। অবশ্য ব্যবসায়ী দোকানদার, এমনকি সার্কদেরও লিখতে দেখা যায়, কিন্তু তাতে দাঁড়ি-কমা থাকে না, স্টাইল বলতেও কিছু থাকে না।

আমি এসব দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আজকাল আমি এমনসব ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি বা শুনতে পাচ্ছি যা আমি আগে কখনো দেখতে পাই নি বা শুনতে পাই নি। আমি ছাতা খুলে ওদের পেছনে রওনা হলাম। আমরা গোরোখোভয় স্ট্রীট পেরিয়ে গেলাম, আমরা মেশাঙকায়া স্ট্রীটে বাঁক নিলাম, তারপর স্টলিনায়া স্ট্রীট। তারপর আমরা এক বিরাট বাড়ির সামনে থামলাম। মেয়েটি ছ'তলায় উঠে গেল। আমি ঠিক করলাম এখন আর বাড়িটাতে ঢুকব না। তবে ঠিকানা লিখে নিলাম, সময় পেলেই আসব।

❑ অক্টোবর ৪ ❑

আজ বুধবার। আমি তাড়াতাড়ি বেরোলাম। বিভাগীয় প্রধানের অফিসে গেলাম। তাঁর সমস্ত পালকের কলম চোখা করতে বসে গেলাম।

আমাদের ডিরেক্টর একজন অত্যন্ত শিক্ষিত ব্যক্তি। তাঁর স্থান যে কোন সরকারি ব্যক্তির অনেক ওপরে। তিনি যে সব বই পড়েন তার সবই ফরাসি বা জার্মান ভাষায় লেখা। তিনি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সেটা তাঁর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তিনি একজন খাঁটি রাজকর্মচারী। তিনি আমাকে একটু বিশেষ পছন্দ করেন। শুধু তাঁর মেয়ে যদি··। যাক্ গে, এ নিয়ে কিছু না বলাই ভালো। আমি এখন 'ছোটো মৌমাছি' পড়ছি। এমন সময়ে দেখলাম ১২-৩০ বেজে গেছে এবং আমাদের ডিরেকটর তখনও শোবার ঘর থেকে বেরোন নি। কিন্তু আড়াইটার সময়ে এমন কিছু ঘটে গেল যা বর্ণনা করার মতো কলম আমার নেই। দরজা খুলে গেল। আমি ভাবলাম ডিরেক্টর এলেন। আমি কাগজপত্তর নিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু ডিরেক্টর না, দেখলাম তাঁর মেয়েকে সশরীরে। কি সুন্দর তার পোশাক। সাদা পোশাক, রাজহাঁসের মতো। কি চমৎকার! সূর্যের আলোর মতো আমার দিকে তাকালো। আমাকে প্রশ্ন করল: 'বাবা এখানে আছেন।' ওহ্ কি চমৎকার গলা! ক্যানারি, ঠিক ক্যানারি পাখি যেন। আমি যেন তাকে বললাম 'দেবি, আমায় মেরে ফেলো না, যদি তাই তোমার ইচ্ছে হয় তবে তা তোমার নিজের সুন্দর হাত দিয়েই করো।' কিন্তু আমি বোবা হয়ে গেলাম, 'না' শব্দটা ছাড়া আর কিছু বলতে পারলাম না। সে আমার দিকে তাকাল, তারপর বইপত্তরের দিকে, তারপরে তার হাতের রুমালটা নিচে ফেলে দিল। আমি মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লাম, কোনরকমে নিজেকে সামলে রুমালটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কি স্বর্গীয় রুমাল! কি চমৎকার বুনন, কি অপূর্ব গন্ধ!

রুমালের গন্ধ থেকেই বোঝা যায় সেটা কত বড় জেনারেলের মেয়ের রুমাল। সে আমায় ধন্যবাদ দিল এবং স্মিত হাসিতে হার মিষ্টি ঠোঁট জোড়া প্রায় ফাঁক হয়ে গেল। ঘন্টাখানেক পরে হঠাৎ একজন এসে খবর দিল, 'তুমি এখন বাড়ি যেতে পারো, কারণ, কর্তা বেরিয়ে গেছেন।' আমি টুপিটা নিয়ে কোটটা চাপিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ আমি বাড়িতে আমার বিছানায় পড়ে রইলাম। তারপর আমি চমৎকার একটা কবিতা নকল করলাম:

> একঘণ্টা তোমায় দেখতে না পেলে
> যেন পুরো বছরটাই চলে যায়
> কি হতভাগ্য জীবন আমার
> তুমি না থাকলে শুধু উদ্বেগ ও দীর্ঘনিঃশ্বাস

এটা নিশ্চয়ই পুশকিনের কোনো লেখা থেকে। সন্ধেবেলা আবার ওভার-কোট জড়িয়ে তার বাড়ির সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আশা ছিল সে এসে যখন গাড়িতে উঠবে তখন আমি তাকে আবার একটু দেখতে পাবো। কিন্তু না, সে বেরোল না।

□ নভেম্বর ৬ □

বিভাগীয় প্রধান ভয়ংকর মেজাজে ছিলেন। আমি অফিসে যেতেই আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন: 'তুমি বলতে পারো তোমার ব্যাপারটা কি।' 'কেন, কিছুই না!' আমি উত্তর করলাম। 'ঠিক বলছো? ভালো করে ভেবে দেখো। তোমার চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। তোমার এখন আরেকটু বুদ্ধিসুদ্ধি হওয়া দরকার। তুমি নিজেকে কি মনে করো? তুমি ভাবছ আমি তোমার মতলবের কথা শুনি নি? আমি জানি তুমি ডিরেক্টরের মেয়ের পেছনে ছুটছ! নিজের দিকে ভালো করে তাকাও। তুমি কি? কিছুই না। কেউই না। নিজের জন্যেই তোমার একটি কোপেক নেই। আরশিতে ভালো করে তাকাও—তোমার মতো লোক একজন জেনারেলের মেয়েকে ভাবতে পারছে!' এসব বলতে লাগল। তার এসব কথায় আমি কিছু পরোয়া করি না। সে ভাবছে সে বিভাগীয় প্রধান হয়ে সব কিছু করতে পারে। আসলে ব্যাপারটা হল সে আমাকে ঈর্ষা করে। ব্যাটা গোল্লায় যাক। সে কি ভেবেছে? আমি কি একটা দরজি বা সাধারণ লোক? আমি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইচ্ছে করলেই আমি উন্নতি করতে পারতাম। আমার মাত্র ৪২ বছর বয়স। আজকাল এই বয়স থেকেই জীবন শুরু হয়। দাঁড়াও, আমি তোমার চেয়েও উন্নতি করব। 'রুচ' থেকে অত্যাধুনিক স্টাইলের একটা কোট করাতে হবে। তখন তুমি আমার জুতো পরিষ্কার করারও যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আমার কেবল টাকাটার অভাব।

□ নভেম্বর ৮ □

আমি আজ একটা থিয়েটারে গেলাম। বইটা ছিল একজন রুশীয় নির্বোধকে নিয়ে। আমি আমার হাসি থামাতে পারি নি। নাটকে কিছুটা নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা ছিল, তার সঙ্গে বিশেষ করে আইনজ্ঞ এবং একজন কলেজের রেজিস্ট্রার সম্পর্কে কিছু ব্যঙ্গ-কবিতা। নাট্যকার সরাসরি দেশের ব্যবসায়ীদের প্রতারক বলেছেন এবং তাদের ছেলেদের চরিত্রহীন করে দেখিয়েছেন। আজকাল চমৎকার সব নাটক দেখা হচ্ছে। আমি নাটক দেখতে ভালোবাসি। পকেটে একটা কোপেক থাকলেই হল। কিন্তু অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের টিকিট কেটে দিলেও যাবে

না। ঐ নাটকটিতে একজন অভিনেত্রী চমৎকার গান করেছিল। সে আমাকে মনে করিয়ে দিল একজনের···যাক, চুপ! আর নয়।

☐ নভেম্বর ৯ ☐

সকাল ৮টায় অফিসে রওনা হলাম। অফিসে বিভাগীয় প্রধান এমন ভাব করলেন যেন তিনি আমায় দেখতে পাননি। আমিও একই অভিনয় করলাম, যেন আমরা পরস্পর অপরিচিত। তারপর আমি কিছু কাগজপত্র দেখলাম, গোছালাম। চারটের সময় বেরিয়ে পড়লাম। ডিরেক্টরের বাড়ির পাশ দিয়ে এলাম, মনে হল না বাড়িতে কেউ আছে। খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়লাম, সারাটা সন্ধ্যা বিছানায় কাটিয়ে দিলাম।

☐ নভেম্বর ১১ ☐

আজ ডিরেক্টরের অফিসে বসে বসে ২৩টি পালকের কলম চোখা করেছি আর ৪ খানি তার মেয়ের জন্যে। ডিরেক্টর কলম খুব ভালোবাসেন। তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত প্রখর। তিনি বেশি কথা বলেন না, কিন্তু তাঁর চিন্তা সব সময়েই কাজ করে যাচ্ছে। প্রায়ই আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। কিন্তু কথা খুঁজে পাই না। আজ বাইরে বড় ঠাণ্ডা বা গরম এরকম কিছু বলে আর কিছু বলতে পারি না। আমি তাঁর বৈঠকখানা ঘরের ভেতর প্রায়ই তাকাই—কি চমৎকার অভিজাত ঘর—কিন্তু অন্য এক দরজা দিয়ে অপর এক ঘরের দিকে আমার চোখ চলে যায়। সেটা তাঁর মেয়ের ঘর—চমৎকার জার ও ফুলে সজ্জিত—তার বিচিত্র পোশাক ছড়ানো—এসব আমি দেখি, দেখতে ভালো লাগে। এবং একবারটি তার শোবার ঘরের দিকেও চোখ ফেলি, দেখি কি বিস্ময় সেখানে আছে—যেন স্বর্গ, স্বর্গের চেয়েও বেশি। তার ঘরের পাদানির দিকে তাকাই—যার ওপর সুন্দর পাতলা পা ফেলে সে বিছানা থেকে নেমে আসে—সুন্দর পায়ে বরফের মত সাদা মোজা পরতে থাকে—আহ্! কি সুন্দর···

আজ ঠিক করলাম, ওদের কুকুর সেজি অপর কুকুর ফিডেলেকে যে চিঠিগুলি লিখেছিল সেগুলি পেতে হবে। একবার আমি সেজিকে খুব কাছে থেকে বলেছিলাম: 'সেজি, ঐ তরুণী সম্পর্কে সব কিছু আমায় বল। আমি কাউকে বলব না।' কিন্তু চতুর কুকুরটি কিছু বলল না, যেন কিছু শুনতেই পায়নি, এমনভাবে দরজার দিকে চলে গেল। কুকুরেরা মানুষের চেয়ে চালাক—এ আমি ঠিক জানি। সেজি ইচ্ছে করলেই আমাকে সব জানাতে পারত। যাকগে, কাল ঐ চিঠিগুলি আনতেই হবে।

□ নভেম্বর ১২ □

বিকেল দুটোর সময় আমি ভার্কভের সেই ছ'তলা বাড়িতে গিয়ে বেল বাজালাম। একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দাঁড়াল। প্রশ্ন করল, 'কি চাই?' 'আমি তোমাদের কুকুর ফিডেলের সঙ্গে কথা বলতে চাই।' আমি বললাম। মেয়েটি একেবারে ‍‍থ হয়ে গেল। কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করতে করতে আমার দিকে ছুটে এল। আমি তাকে রুখতে গেলে সে আমার নাক কামড়ে দিল। যাই হোক, আমি শেষ পর্যন্ত ঐ চিঠির বাণ্ডিলটা নিয়ে চলে এলাম।

আমি চিঠিগুলি ভাগ করে গুছিয়ে নিতে চাইলাম। কারণ, মোমবাতির আলোয় সব চিঠি পড়া যাচ্ছিল না। কিন্তু এমন সময়ে মাভ্রা আবার ঘরের মেঝে পরিষ্কার করতে এল। এসব নির্বোধেরা সর্বদা অসময়ে ঘর পরিষ্কার করে—এ আমি দেখেছি। অগত্যা আমি একবার বাইরে বেরোলাম। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। কুকুরের চিঠিগুলি থেকে আমি ডিরেক্টরের সব কিছু জানতে পারব; এমন কি তাঁর গোপন জীবনও। তাঁর মেয়ের বিষয়েও কিছু জানা যাবে। সন্ধ্যা নাগাদ আমি বাড়ি ফিরে এলাম এবং বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলাম।

□ নভেম্বর ১৩ □

আচ্ছা, এখন চিঠিগুলি পড়া যাক: 'প্রিয় ফিডেলে, তোমার এই বাজে নামটা আমি পছন্দ করতে পারছি না। তোমার জন্যে একটা ভালো নাম পাওয়া গেল না? যাই হোক, তোমার সঙ্গে চিঠি লেখালিখি করে আমি অত্যন্ত খুশি।'

চিঠি বেশ চমৎকার শুদ্ধ করে লেখা। আবার দেখি: 'আমি মনে করি অপরের সঙ্গে ভাব, অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান করা এই জীবনের সব চেয়ে আনন্দের ব্যাপার।' আমার এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না, তবে কথাটা যেন কোনো জার্মান লেখা থেকে অনুবাদ।

আবার পড়ি: 'আমার কর্ত্রী মানে পাপা যাকে সোফিয়া বলে ডাকেন, আমাকে অত্যন্ত পছন্দ করেন। আমি চা এবং কফির সঙ্গে ক্রিম খাই। একটা কথা তোমাকে বলি, বড় বড় হাড় চিবুতে আমার বাজে লাগে, আমি কেবল পাখির ডানা চিবুতে ভালোবাসি। তবে আমার সব চেয়ে খারাপ লাগে আটার ডেলা…'

ধ্যাৎ, এসব আজেবাজে কথা পড়ে কি হবে? অন্য আরেক পাতা পড়া যাক:

'আমাদের বাড়ির সব কিছু জানাতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আমাদের বাড়ির কর্তার কথা শোনো, সোফিয়া যাকে পাপা বলে ডাকে। তিনি বড় অদ্ভুত লোক। বড় কম কথা বলেন। কিন্তু এক সপ্তাহ আগে কেবল বলতে লাগলেন, "আমি কি এটা পাবো? আমি কি এটা পাবো?" তারপর এক সপ্তাহ পরে খুব

উল্লসিত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। সারাটা সকাল য়ুনিফর্ম-পরা লোকেরা এসে তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল। খাবার সময়ে তিনি আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলতে লাগলেন, "দ্যাখ মেজি, এটা কি?" ওটা একটা ফিতে—কিন্তু আমি তার কোনো গন্ধ পেলাম না, তারপর চিবুতে গিয়ে নোনতা লাগল।'

আমার মনে হল, কুকুরটা বড্ড বেড়েছে, তাকে যে চাবকানো হয় নি সেটাই ভাগ্যের কথা।

আচ্ছা এবার দেখা যাক সোফিয়া সম্পর্কে কি লেখা হয়েছে।

'···আমার কর্ত্রী সোফিয়া নাচের আসরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। সে বেরিয়ে যাবার পর আমি তোমাকে কিছু লেখার সুযোগ পেলাম। আমার সোফিয়া নাচের আসরে যেতে খুব ভালোবাসে। আমি সত্যি বুঝতে পারি না সেখানে এত কি আনন্দ আছে।'

আচ্ছা আরেকটা চিঠি পড়া যাক। চিঠিটা একটু বড় মনে হচ্ছে—তাতে আবার তারিখ নেই। 'আমি বসন্তের ডাকে বড় ব্যকুল হয়ে পড়ি। আমার বুক ধুকপুক করতে থাকে। আমি যেন কিছুর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। আমি দরজায় কান পেতে থাকি। বাস্তবিক, আমার অনেক প্রার্থী আছে। তার মধ্যে একটি মোটা খচ্চর এক নম্বরের নির্বোধ—সে নিজেকে একটা বিরাট কিছু ভাবে। আমি তাকে একেবারেই অবহেলা করি—এমনভাব করে থাকি যেন আমি তার দিকে একবারও তাকাইনি। আর ঐ বিরাট ভয়ঙ্কর ড্যানিশ জন্তুটা! ওটা সব সময়ে আমার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। ওটা যদি পেছনের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ে তাহলে সোফিয়ার পাপার চেয়ে লম্বা দেখাবে। তার গলাটা শয়তানের মতো। আমি তার দিকে ঘেউ ঘেউ করি। কিন্তু সে মোটেই পরোয়া করে না···।'

ধ্যাৎ, এসব গোল্লায় যাক। এসব আজেবাজে কথা! আমি চাই মানুষ, কুকুর নয়! আমি আত্মার কথা চাই। মানুষের আত্মার কথা, যা আমাকে সত্যিকারের আনন্দ দেবে। আচ্ছা আরেকটা পাতা ধরা যাক্,—দেখি নতুন কিছু পাওয়া যায় কিনা।

'সোফিয়া একটা ছোটো টেবিলে বসে সেলাই করছিল। এমন সময়ে একটা লোক এসে বলল, "টেপলভ"। "তাকে ভেতরে আসতে বলো," সোফিয়া আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এবং আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "আহ্ সেজি, সেজি, তুই যদি একবার তাঁকে দেখিস না? একজন বড় অফিসার—তার লাল চুল, আর তার চোখ—কি চমৎকার কালো চোখ—আগুনের মতো উজ্জ্বল!"

সোফিয়া তার ঘরে ছুটে গেল। এক মিনিট পর একজন যুবক ঘরে ঢুকল, তার কালো গোঁফ। সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, চুল ঠিক করে নিল এবং ঘরের চারদিকে দেখতে লাগল। আমি জানালার গায়ে গিয়ে বাইরের দিকে

তাকালাম। শীঘ্রই সোফিয়া ঘরে ঢুকে ঐ আগন্তুককে নমস্কার করল। তারপর ওরা কি সব আজে-বাজে কথাবার্তা বলতে শুরু করল। কোনো এক ভদ্রমহিলা যিনি নাচের সময়ে ঠিকমতো পা ফেলতে পারেন না—বোবভ্ নামে কোনো এক ব্যক্তি যাকে সারসের মতো দেখতে এবং যে নাচের সময়ে প্রায় পড়েই গিয়েছিল—লিডিনা নামে এক মহিলা যে-কিনা নিজের চোখ দুটোকে নীল বলে মনে করত, অথচ তা ছিল সবুজ। শুধু এসব আজেবাজে কথা।'

আরো কিছু পড়া যাক: 'এবার একজন সরকারি কর্মচারির কথা শোনো। পাপার ঘরে তাকে একটা টেবিল দেওয়া হয়েছে। তাকে যে কি বিচ্ছিরি দেখতে তা যদি তুমি জানতে! ঠিক যেন একটা বস্তার ওপরে একটা কচ্ছপ। তার নামটা বিদ্ঘুটে। সব সময়ে সে বসে বসে পালকের কলম চোখা করছে। তার চুল দেখতে শুকনো ঘাসের মতো। পাপা চাকরবাকরদের বদলে তাকে দিয়ে খবরাখবর পাঠান।'

আমার মনে হয় নোংরা কুকুরটি এবার আমারই সম্পর্কে বলছে। আমার চুল শুকনো ঘাসের মতো একথা কে বলল?

'সোফিয়া তাকে দেখতে পেলে আর হাসি থামাতে পারে না।'

শয়তান কুকুরটা মিথ্যে কথা লিখছে! তার কথাবার্তা অত্যন্ত খারাপ! আমি জানি কুকুরটা আমাকে ঈর্ষা করে। এর জন্যে দায়ী কে? কেন, আমাদের বিভাগীয় প্রধান! লোকটা আমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে এবং সুযোগ পেলেই আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে। তবুও দেখা যাক—আরও একটা চিঠি আছে।

'প্রিয় ফিডেলে, এত বড় চিঠি দেখার জন্যে আমায় ক্ষমা করো। আমি ভাবে অভিভূত হয়ে আছি। যে লেখক প্রেমকে দ্বিতীয় জীবন বলেছিলেন তিনি ঠিকই বলেছিলেন। আমাদের বাড়িতে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটতে চলেছে। সেই রাজকর্মচারি ভদ্রলোক প্রায়ই আসছে। সোফিয়া তার প্রেমে পাগল হয়ে উঠেছে। শুনেছি খুব শীঘ্র বিয়ে হতে চলেছে। পাপা ঠিক করেছেন তিনি কোনো জেনারেল বা রাজকর্মচারি বা কর্নেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন।'

নিপাত যাক! আমি আর পড়তে পারছি না·· সব সময়ে কেবল অভিজাত ব্যক্তি বা উচ্চস্তরের রাজকর্মচারি। পৃথিবীর সমস্ত ভালো জিনিস তাদের হাতে চলে যায়। আমাদের মতো লোকেরা কিছু একটু সুখের ব্যাপার লাভ করার জন্যে যখনই হাত বাড়ায় ঐসব অভিজাত বা উচ্চস্তরের রাজকর্মচারিরা তা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। গোল্লায় যাক! আমি এবার একজন জেনারেল হব, ঐ মেয়েটিকে জয় করার জন্যে নয়, ঐসব অভিজাত লোকেদের আমার চারদিকে হামাগুড়ি দিতে দেখার জন্যে। তখন আমি তাদের সব নরকে পাঠাব। নিপাত যাক! আমার এখন রীতিমত কান্না পাচ্ছে। ঐ মূর্খ ছোট কুকুরের চিঠিটা আমি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললাম।

☐ ডিসেম্বর ৩ ☐

এ অসম্ভব! এসব আজেবাজে কথা! ঐ বিয়ে হতে পারে না। উচ্চ রাজ-কর্মচারি হয়েছে তো কি হল? এটা একটা খেতাব মাত্র—এটা কেউ দেখতেও পাচ্ছে না বা হাত দিয়ে স্পর্শও করতে পারছে না। একজন উচ্চ রাজ-কর্মচারির কপালে তো আরেকটা তিন নম্বর চোখ নেই, আর তার নাকটাও সোনার নয়—আমার মতো বা সবার মতো সেও নাক দিয়ে কাশে না, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজই করে। অনেকবার আমি এসব পার্থক্যের কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমি একটা ছোটখাটো কর্মচারি কেন? হয়তো আমি আসলে একজন কাউন্ট বা একজন জেনারেলের মতো উচ্চপদস্থ লোক এবং আমি আমাকে অনর্থক একজন ছোট-খাটো কর্মচারি মনে করছি। হয়তো আমি জানিই না আমি কে? ইতিহাসে এরকম অনেক দেখা গেছে: একজন সাধারণ লোক হঠাৎ আবিষ্কার করল সে একজন বড় জমিদার বা এমনি কিছু। ধরো দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমি হঠাৎ যদি একজন জেনারেলের ইউনিফর্ম নিয়ে উপস্থিত হই তখন কি হবে? সেই সুন্দর তরুণী তখন কোন্ সুরে গান করবে? আমি কি ইচ্ছে করলেই গভর্নর জেনারেলের মতো একজন বড়ো কিছু কেউ হতে পারি না?

☐ ডিসেম্বর ৫ ☐

আমি সারাটা সকাল কাগজ পড়ে কাটিয়ে দিলাম। স্পেনে অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে। সেখানকার সিংহাসন খালি হয়েছে কিন্তু সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঠিক করা যাচ্ছে না। তার ফলে অত্যন্ত গণ্ডগোল চলছে। ব্যাপারটা আমাকে খুব নাড়া দিল। তারা বলছে 'ডোনা' সিংহাসন পাবে। কিন্তু সে তা পেতে পারে না, সেটা অসম্ভব। একজন রাজাই সিংহাসনে বসবে। কিন্তু তারা বলছে সেখানে কোনো রাজা নেই। কিন্তু একজন রাজা থাকতেই হবে। রাজা ছাড়া কোনো সরকার থাকতে পারে না। তাহলে রাজা ঠিক আছেন, কিন্তু তিনি কোনো অদৃশ্য স্থানে লুকিয়ে আছেন।

☐ ডিসেম্বর ৮ ☐

আমি অফিসে যাচ্ছিলাম, কিন্তু নানা কারণে গেলাম না। আমি ঐ স্পেনের ব্যাপারটা মাথা থেকে দূর করতে পারছিলাম না। একজন মহিলা ‹‹ করে সিংহাসনে বসেন? ওরা সেটা হতে দেবে না। প্রথমত ইংল্যাণ্ড এটা সহ্য করবে না। আর কি বলব, এটা সমস্ত য়ুরোপের নীতির উপর প্রতিক্রিয়া ঘটাবে: অস্ট্রিয়ার সম্রাট, আমাদের জার,…আমি স্বীকার করছি, এই ব্যাপারগুলো

আমাকে এতই বিচলিত করল যে সারাদিন আমি কোনো কিছুতে মন দিতে পারলাম না। রাত্তিরে খাবার সময়ে মাভ্‌রাও জানালো যে আমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছি। আসলে সত্যিই, বিভ্রান্ত অবস্থায় আমি দুটো পেয়ালা মেঝের উপর ফেলে দিয়েছি, এবং সেগুলি তৎক্ষণাৎ ভেঙে গেছে। খাওয়ার পর আমি রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু নতুন কিছু খুঁজে পেলাম না। তারপর আমি বিছানায় অনেকক্ষণ শুয়ে রইলাম এবং স্পেনের প্রশ্নটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

☐ এপ্রিল ৪৩।২০০০ ☐

আজ বিরাট বিজয়ের দিন। স্পেনের একজন রাজা আছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে পাওয়া গেছে। সেই রাজা আমি নিজে। আমি আজই এটা আবিষ্কার করলাম। সত্যি কথা বলতে কি, বিদ্যুৎ-চমকের মতো ব্যাপারটা আমি জানতে পারলাম। আমি বুঝতে পারছি না কি করে আমি ভাবতে পারতাম অথবা মুহূর্তের জন্যেও কল্পনা করতে পারতাম যে আমি একজন সাধারণ কর্মচারি। এ ধরনের অদ্ভুত ধারণা আমার মাথায় আদৌ ঢুকল কি করে আমি বলতে পারছি না। যাই হোক সামনের পথ পরিষ্কার ঃ সবকিছু দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

আমি গোড়াতেই ব্যাপারটা মাভ্‌রাকে জানালাম। সে যখন শুনল যে তার সামনেই স্পেনের রাজা দাঁড়িয়ে আছেন ভয়ে সে মরতে বসল। মূর্খ স্ত্রীলোকটি নিশ্চয়ই কখনো স্পেনের রাজাকে দেখতে পায় নি। যাই হোক, আমি তাকে কোনো রকমে শান্ত করলাম এবং কিছু নরম কথায় তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে এই নতুন অবস্থায় আরও খুব ভাল হবে এবং আমি তার উপর বিরক্ত হইনি, কারণ সে মাঝে-মাঝে আমার জুতো পরিষ্কার করে দেয়।

কিন্তু সাধারণ নিম্নশ্রেণীর একজনের কাছ থেকে কতটা আর আশা করা যায়? জীবনের বড় বড় ব্যাপার নিয়ে তুমি এদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারো না। মাভ্‌রার ধারণা ছিল স্পেনের সমস্ত রাজাকেই ফিলিপ ২-এর মতো দেখতে হবে, এই কারণেই সে আমার কথায় ভয় পেয়েছিল। কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে ফিলিপ আর আমি এক নয়·· আজ আর অফিসে গেলাম না। অফিস গোল্লায় যাক! না, বন্ধুরা, তোমরা এখন আমায় তাগাদা দিও না।

☐ মারটোবর ৮৬, দিন এবং রাত্রির সন্ধিক্ষণ ☐

একজন কেরানী বলছিল যে আমার এখন অফিসে যাওয়া উচিত কারণ তিন সপ্তাহ ধরে অফিসে যাচ্ছি না। সুতরাং আমি গেলাম একটু মজা করার জন্যে। বড়বাবু ভাবলেন আমি মাথা নত করে ক্ষমা চাইব, কিন্তু আমি তার দিকে একবার

ভাল করে তাকিয়েও দেখলাম না। আমি এমনভাবে টেবিলে গিয়ে বসলাম যেন সেখানে আর কেউ নেই। এইসব কেরানীদের দিকে তাকিয়ে আমি ভাবলাম ঃ "তোমরা যদি শুধু একবার জানতে তোমাদের সঙ্গে একই অফিসে কে বসে আছেন ·· ভগবান, তোমরা কি গণ্ডগোল করে উঠতে। এমন কি বড়বাবু নিজেই বারবার মাথা নত করতেন, যেমন ডিরেক্টর এলে তিনি করে থাকেন।" ওরা আমার সামনে নকল করার জন্যে কিছু কাগজ দিয়ে গেল। কিন্তু আমি একটি আঙুলও তুললাম না। কয়েক মিনিট পরে চারদিকে সবাই পাগলের মতো হুড়োহুড়ি শুরু করল। তারা বলল যে ডিরেক্টর আসছেন। অনেক কেরানী আবার সবার আগে নমস্কার করার জন্যে নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি শুরু করে দিল। কিন্তু আমি ঠায় বসে রইলাম। ডিরেক্টর অফিসে আসছেন বলে প্রত্যেকে জামার বোতাম লাগিয়ে নিল, কিন্তু আমি একবারও নড়লাম না। তিনি তো একটা বিভাগীয় প্রধান মাত্র, তাতে কি ? আমি সবচেয়ে মজা পেলাম যখন ওরা আমাকে সই করার জন্য একটা কাগজ এগিয়ে দিল। ওরা নিশ্চয়ই ভেবেছিল আমি একজন কেরানী হিসেবে সই করব। ভাল, ওদের ভাবনা ওদের ভাবতে দাও ! কিন্তু আমি সই করলাম, ফার্ডিনান্দ ৮, ঠিক কাগজটার একেবারে নীচে যেখানে ডিরেক্টর সই করেন। ভয়ে প্রত্যেকের মুখ যখন কালো হয়ে গেল আমি তখন বেশ মজা পেলাম ; কিন্তু আমি হাত নেড়ে বললাম ঃ "অতটা আনুগত্যের দরকার নেই।" তারপর আমি হেঁটে বেরিয়ে এলাম।

আমি সোজা ডিরেক্টরের বাড়িতে চলে গেলাম। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। দারোয়ান প্রথমে আমায় ঢুকতে দিচ্ছিল না, কিন্তু আমি তাকে কিছু বলার পর তার দুই হাত অসাড় হয়ে ঝুলে পড়ল। আমি সোজা ডিরেক্টরের মেয়ের নিজস্ব ঘরে ঢুকে পড়লাম। সে আয়নার সামনে বসে ছিল এবং লাফিয়ে উঠে পেছন দিকে হাঁটতে লাগল। যাক্, আমি আর তাকে বললাম না যে আমি স্পেনের রাজা। শুধু বললাম এমন সুখ তার জীবনে আসছে যেমনটি সে কখনও কল্পনাও করতে পারেনি, এবং আমাদের বিরুদ্ধে সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে আমরা মিলিত হব। এইটুকু বলে আমি ভাবলাম যে যথেষ্ট বলা হয়েছে এবং আমি চলে এলাম। কিন্তু মহিলারা কতটা নিপুণ হতে পারে ! তারা সত্যিকারের কি সেটা তখনই আমার কাছে স্পষ্ট হল। মহিলারা যে কার প্রতি আসক্ত হতে পারে সেটা এ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি। আমিই প্রথম এ রহস্যের সমাধান করলাম ঃ তারা শয়তানের প্রতি আসক্ত। আমি মজা করছি না, দেহতত্ত্ববিদ্‌রা যাই বলুন না কেন, এটাই একটা বাস্তব সত্য যে মহিলারা শয়তান ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না। থিয়েটারের প্রথম সারিতে বসে যে মহিলাটি হাত নাড়ছে তাকে দেখতে পাচ্ছ তো ? সে কি আসলে ঐ অভিনেতার দিকে তাকিয়ে আছে ? তা নয়, আসলে সে তাকিয়ে আছে সেই শয়তানটির দিকে যে তার পেছনেই দাঁড়িয়ে

আছে। শয়তান আড়ালে থেকে এখন তার দিকে আঙুল নাড়ছে! এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে মহিলাটি তাকেই বিয়ে করবে।

□ তারিখ নেই। ঐ দিনটির কোনো তারিখ নেই। □

আমি নেভ্স্কি এভিনিউ ধরে ছদ্মবেশে ঘুরতে লাগলাম। আমি যে স্পেনের রাজা সেটা কোথাও প্রকাশ করলাম না। জনতার ভিড়ের মধ্যে আমার পরিচয় দেওয়াটা আমি ঠিক হবে বলে মনে করলাম না, কারণ নিয়ম অনুযায়ী, রাজভবনেই আমার প্রথম আত্মপ্রকাশ করার কথা। আমি কেবলমাত্র রাজকীয় পোশাকের অভাবেই এ ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারছিলাম না। আমি যদি শুধু একটা আলখাল্লা পেতাম। আমি দর্জির কাছে যেতে পারি, কিন্তু তারা একেবারে গর্দভ। তারা আজেবাজে কথা নিয়ে থাকে, এবং সবসময়ই কাজে অবহেলা করে। আমার নতুন য়ুনিফর্মটা আমি দুবার মাত্র পরেছি। ঠিক করলাম সেটাকে কেটে নিজেই একটা পোশাক তৈরী করব। যাতে দর্জিরা সেটাকে নষ্ট করে না দেয় তাই জন্যেই কাজটা আমি নিজেই করব ঠিক করলাম, এবং ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে গেলাম যাতে কেউ না দেখতে পায়। দুরকমের কাঁচি দিয়ে কাপড়টা কাটতে হল, কারণ স্টাইলটা একেবারে নতুন ধরনের।

□ আমি তারিখটা মনে করতে পারছি না। তার কোনো মাসও ছিল না। কি জানি ছিল কিনা আমার মাথাব্যথা নেই। □

এখন পোশাক তৈরী। আমি যখন সেটা পরলাম মাভ্রা চিৎকার করে উঠল। কিন্তু আমি রাজভবনে যাব কিনা সে বিষয়ে এখনও মনস্থির করতে পারিনি। স্পেন থেকে প্রতিনিধি দল না আসা পর্যন্ত আমার নিজে থেকে যাওয়াটা রীতি-বিরুদ্ধ হবে। তাতে আমার মর্যাদা নষ্ট হবে। যাই হোক আমি এখন প্রতিটি মুহূর্তে ঐ প্রতিনিধিদলের জন্যে অপেক্ষা করছি।

□ প্রথম। □

প্রতিনিধিদল আসতে এত দেরি করছে কেন, আমি সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছি। কিসে তাদের আসতে এমন বাধা দিচ্ছে? ফরাসী দেশ হতে পারে? হ্যাঁ, ঐ দেশটি এখন খুবই শত্রুভাবাপন্ন। আমি ডাকঘরে গিয়ে জানতে চাইলাম স্পেনের প্রতিনিধিদলের কোনো খবর আছে কিনা। কিন্তু পোস্টমাস্টারটি এত নির্বোধ যে সে এ ব্যাপারে কোনো খবরই রাখে না। সে বলল, "না, স্পেনের কোনো

প্রতিনিধি আসেনি, কিন্তু আপনি যদি চিঠি লিখতে চান সেটা যথানিয়মে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।"

গোল্লায় যাক্! চিঠিপত্র হয়রানি ছাড়া কিছু নয়।

□ মাদ্রিদ, ফেব্রুয়ারিয়া ৩০ □

সুতরাং আমি এখন স্পেনে, এবং তা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে আমি টেরই পেলাম না। আজ সকালে স্পেনের প্রতিনিধিদল এসে পৌঁছল এবং আমি তাদের সঙ্গে একটা গাড়িতে উঠলাম। আমরা এত তাড়াতাড়ি গেলাম যে ব্যাপারটা আমার বড় অদ্ভুত ঠেকল। বাস্তবিক আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা স্পেনের সীমান্তে চলে গেলাম। তারপরে রেলওয়ে এবং জাহাজ। স্পেন একটা অদ্ভুত দেশ: প্রথমে আমি যে ঘরটায় ঢুকলাম সেখানে কতকগুলো ন্যাড়ামাথা লোককে দেখতে পেলাম। আমার অনুমান, সরকারি কর্মচারি বা সৈনিক। সেখানে হয়তো তাদের ওরকম মাথা ন্যাড়া করার রীতি আছে। কিন্তু একজন সরকারি চ্যান্সেলর আমার সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করল সেটা আমার কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত ঠেকল। সে আমার হাত ধরে টেনে একটা ছোট ঘরে ঢোকাল, এবং বলল: "ঐখানে বোসো, আর যদি তুমি নিজেকে একবারও রাজা ফার্দিনান্দ বলো তাহলে তোমার মুখ ভেঙে দেব।" কিন্তু আমি জানতাম ওটা আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে বলা হচ্ছে। তাই আমি ওর কথা মানলাম না। তার জন্যে চ্যান্সেলর আমার পিঠে দুবার এমন আঘাত করল যে আমি যন্ত্রণায় প্রায় চিৎকার করে উঠলাম। কিন্তু আমি নিজেকে সংযত করে রাখলাম। কারণ আমি জানতাম যে-কোনো খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করার আগে এসব নিয়ম পালন করার ব্যবস্থা স্পেনে রয়েছে এবং ঐ নিয়ম স্পেনের সর্বত্র আজও পালন করার হয়। যাক, আমি এবার সরকারি কাজের ব্যাপারে মনোযোগ দিলাম। এটা আমি আবিষ্কার করেছি যে চায়না এবং স্পেন আসলে এক, মানে একটাই দেশ, এবং এই দুটোকে দুখানি দেশ মনে করাটা মানুষের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তবে 'স্পেন' শব্দটা দিয়ে লেখা শুরু করো, দেখবে 'চায়না'তে এসে শেষ হয়েছে। কিন্তু এসব এখন থাক, এমন একটা ঘটনা আগামীকাল ৭টার সময়ে ঘটতে চলেছে যে ব্যাপারটা ভেবে আমি এখন অত্যন্ত বিব্রত। একটা অদ্ভুত ব্যাপার: পৃথিবী চাঁদের গায়ে নেমে পড়ছে। বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী ওয়েলিংটন এ ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে লিখেছেন।

চাঁদ একটা অত্যন্ত লঘু এবং অসার বস্তু দিয়ে তৈরী, এইজন্যেই আমি আরও বেশী চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এটাই সবাই জানে যে চাঁদ হামবুর্গ শহরে তৈরী হয়। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি ইংরেজরা এ ব্যাপারে কিছু এখনও করছে না।

একটা খোঁড়া পিপেওয়ালা চাঁদ তৈরী করে, এবং এটা খুব স্বাভাবিক যে কি দিয়ে চাঁদটা তৈরী করতে হবে তার সম্পর্কে ঐ নির্বোধটার কোনো ধারণাই নেই। চাঁদ তৈরী করার সময়ে সে ঝরঝরে সুতো এবং তিসির তেল ব্যবহার করে। এইজন্যেই পৃথিবীতে এত দুর্গন্ধ, এবং দুর্গন্ধে আমাদের নাক উড়ে গেছে। এইজন্যেই আমরা কেউ আর নিজের নাক দেখতে পাই না, কারণ সেগুলি সব চাঁদে চলে গেছে। সুতরাং পৃথিবী চাঁদের উপর গিয়ে পড়লে আমাদের সমস্ত নাক মাটিতে পিষে যাবে। এইজন্যে আমি এত বিব্রত হয়ে পড়লাম যে তক্ষুনি জুতোমোজা পরে নিলাম এবং কাউন্সিলের ঘরে ছুটে গেলাম। যাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে পুলিশ যাতে পৃথিবীকে চাঁদে নামতে না দেয় সেই ব্যাপারে হুকুম দেওয়া। কাউন্সিলের যেসব ন্যাড়ামাথা কর্মচারিরা বসে ছিল তারা বেশ বুদ্ধিমান। আমি তাদের বললামঃ "ভদ্রমহোদয়গণ, চাঁদকে বাঁচান, কারণ পৃথিবী চাঁদের উপর নেমে পড়ার মতলব করছে।" আমার রাজকীয় ইচ্ছে পালন করার জন্যে প্রত্যেকে যেন দুলতে লাগল। তাদের মধ্যে অনেকে চাঁদে যাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে সেই চ্যান্সেলর ঘরে ঢুকে পড়ল। তাকে দেখে সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু আমি রাজা,—যেখানে ছিলাম সেখানেই থেকে গেলাম। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে চ্যান্সেলর তার লাঠি দিয়ে আমাকে আঘাত করল এবং আমাকে আমার ঘরে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। এর থেকেই এটা স্পষ্ট হয় স্পেনের ঐতিহ্য কী ভয়ঙ্কর!

☐ জানুয়ারি, একই বছরে ফেব্রুয়ারির পর পড়ছে ☐

এই পর্যন্ত স্পেন আমার কাছে কিছুটা রহস্যময়। তাদের জাতীয় নিয়ম আর সরকারি আদব-কায়দা সত্যিই সবচেয়ে অদ্ভুত। আমি বুঝতে পারি না, সত্যিই আমি তাদের বুঝতে পারি না। আজ তারা আমার মাথা ন্যাড়া করে দিল, যদিও আমি সর্বশক্তিতে চিৎকার করে উঠেছিলাম, কারণ আমি সন্ন্যাসী হতে চাই না! তারপর তারা যখন আমার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিল তখন যে আমার কি হয়েছিল তার অতি ক্ষীণ স্মৃতি আমার মনে জাগছে। এর আগে আমি আর কখনও এ ধরনের নারকীয় কাণ্ডের মধ্যে পড়িনি। আমি এমন উন্মত্ত হয়ে উঠে-ছিলাম যে ওরা আমায় ধরে রাখতে পারছিল না। এই ধরনের অদ্ভুত নিয়মের অর্থ কি আমি জানি না। এ রকম বোকার মত, নির্বোধের মত! তাদের রাজাদের মূর্খতা দেখে আমি আরও অবাক হয়ে যাই, কারণ তারা এখন পর্যন্ত এইসব নিয়ম-কানুন দূর করার চেষ্টা করেনি। যাক, এসব লাঞ্ছনার পর এল আমার তদন্তকারী। ভাবলাম আমি বুঝতে পারছি না একজন রাজা কি করে এ-ধরনের তদন্তের আওতায় পড়েন। এর পেছনে অবশ্যই ফ্রান্সের হাত আছে। কি রকম

শ্য়োরের মত কাজ! যে লোকটি তদন্ত করতে এল সে সব সময় আমার উপর অত্যাচার করতে লাগল; কিন্তু আমি ভাল করেই জানি, বন্ধ্ তুমি ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত। ইংরেজরা স্ক্ষ্ম রাজনীতিজ্ঞ এবং তারা সবকিছ্তে নাক গলায়। আর সমস্ত পৃথিবী জানে ইংল্যাণ্ড যখন নস্যি নেয় ফ্রান্স তখন হাঁচে।

□ ২৫ তারিখ □

আজ প্রধান তদন্তকারী আমার ঘরে ঢুকল, কিন্তু তার পায়ের শব্দ পেয়েই আমি টেবিলের নীচে ল্কিয়ে পড়লাম। যখন সে আমাকে দেখতে পেল না তখন ডাকতে লাগল। প্রথমে সে চিৎকার করে ডাকল: "পপ্রিশ্চিন!"—আমি সাড়া দিলাম না। তারপর: "ইভানভ! টিট্যুলর কাউন্সিলর! অভিজাত মান্ষ!"—তখনও আমি সাড়া দিলাম না। "অষ্টম ফার্দিনান্দ, স্পেনের রাজা!" আমি এবার মাথাটা বার করব কিনা ভাবলাম। "না, বন্ধ্ তুমি আমাকে বোকা বানাতে পারবে না! আমি ভালভাবেই জানি তুমি আমার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবে।" সেই সময়ে সে আমাকে দেখতে পেল এবং লাঠি মেরে আমাকে টেবিলের তলা থেকে বের করে দিল। কাজটা ভয়াবহ রকম যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু সব যন্ত্রণাই আমি সহ্য করে যাচ্ছিলাম, কারণ আমি ভালভাবেই জানতাম যে লোকটা মেশিনের মতো অসহায়ভাবে ইংরেজের আদেশ পালন করে যাচ্ছে।

□ মাস ৩৪ বছর ৩৪৯ □

না, আমার আর সহ্য করার শক্তি নেই। ভগবান, ওরা আমার কি না করছে? ওরা আমার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিচ্ছে! ওরা আমার কথা শ্নছে না অথবা আমার কাছে আসছে না এবং আমাকে দেখছেও না। আমি ওদের কি করেছি? ওরা কেন আমার উপর এমন ভাবে অত্যাচার করছে? আমার মতো একজন দ্ঃস্থ হতভাগোর কাছ থেকে ওরা কি চায়? আমার যেখানে নিজের বলতে কিছ্ই নেই সেখানে আমি ওদের কি দিতে পারি? আমি আর এই অত্যাচার সহ্য করতে পারছি না। আমার মাথায় আগ্ন জ্বলছে এবং সব কিছ্ ঘ্রছে কেবল ঘ্রছে। আমায় রক্ষে করো! আমায় নিয়ে যাও! আমায় এমন একটা গাড়ি দাও যার সঙ্গে থাকবে ঘ্র্ণিবায়্র মতো দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়া! চালক, লাফিয়ে ওঠো, এবং বেল বাজিয়ে দাও! ঘোড়ারা ছ্টে যাও এবং আমাকে এই পৃথিবী থেকে নিয়ে চলো! দ্রে, আরও দ্রে, যেখানে কিছ্ই দেখা যায় না, কিছ্ই না! যেখানে আকাশ ঘ্রছে চারদিকে। দ্রে একটি তারা

জ্বলছে, আবছা গাছগাছালি নিয়ে বনবাদাড় সরে যাচ্ছে এবং উপরে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে, গভীর নীল কুজ্ঝটিকা কার্পেটের মতো ছড়িয়ে রয়েছে, রহস্যময় জগতে শুধু একটা গীটার বাজছে, তার একদিকে সাগর, অন্যদিকে ইটালি। এবং সেখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি রাশিয়ার কৃষকদের কুঁড়ে ঘরগুলি। দূরে যে অস্পষ্ট নীলমতো বাড়িটা দেখা যাচ্ছে সেটাই কি আমার। এবং ঐ কি আমার মা যিনি জানালায় বসে আছেন? মা, তোমার হতভাগ্য ছেলেকে বাঁচাও। তার যন্ত্রণাকাতর মাথায় একফোঁটা চোখের জল ফেল। দেখ, ওরা তার উপর কি অত্যাচার চালাচ্ছে! তোমার হতভাগ্য শিশুটিকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরো! তার জন্যে পৃথিবীতে আর এতটুকু জায়গা নেই! ওরা তার উপর কি অত্যাচার চালাচ্ছে! তোমার হতভাগ্য শিশুটিকে একবার বুকে জড়িয়ে ধরো! তার জন্যে পৃথিবীতে আর এতটুকু জায়গা নেই! ওরা তার উপর অত্যাচার করেই চলেছে। মা, মাগো, তোমার হতভাগ্য শিশুটিকে একটুখানি করুণা করো⋯ ⋯

এবং তুমি কি এটা জানতে যে আলজিরিয়ার সুলতানের নাকের নিচে ডান-ধারে একটা আঁচিল ছিল?

ক্রিস্‌মাস ট্রী এবং সেই বিবাহ-অনুষ্ঠান

ফিওদর দস্তয়েভ্‌স্কি (১৮২১-১৮৮১)

সেদিন গিয়েছিলাম এক বিয়েবাড়িতে।·· নাঃ, তার চেয়ে ক্রিস্‌মাস ট্রী-র কথাটাই বলা যাক। বিয়ের উৎসব অনবদ্য হয়েছিল। দারুণ ভাল লাগল; কিন্তু অন্য ঘটনাটি হয়েছিল আরো চমৎকার। কেন জানি না বিয়েবাড়ির দৃশ্য আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল ক্রিসমাস ট্রী-র কথা। ব্যাপারটা হয়েছিল এইরকম।

ঠিক পাঁচ বছর আগে, সেই বছরের শেষ দিনটিতে, বাচ্চাদের এক নাচ-গানের আসরে আমাকে আমন্ত্রণ করলেন এক ভদ্রলোক। ইনি শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী—নানা জায়গায় যাওয়া-আসা আছে, নানা মানুষের সঙ্গে পরিচয় আছে, নানারকম ফন্দি-ফিকির জানেন। তাই মনে হলো বাচ্চাদের নাচ-গানটা একটা অজুহাত মাত্র, ঐ নাম করে বাচ্চাদের বাবা-মায়েরাই একজোট হবেন এবং নির্বিবাদে, রয়ে-সয়ে, নিজেদের কথাই আলোচনা করবেন।

আমি এদের কেউ নই আর সকলকে বলতে হবে এমন কোনো বিশেষ কথাও আমার ছিল না, তাই সন্ধেটা আর সকলের থেকে দূরে-দূরেই কাটিয়ে দিতে পারলাম। আর এক ভদ্রলোক ছিলেন যিনি আমারই মত গার্হস্থ্য-সুখের এই অনুষ্ঠানটিতে হঠাৎই এসে পড়েছেন। আমার দৃষ্টি প্রথমে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলো। তাঁকে দেখলে মনে হয় না যে তিনি পয়সাওয়ালা ঘরের বা বড়ো বংশের সন্তান। তিনি লম্বা, একটু রোগা, অত্যন্ত গম্ভীর ও সুবেশ। স্পষ্টত, পারিবারিক হৈ-চৈয়ের দিকে তাঁর একটুও মন ছিল না। যে-মুহূর্তে তিনি একা একটা কোণে গিয়ে হাজির হলেন, তাঁর মুখের হাসিটি মিলিয়ে গেল এবং তাঁর ঘন কালো ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে রইল। গৃহস্বামী ছাড়া আর কারোর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না; দেখে বিলক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল যে মনে মনে তিনি হাঁফিয়ে পড়েছেন যৎপরোনাস্তি, যদিও শেষাবধি জোর করে মুখে এমন ভাব দেখাতে লাগলেন যেন তাঁর কতই না ভাল লাগছে। পরে জেনেছিলাম যে উনি কোন্ এক দূর জেলা থেকে এসেছেন, রাজধানীতে এসেছেন কি একটা জরুরী, মাথা-গুলিয়ে যাওয়া ব্যাপার নিয়ে। আমাদের গৃহস্বামীর কাছে এক পরিচয়-পত্র নিয়ে এসেছেন কারো হাত থেকে আর গৃহস্বামী তাঁকে দিয়েছেন আশ্রয়, তবে মোটেই স্বেচ্ছায় নয়। বাচ্চাদের এই অনুষ্ঠানে ভদ্রলোককে তিনি আমন্ত্রণ করেছেন নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে।

অনুবাদ : অমিয় বসু

তাসখেলার আসরে কেউ ডাকল না ভদ্রলোককে, কেউ একটা সিগার এগিয়ে দিল না। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাও কেউ বলল না। বোধহয় দূর থেকে চেহারা দেখেই সকলে বুঝে নিয়েছিল তিনি কি দরের মানুষ। অতএব মানুষটি হাত-দুখানা নিয়ে কি করবেন ভেবে না পেয়ে বাধ্য হয়ে সারা সন্ধে তাঁর ঝুলপি-জোড়া চুমরেই কাটালেন। তাঁর ঝুলপি-জোড়া ছিল সত্যি সুন্দর, তবে সে-দুটির পরিচর্যায় তিনি এমন অধ্যবসায় প্রয়োগ করছিলেন যে মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে আগে তাঁর ঝুলপি-জোড়া আবির্ভূত হয়েছিল আর তাদের পরিচর্যা করার জন্য তিনি নিজে এসেছিলেন পরে।

আর একজন অতিথিও আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি একেবারে অন্য ধরনের মানুষ, তিনি এক বিচিত্র চরিত্র। সবাই তাঁকে জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ বলে সম্বোধন করছিল। প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি একজন মানী অতিথি ; তিনি গৃহস্বামীকে দেখছিলেন সেই দৃষ্টিতে যে দৃষ্টিতে গৃহস্বামী দেখছিলেন ঐ ঝুলপিওয়ালা ভদ্রলোককে। গৃহস্বামী ও তাঁর স্ত্রী তাঁকে কতই না মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলছিলেন ঃ সর্বদা তাঁর দিকে নজর রেখেছিলেন, পানীয় এগিয়ে দিচ্ছিলেন, আশ-পাশে ঘোরাফেরা করছিলেন, অভ্যাগতদের তাঁর সামনে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন—কিন্তু একবারও তাঁকে উঠতে বলেননি, আর কারোর সামনে নিয়ে হাজিরও করেননি। লক্ষ্য করলাম যে গৃহস্বামীর চোখে জল চিক্‌চিক করে উঠল যখন জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ মন্তব্য করলেন যে এমন মনোরম একটি সন্ধ্যা তিনি কমই কাটিয়েছেন। এই মহাপুরুষের সামনে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। তাই বাচ্চাদের সঙ্গে একটু খেলাধুলো করে—এদের মধ্যে পাঁচটি হৃষ্টপুষ্ট বালক-বালিকা আমাদের গৃহস্বামীর সন্তান—আমি ছোট্ট এক বৈঠক-খানায় চলে এলাম। ঘরটা একদম খালি ছিল ; আমি গিয়ে বসলাম একটা প্রান্তে যেদিকে টবে-সাজানো শৌখিন গাছপালায় ঘরের অর্ধেকটাই জোড়া ছিল।

বাচ্চাগুলো ছিল চমৎকার। তাদের মায়েরা আর গভর্নেসরা যতই চেষ্টা করে থাকুন, বড়দের হাওয়া তাদের গায়ে একটুও লাগেনি। মুহূর্তের মধ্যে ক্রিস্‌মাস ট্রী খাবলে-খুবলে তারা শেষ মিষ্টিতে এনে দাঁড় করাল আর কোন্‌ খেলনাটা কার জানবার আগেই তাদের অর্ধেকগুলোর দফা নিকেশ করে ফেলল।

এদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল ভারি সুন্দর দেখতে—কালো চোখ, কোঁকড়া চুল ; সে সারাক্ষণ তার কাঠের বন্দুক দিয়ে অনন্যচিত্তে আমার দিকে তাক করে রইল। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে ছিল এই ছেলেটির বোন, বছর-এগারো বয়স, পরীর মত সুন্দরী। মেয়েটি শান্ত ও স্বল্পভাষী—বড়-বড় স্বপ্নালু চোখ তার। বাচ্চারা তাকে কিছু একটা অনুচিত

কথা বলে থাকবে, তাই সে তাদের সঙ্গ ছেড়ে যে-ঘরে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম সেখানে এল। হাতে একটা পুতুল নিয়ে মেয়েটি গিয়ে বসল এক কোণে।

অতিথিরা খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে বলাবলি করছিলেন, ওর বাবা হলেন এক বিরাট ধনী ব্যবসায়ী। এর মধ্যে বরপণ বাবদ তিন লক্ষ রুব্‌ল ওর জন্যে রেখেছেন।"

যে জটলার মধ্যে থেকে কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল সেদিকে মুখ ঘোরাতেই জুলিয়ান মাস্তাকোভিচের চোখে চোখ পড়ে গেল। তিনি এইসব অসার বক্তৃতা যেন শুনছিলেন গভীর মনোযোগের সঙ্গে—তাঁর হাতদুটি ছিল পিছন দিকে আবদ্ধ, মাথা একদিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

উপহার বিতরণে আমাদের গৃহস্বামী যে কূটবুদ্ধির পরিচয় দিলেন সারাক্ষণ মুক্তকণ্ঠে তার তারিফ করেছি। বহু সহস্র রুব্‌ল বরপণ-পাওয়া ছোট্ট মেয়েটি পেয়েছিল সবথেকে সুন্দর পুতুলটি আর বাকি উপহারগুলি, শিশুদের বাপ-মা'র পদমর্যাদা অনুসারে, দামের দিক থেকে ক্রমে ক্রমে নেমে এসেছিল। শেষ শিশুটি ছিল বছর-দশেকের একটি ছোট্ট, রোগা ছেলে, মাথায় লাল চুল, মুখে ফুটকি-ফুটকি দাগ—সে পেল জন্তুজানোয়ারের গল্পের একখানা চটি বই। তাতে না ছিল ছবি না কিছু কারিকুরি। এ হলো গভর্নেস মহিলাটির ছেলে। তিনি তো দরিদ্র বিধবা ; জীর্ণ, ছোট একটা জ্যাকেট পরে ছেলেটিকে মনে হচ্ছিল যেন বিরাট একটা ধাক্কা খেয়েছে বা খুব ভয় পেয়েছে। জন্তুজানোয়ারের গল্পের বইখানা হাতে নিয়ে সে বাচ্চাদের খেলনাগুলোর চারপাশে আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল। ওগুলো নিয়ে খেলতে পারলে সে বোধহয় আর কিছু চাইত না। কিন্তু তার সাহসে কুলোল না। দেখলে বুঝতে পারতেন ছেলেটি জেনে গিয়েছিল সমাজে তার দৌড় কতদূর।

বাচ্চারা কি করছে দেখতে আমার বেশ লাগে। তাদের ভিতরকার স্বকীয়তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তাই নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছে, এটা দেখলে আবিষ্ট হতে হয়। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে লাল-চুল ছেলেটি অন্য শিশুদের হাতের জিনিসগুলিতে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট হয়েছে ; বিশেষ করে ওদের একটি ঘরোয়া নাটকে যোগ দেবার জন্য সে এত উৎসুক হয়ে পড়ল যে সে ঠিক করল যে অন্য শিশুদের তোষামোদই করবে। মুখে হাসি এনে সে ওদের খেলায় যোগ দিল। তার নিজের একটিই আপেল ছিল, সেটা সে এক বখাটে ছোঁড়াকে দিয়ে দিল যার দু-পকেট লজেন্স-মিষ্টিতে ভর্তিই ছিল। এরপর আবার ছেলেটি একটি বাচ্চাকে পিঠে তুলে ঘুরে এল। এ সব আর কিছুর জন্য নয়, যেন সে নাটকের দলে থাকতে পারে।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দুর্বিনীত একটি ছোকরা এসে তার উপর চড়াও হলো এবং তাকে উত্তম-মধ্যম দিল। সে কাঁদবে, সেই সাহসটুকুও পেল না।

গভর্নেস মহিলা এসে তাকে বললেন অন্য বাচ্চাদের খেলাধুলোয় তার নাক গলানোর দরকার নেই—সে আস্তে আস্তে সরে যে ঘরটায় আমি ও সেই ছোট্ট মেয়েটি ছিলাম সেইখানে চলে এল। মেয়েটি তাকে পাশে বসতে দিল আর দুজনে মিলে দামী পুতুলটিকে সাজাতে-গোছাতে লেগে গেল।

আধঘণ্টাটাক গেছে, আমার একটু ঢুল আসছে ফুলগাছের ঘরে বসে লাল-চুল ছেলেটি আর ধনীঘরের উত্তরাধিকারিনী মেয়েটির বকবকানি শুনতে শুনতে—এমন সময় জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ হঠাৎ সেখানে ঢুকলেন। বাচ্চারা বড্ড হৈ-চৈ শুরু করেছে এই অজুহাতে তিনি বসবার ঘর থেকে সরে পড়েছিলেন। আমার নিঃসঙ্গ কোণ থেকে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি যে কয়েক মুহূর্ত আগেও তিনি ঐ ধনী মেয়েটির বাবার সঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে কথাবার্তা বলছিলেন; ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর সদ্য আলাপ হয়েছে। মাস্তাকোভিচ কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন যেন কিছু ভাবছেন ও নিজের মনে কিছু বলছেন, বুঝি আঙুলে কি একটা গুনছেন।

"তিনশো তিনশো—এগারো-বারো-তেরো-ষোলো—হ্যাঁ, পাঁচ বছরে। ধরা যাক, শতকরা চার করে—তাহলে পাঁচ বারোয় ষাট—ষাট, তার ওপর··। যদি ধরি যে পাঁচ বছরে ওটা দাঁড়াবে · হ'লো গিয়ে চারশো। হুঁ, হুঁ! কিন্তু শতকরা চার নিয়ে ঐ বাড়ী শয়তানের মন উঠবে না। হয়তো ও পাচ্ছে শতকরা আট, কিংবা দশই পাচ্ছে। তাহলে হলো পাঁচশো—পাঁচ লক্ষ অন্তত, কিছু না হোক। হাত খরচের জন্য এর বেশি · হুঁ · "

মাস্তাকোভিচ সশব্দে নাক ঝাড়লেন তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল মেয়েটির দিকে। তিনি থমকে দাঁড়ালেন। গাছ-গাছড়ার পিছনে ছিলাম বলে আমাকে তিনি দেখতে পেলেন না। মনে হলো তিনি যেন উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন। নিশ্চয় তাঁর গণনাই তাঁকে অস্থির করে তুলেছে। হাতে হাত ঘষতে ঘষতে তিনি যেন নাচের ঢঙে এগিয়ে-এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আর ক্রমশ যেন তাঁর উত্তেজনা বাড়ছিল। অবশ্য শেষে তিনি আবেগ দমন করলেন এবং স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ভবিষ্যতের বিয়ের কনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে তিনি তার কাছেই যাবেন ঠিক করলেন, কিন্তু আগে একবার চারদিক দেখে নিলেন। তারপর, খুব অপরাধীর মত, পা টিপে টিপে, হাসিমুখে মেয়েটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, নিচু হয়ে তার মাথায় চুমো খেলেন।

উনি যে এরকম হঠাৎ এসে দাঁড়াবেন, না বুঝতে পেরে মেয়েটি তো একটি আর্ত চিৎকার করে উঠল।

তিনি চারদিক তাকিয়ে, মেয়েটির গাল টিপে, চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কি করছ গো তুমি?"

"আমরা খেলছি।"

"খেলছ? ওর সঙ্গে?" বলে মাস্তাকোভিচ গভর্নেসের ছেলের দিকে ভ্রূ তুলে দেখলেন। ছেলেটিকে বললেন, "খোকা, তুমি বসবার ঘরে চলে যাও।"

ছেলেটি কিছু না বলে বড় বড় চোখ করে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইল। মাস্তাকোভিচ আবার সতর্কভাবে চারদিক দেখে নিলেন তারপর মেয়েটির সামনে দাঁড়ালেন নিচু হয়ে।

"ওটা কি গো—পুতুল বুঝি?"

"হ্যাঁ।"—মেয়েটি একটু যেন ঘাবড়ে গেল, তার ভ্রূ-দুটি কুঞ্চিত হলো।

"পুতুল, বেশ। পুতুল কি দিয়ে তৈরী হয় জানো?"

"না তো।" মেয়েটি কথাটা বলল একটু আড়ষ্টভাবে এবং মাথা নিচু করল।

জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ বলে উঠলেন, "পুরনো কাঁথা-কম্বল থেকে, জানো না?" বলেই তিনি কটমট করে গভর্নেসের ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও হে খোকা, যাও—বসবার ঘরে যাও।"

দুই শিশু ভ্রূ কুঞ্চিত করল। তারা পরস্পরকে সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে, এখন আর ছাড়াছাড়ি করতে রাজি নয়।

মাস্তাকোভিচ কণ্ঠস্বর আরো নিচে নামিয়ে বললেন, "জানো, কেন এই পুতুলটা তোমায় দিয়েছে?"

"না।"

"কারণ, এই সাতটা দিন তুমি ভারি লক্ষ্মী হয়ে ছিলে।"

এই কথা বলতে বলতে মাস্তাকোভিচ যেন প্রবল উত্তেজনার দমকে আক্রান্ত হলেন। চারদিক দেখলেন, তারপর বললেন, "খুকুসোনা, যদি তোমার বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা করতে যাই, তুমি আমাকে ভালবাসবে?"

উত্তেজনা এবং অধীরতার ফলে তাঁর কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, যে তাঁর ঐ কথাগুলো কোনমতে শোনা গেল।

ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটিকে তিনি চুমু খাওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পাশের ছেলেটি দেখছিল যে মেয়েটির চোখে জল এসে পড়েছে—সে তার হাতটা ধরে জোরে কেঁদে উঠল সমব্যথী হিসেবে। এতে ভদ্রলোক গেলেন চটে।

"চলে যাও। চলে যাও। ও ঘরে তোমার বন্ধুদের কাছে যাও।"

মেয়েটি বলে উঠল, "না, আমি বলছি ও যাবে না। আমি বলছি ও যাবে না। আপনি যান। ওকে ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন।" মেয়েটি প্রা[illegible] কেঁদেই ফেলল।

দরজার ওদিকে পদশব্দ শোনা গেল। জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ চমকে উঠলেন, তারপর তাঁর সৌম্য দেহটিকে সোজা করে নিলেন। লাল-চুল ছেলেটি

তার চেয়েও বেশি ভয় পেয়েছিল। সে মেয়েটির হাত ছেড়ে দিয়ে, দেয়াল ঘেঁষে হেঁটে বসবার ঘরের মধ্যে দিয়ে একেবারে খাবার ঘরে পালিয়ে গেল।

যাতে কেউ না দেখতে পায় তাই মাস্তাকোভিচও খাবার ঘরের দিকে চললেন। তাঁর মুখচোখ ছিল চিংড়ীমাছের মত লাল। আয়নায় নিজের মুখ দেখে তিনি যেন লজ্জা পেলেন। বোধ হয় নিজের ভাবোন্মত্ততা ও অধৈর্যে নিজেই বিরক্ত হয়েছিলেন। নিজের গুরুত্ব ও মর্যাদার কোনো মূল্য না দিয়ে, লোভাতুর বালক যেমন সোজা প্রার্থিত বস্তুর দিকে ছোটে, তিনিও তাঁর হিসেবী মনোবৃত্তির দ্বারা প্রলুব্ধ এবং বিদ্ধ হয়ে ছুটেছিলেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রার্থিত বস্তুটি এখনও প্রস্তুত নয় ; আরো বছর পাঁচেক লাগবে প্রস্তুত হতে। মাননীয় ভদ্রলোকটির পিছন পিছন আমিও খাবার ঘরে হাজির হলাম এবং সেখানে একটি দর্শনীয় নাটক দেখতে পেলাম।

জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ—রাগে তাঁর মুখচোখ লাল, দুচোখের দৃষ্টিতে যেন বিষ—লাল-চুল ছেলেটাকে ভয় দেখাতে লাগলেন। ছেলেটাও ক্রমে পিছু হটতে হটতে এমন জায়গায় দাঁড়াল যেখান থেকে আর পিছু হটা যায় না। ভয়ে কোথায় পালাবে তাই সে ঠিক করতে পারছিল না।

"বেরোও এখান থেকে। এখানে কি আছে তোমার ? বেরিয়ে যাও বলছি, অপদার্থ ! ওখান থেকে ফলটা-পাকুড়টা সরাচ্ছ বুঝি ? ও, তাই এসেছ ফল-গুলো সরাতে ! বেরো, হতচ্ছাড়া, যেখানকার লোক সেখানে যা।"

ছেলেটি ভয় পেয়ে গিয়ে, যা-হয়-হোক এমনি শেষ চেষ্টা হিসেবে, চট করে টেবিলের নিচে ঢুকে পড়ল হামাগুড়ি দিয়ে। আর তার পশ্চাদ্ধাবনকারী ; যতদূর সম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে, নিজের নরম-কাপড়ের বড় রুমালটা বার করে সেটাকে চাবুকের মত ঘোরাতে লাগলেন যাতে ছেলেটাকে তার বর্তমান অবস্থান থেকে বার করে আনা যায়।

এখানে বলা দরকার যে মাস্তাকোভিচ কিছুটা মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর চেহারাটা ছিল ভারী, হৃষ্ট-পুষ্ট, গালদুটো ফোলা, ভুঁড়ি ছিল আর পায়ের গোছ বাদামের মত গোল হয়ে গিয়েছিল। তিনি ঘামছিলেন, হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন আর হাঁফাচ্ছিলেন। ছেলেটার ওপর তাঁর এতই বিরাগ (নাকি ঈর্ষা ?) যে সত্যি সত্যি তিনি উন্মাদের মত ঘুরতে লাগলেন।

আমি প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম। জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ আমার দিকে তাকালেন। তিনি যেন সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছেন এবং স্পষ্টত মুহূর্তের জন্য নিজের বিপুল মর্যাদার কথাও বিস্মৃত হয়েছেন। ঠিক সেই দণ্ডে সামনের দরজার গোড়ায় আবির্ভূত হলেন গৃহকর্তা মহাশয়। ছেলেটা হামা-গুড়ি দিয়ে টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এল, কনুই আর হাঁটুর ধুলো ঝেড়ে নিল। মাস্তাকোভিচ রুমালের একটা কোণ হাতে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, এখন

তাড়াতাড়ি করে সেটা নাকের তলায় লাগিয়ে নিলেন। গৃহস্বামী খুব সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের তিনজনকে দেখলেন। তবে যিনি মানুষের ধরন-ধারণ বোঝেন এবং অবিলম্বে সেই অনুযায়ী মানিয়ে নিতে পারেন। সেইরকম লোক হিসেবে যিনি তাঁর বিশেষ মূল্যবান অতিথিটিকে কব্জা করার এবং তাঁকে দিয়ে নিজের কাজ আদায় করার সুযোগটি ছাড়লেন না।

লাল-চুল ছেলেটিকে দেখিয়ে তিনি বললেন, "এই যে ছেলেটি যার কথা আপনাকে বলছিলাম। ওর হয়ে ভাবছিলাম হয়ত আপনার দ্বারা ওর কিছু উপকার হলেও হতে পারে।"

জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ উত্তরে বললেন, "ওঃ।" তিনি তখনও নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে উঠতে পারেননি।

"এ আমার গভর্নেসের ছেলে", গৃহস্বামীর কণ্ঠে অনুনয় ফুটে উঠছিল "মহিলা বড় দুঃখিনী—স্বামী ছিলেন এক সৎ সরকারী কর্মচারী। তাই বলছি, যদি পারেন..."

"অসম্ভব, অসম্ভব," মাস্তাকোভিচ একটুও সময় না দিয়ে বলে উঠলেন, "আমাকে মার্জনা করতে হবে, ফিলিপ অ্যালেক্সেইয়েভিচ। সত্যি পারব না। আমি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি—চাকরি খালি নেই। তাছাড়া দশজনের নাম খাতায় লেখানোই আছে—আগে তো তাদেরই ডাকা উচিত। কিছু মনে করবেন না।"

গৃহস্বামী বললেন, "কি আর করা যাবে। ছেলেটা বড় শান্তশিষ্ট, ভালমানুষ ধরনের।"

জুলিয়ান ঠোঁটটা বেঁকিয়ে বললেন, "আমার ধারণা অতি পাজী বদ্ ছেলে। চলে যাও খোকা। এখানে কি করছ এখনও? অন্য ছেলেরা যেখানে রয়েছে যাও।"

নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না, আমার দিকে একবার আড় চোখে তাকালেন। আমিও আর চুপ করে থাকতে পারলাম না—সোজা, তার মুখের ওপরে হো-হো করে হেসে উঠলাম। উনি মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন এবং যাতে আমি শুনতে পাই এমনভাবে গৃহস্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন এই অদ্ভুত ছোকরাটি কে? ওঁরা দুজন নিচুগলায় কথা বলতে বলতে বাইরে চলে গেলেন, আমার দিকে আর তাকালেন না।

হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল। তারপর আমিও বসবার ঘরে হাজির হলাম। মহাপুরুষটি তখন শিশুদের বাপ-মা এবং সস্ত্রীক গৃহস্বামীর দ্বারা পরিবৃত হয়ে এক মহিলার সঙ্গে সাগ্রহে বার্তালাপ করতে শুরু করেছেন; মহিলার সঙ্গে তাঁর তখনই পরিচয় হয়েছে। ছোট্ট, ধনীঘরের সেই মেয়েটির হাত ঐ মহিলার হাতে ধরা ছিল। জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ মুক্তকণ্ঠে কন্যার প্রশংসা

করে চললেন। লক্ষ্মী মেয়েটির রূপ, গুণ, তার লজ্জাশীলতা, তার সুন্দর শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির বর্ণনা করতে করতে তিনি একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। স্পষ্টতই এ কন্যার জননীকে তুষ্ট করার প্রয়াস; জননী তো কথা শুনতে শুনতে আর চোখের জল ধরে রাখতে পারছিলেন না, আর পিতা একটি সন্তোষের হাসি হেসে বুঝিয়ে দিলেন তিনি খুশি।

এই আনন্দটা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সকলে এতে যোগ দিলেন। বাচ্চাদেরও খেলাধুলো বন্ধ রাখতে হলো যাতে কথাবার্তার ব্যাঘাত না হয়। আবহাওয়াটা যেন একটা ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাবে থমথম করতে লাগল। শুনতে পেলাম দুলালী কন্যার মা অত্যন্ত গভীরভাবে অভিভূত হয়ে জুলিয়ানকে জিজ্ঞেস করছেন যে তিনি তাঁদের বাড়িতে একবার এসে তাঁদের সম্মানিত করবেন কি না। অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, তাও শুনলাম। এরপর অতিথিরা ভদ্রতার খাতিরে ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লেন; শুনতে পেলাম গদগদ কণ্ঠে তাঁরা ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, কন্যা এবং বিশেষ করে জুলিয়ান মাস্তাকোভিচের সুখ্যাতি করছেন।

জুলিয়ানের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক। উচ্চকণ্ঠে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "উনি কি বিয়ে করেছেন?"

জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ যেন বিষদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। আর আমার পরিচিত ভদ্রলোক আমার—ইচ্ছাকৃত—নির্বুদ্ধিতায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উত্তর দিলেন, "না।"

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, আমি—গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। কোন বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষে দর্শক-সমাগম দেখে অবাক হলাম। সেদিন আবহাওয়া ছিল বিশ্রী, ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হব-হব করছিল। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গির্জার ভিতরে ঢুকলাম। বরকে দেখলাম বেশ গোলগাল, হৃষ্টপুষ্ট ভুঁড়িওয়ালা ছোটখাট মানুষটি; দুরস্ত পোশাক-আশাক। তিনি নানা বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছিলেন, লোককে কাজে পাঠাচ্ছিলেন, ব্যবস্থাদি করছিলেন। শেষে খবর এল যে কনে আসছে। আমি ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম এবং এক আশ্চর্য সুন্দরী কনের দর্শন লাভ করলাম। তার জীবনের প্রথম বসন্ত তখনও বোধকরি মুকুলিতই হয়নি। কিন্তু সুন্দরীর মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ন, যেন তার মন রয়েছে অন্য কোথাও। আমার তো এ কথাও মনে হলো যে, কনের চোখদুটি লাল হওয়ার কারণ সাম্প্রতিক অশ্রুমোচন। তার মুখচোখের প্রতিটি রেখায় যে গ্রীসীয় ঋজুতা ছিল তা তার সৌন্দর্যকে প্রদান করছিল এক বিচিত্র তাৎপর্য ও গাম্ভীর্য। কিন্তু সেই ঋজুতা, গাম্ভীর্য ও সেই বিষণ্নতার মধ্য দিয়েও ফুটে

উঠছিল এক শিশুর সারল্য। তার মুখেচোখে এমন এক ছেলেমানুষির ভাব ছিল যা ঠিক বলে বোঝান যায় না, আর ছিল এক অনির্দিষ্টতা ও তারুণ্য। সে মুখচোখ, কোনো কথা না বলেও, যেন করুণা ভিক্ষা করে নিচ্ছে।

সবাই বলল কনের বয়েস সবে ষোলো। আমি বরকে মনোযোগ দিয়ে দেখলাম। হঠাৎ চিনতে পারলাম—এ যে জুলিয়ান মাস্তাকোভিচ। এই পাঁচ-বছরে তো তাঁর সঙ্গে দেখাই হয়নি। তখন আবার কনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম—ও হরি! যত তাড়াতাড়ি পারা যায় গির্জা থেকে কেটে পড়া গেল। লোকে কনের ধনসম্পত্তি নিয়ে বলাবলি করছে শুনলাম, বলছে বিয়েতে পাঁচ লক্ষ রুবল বরপণ দেওয়া হয়েছে, হাত খরচের জন্য দেওয়া হয়েছে এত ইত্যাদি।

রাস্তায় বেরিয়ে আসতে আসতে নিজের মনে ভাবলাম, "তাহলে তো লোক-টার গণনায় ভুল হয়নি।"

ঈশ্বর সত্যকে দেখেন, তবে দেরিতে

লেভ তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০)

ভ্লাদিমির শহরে বাস করত এক তরুণ ব্যবসায়ী। তার নাম ছিল ইভান ডিমিট্রিচ্ আকসিওনভ। তার গোটাদুই দোকান এবং একটি সুন্দর বাড়ী ছিল।

আকসিওনভকে সুপুরুষ বলা যায়। সুন্দর কোঁকড়া চুলওয়ালা লোকটি বেশ আমুদে প্রকৃতির, আর গান-বাজনাও সে ভালবাসত খুব। দোষের মধ্যে বলতে গেলে,—মদ খেত খুব বেশী। আর মদের মাত্রা চড়লেই প্রায়ই সে কোনো না কোনো গোলমাল পাকিয়ে বসত। অবশ্য বিয়ে করার পর কখনো-সখনো একটু-আধটু পান করা বাদে মদ খাওয়া বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছিল।

একদা এক গ্রীষ্মকালে আকসিওনভ 'নিজনি'র মেলায় ব্যবসার উদ্দেশে যাবে বলে মনস্থ করল। পরিবারের লোকজনদের বিদায় জানিয়ে যখন সে রওনা হতে যাচ্ছে তখন তার স্ত্রী এসে বলল, 'ওগো, তুমি আজ আর বেরিও না, কাল রাতে তোমাকে নিয়ে ভারি বিচ্ছিরি একটা স্বপ্ন দেখেছি।'

স্ত্রীর কথায় আকসিওনভ হেসে বলল, 'বুঝেছি, আসলে তুমি ভয় পাচ্ছ। তুমি ভাবছ আমি বাইরে গেলেই মদের ফোয়ারা ছোটাবো।'

স্ত্রী পাংশুমুখে বলল, 'জানিনা কেন যে আমার বুক কাঁপছে। তোমাকে শুধু এইটুকুই বলছি, স্বপ্নটা কিন্তু মোটেই ভাল নয়। আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম—শহর থেকে তুমি ফিরে এসে টুপিটা খুললে, দেখি তোমার সব চুল সাদা হয়ে গেছে।'

আকসিওনভ ফেটে পড়ল হাসিতে। 'আরে, ওটা তো একটা শুভ লক্ষণ। দেখো, এবারের মেলায় আমার সব মাল বিক্রী হয়ে যাবে। তোমার জন্য একটা চমৎকার উপহার নিয়ে আসব।'

এই বলে স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল মেলার উদ্দেশে।

পথে দেখা হল এক ব্যবসায়ী বন্ধুর সঙ্গে। দুজনে তো খুব খুশি। পথের ধারে এক সরাইখানায় সে রাতটা আশ্রয় নিল তারা। দুজনে মিলে চা

অনুবাদ : দেবাশিস সান্যাল

খেতে খেতে অনেক গল্প-গুজব করল। তারপর রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে পাশাপাশি দুটি ঘরে শুয়ে পড়ল।

আকসিওনভের বেলা পর্যন্ত ঘুমনোর অভ্যেস ছিল না কোনো দিনই। পরদিন খুব ভোরে উঠে সে সহিসকে গাড়ীতে ঘোড়া জুততে বলল। সরাই-খানার মালিক সরাইসংলগ্ন ছোট একটি বাসায় থাকত। আকসিওনভ সরাইয়ের মালিকের কাছে গিয়ে তার পাওনাগণ্ডা সব মিটিয়ে দিয়ে আবার রওনা হল মেলার উদ্দেশে।

মেলার পথ এখনো অনেকটা। মাইল-পঁচিশেক আসার পর মনে হল, একটু বিশ্রাম নিলে হয়। ঘোড়াগুলো ছুটছে অনেকক্ষণ, ওদেরও একটু দানাপানি প্রয়োজন। রাস্তার ধারে একটা ছোট্ট সরাইয়ে ঢুকে আস্তাবলে ঘোড়াগুলো রেখে ও তার প্রিয় সঙ্গী গিটারটা বার করে বাজাতে শুরু করল।

এই সময় দেখা গেল ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে এক রাজকর্মচারী, সঙ্গে দুজন সৈন্য। রাজকর্মচারীটি এসেই আকসিওনভকে জেরা করতে শুরু করে দিলেন।

প্রথমে নাম-ঠিকানা জিজ্ঞাসা করা হল, তারপর অন্য প্রশ্ন—'গতকাল কোথায় ছিলেন? রাত্রে কোথায় খেয়েছেন বলুন! আপনি কি আপনার সঙ্গী ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটিকে সকালে দেখেছেন? আর এই সাত-সকালেই বা রওনা দিলেন কেন?'

হঠাৎ একগাদা প্রশ্নের ঠেলায় বেচারী হকচকিয়ে যায়। আকসিওনভ বুঝতেই পারে না তাকে এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে কেন। তবু সে শান্তভাবে সবকিছুই বলে গেল। শেষকালে একসময় সে বলে ফেলল, 'আপনি মশাই তখন থেকে এমন জেরা করছেন যেন আমি চোর কিংবা ডাকাত। আরে বাবা, আমি চলেছি আমার নিজের ব্যবসার কাজে। ফালতু আমার সময় নষ্ট করছেন এইসব আজেবাজে জেরা করে।'

রাজকর্মচারীটির কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, 'শুনুন, আমি এ-অঞ্চলের পুলিশ অফিসার। আপনাকে এতক্ষণ ধরে এইসব প্রশ্ন করা হচ্ছে তার কারণ, যে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকটির সঙ্গে আপনি রাত কাটিয়েছেন, তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। কোনো ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা আপনার জিনিসপত্র পরীক্ষা করে দেখব।'

পুলিশ অফিসার তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। আকসিওনভের বিছানাপত্র খুলে ফেলা হল। হঠাৎ বিছানার ভেতর থেকে একটা রক্তমাখা ছোরা বার করে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ ছোরা কার?'

আকসিওনভ তার বিছানার মধ্যে রক্তমাখা ছোরাটা দেখে ভয়ে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

'এ ছোরাতে রক্ত লাগল কী করে, অ্যাঁ?' পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন।

আকসিওনভের গলা দিয়ে কোনো স্বরই বেরুল না। অনেক কষ্টের পর কোনোমতে আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে · মানে···আমি জানি না এই ছোরাটা আমার নয়।' পুলিশ অফিসার এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজকেই সকালে ঐ ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে তাঁর বিছানায় গলা কাটা অবস্থায় দেখা গেছে, আর আপনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়—কেননা ঐ বাড়ীটি ভেতর থেকে তালা বন্ধ ছিল। আপনি ছাড়া ঐ বাড়ীতে দ্বিতীয় কোনো প্রাণী ছিল না। তাছাড়া আরো বড় প্রমাণ, আপনার বিছানাপত্রের ভেতর থেকে ঐ রক্তমাখা ছোরাটা পাওয়া গেছে, আপনার মুখচোখের ভঙ্গিও খুব সন্দেহজনক। এবার পরিষ্কার করে বলুন তো, ঠিক কীভাবে খুনটা করলেন? আর কত টাকা চুরি করেছেন, সেটাও সত্যি করে বলে ফেলুন।'

আকসিওনভের মুখচোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, হাত-পা কাঁপতে লাগল। সে প্রাণপণে পুলিশ-অফিসারটিকে বোঝাতে চেষ্টা করল, 'দোহাই হুজুর, বিশ্বাস করুন, রাত্রে চা খাওয়ার পর তার সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি। খাওয়া-দাওয়া সেরে সোজা শুয়ে পড়েছি নিজের ঘরে। আর টাকা চুরির কথা বলছেন, বিশ্বাস করুন, বাড়ী থেকে বেরুনোর সময় ব্যবসার জন্য যে আট হাজার রুবল নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তার বাড়তি একটি কানাকড়িও আমার কাছে নেই। এ-ছোরা আমার তো নয়ই, কোনো কালে ছিল না হুজুর, আমি নিরপরাধ।'

দুর্ভাগ্যের বিষয়, পুলিশ-অফিসারটি আকসিওনভের কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করলেন না। তার টাকাকড়ি, জিনিসপত্র সব কেড়ে নিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে গাড়ীতে করে নিয়ে গেলেন সামনের শহরে। সেখানে একটি কারাগারে তাকে বন্দী করে রাখা হল। আকসিওনভ নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে কাঁদতে লাগল।

এদিকে ভ্লাদিমির শহরে তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে পুলিশ গেল। স্থানীয় লোকেরা জানালো, লোক হিসাবে আকসিওনভ মন্দ নয়, তবে অতীতে সে স্রেফ মদ খেয়েই কাটাত।

দেখতে দেখতে বিচারের দিন এসে গেল। রাজান শহরের সেই ব্যবসায়ীকে খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল আকসিওনভকে।

এদিকে, তার স্ত্রী-বেচারী এই দুঃসংবাদ পেয়ে ছটফট করতে থাকে। সে তো এসব কথা বিশ্বাসই করতে চায় না। তার ছেলেমেয়েরা সব নাবালক—ছোট ছেলেটি তো একেবারে কোলের।

অনেক ভেবেচিন্তে এক সময় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে সে চলল জেলখানায় স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে।

সেখানে স্বামীর সঙ্গে তার দেখা করার অনুমতি মিলল। কারাগারে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে জেলখানার পোশাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় স্বামীকে দেখে সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না—সেখানেই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ বাদে তার মূর্চ্ছা ভাঙার পরে আস্তে আস্তে সে নিজেকে সামলে নিল। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আকসিওনভের পাশে বসে কথা বলতে শুরু করল। বাড়ী-ঘরের সব কথা বলে তার বউ জানতে চাইল, কীভাবে এই বিচ্ছিরি কান্ডটা ঘটল।

যা-যা ঘটেছে আকসিওনভ সবই বলে গেল একে-একে। সব শুনে বউ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন উপায় ?'

'উপায় হচ্ছে মহামান্য জারের কাছে প্রার্থনা জানানো।'

'হায় ভগবান. তা কি আর জানাতে বাকি রেখেছি ?'

কিন্তু তিনি সেই আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

এ-কথা শুনে আকসিওনভ মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল।

এবার নিচু গলায় তার বউ বলল, 'দেখলে তো, সেদিন যে তোমাকে দুঃস্বপ্নের কথা বলেছিলাম তা মিছে নয়—সেদিন তোমার রওনা হওয়া মোটেই উচিত হয়নি।' আঙুল দিয়ে তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে বউ বলল, 'হ্যাঁগো, আমায় সত্যি কথাটা বলো না! ওই খুনটা সত্যিই তুমি করেছ, তাই না ?'

আকসিওনভ আর্তনাদ করে ওঠে 'ওহ্ শেষকালে তুমিও আমাকে খুনী বলে সন্দেহ করছ ?'

এরপর সে আর কোনো কথা বলল না, দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। এমন সময় কারারক্ষী এসে জানালো, দেখা করার সময় পেরিয়ে গেছে। এবার তার বউ-ছেলে-মেয়েকে বিদায় নিতে হবে। অগত্যা শেষবারের মতো বিদায় জানিয়ে আকসিওনভ তার কুঠুরিতে ফিরে গেল।

বউ-ছেলে-মেয়ে চলে যাবার পর সে বসে বসে ভাবতে লাগল। হায়, তার নিজের বউ পর্যন্ত তাকে খুনী বলে সন্দেহ করছে—কার কাছে সে দাঁড়াবে! এখন মনে হচ্ছে একমাত্র ঈশ্বরই কেবল আসল সত্য জানেন, আর তাই বৃথা অন্য কোথাও অনুরোধ-উপরোধ না জানিয়ে কেবল ঈশ্বরের দরবারেই প্রার্থনা করা উচিত। একমাত্র ঈশ্বরই তাকে করুণা করতে পারেন। এই ভেবে সে বিভিন্ন উপর-মহলে দরবার জানানো বন্ধ করে দিয়ে একমনে কেবল ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল।

সমস্ত প্রার্থনা নিষ্ফল হয়ে গেল। বিচারে আকসিওনভ দোষী সাব্যস্ত হল;—শাস্তি হল, বেত্রাঘাত সহ সাইবেরিয়ায় নির্বাসন!

বেত্রাঘাতে তার শরীর জর্জরিত হয়ে গেল। ক্রমে আঘাতের ক্ষতগুলি শুকিয়ে যাবার পর তাকে নির্বাসিত করা হল সাইবেরিয়ায়।

দেখতে দেখতে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর তার কেটে গেল বন্দীদশায়। তার মাথার সমস্ত চুল হয়ে গেল বরফের মত সাদা, দাড়িও ধূসর এবং দীর্ঘ। তার সমস্ত আনন্দের ধারা গেল একেবারে শুকিয়ে, শরীরটাও গেল নুয়ে। কখনো তাকে হাসতে দেখা যেত না, কথাবার্তা খুবই কমিয়ে দিয়েছিল, তাকে শুধু মাঝে মাঝে ঈশ্বর আরাধনা করতে দেখা যেত।

জেলে থাকার সময়ই আকসিওনভ বুটজুতো তৈরী করা শিখেছিল। বুট-জুতো তৈরী করার মজুরি বাবদ যা সামান্য অর্থ সে উপার্জন করেছিল তাই দিয়ে সে কিনে ফেলল সন্তদের জীবনী নামক বইটি। কারাগারের সামান্য আলোর মধ্যে সময় পেলেই সে বইটি খুলে পড়ত। আর রবিবার কারাগারের চার্চের প্রার্থনা সভায় তাকে দেখা যেত নিয়মিত ভাবে। গানের গলাটি তখনও তার বেশ ভাল ছিল।

কারাধ্যক্ষ বিনম্র স্বভাবের জন্য আকসিওনভকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন, জেলের অন্যান্য কয়েদীরাও তাকে শ্রদ্ধা করত। নানা জনে নানা ভাবে সম্বোধন করত তাকে—কেউ বলত, 'ঠাকুর্দা', কেউ 'দাদু' আবার কেউ বা 'সন্নেসিঠাকুর'। জেলের কয়েদীরা তাকে তাদের মুখপাত্র বানিয়ে দিয়েছিল—যখনই কোনো অভিযোগ জানানোর দরকার পড়ত, তখনই ডাক পড়ত আকসিওনভের, আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সময়ও তার ছিল মধ্যস্থের ভূমিকা।

দিনের পর দিন গড়িয়ে যায়। আকসিওনভ বাড়ির কোনো খবর পায় না—সে জানতেই পারে না বউ-ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে, বেঁচে আছে কি না কে জানে।

এরই মধ্যে একদিন নতুন আরেকদল বন্দী এল এই বন্দীশালায়। সন্ধ্যে-বেলায় পুরনো কয়েদীরা নতুন কয়েদীদের ঘিরে গল্প শুরু করল। কে কোথা থেকে এসেছে, কার কি অপরাধ, কার শাস্তির মেয়াদ কতদিন এইসব গল্প। অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে আকসিওনভও এককোণে বসে এইসব কথোপকথন শুনছিল।

নতুন কয়েদীদের মধ্যে একজন ছিল লম্বা চেহারার ছোট করে ছাঁটা ধূসর দাড়ি, তার কথাগুলো কানে গেল, 'আরে ভাই, আমি সামান্য একটা স্লেজ গাড়ির ঘোড়া চুরির অপরাধে ধরা পড়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, চুরির জন্যে নয়—একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবো বলেই নিয়েছিলাম, পরে ঘোড়াটা ফেরত দিতাম। কেননা, গাড়ির মালিকও আমার বন্ধুস্থানীয়। কী আর করা যাবে, কপাল মন্দ! পুলিশের লোক আমার কথা বিশ্বাস করল না, বলে—তুমি চুরি করেছো। আবার মজার কথা শোনো, এক সময় আমি এমন অপরাধ

করেছিলাম যে অনেক আগেই আমার এখানে চলে আসার কথা, অথচ সে সময় পুলিশ আমাকে পাকড়াতে পারে নি। আর দেখো, একেই বলে কপাল! এখন বিনা দোষে আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে। অবশ্য এর আগে কখনো শাস্তি ভোগ করিনি বললে মিথ্যে বলা হবে, সাইবেরিয়ায় আমি এর আগে একবার ঘুরে গেছি—তবে মেয়াদ বেশী দিনের ছিল না।

'তুমি কোথাকার লোক ভাই'—একজন প্রশ্ন করল।

'আমি হলাম গিয়ে ভ্লাদিমিরের বাসিন্দা। বউ-ছেলেমেয়ে সব ওখানেই থাকে। আমার নাম 'মেকার', অবশ্য 'সেমিওনিচ' বলেও অনেকে ডাকে।'

আকসিওনভ এতক্ষণ কথাগুলো শুনছিল, এবার সে মাথা তুলে বলে, 'আচ্ছা, তুমি তো ভ্লাদিমিরের লোক বললে, ওখানে আকসিওনভ পদবীর কোনো ব্যবসায়ীকে চিনতে?'

'আরে ওদের চিনবো না! আকসিওনভরা তো খুব বড়লোক। ওদের বাবা অবশ্য আমাদের মত কী একটা অপরাধ করে সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড ভোগ করছে।

এবার একটু থেমে বলল, 'আচ্ছা দাদু, তুমি বলো তো কী অপরাধের জন্য এখানে এসেছ?'

আকসিওনভের আর ইচ্ছে হল না তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী শোনাতে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে শুধু বলল, 'আমার পাপের জন্য ছাব্বিশ বছর ধরে এই জেলখানার শাস্তি ভোগ করছি।'

'অপরাধটা কি ছিল?' মেকার ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

আকসিওনভ মুখ খুলতে চাইল না। সে শুধু বলল, 'হ্যাঁ, এটুকু বলতে পারি, আমি যা করেছি, তার যোগ্য শাস্তিই ভোগ করছি।'

সে আর কিছু বলতে না চাইলেও পুরনো কয়েদীরা জানালো—একজন বদমাস লোক একজনকে খুন করে তার রক্তমাখা ছোরাটা আকসিওনভের বিছানার মধ্যে গোপনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে সম্পূর্ণ নিরপরাধ হয়েও আজ দীর্ঘদিন যাবত সে শাস্তিভোগ করছে।

একথা শুনে মেকার নিজের হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বলল, 'অদ্ভুত! সত্যিই অদ্ভুত ব্যাপার! দাদু! সত্যি তুমি কত বুড়ো হয়ে গেছো!'

মেকারের এই কথায় অন্যরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার বল তো? তুমি কি আগে কখনো আকসিওনভকে দেখেছো?'

মেকার একথার উত্তর দিল না। শুধু বলল, 'সত্যি, ভাবতে ভাল লাগছে, আমরা কি অদ্ভুতভাবে এখানে মিলিত হই।'

এই কথাগুলো আকসিওনভের কানে যেতে মনে হল, এই লোকটা বোধহয় খুনীটাকে চেনে। তাই সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা মেকার, তুমি বোধহয় সেই ঘটনাটা

জানো, আর মনে হচ্ছে তুমি আগে আমাকে দেখেছো।'

'আরে এ ঘটনা কি না শুনে থাকতে পারি। সারা পৃথিবীটাই হল গাল-গল্পের জায়গা। তবে এ তো বহুদিনের ব্যাপার—কি শুনেছিলাম সব ভুলে-টুলে গেছি।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয় শুনেছিলে কে ঐ ব্যবসায়ীটাকে খুন করেছিল?

'আরে এ-তো সোজা কথা।' মেকার হেসে জবাব দিল, 'খুনী হচ্ছে সেই লোক যার ব্যাগের জামাকাপড়ের মধ্যে ছোরাটা পাওয়া গিয়েছে। যদি অন্য কেউ সেই ছোরাটা সেখানে লুকিয়ে রেখে থাকে,—হাতেনাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত প্রমাণ নেই। ঐ যে কথায় বলে না, চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড় ধরা! মাথার নিচে ব্যাগ রেখে তুমি ঘুমোচ্ছ, সেখানে কেউ ছোরাটা ঢুকিয়ে রাখতে গেলে তোমার ঘুম ভেঙে যাবে না! বলো, সত্যি কি না?'

এই কথাগুলো শুনে আকসিওনভ পরিষ্কার বুঝতে পারল, এই লোকটাই তার ব্যবসায়ী বন্ধুকে খুন করেছে। মুখে সে একটাও কথা বলল না, ধীর পায়ে আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

সারারাত্রি তার চোখে এক ফোঁটা ঘুমও এল না। দারুণ মনোকষ্ট নিয়ে সে সারা রাত ছটফট করতে লাগল। চোখের সামনে তার ফেলে-আসা যৌবনের সোনার দিনগুলি একে-একে ভেসে উঠতে লাগল—সেই মেলাতে যাবার দিনে স্ত্রীর মুখের ছবি—সেই মুখ, সেই চোখ—তার হাসি—তার কথা যেন সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার ছোট ছেলে-মেয়েদের মুখচ্ছবি।···একজন যেন গরম চাদরে গা মুড়ে আছে, আর কোলের বাচ্চাটি মা'র কোলে শোভা পাচ্ছে দেবশিশুর মতো। নিজেকে যেন সে দেখতে পাচ্ছে যুবাপুরুষের মতো। চোখের সামনে আস্তে-আস্তে ভেসে আসছে সেই সব দৃশ্য—হোটেলের বারান্দায় বসে বসে সে গীটার বাজাচ্ছে······আহা, কী উদ্দাম, কী স্বাধীন জীবনই না তখন ছিল! আবার পরক্ষণেই ভেসে উঠল সেই জায়গার দৃশ্য যেখানে তাকে নির্মমভাবে চাবুক মারা হয়েছিল—সেই সারি-সারি জল্লাদের দল—সেই দীর্ঘ ছাব্বিশ বছরের শৃঙ্খলিত কয়েদী জীবন যা তাকে অকালে অতিবৃদ্ধে পরিণত করেছে। তার মুখ-চোখের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। শোকে, দুঃখে, হতাশায় তার মনে হয় এখুনি আত্মহত্যা করে সে সব জ্বালা জুড়োবে।

পরক্ষণেই সে খেয়াল করে, এই নিষ্ঠুর পরিণতির জন্য সেই হারামজাদা মেকারই দায়ী। ক্রোধে অন্ধ হয়ে এক সময় মনে হয় এক্ষুনি গিয়ে তাকে শেষ করে দিয়ে আসে—তাতে জীবন যায় যাক।

সমস্ত সময়টা তার অসহ্য জ্বালায় কাটতে লাগল। সারা রাত ধরে সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল, তবু কিছুতেই জ্বালা জুড়োতে চায় না। ক্রমে

সকাল হল। সারাদিনে মেকারের কাছে যাওয়া দূরে থাক, একবার চোখ তুলেও তাকে সে দেখল না।

এইভাবে দেখতে দেখতে দিন পনেরো কেটে গেল। আকসিওনভ রাতের পর রাত নিদ্রাহীন কাটিয়ে দেয়—সে বুঝতে পারছে না এখন সে কী করবে!

একরাত্রে সে অন্যমনস্কভাবে জেলের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, ঘরের কাছের একটি দেওয়াল থেকে যেন খানিকটা মাটি খসে পড়ছে। ব্যাপারটা ভাল করে দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ক্রমে আরো মাটি খসে পড়ে একটি গর্ত দেখা গেল। খানিক পরেই সেই গর্ত থেকে একটি মাথা উঁকি মারল। সেই অন্ধকারের মধ্যেও মাথাটি চিনতে একটুও ভুল হল না তার—সে হচ্ছে মেকার।

বিরক্ত হয়ে আকসিওনভ চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই মেকার ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরল। চুপি চুপি সে বলল, 'বুঝলে, বহু কষ্ট করে রোজ একটু একটু করে গর্তটা খুঁড়ছি এখান থেকে পালাবো বলে। বাইরের মাঠে যখন আমাদের কাজ করাতে নিয়ে যায় সেই সময় গর্ত কাটার মাটিগুলো বাইরে ফেলে দিয়ে আসি। তুমি শুধু চুপচাপ থেকো। কাউকে কিছু বলতে যেও না দয়া করে। ভেব না, তোমারও পালাবার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে তুমি যদি আমাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করো, তাহলে জেনে রাখো আমি মারা যাবার আগে তোমাকে মেরে রেখে যাবো। বুঝলে?'

এই কথা শুনে আকসিওনভ রাগে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। মেকারের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলল, 'আমার মুক্তি পাওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই। তুমি আর আর আমাকে নতুন করে কি মারবে, বহুদিন আগেই তুমি আমাকে মেরে রেখেছো। আর তোমার ব্যাপারে কী করব না করব সে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

পরের দিন কয়েদীদের কাজ করাতে নিয়ে যাবার সময় মাটি সরানোর ব্যাপারটা কারারক্ষীদের নজরে পড়ে গেল। তারা অনুসন্ধান চালিয়ে সুড়ঙ্গটির সন্ধান পেল। স্বয়ং কারাধ্যক্ষ এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন। তারপর সবাইকে জিজ্ঞেস করা হল, কে এই গর্ত খুঁড়েছে। সকলেই একবাক্যে জানালো এই গর্ত খোঁড়ার ব্যাপারটা তারা আদৌ জানে না। অবশেষে কারাধ্যক্ষ এলেন আকসিওনভের কাছে। তিনি আকসিওনভকে একজন সৎ ও ধার্মিক হিসাবে ভালবাসতেন। তিনি জানতেন সে অন্তত সত্যি কথাটা বলবে।

কাছে এসে সস্নেহে তিনি বললেন, 'বুড়োবাবা, সত্যি করে বলো তো, দেওয়ালের গায়ে গর্তটা কে বানিয়েছে?'

আকসিওনভ একবার চকিতে তাকালো মেকারের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'হুজুর, মাপ করবেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় আমি কিছু বলি। আপনি ইচ্ছে

করলে আমাকে শাস্তি দিতে পারেন।'

কারাধ্যক্ষ বুঝতে পারলেন, আকসিওনভ কাউকে আড়াল করতে চাইছে। তিনি অনেক চেষ্টাচরিত্র করলেন, কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটা কথাও বার করতে পারলেন না। শেষে হতাশ হয়ে চলে গেলেন তিনি।

ঐদিন রাত্রে আকসিওনভ যখন তার বিছানায় শুয়ে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিল—সবে একটু তন্দ্রা এসেছে, তখন কে যেন খুব সন্তর্পণে তার বিছানায় এসে বসল। অন্ধকারের মধ্যেও সে মেকারকে চিনতে পারল।

মেকার কোনো কথা বলছে না, নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে। আকসিওনভ উঠে বসে তীব্রভাবে বলল, 'আমার কাছ থেকে আর কী চাও? কেন এসেছো এখানে? এখুনি চলে যাও এখান থেকে, নয়তো আমি কারারক্ষীকে ডাকবো।'

মেকার এবার ঝুঁকে পড়ল আকসিওনভের কাছে। ফিসফিস করে বলল, ইভান ডিমিট্রিচ্। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।'

'কিন্তু কেন?'

'কারণ, আমি সেই জঘন্য অপরাধী যে সেই ব্যবসায়ীটিকে খুন করেছিল। আমিই সেই রক্তমাখা ছোরাটা লুকিয়ে রেখেছিলাম তোমার জামাকাপড়ের মধ্যে। হয়তো সেদিন তোমাকেও খুন করতাম, কিন্তু বাইরে একটা গোলমালের আওয়াজ শুনে জানলা টপকে সে রাত্রে পালাতে হয়েছিল আমাকে।'

আকসিওনভ চুপ করে বসেছিল। সে ভেবে পাচ্ছে না কী বলবে। মেকার এবার বিছানা থেকে নেমে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, 'ইভান ডিমিট্রিচ্ আমাকে দয়া করে ক্ষমা করো। ঈশ্বরের দোহাই, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমি সকলের সামনে সত্যি কথা স্বীকার করব। আমি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেব,—আমিই সেদিন সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে খুন করেছিলাম,—তাহলেই তুমি মুক্তি পেয়ে বাড়ি চলে যেতে পারবে।'

আকসিওনভ আস্তে আস্তে বলল, 'এসব কথা বলা তোমার কাছে অতি সোজা। কিন্তু একবার চিন্তা করো, শুধুমাত্র তোমার জন্যে আমি ছাব্বিশ বছরের নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি এখানে। আর বাড়ি যেতে বলছ? বাড়ির আর কী আকর্ষণ আছে আমার কাছে? স্ত্রী এতদিনে হয়তো মারা গেছে; ছেলেমেয়েরা এখন আমাকে চিনতেও পারবে না। আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

মেকার কিন্তু উঠল না। মেঝেতে মাথা ঠুকতে-ঠুকতে বলল, 'প্রভু যিশুর দোহাই, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আমাকে যখন চাবুক কসিয়েছে জেলেতে তখনও এত কষ্ট হয়নি। কিন্তু তোমার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারছি না—ওঃ ভগবান!' এই বলে সে কাঁদতে শুরু করে দিল।

মেকারকে কাঁদতে দেখে এবার সেও নিজেকে সামলাতে পারল না। তার চোখেও নেমে এল অশ্রুর বন্যা।

সস্নেহে মেকারের পিঠে হাত রেখে সে বলল, 'দুঃখ কোরো না, ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন। কে জানে, হয়তো আমি তোমার চেয়ে শতগুণে খারাপ ছিলাম, তার জন্যে এই শাস্তি ভোগ করছি।'

কথাগুলো বলার পরে মনে হল তার বুকের থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেছে। এখন আর তার বাড়ি ফেরার লোভ নেই—এই জেলখানা ছেড়ে যেতে তার মন চায় না। এখন শুধু মনে মনে তার প্রতীক্ষা—কখন জীবনের অন্তিম লগনটি আসবে।

অনেক চেষ্টা করেও আকসিওনভ কিন্তু মেকারকে তার স্বীকারোক্তি দেওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। মেকারের স্বীকারোক্তি দেওয়ার পরে আকসিওনভের মুক্তির আদেশ এল—কিন্তু দেখা গেল, ছাড়া পাওয়ার আগেই তার আত্মা তার দেহ থেকে মুক্তিলাভ করে গেছে।

ক্যালাভিরাস জেলার বিখ্যাত লাফারু ব্যাঙ

মার্ক টোয়েন (১৮৩৫-১৯১০)

আমার এক বন্ধু পুব দেশ থেকে চিঠি লিখেছিল আমি যদি তার বন্ধুর বন্ধু লিওনিডাস ডবলিউ স্মাইলির খবরটা সাইমন হুইলারের কাছ থেকে জেনে তাকে জানাই তো ভাল হয়—সে কারণেই আমি মধুর চরিত্রের বুড়ো সাইমন হুইলারের কাছে গিয়ে আমার বন্ধুর খোঁজ করেছিলাম। লোকটি কথা বলতে পারলে আর কিছু চায় না—আর সে বকবক করে যা বলে গেল তারই ফল এখানে, একটু পরেই, আপনাদের সামনে একটি কথাও না বাড়িয়ে বা কমিয়ে উপস্থাপিত করছি। আমার একটু-একটু যেন সন্দেহ হচ্ছে আসলে লিওনিডাস ডবলিউ স্মাইলির অস্তিত্ব আদপেই ছিল না, আমার বন্ধু এমন কোন ব্যক্তিকেই চিনত না—আসলে সে ভেবেছিল আমি যদি লিওনিডাস্ ডবলিউ স্মাইলির কথা জিজ্ঞেস করি তাহলে তার মনে পড়ে যাবে হতভাগা জিম্ স্মাইলির কথা, আর সে সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যানর ঘ্যানর করতে শুরু করবে জিম্ সম্পর্কে কোন নারকীয় দীর্ঘ উপাখ্যানের ব্যাখ্যান, যার সঙ্গে নাটকীয় কোন উত্তেজনা থাকবে না, আর আমার কাজে তো লাগবেই না! আমার বন্ধু সেই মতলব করে আমাকে বুড়োর কাছে যদি পাঠিয়ে থাকে তাহলে সে সাধ তার মিটেছিল।

সাইমন হুইলারের দর্শন পেলাম এঞ্জেলস্-এর পুরনো খনি বসতির এক ভগ্নদশাগ্রস্ত মদের দোকানের গরম স্টোভের কাছে একটা চেয়ারে। মোটাসোটা চেহারা, মাথায় বিরাট টাক নিয়ে লোকটি দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছিল। দেখলাম লোকটির মুখটি সারল্যে ভরপুর, মনোহরণকারী ভদ্র এবং প্রশান্ত। ঘুম ভেঙে যেতেই আমাকে স্বাগত জানাল লোকটি। আমি তাকে বললাম আমার এক বন্ধু তার ছেলেবেলার এক প্রিয় বন্ধুর খোঁজ-খবর নিতে আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে—লোকটির নাম লিওনিডাস ডবলিউ স্মাইলি, কিংবা, রেভারেণ্ড লিওনিডাস্ ডবলিউ স্মাইলি—তা পাদরি হলে হবে কি, বয়স তার খুব বেশি নয়, আমার বন্ধু কার কাছ থেকে শুনেছে লোকটি এঞ্জেল'স ক্যাম্পে এক সময় ছিল। এর পর আমি আরও বললাম, যদি মিস্টার হুইলার রেভারেণ্ড

অনুবাদ : হিমানীশ গোস্বামী

লিওনিডাস্ ডবলিউ স্মাইলি সম্পর্কে কিছু হদিশ-টদিশ দিতে পারেন তাহলে আমি বেশ ভালমতই কৃতজ্ঞ থাকব তাঁর কাছে।

এর পর আর কি। সাইমন হুইলার আমাকে একটা কোণে নিয়ে আটক করে ফেললেন। তাঁর চেয়ার এমন ভাবে রাখলেন যে আমি যাতে ভদ্রভাবে সরে পড়তে না পারি—তিনি আমাকে একেবারে বসিয়ে দিলেন বলা যায়। আমি ঐ কোণে বসে রইলাম আর তিনি শুরু করলেন তাঁর একঘেয়ে ঘ্যানর-ঘ্যানর। এর পরবর্তী অনুচ্ছেদ থেকে পাঠকেরা তার প্রমাণ পাবেন। এই যে তাঁর ঘ্যানর-ঘ্যানর তার মধ্যে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও হাসেননি, মৃদু-হাসিও নয়, কপাল কোঁচকাননি, আর যেরকম মৃদু স্বরে শুরু করেছিলেন তাঁর বক্তব্য সেই সুরের ধারা তিনি বজায় রেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। আর এই বলার সময় তাঁর হাবেভাবে বিন্দুমাত্র উৎসাহের ঝিলিকও ছিল না—তবে হ্যাঁ, তাঁর কথাবার্তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল একটা আন্তরিক ব্যগ্রতার ধারা—যা থেকে আমি বুঝতে পারলাম গল্পের মধ্যে হাস্যকর বা অদ্ভুত কিছু থাকলেও তিনি সে-সব সত্যিকারের দরকারি তথ্য মনে করেই বলছিলেন, এবং এটাও তাঁর বিশ্বাস ছিল যে তিনি যে-দুজনকে নিয়ে গল্পটা বলছিলেন সে-দুজনই ছিল চতুর প্রতিভার চূড়ান্ত উদাহরণ। আমার অবশ্য মনে হয়েছিল হাসি সম্পূর্ণ বর্জন করে এরকম অদ্ভুত গল্প গম্ভীরভাবে বলে যাওয়াটাই একটা অসম্ভব কাণ্ড।

আমি আগেই বলেছি, আমি রেভারেণ্ড লিওনিডাস্ স্মাইলি সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম, তিনি তখন বলতে শুরু করলেন। তিনি বলে চললেন তো চললেনই, আর আমি একবারও তাঁকে বাধা দিলাম না। জানিয়ে রাখি তাঁর কণ্ঠ সর্বদাই ছিল মর্দাসিক্ত।

কোন্ সময় যেন? দাঁড়াও মনে করে নিই, বোধ হয় ১৮৪৯ সালের শীতের সময়—কিংবা ১৮৫০-এর বসন্তকালে হবে, হুঁ, জিম স্মাইলি বলে একজন এখানে ছিল বটে। তা আমি সময়টা একটু গুলিয়ে ফেলেছি বোধহয়—কারণ কি জানো? ও যখন এখানে এল তখনও বড় খালটা কাটা হয়নি—মানে, খালটা কাটা হলেও শেষ হয়নি মোটেই। তবে সে যাই হোক লোকটা ছিল রাম-জুয়াড়ি—এমন অদ্ভুত লোক আমি জীবনে দেখিনি—সুযোগ পেলেই সে বাজি ধরত, সে তা যার উপরেই হ'ক না কেন। অবশ্য বাজি ধরবার জন্য লোক দরকার হত—সেই লোক পেলেই সে বাজি-যুদ্ধে নেমে পড়ত, আর অপর লোক যদি তার প্রস্তাব মত বাজি খেলতে রাজি না হত তাহলে সে অন্য পক্ষে বাজি ধরত। অন্য লোক যদি কোনো কিছুর পক্ষে বাজি ধরত, ও তার বিপক্ষে বাজি ধরতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করত না—তা সে বাজি যা নিয়েই হ'ক না কেন, ওর নেশা ছিল বাজি ধরার, তাতেই সে খুশি থাকত। আর তাজ্জব কি বাত, প্রায় সব বাজিতেই সে জিতত। সে বাজি ধরার জন্য যেন মুখিয়ে থাকত, আর একটা সুযোগ পেলেই

ঝাঁপিয়ে পড়ত। দুনিয়ায় এমন বিষয় ছিল না যা নিয়ে ও বাজি ধরেনি—তা তুমি যে দিকে বাজি ধরবে ও ঠিক অন্য দিকে বাজি ধরবেই। দারুণ কপাল ছিল ওর। যদি কোথাও ঘোড়-দৌড় হচ্ছে জানা যেত তাকে দেখা যেত সেখানে। হয় জিতে একেবারে টইটম্বুর হয়ে মাটিতে পা পড়ছে না, নয়ত সব হেরে বসে আছে। যদি কোথাও কুকুরে-কুকুরে লড়াই হয় ওকে সেখানেও দেখা যেত বাজি ধরতে। দুই বেড়ালে ফ্যাঁস-ফোঁস ঝগড়া হচ্ছে, বাস্ আর কথাবার্তা নেই, ও বাজি ধরবেই। এমন কি একটা বেড়ার উপর দুটো পাখি বসে থাকলে সে কোন্ পাখিটা আগে উড়বে তা নিয়ে বাজি ধরবে। মোরগের লড়াই হলেও ও বাজি ধরতে ছুটবে—আবার যদি এখানে কোনো সভা হয় তাহলে সে বাজি ধরবে কার উপর জানো? পার্সন ওয়াকারের উপর—ওর মতে পার্সন ওয়াকারের মতো সুবক্তা এ অঞ্চলে আর নেই। তা লোকটা সুবক্তা ঠিকই, মানুষটা ভালও। ওয়াকারের সভা হলেই ও সেখানে ছোটে। তারপর ধরো সে দেখতে পেল কেউ কোথাও যাবে বলে রওয়ানা দিয়েছে বা দিচ্ছে, সে তক্ষুনি যে যেখানেই যাওয়া মনস্থ করুক না কেন, সেখানে পৌঁছতে কত সময় লাগবে তা নিয়ে তোমার সঙ্গে বাজি ধরবে—আর যদি তুমি বাজি ধরো তাহলে সে ঐ লোকটার পেছন-পেছন যাবে। এমন কি লোকটা মেক্সিকো গেলে সেও ছাড়বে না। সে দেখবে লোকটা কোথায় গেল, আর যেতে কত সময় লাগল। এখানে স্মাইলিকে অনেকেই দেখেছে, তারা ওর সম্পর্কে কিছু না কিছু বলতে পারবে। হ্যাঁ, ওর কাছে সবই সমান ছিল—সে যে কোনো ব্যাপারেই বাজি ধরত এটাই হল আসল কথা—সাংঘাতিক মানুষ! একবার হল কি শোনো, পার্সন ওয়াকারের স্ত্রী দারুণ অসুস্থ হয়েছিলেন, বেশ ঘোরালো অবস্থা—অনেকদিন চলল যমে-মানুষে টানাটানি, এমন হল একবার যে আর বুঝি বাঁচেন না, এই সময় একদিন ও এল, জিজ্ঞেস করল কেমন আছেন মিসেস ওয়াকার। মিস্টার ওয়াকার বললেন, আগের চেয়ে অনেক ভাল—ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ তাঁর অসীম করুণার জন্য, এখন বেশ ভালই বোধ করছেন তিনি, আর ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তিনি সেরে উঠবেন ঠিকই। আর স্মাইলি তার উত্তরে কি বলল শোনো, "আড়াই ডলার বাজি ধরতে চান? আমি বলছি উনি সেরে উঠবেন না।"

এ-বছর স্মাইলি একটা মেয়ে ঘোড়া যোগাড় করেছিল—এখানকার ছোকরারা বলত পনেরো মিনিট বাঁটকুল, ঘোড়াটা ছোট ছিল ঠিকই কিন্তু পনেরো মিনিট কথাটা মজা করে বলা—কারণ ঐ ঘোড়া দৌড়িয়ে ওর বেশ ভালই টাকা হত যদিও সে ধীরে চলত, সর্বদাই হাঁফানিতে ভুগত, কিংবা মেজাজ ঠিক থাকত না, কখনো বা তার হত দারুণ কাশি, কিংবা ঐরকমই ভয়াবহ কিছু একটা। ফলে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে ও অন্য সকলের সঙ্গে একসঙ্গে দৌড় শুরু করলেও ওকে দু কিংবা তিনশো গজ এগিয়ে রাখা হত দৌড় শুরু করার সময়।

ওকে সব ঘোড়াই মেরে বেরিয়ে যেত ; কিন্তু দৌড়ের শেষ দিকে ঘোড়াটা দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠত, একটা হেস্তনেস্ত করবার মতো মেজাজ এসে যেত তার। দারুণ লম্বা-লম্বা পা ফেলে-ফেলে সে দৌড়তে শুরু করত অকস্মাৎ, সে কি দারুণ লম্ফঝম্প—কখনো পা-গুলিকে বিস্তার করছে, কখনো শূন্যের দিকে তুলছে, কখনো বা ঝোপের বেড়ার সঙ্গে ধাক্কা লাগাচ্ছে, আর সর্বদাই ধুলোর ঝড় তুলছে, আর কি আওয়াজই না ছাড়ছে কাশতে কাশতে, হাঁচতে হাঁচতে আর নাক ঝাড়তে ঝাড়তে—শেষ পর্যন্ত তার নাকটাই ঠেকত গিয়ে দড়িতে অন্য সব ঘোড়ার আগেই।

ওর কুকুরের ছানা ছিল ছোটখাটো বাচ্চা একটা কুকুর, দেখলে মনে হত ওর দাম একটা পয়সাও হবে না, সেটি ছিল একেবারে এক নম্বরের চোর, কোনো খাদ্য অসাবধানে ফেলে রাখলেই সে তা নিয়ে সরে পড়ত। কিন্তু কেউ ওর উপর বাজি ধরলেই তার রূপান্তর ঘটে যেত অকস্মাৎ, তার মুখ হয়ে পড়ত জাহাজের সামনের দিকটার মতো উদ্ধত, দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ত আর গনগনে চুল্লির আগুনের মতো ঝকঝক করত। আবার, কোনো কুকুর তাকে নিয়ে হেনস্থা করতে পারত, তাকে ভয় দেখিয়ে কাবু করতে পারত, কামড়াতে পারত, তাকে কামড়ে ধরে দু-তিন পাক ঘোরাতে পারত। কুকুরটার নাম ছিল অ্যান্ড্রু জ্যাকসন—কুকুরটা তার খুশি মতো ভান করতে ছিল ওস্তাদ, আর অ্যান্ড্রু জ্যাকসন যখন এই রকম হেনস্থা হওয়ার ভান করত—তখন ওর প্রতিদ্বন্দ্বী কুকুরের উপর লোকেরা তাদের বাজির পরিমাণ বাড়িয়ে দিত দ্বিগুণ, চতুর্গুণ ·· শেষ পর্যন্ত বাজি-ধরনেওয়ালাদের টাকাপয়সা ফুরিয়ে গেলে তবেই বাজি ধরা শেষ হত, আর ঠিক যেন এই মুহূর্তেরই অপেক্ষা করত ঐ কুকুরটা, এই সময় অ্যান্ড্রু জ্যাকসন দুম্ করে কামড়ে ধরত অন্য কুকুরটার পেছন দিকের ঠ্যাঙ একটা আর একেবারে নট-নড়নচড়ন করে ঠেসে ধরে রাখত। নখ-টখের ব্যাপারই না—সোজাসুজি চেপে ধরে রাখত যতক্ষণ না তাকে জয়ী ঘোষণা করা হত—তা এ জন্য অ্যান্ড্রু জ্যাকসন অনন্তকাল চেপে ধরে রাখতেও পিছ্-পা ছিল না। এই অ্যান্ড্রু জ্যাকসন কুকুরটা হারেনি—হারতও না কখনও যদি না স্মাইলি আর একটা কুকুরকে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করত। এই কুকুরটার আবার পেছনের দুটি পা-ই ছিল না, একেবারে কেটে বরবাদ হয়ে গিয়েছিল একদা এক কাঠ চেরাইয়ের গোল করাতে, ফলে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল, কেননা, অ্যান্ড্রু জ্যাকসন তার প্রচলিত অভ্যাস অনুযায়ী একের পর এক সবই করে যাচ্ছিল—লোকেরা টাকাও ধরছিল তার উপর ক্রমবর্ধমানভাবে, আগেকার দিনগুলির মতই—তারপর এল সেই পেছনের ঠ্যাঙ কামড়ানোর সময়, কিন্তু সে এক মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারল তাকে কী দারুণই না ঠকানো হয়েছে, আর অন্য কুকুরটার কতখানি সুবিধে হয়েছে তার পেছনের পা-দুটি না থাকাতে, সে

তো ঐ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেছে বলে মনে হল, তারপরই সে একেবারে হতাশায় ভেঙে পড়ল, জিতবার সমস্ত আগ্রহ তার মন থেকে অন্তর্হিত হল, ফলে সে হেরে গেল নিদারুণ ভাবেই। সে স্মাইলির দিকে তাকালো এমন করুণভাবে —যেন সে বলতে চাইছিল তার হৃদয় একেবারে চূর্ণ হয়ে গেছে—এবং এর জন্য দায়ী স্মাইলিই, কেননা, যার পেছনের পা দুটোই নেই, তাকে সে চেপে ধরবে কোথায়! এমন কুকুরের সঙ্গে লড়াই বাধানোর ব্যবস্থা করে স্মাইলি মোটেই ঠিক কাজ করেনি। যুদ্ধের এহেন অবস্থায় চরম হতাশ হয়ে কুকুরটা দুর্বলভাবে কোনোক্রমে একটুখানি গিয়ে শুয়ে পড়ল, আর উঠল না। সেটাই হল তার শেষ শয্যা। অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন কুকুরটা দারুণ ছিল, সে বেঁচে থাকলে সে খুব নাম করতে পারত, কেননা জিতবার জন্য যা-যা দরকার সে-সবই তার ছিল, আমি জানি তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছিল—আসলে সে জীবনে তেমন সুযোগই পেল না, তা সত্ত্বেও সে—যতটুকু সুযোগ সে পেয়েছিল তারই মধ্যে যে রকম লড়াই করেছিল দারুণ প্রতিভা না থাকলে ওটুকু করাও তার পক্ষে সম্ভব হত না। তার শেষ লড়াইয়ের কথা মনে পড়লেই দুঃখে আমার হৃদয় ভরে ওঠে, বিশেষ করে শেষ পর্যন্ত অ্যাণ্ড্রু যে ভাবে মারা গিয়েছিল সেটা ভেবে।

তারপর শোনো—এ বছর স্মাইলি কয়েকটা খুদে কুকুর র‍্যাট-টেরিয়ার, মোরগ, হুলো বেড়াল, এই সব কোত্থেকে যোগাড় করল—কিন্তু কিছু হল না, অনেক পরিশ্রমের পরও কেউ ওদের উপর টাকা বাজি রাখতে রাজি হল না। তারপর একদিন সে কোত্থেকে একটা ব্যাঙ ধরে আনল। সেটাকে সে বাড়িতে নিয়ে গেল—বলল, ঐ ব্যাঙটাকে সে শিক্ষিত করে তুলবে—সে তো এই মাস-তিনেক হয়ে গেল। এই তিন মাস সে তার বাড়ির পেছনের বাগানে সব সময় ব্যাঙটাকে লাফানোর কলা-কৌশল শেখাতে তার সর্ব শক্তি ঢেলে দিল। আর সত্যি কথা বলতে কি ব্যাঙটা লাফানো শিখেছিল দারুণ। ও ব্যাঙটার পেছনে একটু গুঁতো দিলেই দেখা যেত পর-মুহূর্তে ব্যাঙটা শূন্যে উঠে পড়েছে যেন সেটা একটা ফুটন্ত খই। শূন্যে উঠে ব্যাঙ একটা ডিগবাজি খেত কখনও, সুযোগ পেলে দু-বারও ডিগবাজি দিয়ে দিত। সে মাটিতে এসে পড়ত স্বচ্ছন্দে, একেবারে যেন বেড়াল। সে ব্যাঙটাকে মাছি ধরা শেখাতো—একবার নয়, অসংখ্যবার। দেয়ালে মাছি আটকে রাখত অনেক উঁচুতে—তার চাইতে উঁচু হলে ব্যাঙ দেখতেই পেত না এমন উঁচুতে। স্মাইলি বলত, বুঝলে ভায়া, ব্যাঙদের দরকার সু-শিক্ষা, ঠিকমত শিক্ষা দিলে ব্যাঙ প্রায় সবই করতে পারে, কথাটা ঠিকই বলেছিল স্মাইলি—এই তো এই দোকানেই একবার হয়েছিল ব্যাপারটা, স্মাইলি ব্যাঙটাকে বলেছিল, ড্যানিয়েল, মাঁছি। মাছি !! আর সঙ্গে সঙ্গে বিরাট একটা লাফ দিয়ে ঐ অত উঁচু টেবিলের উপর থেকে মাছিকে মুখে করে আবার এসে নেমেছিল মেঝেতে থপ্ করে। আর কি

তার মুখের ভাব। সে এসে নেমে তার পেছনের পা দিয়ে মাথা চুলকে এমনভাবে তাকিয়ে রইল যেন ব্যাপারটা উল্লেখযোগ্যই নয় মোটে, যেন সব ব্যাঙই ওটা করে থাকে। ওরকম বিনয়ী এবং সরল-মন ব্যাঙ আর দুটি কোথাও পাবে না, বুঝলে, এমন ব্যাঙটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি! এরকম প্রতিভা আর কোনো ব্যাঙের হয় না। আর কি লাফানো—কেবল উঁচুর দিকে নয়, সামনা-সামনি মাটির উপর লাফিয়ে ও যতটা জায়গা অতিক্রম করতে পারে ঐ জাতের অন্য কোনো ব্যাঙের বাপের সাধ্যি নেই অতটা লাফানোর। স্মাইলি এই নিয়েই বাজি ধরত—লাফানোর আগে সে প্রাণপণ সংগ্রহ করত বাজির টাকা, বুঝলে ভায়া—আর এই ব্যাঙ নিয়ে স্মাইলির সে কি গর্ব! হবে নাই বা কেন, অমন ব্যাঙ কি সহজে মেলে নাকি কোথাও? আগেই বলেছি না, এমন ব্যাঙটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি? আমি কেন, অন্য সকলে যারা পৃথিবীর এদিক-ওদিক ঘুরেছে তারা পর্যন্ত বলত এমন ব্যাঙটির কোনো তুলনা নেই।

স্মাইলি ব্যাঙটাকে রাখত ছোট একটা জালি বাক্সে, সে কখনোসখনো ঐ বাক্সসমেত ব্যাঙটাকে শহরে নিয়ে আসত বাজির লড়াইয়ের জন্য। একদিন বাইরের একজন তাকে ঐ-রকম জালি-বাক্স আনতে দেখে জিজ্ঞেস করল. "হ্যাঁ-হে, তোমার ঐ বাক্সের মধ্যে কি আছে?" আর স্মাইলি তার স্বভাব মতো জবাব দিল, "তা এর মধ্যে একটা পায়রা থাকতে পারে, একটা ক্যানারি থাকলেও ক্ষতি ছিল না. কিন্তু রয়েছে মাত্র একটা ব্যাঙ।" তখন আগন্তুক বাক্সটা নিয়ে নিবিড় ভাবে দেখল, এদিক একবার ঘোরালো, অন্যদিকে একবার ঘোরালো—বেশ যত্নের সঙ্গে, তারপর বলল, "হুঃ ঠিকই তো, ব্যাঙই বটে, তা এর দ্বারা কি করা হয়?" স্মাইলি তখন খুব অবহেলা এবং অযত্নের সঙ্গে বলল, "সে একটিই কম্মো করতে পারে—সারা ক্যালাভিরাস কাউণ্টির যে কোনো ব্যাঙকে এ লাফানো প্রতিযোগিতায় গো-হারান হারাতে পারে। তখন ঐ লোকটি বাক্সটিকে নিয়ে আরও নিবিষ্টভাবে দেখে স্মাইলিকে ফেরত দিয়ে বলল, "দেখে তো মনে হচ্ছে না এই ব্যাঙ অন্য কোনো ব্যাঙের চেয়ে উৎকৃষ্ট!" তখন স্মাইলি বলল, "তা তোমার চোখে না পড়তেও পারে—তা এটাও হতে পারে ব্যাঙের বাপু তুমি কিছু বোঝ, আবার এটাও হতে পারে তুমি একেবারেই কিছু বোঝ না। আবার এও হতে পারে তুমি ব্যাঙ বিষয়ে অভিজ্ঞ, কিন্তু হতে এও পারে তুমি কিস্সু জানো না, তা সে যাই হক আমার ব্যাঙ নিয়ে একটা মত আমার আছে, আ আমার মতটাই যে ঠিক সেটা প্রমাণ করার জন্য আমি চল্লিশ ডলার বাজি রাখতে রাজি আছি।' তখন বাইরের লোকটি ব্যাঙটাকে আবার একটু দেখে দুঃখিত ভাবে বলল, আমি এ অঞ্চলে নতুন, আমার ব্যাঙ নেই। একটা ব্যাঙ থাকলে আমি অবশ্য বাজি ধরতাম।"

তখন স্মাইলি বললো কি শোনো—সে বলল, "ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে, তা তুমি এই বাক্সটা একটু ধরলেই আমি তোমার জন্য একটা ব্যাঙ ধরে আনব।" তখন লোকটা বাক্সটা ধরল—আর পকেট থেকে চল্লিশটি ডলার বার করে স্মাইলির চল্লিশ ডলারের উপর রাখল। এটা হল বাজির টাকা। তারপর সে অপেক্ষা করতে লাগল—বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ব্যাঙটাকে বার করে আনল—আর একটা চামচ দিয়ে তার মুখটাকে হাঁ করিয়ে ছোট ছোট শিসের গুলি ভরে দিতে লাগল—আর একটা দুটো নয় অনেক-গুলো, গুলিগুলো প্রায় তার পেট ভর্তি হয়ে গলা পর্যন্ত যেন এসে ঠেকল। তারপর তাকে মেঝের উপর বসিয়ে দিল, এদিকে স্মাইলি জলার ধারে গিয়ে অনেক খুঁজেও ব্যাঙ পাচ্ছে না, কাদায় পা ডুবে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাঙ আর পাওয়া যায় না—শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা ব্যাঙ ধরে ফেলে সে সেটাকে এনে আগন্তুকের হাতে দিল। তারপর বলল, "বেশ এবারে লড়াই শুরু হতে পারে, লাফানোর লড়াই। যদি তুমি প্রস্তুত থাকো তাহলে ড্যানিয়েলের পাশে ঐ ব্যাঙটাকে বসাও যাতে দুজনের সামনের পা দুটি এক লাইনে থাকে, তারপর আমি বললে খেলা শুরু হবে।" তারপর বলল—"এক·· দুই···তিন·· লাফাও!" একই সঙ্গে স্মাইলি আর অন্য লোকটি তাদের নিজেদের ব্যাঙের পেছনে থাবড়া মারল—নতুন ব্যাঙটা সঙ্গে সঙ্গে লাফালো, কিন্তু ড্যানিয়েল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল একটা আর কাঁধ দুটো ঝাঁকালো ঠিক একজন ফরাসী ভদ্রলোকের মতো, কিন্তু লাভ হল না তাতে—সে একটুও এগুতে পারল না—সে বসে রইল অনেকটা কামারশালার বড় লোহার মত দৃঢ় ভাবে। নোঙর ফেলা জাহাজের মতো সে অনড় হয়ে রইল। এই ব্যাপার দেখে স্মাইলির বিস্ময়ে বাক্য সরল না, বিরক্তও সে কম হল না, কিন্তু সে তো কিছুতেই বুঝতে পারল না ব্যাপারটা কি হল।

আগন্তুক টাকা নিয়ে পকেটে পুরলো, তারপর চলতে শুরু করল—তারপর সে যখন দরজা পর্যন্ত গিয়েছে তখন সে তার বুড়ো আঙুল কাঁধের উপর এনে ড্যানিয়েলের দিকে তাগ্ করে বলল, "ঐ ব্যাঙটার এমন কিছু বিশেষত্ব আছে বলে তো আমার মনে হয় না, ওটা অন্য যে-কোনো ব্যাঙের মতই, অতি সাধারণ!"

স্মাইলি আর কি করে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা চুলকোতে লাগল—একটু হতবুদ্ধির মতো তাকিয়ে রইল দীর্ঘকাল, অবশেষে সে বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না ব্যাঙটা একদম অচল হয়ে পড়ল কেন—ওর কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়, ওটাকে দেখে বেশ হোঁত্কা-হোঁত্কা মনে হচ্ছে।" তারপর স্মাইলি ড্যানিয়েলের ঘাড় ধরে তুলে বলল, "ওরে শালা! এটার ওজন দেখি দু কেজির মত মনে হচ্ছে!" তারপর ব্যাঙটাকে উপুড় করে ধরতেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রায় দু-মুঠো শিসের গুলি। তখন সে বুঝতে পারল কি ভাবে তাকে ঠকানো

হয়েছে—সে রেগে অগ্নিশর্মা হল, বলাই বাহুল্য—সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙটাকে মেঝেতে রেখে ছুটলো সেই ঠগ্‌টার পেছনে, কিন্তু ধরতে পারেনি তাকে। তারপর—

এই সময় কে যেন বাইরে থেকে সাইমন হুইলারকে ডাকল, তখন তাকে কে ডাকছে, কেনই বা ডাকছে দেখবার জন্য উঠে দাঁড়াল। বাইরে যেতে যেতে সাইমন আমাকে বলল, বসে থাকো যেখানে বসে আছ—আমি এক্ষুনি আবার আসছি।

আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, কেননা, চালাক-চতুর, ভবঘুরে জিম স্মাইলির গপ্পোকথা শুনবার আমার আর বিন্দুমাত্র স্পৃহা ছিল না, আসলে, রেভারেণ্ড লিওনিডাস ডবলিউ স্মাইলির সম্পর্কে যাই শুনি না কেন, তাতে জিম স্মাইলি সম্পর্কে এক বিন্দুও আমার জ্ঞানলাভ হত না। আর সেই কারণেই, সেখানে আর অপেক্ষা না করে আমি সরে পড়তে যেতেই দরজায় হুইলারের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়ে গেল। সে তক্ষুনি আমাকে আটকে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলঃ "তারপর কি হল শোনো, এ বচ্ছর স্মাইলি একটা কানা গরু যোগাড় করেছিল যেন কোত্থেকে, তার ল্যাজও ছিল না—একেবারে ছিল না তা না, একটা কলার মত একটুখানি ল্যাজ ছিল—তারপর হল কি···।

"যাক্‌গে, মরুক্‌গে, গোল্লায় যাক্ স্মাইলির গরু !" আমি বেশ নরম করেই বললাম, তারপর ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে এলাম।

মাতা মেরীর বাজীকর

আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-১৯২৪)

রাজা লুইয়ের সময়ে বারনাবাস নামে এক গরিব বাজীকর ছিল। এই গ্রাম্য মানুষটি শহরে শহরে ঘুরে তার কলাকৌশলপূর্ণ ভোজবাজী দেখিয়ে বেড়াতো।

রোদ ঝলমলে দিনগুলোয় চৌরাস্তায় সে তার জীর্ণ পুরোনো কার্পেট বিছিয়ে মজাদার বোলচাল ছুঁড়ে ছেলেমেয়ের দঙ্গল আর ভবঘুরে লোকজন জড়ো করে ফেলত। এক বুড়ো বাজীকরের কাছে যেমন শিখেছিল সেই কথা-গুলোই একটা শব্দও এদিক-ওদিক না করে সে আউড়ে যেত আর সেই সঙ্গে বিচিত্র ভঙ্গিতে নাকের ডগায় ডিশ রেখে দাঁড়াতো। জনতা প্রথমটা তাকে তেমন আমল দিত না। কিন্তু সে যখন শীর্ষাসনের কায়দায় মাটিতে মাথা রেখে শুধু দুটো পায়ের সাহায্যে ছ-ছটি তামার গোল্লা নিয়ে লোফালুফি করত আর সূর্যের আলোয় সেগুলো ঝলকাতো কিংবা যখন শরীরটাকে উলটে ধনুকের মত বাঁকিয়ে গোড়ালির সঙ্গে গলা ছুঁইয়ে পুরো দস্তুর একটা চাকা বনে যেত এবং সেই অবস্থায় এক ডজন ছুরি নিয়ে খেলা দেখাতো তখন তার দর্শকরা মুগ্ধ তারিফের সঙ্গে পয়সা-টয়সা বৃষ্টির মত ছুঁড়ে দিত তার পেতে রাখা কার্পেটের ওপর।

তবু নিজের শ্রমে বেঁচে থাকা মানুষের মতই বারনাবাসকেও একেক সময় রুটি জোটাতে রীতিমত মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হত। পিতৃপুরুষ আদমের ভুলের মাশুলের দায়ভাগী আমাদের তুলনায় তাকে কিঞ্চিৎ বেশীই কৃচ্ছ্রসাধন করতে হত পেটের ভাত জোটাতে।

তাছাড়া যতটা সে পরিশ্রম করতে চাইতো ততটা তার পক্ষে সম্ভব হত না। কারণ ওই নিপুণ কলাকৌশল দেখাতে গাছপালার মত তারও প্রয়োজন হত রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের উষ্ণতা। শীতের সময়ে নিষ্পত্র বৃক্ষের মতই সে হয়ে পড়তো বস্তুতপক্ষে অর্ধমৃত। বরফঠাণ্ডা মাটি বাজীকরের পক্ষে ছিল খুবই কঠিন ঠাঁই। মন্দ ঋতুতে সে শীতে আর ক্ষিধের জ্বালায় কষ্ট পেত। কিন্তু সরলপ্রাণ মানুষটি এসবই নীরবে সয়ে যেত।

অনুবাদ : আনন্দ বাগচী

ধনদৌলতের উৎস আর মানবিক অবস্থার অসাম্য নিয়ে সে কখনোই মাথা ঘামায়নি। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই জীবন দুর্ভাগ্যজনক হলেও পরবর্তী জীবন কখনো ভাল ছাড়া মন্দ হতে পারে না। আর এই বিশ্বাসই তাকে খাড়া রেখেছিল। চতুর লোকদের মত সে নিজের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিকিয়ে দেয়নি। অকারণে তো সে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতো না, একজন সৎ মানুষের জীবনই সে যাপন করতো। নিজের স্ত্রী ছিল না, তবু প্রতিবেশীদের স্ত্রীর প্রতি সে আসক্তির চোখে তাকায়নি। বাইবেলের সামসনের কাহিনী থেকেই এটা স্পষ্ট যে নারী হচ্ছে শক্তিমান পুরুষের শত্রু।

বস্তুত, দৈহিক সুখের দিকে তার মন ঝোঁকেনি! নারী-সম্ভোগের আনন্দের চেয়ে মদ্যপান ত্যাগ করতেই তাকে বেশী যন্ত্রণা পেতে হয়েছে। কারণ মদ্যপ না হলেও চমৎকার দিনগুলোয় মদ্যপান সে উপভোগই করতো। সে ছিল ঈশ্বর-ভীরু ভালোমানুষ, কুমারী মেরীর প্রতি ছিল তার সনিষ্ঠ শ্রদ্ধা। গীর্জায় গেলে তাঁর মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে সে এই প্রার্থনাটি উচ্চারণ করতে কখনো ভুলতো না—'দেবী, ঈশ্বরেচ্ছায় যে পর্যন্ত না আমার মৃত্যু হয় তুমি আমার জীবনের প্রতি দৃষ্টি রেখো। তারপর মৃত্যু হলে দেখো যেন স্বর্গের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হই।'

দিনভর বৃষ্টির পর এক সন্ধেবেলায় সে পুরনো কার্পেটে জড়ানো তার খেলার বল আর ছুরিগুলো বগলে নিয়ে বিষন্ন মনে কুঁজো হয়ে হেঁটে চলেছিল। রাতের খাওয়া জোটেনি, না জুটুক, একটা আস্তানা তো চাই, তাই শোবার জন্যে খড়ের গাদা খুঁজছিল সে। এমন সময় দেখতে পেল এক ভিক্ষু সন্ন্যাসীও একই দিকে চলেছেন। বারনাবাস সসম্ভ্রমে তাঁকে নমস্কার জানালো। পাশাপাশি চলতে চলতে দুজনের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল।

'বন্ধু,' ভিক্ষু বললেন, 'তোমার গায়ে এরকম সবুজ পোশাক কেন? তুমি কি কোন যাত্রার পালায় বোকার পার্ট করতে যাচ্ছ?'

'মোটেই না ফাদার।' সে উত্তর দিল, 'আমার নাম বারনাবাস। ভোজবাজীর খেলা দেখানোই আমার কাজ। আমি যদি প্রতিদিন খেতে পেতাম তাহলে এটাই হত দুনিয়ার শুদ্ধতম জীবন যাপন।'

'বন্ধু বারনাবাস!' সন্ন্যাসী বললেন, 'কী বলছ তুমি! সন্ন্যাসীর জীবন ছাড়া কোন শুদ্ধতর জীবন নেই। পুরোহিত ঈশ্বরের, কুমারী মাতা ও সন্তদের উপাসনার অনুষ্ঠান করেন। ভিক্ষুর জীবন হচ্ছে প্রভুর চিরন্তন স্তব বিশেষ।'

বারনাবাস বলল, 'ফাদার, আমি স্বীকার করছি আমি অজ্ঞ লোকের মতই কথা বলেছি। আপনাদের সঙ্গে আমার অবস্থার তুলনাই চলে না। কসরৎ দেখানোয় কিংবা নাকের ডগায় লাঠি দাঁড় করিয়ে তার ওপরে দিনার রেখে খেলা দেখানোর মধ্যে যদিই বা কিছু গুণপনা থেকে থাকে তা অবশ্যই আপনার

উৎকর্ষের সঙ্গে তুলনায় আসে না। ফাদার, আমার ইচ্ছে করে আমি আপনার মতই প্রতিদিন গির্জার উপাসনায় বিশেষ করে সেই পবিত্র কুমারীর নাম গান করতে পাই কারণ ধর্মত আমি তাঁর প্রতি মনে প্রাণে সমর্পিত। মঠের এই ধার্মিক জীবনে প্রবেশ করার জন্যে আমি আমার এই জাদুবিদ্যা ছেড়ে দিতে রাজী আছি যা আমাকে প্রায় শ-ছয়েকের বেশী গ্রাম এবং শহরের মানুষের কাছে পরিচিত করেছে।'

জাদুকরের সরলতায় সন্ন্যাসী মুগ্ধ হলেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তিনি বারনাবাসকে সেই স্থিতধী মানুষদের একজন বলে চিনতে পারলেন স্বয়ং প্রভু যাঁদের সম্পর্কে বলে গেছেনঃ পৃথিবীতে এদের হৃদয়ে শান্তি বিরাজ করুক। আর তাই তিনি বললেন, বন্ধু বারনাবাস, তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি যে মঠের অধ্যক্ষ সেখানে তোমার যাতে জায়গা হয় সে ব্যবস্থা আমি করবো। মিশরের মেরীকে যে ঈশ্বর মরুভূমির ভেতরে পথ দেখিয়েছিলেন তিনিই তোমার সামনে আমাকে এনে দিয়েছেন যাতে আমি তোমাকে শান্তির পথে নিয়ে যেতে পারি।'

এভাবেই বারনাবাস সন্ন্যাসীতে রূপান্তরিত হল। যে মঠে সে স্থান পেল সেখানে সন্ন্যাসীরা খুব আড়ম্বরের সঙ্গে স্বর্গীয় কুমারীর উপাসনা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতেন। প্রত্যেকেই নিজের ঈশ্বরদত্ত জ্ঞান ও দক্ষতা তাঁর সেবায় নিবেদন করতেন।

মঠপ্রধান নিজে এই কর্মকৃত্য পালন করতেন শাস্ত্রবিধিমতে দেবমাতার প্রশস্তিসূচক বই লিখে। ব্রাদার মরিস সেই স্তবগুলিকে সুনিপুণ হস্তাক্ষরে তুলট কাগজের পৃষ্ঠায় নকল করে দিতেন। আর ব্রাদার আলেকজাণ্ডার সেই পৃষ্ঠাগুলিকে সুন্দর করে অলঙ্করণ করতেন। তিনি আঁকতেন পদতলে চারটি সিংহপ্রহরী সমেত সলোমনের সিংহাসনে বসা স্বর্গের রানীর ছোট ছোট ছবি। জ্যোতির্বলয়ে ঘেরা যাঁর মাথার চারপাশে সাতটি উড়ন্ত পারাবত—সাতটি ঐশী উপহার—ভয়, করুণা, বিদ্যা, শক্তি, বিচার, বুদ্ধি ও জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে ছ জন সোনালী চুলের কুমারী মূর্তিঃ নম্রতা, বিচক্ষণতা, অবসর, শ্রদ্ধা, সতীত্ব ও বাধ্যতা। দেবীর পায়ের কাছে সম্পূর্ণ নগ্ন ও শুভ্রোজ্জ্বল দুটি ক্ষুদ্রকায় মূর্তি প্রার্থনা জানানোর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। অকারণে নয়, এই দুটি আত্মা মুক্তির জন্য দেবীর সর্বশক্তিমান কৃপা ভিক্ষা করছে। অপর এক পৃষ্ঠায় দেখা যাবে আলেকজাণ্ডার মেরীর সামনে ঈভের পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থিতি এঁকেছেন—একই সঙ্গে পাপ ও তার প্রায়শ্চিত্ত, নারীর অবনতি ও কুমারীর সমুন্নতি। ওই বইয়ের অন্যান্য দামী ছবিগুলির মধ্যে ছিল জীবন্ত জলের কুয়ো, ফোয়ারা লিলিফুল, চাঁদ, সূর্য, গীর্জার গীতগাথায় বহুকথিত নিরুদ্ধ উদ্যান। স্বর্গদ্বার এবং ঈশ্বরের নগরী। এগুলি সবই ছিল কুমারী মেরীর ছবি।

ব্রাদার মারবোডও মেরীর স্নেহভাজন সন্তানদের একজন। তিনি সমস্তক্ষণই পাথর খোদাই করে মূর্তি বানানোয় এমন ব্যস্ত থাকতেন যে তাঁর দাড়ি আর ভুরু পাথরের গুঁড়োয় সাদা হয়ে থাকতো, চোখ দুটো সব সময় ফোলা ফোলা আর জলে ভর্তি। কিন্তু তিনি সেই বার্ধক্যেও ছিলেন কর্মঠ ও সুখী ব্যক্তি। কোন সন্দেহ ছিল না, স্বর্গের রানী তাঁর এই শিশুটির জীবনের শেষের দিনগুলিতে সজাগ নজর রেখেছিলেন। মারবোড দেবীর মঞ্চাসীন মূর্তিকেই রূপায়িত করে তুলেছিলেন। জ্যোতির্বলয় ঘেরা কপালে মুক্তামালা।

এ-ছাড়াও মঠে কবিরা ছিলেন। পরম করুণাময়ী কুমারী মেরীর সম্মানে তাঁরা ল্যাটিন ভাষায় গদ্যপ্রশস্তি আর গীত রচনা করেছিলেন। পিকার্ড তাঁদের মধ্যে অবশ্যই একজন, যিনি আমাদের মহীয়সী মহিলার অলৌকিক কাহিনীকে চলতি মুখের ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

মহিমাকীর্তনের এত বড় প্রতিযোগিতা আর তার এমন সুচারু রূপায়ণ লক্ষ্য করে বারনাবাস নিজের অজ্ঞতায় ও সাধারণত্বে মনে মনে আক্ষেপ না করে পারে না। মঠের প্রাচীর ঘেরা ছোট্ট বাগানে বেড়াতে বেড়াতে সে দুঃখের সঙ্গে স্বগতোক্তি করে, 'এই পবিত্র মাতৃদেবীকে আমি তো অন্তরের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছি, তবু মঠের অন্য ভাইদের মত আমি কেন যে তাঁর যোগ্য বন্দনা রচনা করতে পারি না। হায়, পারি না বলেই আমি এত অসুখী! হায় দেবী, আমি তোমার উপাসনায় অক্ষম এক শিল্পক্ষমতাহীন মূর্খ লোক, আমার না আছে কোন আধ্যাত্মিক বক্তব্য, না আছে শাস্ত্রানুশীলিত কোন সুন্দর রচনা। মনোহারি চিত্রকর্ম, সুদক্ষ ভাস্কর্য কিংবা নির্ভুল ছন্দোবদ্ধ কবিতা— হায়রে কপাল, কিছুই নেই আমার।

এই ভাবে বিলাপ করতে করতে নিজেকে সে বিষাদমগ্ন করে ফেলেছিল।

এক সন্ধ্যায় সন্ন্যাসীরা যখন প্রসঙ্গ বদলের জন্য নিজেদের মধ্যে অন্য বিষয়ে কথা বলছিলেন, তার সে শুনতে পেল একজন অন্য এক সাধুর বিষয়ে কিছু বলছেন। ওই সাধুটি নাকি 'জয় মেরী' ছাড়া অন্য কিছুই আবৃত্তি করতে পারতেন না। এই অক্ষমতার জন্যে তিনি তিরস্কৃতও হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মুখ থেকে পাঁচটি গোলাপ ফুলের জন্ম হয়েছিল ইংরেজী মারিয়া শব্দের পাঁচটি অক্ষরের বন্দনায়। এর ফলে তাঁর পবিত্রতা, তাঁর সিদ্ধি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল।

এই গল্প শোনার পর বারনাবাস কুমারী মেরীর করুণা বিষয়ে আরও একবার সচেতন হল কিন্তু এই আনন্দজনক অলৌকিক উদাহরণে শান্তি পেল না, কারণ আবেগতাড়িত হৃদয়ে সে নিজেও চাইছিল স্বর্গীয় দেবীর গরিমা উদ্‌যাপন করতে।

আর সেই উদ্দেশ্যেই সে একটা পথ, একটা উপায় খুঁজে মরছিল। কিন্তু বৃথাই। প্রতিটি দিনই তাকে আরও দুঃখিত করে তুলছিল। ব্যর্থতায় ভারাক্রান্ত

করছিল। শেষে এক সকালে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে সে গির্জায় ছুটে গেল। ঘণ্টাখানেকের বেশী একা একা সেখানে কাটিয়ে আহারের জন্যে ঘরে ফিরল। তারপর আহারান্তে আবার সেখানে, সেই ভজনকক্ষে। সেদিনের পর থেকে প্রতিদিন। যে মুহূর্তে সে একলা হয়ে যেত, অন্যান্য ভিক্ষুসাধকরা তাঁদের সংস্কারমুক্ত শিল্প-বিজ্ঞানের অভীষ্ট লাভের জন্যে সাধনমগ্ন হতেন, সেই সময়ের অধিকাংশই বারনাবাস এই ভাবে কাটিয়ে দিত। আর সে দুঃখিত নয়, আর সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে না।

কিন্তু তার এই বিচিত্র আচরণে ক্রমে ভিক্ষুদের মনে কৌতূহল জাগল। প্রায়ই দলছুট হয়ে বারনাবাস একা একা কি করে তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে জল্পনা চলল। অন্য সন্ন্যাসীরা কে কি করছেন তার খোঁজখবর রাখা যাঁর দায়িত্ব, সেই মঠ-প্রধান স্থির করলেন লোকটার ওপর নজর রাখতে হবে। তাই একদিন, বারনাবাস যখন একা ভজনকক্ষে ঢুকেছে, তিনি দুজন সবচেয়ে বর্ষীয়ান সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেলেন ঘরের ভেতরে কি হচ্ছে।

কুমারী মাতার মূর্তির সামনে বারনাবাসকে তাঁরা দেখতে পেলেন। মাটিতে মাথা আর শূন্যে পা রেখে সে ছটা তামার গোলা আর বারোটা ছুরি নিয়ে বাজীর খেলা দেখিয়ে চলেছে। যে ক্রীড়ানৈপুণ্য একদা তাকে খ্যাতির চূড়ায় তুলেছিল, পবিত্র মেরীর সম্মানে সেই খেলাই সে দেখাচ্ছে। বারনাবাস যে তার চূড়ান্ত দক্ষতাকেই মেরীর উপাসনায় নিবেদন করে চলেছে তা বুঝতে না পেরে সেই বয়স্ক মঠভ্রাতা দুজন এই অপবিত্র কাজ থেকে তাকে নিরস্ত করার জন্যে চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু প্রধান সন্ন্যাসী জানতেন বারনাবাস সরলাত্মা, নিষ্পাপ, কিন্তু লোকটার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে তাতে তাঁর সন্দেহ থাকল না। তিন সন্ন্যাসী তখন বারনাবাসকে ভজনকক্ষ থেকে বার করে দিতে যেই না এগিয়েছেন অমনি দেখতে পেলেন এক অভাবনীয় দৃশ্য। জননী মেরী ধীর পায়ে তাঁর বেদী থেকে নেমে এসে তাঁর নীল আলখাল্লার প্রান্ত দিয়ে বাজীকরের কপালের ফুটে ওঠা স্বেদবিন্দু মুছে দিচ্ছেন।

মঠ-প্রধান তখন নতজানু হয়ে সেই মার্বেল পাথরের মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে এই দুটি কথা উচ্চারণ করলেন :

'পবিত্র হৃদয় তাঁর আশীর্বাদধন্য, কারণ তারাই ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।'

'আমেন।' মেঝেয় প্রণাম করতে করতে সন্ন্যাসী ভ্রাতারা প্রতিধ্বনি করলেন।

জনৈক বৃদ্ধ

গী দ্য মোপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩)

সমস্ত সংবাদপত্রেই এই বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল ঃ

সর্বসুবিধাযুক্ত দীর্ঘ অবকাশ যাপন অথবা স্থায়ী বসবাসের জন্য রঁদেলির নতুন খনিজ নির্ঝর আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এখানকার লৌহসমৃদ্ধ জল সারা বিশ্বে অদ্বিতীয়, রক্তদূষণের মোকাবিলা করতে যার খ্যাতি আছে। আর আছে মানুষকে দীর্ঘজীবী করার এক অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা। ফার অরণ্যের মাঝখানে পার্বত্য এলাকার নিরালে বিজনে ছোট্ট শহরটির মনোরম পরিবেশে চলে আসুন। কয়েক শতাব্দী যাবৎ এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, এখানকার মানুষ অসাধারণ পরমায়ুর অধিকারী।

দলে দলে লোক ছুটল সেখানে।

একদিন সকালে ওখানকার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের ডাক পড়ল এক নবাগত ভদ্রলোকের বাড়িতে। ভদ্রলোকের নাম মঁসিয়ে দারোঁ। কদিন আগেই তিনি এসেছেন, বনের ধারে ভাড়া নিয়েছেন চমৎকার একটি বাড়ি। ছিয়াশি বছরের ছোটখাটো মানুষটি, কিন্তু এই বয়েসেও যথেষ্ট প্রাণবন্ত, কষ্টসহিষ্ণু, স্বাস্থ্যবান এবং কর্মঠ। বয়স লুকনোর জন্য অশেষ কষ্ট-কসরত করতে হয় তাঁকে।

তিনি ডাক্তারকে একটি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। তারপর সরাসরি কথাবার্তা শুরু করলেন।

বললেন, 'শোনো ডাক্তার, যদি আমি সুস্বাস্থ্যের মালিক হই তবে তা সংযত জীবনযাপনের দৌলতে। যদিও খুব বুড়ো আমি নই, তবু সমীহ করার মতো একটা বয়েস তো হয়েছেই। অথচ আমার কোনো অসুখ-বিসুখ নেই, এমনকি সামান্য শরীরখারাপও করে না। তোমরা বলছ এখানকার জল-হাওয়া দারুণ স্বাস্থ্যকর। আমি এটা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করছি। কিন্তু এখানে স্থায়ী আস্তানা গাড়ার আগে আমি প্রমাণ চাই। তাই তোমাকে অনুরোধ করছি, সপ্তাহে একদিন তুমি আমার এখানে এসো, আমাকে এইসব তথ্য সবিস্তারে জানাও।

'সর্বপ্রথমে আমি এই শহরের এবং আশপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে যাদের বয়েস আশির বেশি, তাদের একটি পূর্ণ তালিকা—যাকে বলে একেবারে

অনুবাদ : রঞ্জন ভাদুড়ী

সুসম্পূর্ণ তালিকা পেতে ইচ্ছুক। তাদের প্রত্যেকের কিছু কিছু দৈহিক ও শারীরবৃত্তীয় বিবরণও আমার জানা দরকার। তাদের পেশা, তাদের জীবন-যাত্রাপ্রণালী, তাদের অভ্যেস —এগুলোও আমি জানতে ইচ্ছুক। তারা কেউ মারা গেলে তুমি দয়া করে আমাকে খবর দেবে ; কী কারণে কী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হল সেটাও সংক্ষেপে বলবে।'

এর পর তিনি সহাস্যে তাঁর বলিরেখাকুঞ্চিত ছোট্ট হাতখানা ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ডাক্তার, আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম, আশা করি আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে।'

ডাক্তার তাঁর করমর্দন করলেন এবং সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন তাঁকে।

মঁসিয়ে দারেঁা সর্বদা মৃত্যুভয়ে আচ্ছন্ন থাকতেন' প্রায় কোনরকম পার্থিব আনন্দ-ফুর্তির ধারেকাছে তিনি ঘেঁষতেন না, কারণ তিনি ওসব বিপজ্জনক মনে করতেন। তিনি মদ্যপান করেন না বলে যখনই কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে বলত, 'সে কী মশাই, যা খেলে মনপ্রাণ চাঙ্গা হয়, মানুষ স্বপ্নরাজ্যে চলে যায়—' তিনি তৎক্ষণাৎ অাঁতকে উঠে তাকে থামিয়ে দিতেন, 'আমার জীবনটাকে মূল্য দিই আমি।' 'আমার' শব্দটির উপর তিনি বেশ জোর দিতেন, যেন তাঁর জীবনের—শুধু তাঁরই জীবনের বিশেষ একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। যেন সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর জীবনের বিস্তর ফারাক—এ ব্যাপারে প্রতিবাদের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

সম্বন্ধসূচক 'আমার' সর্বনামটির উপর গুরুত্ব আরোপের ব্যাপারে তাঁর একটা নিজস্ব বিশেষ পদ্ধতি ছিল। যখন তিনি বলতেন, 'আমার চোখ, আমার পা, আমার বাহু, হাত' তখন এ-বিষয়ে ভুল করার উপায় থাকত না যে, তাঁর ওই ইন্দ্রিয়গুলি যার-তার ইন্দ্রিয়ের মতো নয়। তিনি যখন তাঁর ডাক্তারের প্রসঙ্গে কথা বলতেন তখন এই স্বাতন্ত্র্যবোধ আরও লক্ষণীয় হয়ে উঠত। যখন তিনি বলতেন, 'আমার ডাক্তার', তখন লোককে ভাবতে হত ওই ডাক্তার একমাত্র তাঁরই, শুধুমাত্র তাঁর জন্যই পূর্বনির্দিষ্ট। যেন তাঁর অসুখেই তিনি চিকিৎসা করেন শুধু, এবং কোনোরকম ব্যতিক্রম ব্যতিরেকেই তিনি পৃথিবীর অন্যান্য ডাক্তারদের চেয়ে সেরা

অন্য মানুষজন তাঁর চোখে ছিল ছাঁচের পুতুল, যাদের শুধু পৃথিবীর শূন্যস্থান পূরণের জন্যই গড়া হয়েছে। তিনি তাদের দুটো ভাগে ভাগ করে-ছিলেন : এক দলের সংস্পর্শে এসে কিছু সুযোগ-সুবিধে পেয়েছিলেন, তাদের তিনি শুভেচ্ছা জানিয়ে সম্ভাষণ করতেন ; আর-এক দলের প্রতি এ-ব্যাপারে বিমুখ ছিলেন। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর মানুষই তাঁর কাছে সমান অকিঞ্চিৎকর ছিল।

যাই হোক, যেদিন রুঁদেলির ডাক্তার তাঁকে শহরের সতেরো জন অশীতিপর

বাসিন্দার এক তালিকা এনে দিলেন, সেদিন থেকে তিনি হৃদয়ে এক নতুন ভাবনার দোলা অনুভব করতে লাগলেন। মনে তাঁর এক অপরিচিত উৎকণ্ঠা সেইসব বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জন্যে, যাদের সঙ্গে একের পর এক তিনি পথের ধারে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের বাসনা আদৌ তাঁর ছিল না, কিন্তু তাদের শরীর-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তিনি একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলেছিলেন। প্রতি বৃহস্পতিবারে ডাক্তারের সঙ্গে আহারে বসে তিনি শুধু তাদের কথাই আলোচনা করতেন। বলতেন, 'আচ্ছা ডাক্তার, আজ জোসেফ পয়েনকো কেমন আছে? আমরা গত সপ্তাহে তাকে সামান্য অসুস্থ দেখে এসেছি।' ডাক্তার যখন রোগীর স্বাস্থ্যবিবরণ দিতেন, মঁসিয়ে দারেঁা তখন তাঁকে বিজ্ঞের মতো নানা পরামর্শ দিতেন। যেমন বলতেন, রোগীর পথ্য, তাকে নিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তার চিকিৎসাপদ্ধতি বদলানো দরকার। অপরের ক্ষেত্রে এসব করে সুফল পাওয়া গেলে তিনি পরে তাঁর প্রতিও এগুলো প্রয়োগ করতে পারেন। ওই সতেরো জন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যেন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার গবেষণাগার হয়ে উঠেছিল, যেখানে তিনি অনেক কিছু শিখেছিলেন।

এক সন্ধ্যায় ডাক্তার ঘরে ঢুকেই ঘোষণা করলেন, 'রোসেলি তুর্নেল মারা গেছেন।'

মঁসিয়ে দারেঁা চমকে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছিল?'

'খুব ঠাণ্ডা লেগেছিল।'

খর্বাকৃতি বৃদ্ধ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'মহিলা অত্যন্ত মোটা আর ভারী ছিলেন, নিশ্চয়ই খুব বেশি খেতেন। আমার যখন ওঁর বয়েস হবে আমি আমার ওজন সম্পর্কে আরও সচেতন হব।' (রোসেলি তুর্নেলের চাইতে তিনি দু' বছরের বড় ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের বয়স সত্তর বলে চালাতেন।)

কয়েক মাস পরে হেনরি ব্রিসো মারা গেলেন। মঁসিয়ে দারেঁা ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। এবারে যে লোকটি চলে গেল সে শুধু রোগাপাতলাই ছিল না, তাঁর চেয়ে তিন মাসের ছোটও ছিল। শরীর-স্বাস্থ্যের যত্নও ছিল তার। মঁসিয়ে দারেঁা ডাক্তারকে কোনো প্রশ্ন করতে সাহস পেলেন না, উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলেন ডাক্তারের মুখ থেকে বিস্তারিত শোনার অপেক্ষায়।

'ওহো, তাহলে তার মৃত্যুটা তুমি বলতে চাইছ নেহাতই আকস্মিক। কিন্তু গত সপ্তাহেও দেখেছি সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। আমার মনে হয়, ডাক্তার, সে নির্ঘাত কিছু গড়বড় করে বসেছিল।'

ডাক্তার ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছিলেন। বললেন, 'আমার তা মনে হয় না। তাঁর ছেলেমেয়েদের কাছে শুনেছি, তিনি খুব সাবধানে থাকতেন।'

এর পর আর থাকতে না পেরে মঁসিয়ে দারো ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু—কিন্তু—তাহলে কিসে মারা গেল সে?'

'প্লুরিসিতে।'

খর্বাকৃতি বৃদ্ধ বিশুদ্ধ আনন্দে তাঁর শুষ্ক হাতে তালি বাজালেন।

'আমি তোমাকে বললাম না! বললাম, কিছু-একটা গড়বড় করেছিল। শুধুমুধু তোমার প্লুরিসি হতে পারে না। খাওয়াদাওয়ার পর নিশ্চয়ই সে হাওয়া খেতে বাইরে বেরুত, এই করে নিশ্চয়ই বুকে ঠাণ্ডা বসিয়েছিল। প্লুরিসি! এটা আবার একটা অসুখ নাকি! এটা একটা দুর্ঘটনা। বোকারাই শুধু প্লুরিসিতে মরে।'

অতঃপর তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর আহার সারলেন। যারা মারা গেছে, খেতে বসে তাদের সম্বন্ধে আলোচনাও হতে থাকল।

'আর মাত্র পনেরোজন থাকল এখন। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই তাগড়াই এবং দিলখোলা, তাই নয় কি? মানবজীবনের ধর্মই এই: কমজোরিরা আগে মরে। যাদের বয়েস তিরিশের ঊর্ধ্বে, ষাটে পৌঁছুনোর একটা ভাল সুযোগ রয়েছে তাদের। ষাট পেরিয়ে যায় যারা, তারা প্রায়ই আশি ধরে ফেলে। আর যারা আশিও পেরিয়ে যায় তারা প্রায় সর্বদাই শতায়ু হবার জন্যে বেঁচে থাকে, কারণ তারা অপরের চেয়ে যোগ্য, শক্ত ও বিচক্ষণ।'

সেই বছরেই আরও দুজন মারা গেল, একজন আমাশায় এবং আর-একজন অজ্ঞান অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে। মঁসিয়ে দারো প্রথমোক্ত লোকটির মৃত্যুতে খুবই মজা পেলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, আগের দিন লোকটি নিশ্চয়ই কোনও উত্তেজক খাবার-টাবার খেয়েছিল।

'আমাশা হচ্ছে অসাবধান লোকদের অসুখ! গোল্লায় যাক। কিন্তু ডাক্তার, লোকটার খাওয়াদাওয়ার প্রতি তোমার একটু নজর রাখা উচিত ছিল।'

যে-লোকটি বেহুঁশ হয়ে দম আটকে মারা গেছে, তাঁর মতে তার মৃত্যুর কারণ হৃদ্‌যন্ত্রের খারাপ অবস্থা, যা এতদিন খেয়াল করা হয়নি।

এক সন্ধ্যায় ডাক্তার পল তিমোনে নামে একজনের মৃত্যু-সংবাদ জানালেন। এই মমির মতো শুষ্ক লোকটি একশো বছর পর্যন্ত টিঁকে যাবেন এমন একটা আশা করা হয়েছিল এবং তাতে খনিজ ঝরনাটির বিজ্ঞাপনও হত।

যখন মঁসিয়ে দারো তঁার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্‌ রোগে তিনি মারা গেলেন?' ডাক্তার উত্তর দিলেন, 'মাফ করুন, সত্যিই আমি কিছু জানি না।'

'জানো না মানে! একজন ডাক্তারকে সব সময়ই জানতে হয়। তঁার কোনো-রকম ইন্দ্রিয়বৈকল্য ছিল না তো?'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন।

'না, একেবারেই না।'

'ধরো এমনও হতে পারে, লিভার বা কিডনির কোনো সংক্রমণ?'

'না, ওগুলো চমৎকার কাজ করছিল।'

'পাকস্থলী ঠিকমতো কাজ করছিল কি না পরীক্ষা করে দেখেছিলে? হজম-শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে কিন্তু স্ট্রোক হতে পারে।'

'স্ট্রোক-ফোক হয়নি।'

মঁসিয়ে দারেঁা অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়লেন। উত্তেজিতভাবে বললেন, 'দ্যাখো ডাক্তার, নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তোমার মতে কী সেই কারণ?'

ডাক্তার হাত ছুঁড়ে অসহায় ভাব দেখালেন।

'আমার কোনো ধারণা নেই, আদৌ কোনো ধারণা নেই। যেহেতু তিনি মারা গেছেন, তাই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এর বেশি কিছু বলার নেই।'

তখন মঁসিয়ে দারেঁা আবেগকম্প্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওঁর যেন ঠিক কত বয়স হয়েছিল? আমি মনে করতে পারছি না।'

'উননব্বুই।'

শুনে খর্বাকৃতি বৃদ্ধ যুগপৎ অবিশ্বাসে-আশ্বাসে বিস্ময় প্রকাশ করলেন:

'উননব্বুই। সুতরাং আর যাই হোক, এটাকে বুড়ো বয়স বলা যায় না।'

প্রিয়তম

আন্তন পাভলোভিচ চেকভ (১৮৬০-১৯০৪)

ওলেংকা বসেছিল ওর বাড়ির খিড়কি দরজার সিঁড়িতে। হাতে কাজ নেই। গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। কয়েকটা মাছি জ্বালাতন করছে। তবে আর কিছুক্ষণ পরেই যে সন্ধ্যে হবে এটা ভাবতেই ওলেংকার ভাল লাগছিল। পূব দিক থেকে বৃষ্টির কালো মেঘ এসে জমছিল আকাশে। দু-একটা ঝাপটা জোলো বাতাস এসে মাঝেমধ্যেই গায়ে লাগছিল। অবসরপ্রাপ্ত কলেজিয়েট অ্যাসেসর প্লেমায়ানিকভের মেয়ে ওলেংকা।

ওই একই বাড়ির কোণার দিকের একটি ঘরে থাকে কুকিন। আকাশের দিকে তাকিয়ে সে উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। মুক্তাঙ্গন থিয়েটার টিভোলির পরিচালক হল কুকিন।

"বৃষ্টি। আবার বৃষ্টি। রোজ শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। যেন আমার গায়ে থুথু ছিটিয়ে দিতে চায়। এবায় গলায় দড়ি দেব। বৃষ্টি আমার সর্বনাশ করে দিল। প্রতিদিন প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে।"

কুকিনের গলার হতাশা ঝরে পড়ছে। নিজের দু-হাত অস্থিরভাবে মুচড়ে সে ওলেংকাকে বলছে: "এই কী জীবন, ওলগা সেমাইওনোভ্না। এবার কাঁদাবে। লোকটা খাটছে। যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কষ্ট পাচ্ছে। রাত্রে ঘুমোতে পারছে না। সব কিছু ঠিকঠাক চালানোর জন্যে ওর আর চিন্তার শেষ নেই। তাতে ফলটা কী হচ্ছে? সে তো দর্শকদের দিচ্ছে সেরা অপেরা, সেরা অভিনয়, সেরা শিল্পী। কিন্তু ওরা কি তা চায়? ওরা কি এর এতটুকুও প্রশংসা করে? জনসাধারণের স্বভাবটাই রুক্ষ। একেবারে বিরক্তিকর ব্যাপার। জনসাধারণ চায় সার্কাস, দেখতে চায় বোকার কাণ্ড কারখানা। তার ওপর এই আবহাওয়া। দেখো, দেখছো তো, সন্ধে হতে না হতেই প্রায় রোজ বৃষ্টি। মে মাসের দশ তারিখে সেই যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, পুরো জুন মাস ধরে চলছে। থামার আর লক্ষণ নেই। বিশ্রী ব্যাপার। দর্শক পাচ্ছি না। আমাকে কি ভাড়া গুনতে হচ্ছে না? শিল্পীদের কি আমাকে টাকা দিতে হচ্ছে না?"

পরের দিন সন্ধ্যের দিকে আকাশে আবার মেঘ জমল। কুকিন উন্মাদের মতো হাসতে হাসতে বলল:

অনুবাদ: দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

"থোড়াই কেয়ার করি। যা পারে করুক। আমার থিয়েটারটাকে ডুবিয়ে দিক। আমাকেও ডোবাক। এ জন্মে, পরজন্মে আমি একেবারে দুর্ভাগা। শিল্পীরা আমার বিরুদ্ধে মামলা করুক, আমাকে কাঠগড়ায় টেনে নিয়ে যাক। কাঠগড়াই বা কেন? সাইবেরিয়ার শ্রমশিবিরে কেন নয়? কেন বা ফাঁসিকাঠেই নয়। হা, হা, হা!"

তৃতীয় দিনেও সেই একই ঘটনা ঘটল।

ওলেঙকা মন দিয়ে কুকিনের কথা শুনেছে। শুনেছে নিঃশব্দে। কখনও ওর দু চোখ জলে ভরে গিয়েছে। কুকিনের দুর্ভাগ্য শেষ পর্যন্ত ওকে নাড়া দিল। ওলেঙ্কা ভালবেসে ফেলল কুকিনকে। রোগা বেঁটে কুকিনের মুখের রঙ হলুদ। কোঁকড়ানো চুল পিছন দিকে আঁচড়ানো। ওর গলার স্বরটাও মিহি। কথা বলার সময় ওর চেহারা ও গলার এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওর মুখে সব সময় হতাশার ছাপ। তবু ওলেঙকার ওর জন্যে সত্যিই একটা গভীর অনুভূতির সৃষ্টি হল।

ওলেঙকা মনে মনে সর্বদাই কাউকে না কাউকে ভালবেসেছে। ভাল না বেসে পারেনি। ওলেঙকা ভালবেসেছে ওর রুগ্ন বাবাকে। বাবা অন্ধকার ঘরে সব সময় একটা আরামচেয়ারে বসে থাকেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। ওলেঙকা ভালবেসেছে ওর খুড়ীমাকে। খুড়ীমা বছরে এক আধবার ব্রিয়ান্স্কা থেকে এসে ওদের দেখে যান। এরও আগে ওলেঙকা যখন একটি শিক্ষায়তনের ছাত্রী, তখন সে ভালবেসেছিল ওর ফরাসী শিক্ষককে। শান্ত শিষ্ট মেয়ে ওলেঙকা। ওর মন মায়ামমতার ভরা। স্বভাবও ভারি মিষ্টি। ওর সুন্দর গোলাপী গাল, সাদা, নরম ঘাড়, আর ঘড়ের ছোট্ট কালো তিল। ভাল কিছু শুনলেই ওর মুখে সরল একটা হাসি ফুটে ওঠে। এসব দেখে লোকেরা ভাবে "না, মেয়েটি তত খারাপ নয়।" এর উত্তরে ওলেঙকা আবার হেসে উঠত। কথাবার্তার মাঝখানে অতিথি মেয়েরাও ওর হাত চেপে ধরে খুশিতে বলে ওঠে, 'লক্ষ্মী মেয়ে!'

শহরের উপকণ্ঠে জিপ্সি রোডের এই বাড়িটা উত্তরাধিকারসূত্রে ওলেঙকার। জন্ম থেকেই সে এই বাড়িতে আছে। বাড়িটা টিভোলি থিয়েটার থেকে খুব একটা দূরে নয়। সন্ধ্যে থেকে শুরু করে একেবারে গভীর রাত পর্যন্ত সে এখান থেকেই থিয়েটারের বাজনা ও পটকার শব্দ শুনতে পায়। ওলেঙকা ভাবে, কুকিন ওর ভাগ্যের সঙ্গে জোর লড়াই করছে, কুকিন ওর প্রধান শত্রু ভাবলেশহীন দর্শকদের সমুচিত শিক্ষা দিচ্ছে। আস্তে আস্তে ওলেঙকার হৃদয়-মন আরও নরম হয়ে উঠল। সারা রাত সে ঘুমোতে পারল না। ভোর রাতে কুকিন যখন বাড়ি ফিরল, সেই সময় ওলেঙকা জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। পর্দার ফাঁক দিয়ে কুকিন ওর মুখ দেখতে পেল, দেখল ওর মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, সদয় হাসি।

কুকিনকে এই হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে ওলেঙ্কা।

ওলেঙ্কাকে বিয়ের প্রস্তাব জানাল কুকিন, একদিন ওদের বিয়েও হয়ে গেল। ওর সুন্দর গলা আর পরিপুষ্ট ঘাড়ের সৌন্দর্য কুকিন যখন প্রথম ভাল করে দেখতে পেল, তখন সে ওর নিজের দু-হাত জড়িয়ে বলল, "তুমি আমার সব থেকে প্রিয়।"

কুকিন সুখী হল। কিন্তু ওদের বিয়ের দিনেও বৃষ্টি পিছু ছাড়ল না। হতাশার ছাপও ওর মুখ থেকে গেল না।

দুজনে সুখে-শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছিল। ওলেঙ্কা ক্যাশিয়ারের বাক্স নিয়ে বসত, সব হিসেবপত্র লিখে রাখত, সবার বেতন মিটিয়ে দিত। থিয়েটারটাকে সে বেশ ঠিকঠাক রেখেছিল। ওর সেই গোলাপী গাল, দৈব আভার মতো ওর মুখমন্ডল ঘিরে-থাকা সুন্দর সরল হাসি ক্যাশিয়ারের কাউন্টারের ফোকর থেকে দেখা যেত। দেখা যেত থিয়েটারের দৃশ্যপটের আড়াল থেকে, কাফে-রেস্তোরাঁয়। ওলেঙ্কা ওর বন্ধুদের বলতে শুরু করল, পৃথিবীতে থিয়েটারই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে দরকারী। পৃথিবীতে থিয়েটারের মতো ভাল আর কিছু নেই। সত্যিকারের আনন্দ যদি পেতে চাও, শিক্ষিত যদি হতে চাও, তাহলে থিয়েটারই একমাত্র জায়গা।

"কিন্তু লোকেরা কি এটা বোঝে, ভাবছ?"—ওলেঙ্কা বলল। "লোকেরা সার্কাসই দেখতে চায়। গতকাল ভানিচ্‌কা ও আমি ফাউস্ট মঞ্চস্থ করলাম। দর্শকদের আসন প্রায় সবটাই ফাঁকা। আমরা যদি হাবিজাবি কিছু করতাম, তাহলে দেখতে থিয়েটারে লোক আর ধরছে না। আগামী কাল আমরা অর্ফিউস করব। দেখতে এসো।"

থিয়েটার ও শিল্পীদের নিয়ে কুকিন যা বলত, অবিকল সেই সব কথারই পুনরাবৃত্তি করত ওলেঙ্কা। কুকিনের মতোই ওলেঙ্কা দর্শকদের সমালোচনা করে বলত, ওরা শিল্প বোঝে না। মহলার সময় ওলেঙ্কা গিয়ে নাক গলাত, শিল্পীদের অভিনয় শুধরে দিত, বাজনদারেরা কেমন বাজাচ্ছে লক্ষ্য করত। স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় খারাপ কিছু সমালোচনা বেরোলেই সে কেঁদে ফেলত, সম্পাদকের কাছে গিয়ে তর্ক জুড়ে দিত।

শিল্পীরা ওকে পছন্দ করত। ওকে বলত "ভানিচ্‌কা ও আমি" এবং "প্রিয়তম"। শিল্পীদের অবস্থা দেখে কষ্ট পেত ওলেঙ্কা, মাঝেমধ্যে ওদের যৎসামান্য ধারদেনাও দিত। ওরা সেই টাকা ফেরত না দিলে সে কখনও স্বামীকে জানাত না। খুব খারাপ লাগলে, সে বড় জোর দু এক ফোঁটা চোখের জল ফেলত।

শীতকালটাও ওদের দুজনের বেশ ভালই কাটছিল। পুরো শীতকালটায় ওরা শহরের একটা থিয়েটার লিজ নিয়েছিল। অল্প কয়েকদিনের জন্য সেই

থিয়েটার ওরা আবার লিজ দিয়েছিল স্থানীয় অপেশাদার শিল্পীদের এবং একটি থিয়েটার কোম্পানি ও এক জাদুকরকে।

ওলেংকা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সব সময় সে সুখে ও পরিতৃপ্তিতে ঝলমল করত। ওদিকে কুকিন আরও রোগা হয়ে গেল, ওর চেহারা হয়ে গেল আরও নিষ্প্রভ। সারা শীতকালটায় ভাল ব্যবসা করলেও সে শুধু ওর দারুণ লোকসানের কথাই বলত। রাত্রে কুকিন কাশত। ওলেংকা ওকে সিরাপ ও লেবুর রস খাওয়াত, ওডিকোলন মাখিয়ে দিত, নরম কাপড়ে ঢেকে রাখত।

ওলেংকা ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলত, "তোমার মতো এত ভাল আর কাউকে বাসি না।"

থিয়েটারের কাজে কুকিন মস্কো গেল। কুকিনকে ছেড়ে ওলেংকা দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। দূরে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে সে সারাক্ষণ জানলায় বসে থাকত। মস্কোয় কুকিনের কয়েক দিন দেরি হয়ে গেল। সে ওলেংকাকে চিঠি লিখে জানাল, ইস্টারের সময় ফিরবে। টিভোলি থিয়েটারের জন্যে যে সব ব্যবস্থা হয়েছে সে-সব কথাও সে চিঠিতে জানাল। কিন্তু ইস্টারের সোমবারের আগে এক দিন গভীর রাত্রে বাইরের ফটকে অশুভ কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। একটা পিপের ওপর যেন আওয়াজ করা হচ্ছে—দুম, দুম, দুম! ঘুম-চোখে পরিচারক খালি পায়ে জলকাদা মাড়িয়ে ফটক খুলতে ছুটে গেল।

"দরজা খুলুন, টেলিগ্রাম আছে।" একজন গমগমে গলায় বলে উঠল।

ওলেংকা এর আগেও স্বামীর কাছে থেকে টেলিগ্রাম পেয়েছে। কিন্তু এবার কেন যেন সে ভয়ে কুঁকড়ে গেল। টেলিগ্রাম খোলার সময় ওর হাত কাঁপছে। সে পড়ল :

"ইভান পেত্রোভিচ হঠাৎ আজ মারা গিয়েছেন। মঙ্গলবার ওঁর অন্ত্যেষ্টির জন্য দুত নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।"

টেলিগ্রামটি এভাবেই লেখা হয়েছিল—অন্ত্যেষ্টি এবং একটি দুর্বোধ্য শব্দ—"প্রুত"। অপেরা কোম্পানির ম্যানেজার টেলিগ্রামটিতে সই করেছিলেন।

ওলেংকা কান্নায় ভেঙে পড়ল। "ওগো, তুমি আমার প্রাণ। তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ভানিংকা, তোমার সঙ্গে কেন আমার দেখা হল? কেন তোমাকে ভালবাসলাম? তোমার ওলেংকাকে তুমি কার কাছে রেখে গেলে?"

মঙ্গলবার মস্কোর ভাগানকভ সমাধিক্ষেত্রে কুকিনের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হল। বুধবার ওলেংকা বাড়ি ফিরে এল; ঘরে ফিরেই সে বিছানায় আশ্রয় নিল। আর এমন চিৎকার করে কাঁদতে লাগল যে, রাস্তা ও পাড়াপড়শীদের ঘর থেকে ওর সেই কান্না শোনা গেল।

"আহা, লক্ষ্মী মেয়েটা। শুনছো, ওলগা সেমাইওনোভ্না কেমন কাঁদছে?" প্রতিবেশীরা যেতে যেতে বলল।

মাস-তিনেক পরের কথা। ওলেঙ্কা গির্জায় প্রার্থনা সেরে বাড়ি ফিরছে। মন ভাল নেই। গভীর শোকের ছায়া এখনও কাটেনি। একটি লোক ওর পাশাপাশি হাঁটছিল। সেও গির্জা থেকে ফিরছে। নাম ভাসিলি পুস্তোভলিভ। ব্যবসায়ী বাবাকায়েভের কাঠগোলার সে ম্যানেজার। ওর মাথায় টুপী, গায়ে সাদা কোট। তাতে সোনার চেন। ওকে দেখে ব্যবসায়ীর থেকেও জমিদার বলেই বেশি মনে হয়।

"ওলগা সেমাইওনোভ্না, প্রতিটি জিনিসই নিয়তি-নির্দিষ্ট," শান্ত, সহানুভূতিপূর্ণ গলায় লোকটি বলল। "আমাদের কোনও প্রিয়জন যদি মারা যায়, তাহলে বুঝতে হবে, সেটা ভগবানের ইচ্ছা। এবং কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে, সহ্য করতে হবে।"

লোকটি ওকে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বিদায় জানাল। সে চলে যাবার পর ওলেঙ্কা সারাদিন ওর সেই শান্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। যখনই ওলেঙ্কা চোখ মুজেছে, তখনই লোকটির কালো দাড়ি ওর চোখে ভেসে উঠেছে। লোকটিকে খুব ভাল লাগল ওলেঙ্কার। আর লোকটিরও যে ওকে মনে ধরেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরেই। কারণ, কয়েক দিন পরেই এক বয়স্কা ভদ্রমহিলা এলেন ওলেঙ্কার ঘরে। ওলেঙ্কার সঙ্গে ওঁর পরিচয় অল্পই। কফির টেবিলে ভদ্রমহিলা বসতে না বসতেই শুরু করে দিলেন পুস্তোভালভের গল্প। কী ভাল মানুষই না পুস্তোভালভ, ধীর স্থির এই মানুষটিকে যে-কোনও মেয়েই স্বামী হিসেবে পেলে খুশী হবে—এরকম অনেক কথাই তিনি বলে চললেন। তিন দিন পরে পুস্তোভালভ নিজেই ওলেঙ্কার বাড়ি এল। থাকল মাত্র দশ মিনিট, কথাও বলল অল্প, কিন্তু তাতেই ওলেঙ্কা ওকে ভালবেসে ফেলল। বেপরোয়া ওর এই ভালবাসা। সারারাত সে ঘুমোতে পারল না। যেন জ্বর হয়েছে, এমনভাবে ওর গা গরম হয়ে উঠল। সকালে ওলেঙ্কা গেল সেই বয়স্কা ভদ্রমহিলার বাড়ি। শীঘ্রই ওলেঙ্কা ও পুস্তোভালভের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, বিয়েও চুকেবুকে গেল কয়েক দিন পর।

পুস্তোভালভ ও ওলেঙ্কা সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। রাত্রে খেতে আসার আগে পর্যন্ত পুস্তোভালভ অধিকাংশ দিনই থাকত কাঠগোলায়। ব্যবসাপত্রের কাজে সে একদিন বাইরে গেল। ওর অনুপস্থিতিতে ওলেঙ্কা গিয়ে বসল ওর অফিসে। সন্ধ্যে পর্যন্ত সেখানে থেকে সে হিসেবপত্র রাখে, খদ্দেরদের দেখাশোনা করে।

"এখন ফি বছর কাঠের দাম শতকরা কুড়ি ভাগ বাড়ছে," খদ্দের ও পরিচিত লোকদের বলল ওলেঙ্কা। "ভেবে দেখুন, এক সময় আমরা এখানে আমাদের বন থেকে কাঠ কিনতাম। এখন কাঠের খোঁজে ভাসিচ্কাকে প্রতি বছর মাগিলেভ-এর সরকারের কাছে যেতে হচ্ছে। আর যা ট্যাক্স!" গালে হাত দিয়ে ভীতুর

মতো সে বলল। "যা ট্যাক্স!"

ওলেংকার মনে হচ্ছে, সে যেন দীর্ঘদিন ধরে কাঠের ব্যবসা করছে। মনে হচ্ছে, জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বস্তু হল কাঠ। সে যেভাবে 'তক্তা', 'পাল্লা', 'বর্গা' 'খুঁটি' কথাগুলো উচ্চারণ করে, শুনতে বেশ মিষ্টি লাগে। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখে, গাদা-গাদা কাঠ বিশাল পাহাড়ের মতো হয়ে উঠেছে। গাড়ি গাড়ি কাঠ আর কাঠ শহর থেকে দূরের, অনেক দূরের অরণ্যের বার্তা বহন করে আনছে। সে স্বপ্ন দেখে, ৩৬ ফুট × ৫ ইঞ্চি বর্গার পুরো একটা বাহিনী কাঠ-গোলার সঙ্গে লড়াই করার জন্য সোজা এগিয়ে আসছে; বর্গা, খুঁটি, পাল্লা ও তক্তাগুলো নিজেরা গায়ে গায়ে ঠোকাঠুকি করছে, ঠক্ ঠক্—ঠক্ ঠক্ শব্দ হচ্ছে শুকনো কাঠের। বর্গা, খুঁটি, পাল্লা ও তক্তাগুলো মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, তারপর স্তূপের পর স্তূপ হয়ে যাচ্ছে, ওলেংকা ঘুমের মধ্যেই চিৎকার করে ওঠে, পুস্তোভালভ তখন শান্ত গলায় ওকে বলে :

'সোনা আমার, কী হল?'

স্বামীর মতামতই ওলেংকার মতামত। স্বামী যদি মনে করে, ঘরটা খুব গরম, তাহলে ওলেংকাও ভাবে সত্যিই ঘরটা খুব গরম। স্বামী যদি মনে করে, ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে তাহলে ওলেংকাও ঠিক সেই কথাই ভাবে। পুস্তোভালভ আমোদপ্রমোদ পছন্দ করে না। ছুটির দিন সে বাড়িতেই থাকে। ওলেংকাও ঠিক তাই করে।

ওলেংকার বন্ধুরা বলে, "তুই সব সময় হয় বাড়িতে না-হয় কাঠগোলায় থাকিস। থিয়েটার বা সার্কাস দেখতে যাস না কেন?"

ঠাণ্ডা গলায় জবাব দেয় ওলেংকা, "ভানিচকা ও আমি কখনও থিয়েটারে যাই না। কত কাজ আমাদের, হাবিজাবি ব্যাপারে সময় নষ্ট করার সময় নেই। লোকেরা থিয়েটারে গিয়ে কী পায়?"

প্রতি শনিবার সন্ধেয় ওলেংকা ও পুস্তোভালভ ঘড়ির কাঁটা ধরে প্রার্থনা সভায় হাজির হয়। ছুটির দিনগুলোয় প্রার্থনা সারতে সকাল সকাল যায় গীর্জায়। ফেরার পথে পাশাপাশি দুজনে হেঁটে আসে। তখন ওদের দুটি মুখ মনে হয় অপার্থিব। দুজনের গা থেকেই সুগন্ধ ভেসে আসে। ওলেংকার রেশমী পোশাক ঝলমল করে। বাড়িতে ওরা চায়ের সঙ্গে নানা ধরনের জ্যাম-দেওয়া রুটি খায়। খায় নানা ধরনের পিঠে। প্রতিদিন দুপুরবেলা ওদের বাড়ির উঠোনে ও ফটকের বাইরে বাঁধাকপির স্যুপ, ভেড়া কিংবা হাঁসের মাংসের রোস্টের লোভনীয় গন্ধ ভেসে আসে। ধর্মীয় প্রার্থনার দিন ওরা মাংস খায় না। সেদিন ওদের হেঁসেল থেকে ভেসে আসে মাছের রান্নার চমৎকার গন্ধ। ফটক পেরিয়ে যাবার সময় জিভে জল না এসে পারে না, মনে হয় এখনই গিয়ে খাবার টেবিলে বসে পড়ি। অফিসের টেবিলে সবসময় থাকে

গরম সামোভার। খদ্দেরদের দেওয়া হয় চা ও বিস্কুট। সপ্তাহে একদিন ওরা যায় গোশলখানায়, যখন ফেরে তখন ওদের মুখের রঙ লাল। দুজনে পাশাপাশি হেঁটে আসে।

ওলেংকা ওর বন্ধুদের বলে, "ঠাকুরের দোহাই, দুজনে বেশ আছি। ঠাকুরের ইচ্ছা, সবাই যেন ভানিচকা ও আমার মতো বাঁচে।"

একদিন পুস্তোভালভ গেল মোগিলেভ সরকারের কাছে কাঠ কিনতে। ওর কথা ভেবে ভেবে ওলেংকার মন তখন খুবই খারাপ। রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছে, কেঁদেছে। ওর বাড়ির কোণায় থাকে স্মিরনভ। বয়সে তরুণ, পেশায় পশুচিকিৎসক। এই স্মিরনভ সন্ধেবেলায় ওর কাছে এসে গল্পগুজব করে, তাস খেলে। এতে ওলেংকা মনের কষ্টটা ভুলে থাকে। স্মিরনভের নিজের জীবনের গল্পগুলোই ওর শুনতে ভালো লাগে। স্মিরনভ বিয়ে-থা করেছে, একটি ছেলে আছে। তবে সে বউয়ের সঙ্গে থাকে না। কারণ বউ তাকে ঠকিয়েছে। এখন স্মিরনভ ওকে ঘৃণা করে, ছেলের ভরণপোষণের জন্যে ওকে মাসে চল্লিশ রুবল পাঠায়। এসব শুনে ওলেংকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, মাথা নাড়ে, স্মিরনভের জন্যে কষ্ট অনুভব করে।

মোমবাতির আলোয় ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে দিতে ওলেংকা বলে, "ঠাকুর আপনার সহায় হন, এখানে এসে কিছু সময় যে কাটিয়ে গেলেন তার জন্য ধন্যবাদ, ভালো থাকুন।"

শান্ত, নরম গলায় কথাগুলো বলল ওলেংকা। ভেবেচিন্তে বলল। ওর স্বামী যেভাবে কথা বলে, ঠিক সেইভাবে। পশুচিকিৎসক চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে ওর উদ্দেশে ওলেংকা বলে উঠল, "আপনি কি জানেন, ভ্লাদিমির প্লাতোনিচ, স্ত্রীর সঙ্গে আপনার মিটমাট করে নেওয়া উচিত। অন্তত আপনার ছেলের কথা ভেবেই আপনার স্ত্রীকে ক্ষমা করা উচিত। ধরে নিতে পারেন, ছেলেরা সব বোঝে।"

পুস্তোভালভ ফিরে আসার পর ওলেংকা ফিসফিসিয়ে ওকে পশু-চিকিৎসক ও তার অসুখী পারিবারিক জীবনের কথা বলল। দুজনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল। বাবার জন্যে ছেলের নিশ্চয় মন খারাপ করে। তারপর এক অদ্ভুত যোগাযোগ। দুজনেই ঈশ্বরের মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করল, ঠাকুর আমাদের সন্তান দাও।

পুস্তোভালভরা এভাবেই সুখে-শান্তিতে পুরো ছ'টি বছর কাটিয়ে দিল। কিন্তু হঠাৎ শীতকালে একদিন ভাসিলি আন্দ্রেইচ চাটা খেয়ে কাঠগোলায় যাবার সময় ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসল। মাথার টুপী পরে যায়নি, তাই অসুস্থ হয়ে পড়ল। সেরা ডাক্তাররা ওর চিকিৎসা করলেন। কিন্তু রোগ কমা তো দূরের কথা, বরং বেড়েই চলল। চার মাস অসুস্থ থাকার পর সে মারা গেল। আবার বিধবা হল ওলেংকা।

"ওগো, তুমি আমাকে কার কাছে রেখে গেলে?" অন্ত্যেষ্টির পর ওলেংকা কাঁদছে আর মাথা ঠুকছে। "তোমাকে ছাড়া আমি কী করে বাঁচব? পোড়া কপাল। আমার মা নেই, বাবা নেই। আর এখন কেউ আমাকে দেখার থাকল না।"

শোকজ্ঞাপক কালো পোশাক পরে বাইরে যায় ওলেংকা। টুপী, দস্তানা পরা সারা জীবনের মতো ছেড়ে দিল। গির্জা আর স্বামীর সমাধিস্থল—এছাড়া সে আর বড় একটা বাইরে যায় না। প্রায় সন্ন্যাসিনীর মতো থাকে।

ছ'মাসের আগে সে শোকজ্ঞাপক পোশাক গা থেকে খোলেনি, খোলেনি জানলার কপাটও। এরপর সে সকালে রাঁধুনিকে নিয়ে মাঝেমধ্যে বাজারে যাওয়া শুরু করল। কীভাবে সে বাড়িতে থাকে, কী করে, এসবই নিছক অনুমান সাপেক্ষ। ছোট্ট বাগানে বসে পশু-চিকিৎসকের সঙ্গে তাকে চা খেতে দেখা যায়, পশুচিকিৎসক তাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনায়—এ সব ঘটনা থেকে যা বোঝার তা বুঝে নিতে হয়। ডাকঘরে ওলেংকা ওর চেনাজানা এক মেয়েকে যা বলেছে, তা থেকেও ওর কিছু খোঁজখবর পাওয়া যায়। ওলেংকা মেয়েটিকে বলেছে :

"এই শহরে পশুদের দেখাশোনার বিশেষ ব্যবস্থা নেই। তাই এত রোগ-টোগ দেখা যাচ্ছে। প্রায়ই শুনতে পাবে, লোকেরা দুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে, ঘোড়া ও গরু মানুষকে সংক্রামিত করছে। মানুষের মতোই গৃহপালিত জন্তুজানোয়ারদের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া উচিত।"

পশুচিকিৎসকের কথারই পুনরাবৃত্তি করে ওলেংকা। প্রতিটি ব্যাপারে পশুচিকিৎসকের যা মতামত, ঠিক সেই মতামতই ওলেংকার। আসল কথাটা হল, কাউকে ছাড়া সে থাকতে পারে না। আর এবার সে ওর নতুন সুখের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে বাড়ির কোণাতেই। অন্য যে কেউ হলে লোকেরা তার নিন্দা করত। কিন্তু ওলেংকাকে কেউ খারাপ ভাবতে পারে না। তার জীবনের সব কিছুই অত্যন্ত স্বচ্ছ। সে ও পশুচিকিৎসক কখনও ওদের সম্পর্ক বদল নিয়ে কোনও কথা বলেনি। বস্তুত ওরা ব্যাপারটা গোপন রাখারই চেষ্টা করেছে, তবে পারেনি। কারণ ওলেংকার কোনও লুকোচাপা ব্যাপার থাকতে পারে না। পশুচিকিৎসকের সেনাবাহিনীর সহকর্মীরা ওকে দেখতে এলে, ওলেংকা ওদের চা ঢেলে খাওয়াল, রাত্রের খাবার পরিবেশন করল। গবাদি পশুর প্লেগ, ক্ষুর ও মুখের রোগ, পুরসভার কসাইখানা—এসব নিয়ে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা জুড়ে দিল। পশুচিকিৎসকের তখন রীতিমত অস্বস্তি হচ্ছে। অতিথির চলে যাবার পর সে ওর হাত চেপে ধরে, রাগে ঝন্ ঝন্ করে উঠল।

"যে বিষয় বোঝো না, তা নিয়ে কথা বলতে তোমাকে নিষেধ করিনি? আমরা ডাক্তাররা যখন কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, তখন দয়া করে

নিজেকে তাতে জড়িয়ো না। ব্যাপারটা বিশ্রী হয়ে উঠছে।"

বিস্ময় ও শঙ্কামেশানো চোখে ওলেঙকা ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। বলল:

"তাহলে ভলোদিচ্‌কা, আমি কী নিয়ে কথা বলব?" চোখে জল ওলেঙকার, ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না।" ওরা দুজনেই এখন সুখী।

কিন্তু এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হল না। পশু-চিকিৎসক সেনাবাহিনীর সঙ্গে খুব দূরের একটা জায়গায় বদলি হল, আর ফিরল না। প্রায় সাইবেরিয়ার মতো সুন্দর একটা জায়গায় ওর এভাবে বদলির অর্থ, ওলেঙকা একা পড়ে থাকল।

ওলেঙকা এবার পুরোপুরি নিঃসঙ্গ। ওর বাবা বহুদিন আগেই মারা গেছেন, ওঁর সেই আরামচেয়ার পায়া ভেঙে পড়ে আছে ঘরের কোণে, তাতে ধুলো জমেছে। রোগা ও গৃহবন্দী ওলেঙকা। রাস্তায় লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে তারা আর আগের মতো ওর দিকে তাকায় না, হাসে না। ওলেঙকার জীবনের সেরা দিনগুলো আর নেই, নানা রঙের সেই দিনগুলো মিলিয়ে গেছে অতীতে। এরপর ওর যে নড়বড়ে দিনগুলো শুরু হতে যাচ্ছে, তার কথা না-ভাবাই ভালো।

সন্ধেবেলা সিঁড়িতে বসে ওলেঙকা শুনতে পায় টিভোলি থিয়েটারে বাজনা বাজছে, পটকার শব্দ হচ্ছে। কিন্তু এটা তার মনে আর কোনও সাড়া জাগায় না। অস্থির হয়ে সে উঠোনের দিকে তাকায়। শূন্যমন, ওর কোনও প্রত্যাশাও নেই। রাত্রি এলে সে ঘুমোতে যায়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুধু শূন্য উঠোনের স্বপ্নই দেখে। খেতে হয় খায়, ঘুমোতে হয় ঘুমোয়।

সবচেয়ে খারাপ হল, কোনও বিষয়ে ওলেঙকার আর কোনও মতামত নেই। চারপাশে যা ঘটছে সে দেখে, বোঝে। কিন্তু কোনও কিছু সম্পর্কে কোনও ধারণা ও মতামতই সে গড়ে তুলতে পারে না। কোনও মতামত বা ধারণা না-থাকাটা যে কী সাংঘাতিক! যেমন, তুমি একটা বোতল দেখছ, দেখছ বৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু কেন এই বোতল বা বৃষ্টি, তারা দেখতেই বা কেমন, তা তুমি বলতে পারছ না, হাজার টাকা দিলেও বলতে পারছ না। কুকিন ও পুস্তোভালভ যখন বেঁচে ছিল, যখন পশু-চিকিৎসক কাছে ছিল, তখন সব কিছুর একটা মানে ছিল ওলেঙকার কাছে। তখন সে যে-কোনও ব্যাপারে খোলাখুলি ওর মতামত জানিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এখন ওর হৃদয় ও মস্তিষ্ক বাড়ির উঠোনটার মতোই ধু-ধু ফাঁকা।

আস্তে আস্তে শহরটা চারপাশে বেড়ে উঠল। জিপ্‌সি রোড এখন আরও চওড়া ও বড় হয়েছে, যেখানে ছিল টিভোলি থিয়েটার ও কাঠগোলা সেখানে এখন বড়-বড় বাড়ি উঠেছে, নতুন রাস্তাঘাট হয়েছে। সময় কত দ্রুত চলে যায়! ওলেঙকার বাড়ি বিষণ্ন, বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। উঠোনের আশেপাশে কলকারখানা উঠেছে, উঠোনটাকে আরও ছোট্ট দেখাচ্ছে। ওলেঙকারও বয়স হয়েছে, সে এখন

বাড়িতেই থাকে। গ্রীষ্মে শূন্য, রূক্ষ, তিক্ত মনেই সিঁড়িতে এসে বসে। কখনও বসন্তের বাতাসে, কিংবা ভেসে আসা গির্জার ঘণ্টার শব্দে, হঠাৎ ওর মনে স্মৃতির দরজা হাটপাট হয়ে খুলে যায়, উষ্ণ আবেগে খুলে যায় হৃদয়ের দরজা। দু-গাল দিয়ে বয়ে যায় অশ্রুধারা। কিন্তু কয়েক মুহূর্তমাত্র। তারপর আবার সেই শূন্যতা ফিরে আসে। তখন মনে হয়, বেঁচে থেকে লাভ কী? কালো বেড়ালছানা ব্রায়স্কা এসে গায়ে গা ঘষতে থাকে, আদুরে গলায় মিউ মিউ করে ডাকে। কিন্তু ছোট্ট বেড়ালছানার আদর ওলেংকাকে স্পর্শ করে না। এটা ওর দরকার নেই। ওর যা দরকার, তা হল ভালবাসা। সেই ভালবাসা, যা ওর সমস্ত অস্তিত্ব, হৃদয়, মন ও বুদ্ধিকে ভরিয়ে রাখবে। সেই ভালবাসা ওকে গড়ে উঠতে দেবে ওর নিজস্ব ধ্যানধারণা, সন্ধান দেবে জীবনের লক্ষ্যের। শিরা-উপশিরায় যে রক্তের বয়স বাড়ছে তাকে যোগাবে উত্তাপ! কালো বেড়ালছানাটাকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে ওলেংকা বলে উঠল:

"দূর হ! এখানে কী করছিস?"

এভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটল। আনন্দ করার মতো একটা কিছুও নেই, নেই বলার কথাও। মতামত দেবার মতো কিছুই ঘটছে না। রাঁধুনি মাভ্রা যা বলে, সেটাই সে ঠিক বলে মেনে নেয়।

জুলাইয়ের এক তপ্ত গোধূলি। হঠাৎ দরজার কড়া নড়ে উঠল। ওলেংকা নিজে গিয়ে দরজা খুলতেই একেবারে হতবাক। সামনে দাঁড়িয়ে আছে পশু-চিকিৎসক স্মিরনভ। ওর চুলে পাক ধরেছে। ফৌজি পোশাক নয়, পরেছে অসামরিক পোশাক। পুরনো সব স্মৃতি বানের জলের মতো ওলেংকার মনে ভেসে এল। নিজেকে সে আর সামলাতে পারল না, কেঁদে উঠল। তারপর কোনও কথা না বলে স্মিরনভের বুকে মাথা রাখল আস্তে আস্তে। এমনই সে অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, কখন যে ওরা ঘরে এসে একসঙ্গে বসে চা খেতে শুরু করছে, তা বুঝতেও পারেনি!

আনন্দে কাঁপা-কাঁপা গলায় ওলেংকা বলল, "লক্ষ্মীটি! ঠাকুর কোত্থেকে তোমাকে পাঠাল?"

সে বলল, "আমি এবার এখানেই বাসা করব। আর কোথাও যাব না। চাকরি ছেড়ে এসেছি। স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে চাই, গুছিয়ে ঘরকন্না করতে চাই। তাছাড়া ছেলে বড় হয়েছে। ওকে জিমনাসিয়ামে পাঠাতে হবে। তুমি তো জানো, স্ত্রীর সঙ্গে আমার মিটমাট হয়ে গেছে।"

ওলেংকা জিজ্ঞেস করল, "ও কোথায়?"

"ওদের হোটেলে রেখে এসেছি। থাকার জায়গা খুঁজছি।"

"আচ্ছা মানুষ তো। আমার বাড়িটা নাও। এই বাড়িতে চলবে না? লক্ষ্মীটি! কেন, আমি তো তোমার কাছ থেকে ভাড়া নেব না।"

দারুণ উত্তেজনা ওলেংকার। আবার সে কাঁদল। "তোমরা এখানে থাকো, বাড়ির ওই কোণের ঘরটাই আমার যথেষ্ট। ঠাকুর, আজ আমার কী আনন্দই না হচ্ছে।"

পরের দিনই বাড়ির ছাদ, দেয়াল সব চুনকাম করা হল। ওলেংকা উঠোনে ঘুরে ঘুরে সব কাজ তদারকি করল। ওর মুখ আগের মতোই হাসিতে ঝলমল করছে। ওর সমস্ত আবার নতুন করে জেগে উঠেছে। যেন দীর্ঘ একটা ঘুম থেকে সবে সে জেগে উঠল। পশু-চিকিৎসকের স্ত্রী ও ছেলে এসে পড়ল। স্ত্রী দেখতে রোগা, সাদাসিধে। মুখে বিরক্তির চিহ্ন। ছেলের নাম সাসা। দশ বছর বয়সের তুলনায় সে দেখতে ছোট। গোল মুখ, নীল চোখ আর ভাঙা গাল। উঠোনে এসেই সে বেড়ালছানাটাকে নিয়ে পড়ল। সমস্ত বাড়িটা ওর হাসির শব্দে ভরে উঠল।

"মাসী, এটা কি তোমার বেড়াল?" ওলেংকাকে সে জিজ্ঞেস করল। "ওর যখন বাচ্চা হবে, আমাকে একটা দিয়ো। মা ইঁদুরকে খুব ভয় পায়।"

ওলেংকার কত কথা ওর সঙ্গে। ওকে সে চা এনে দিল। ওলেংকার হঠাৎ খুব মায়া হল ওর জন্যে, সাসা যেন ওর নিজের ছেলে।

সন্ধেবেলা খাবার ঘরে বসে সাসা যখন লেখাপড়া করে, ওলেংকা তখন বড় মমতা নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে বলে:

"আমার আদরের ছোট্ট সোনা, খুব বুদ্ধি তোমার। আর তুমি দেখতে ভারী মিষ্টি।"

সাসা তখন পড়ছে, "চারপাশে জলবেষ্টিত ভূখণ্ডকে বলে দ্বীপ।"

ওলেংকা ওর মতোই বলতে থাকে, "জলবেষ্টিত ভূখণ্ডকে বলে দ্বীপ।" বহু-বহু বছরের স্তব্ধতা ও মানসিক শূন্যতার পর এই প্রথম ওলেংকা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আবার একটা কথা বলছে।

এখন আবার ওর নিজস্ব মতামত শোনা যাচ্ছে। রাত্রে খাবার টেবিলে সাসার মা-বাবার সঙ্গে সে আলোচনা করে, জিমনাসিয়ামে ছেলেদের লেখাপড়া এখন কত কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে হাজার হলেও, ব্যবসায়িক লেখাপড়ার চেয়ে সাবেক পদ্ধতির লেখাপড়াই ভাল। কারণ জিমনাসিয়াম থেকে পাশ করে যে-কোনও কেরিয়ারের পথ তোমার জন্যে খোলা থাকবে। তুমি চাইলে ডাক্তার হতে পারবে, আর যদি চাও এঞ্জিনিয়ার হতে, তারও কোনও বাধা নেই।

সাসা জিমনাসিয়ামে যাওয়া শুরু করল। ওর মা খারকভে বোনের সঙ্গে একদিন দেখা করতে গিয়ে আর ফিরল না। গবাদি পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে ওর বাবা রোজ বেরিয়ে যায়, কখনও কখনও আবার পুরো তিন-তিনটি দিন কাটিয়ে ফেরে। ওলেংকার তাই মনে হয়, সাসা যেন অনাথ। এমনভাবে ওর প্রতি আচার-আচরণ করা হয় যেন, ও অযাচিতভাবে এসে পড়েছে, অনাহারেই

ওর মরে যাওয়া উচিত। ওলেঙ্কা তাই ওকে নিজের কাছে, বাড়ির কোনার দিকে যেখানে সে থাকে, সেখানে নিয়ে গিয়ে রাখল, ছোট্ট একটা ঘর ছেড়ে দিল ওকে।

প্রতিদিন সকালে ওলেঙ্কা সাসার ঘরে এসে দেখে, গালে হাত রেখে সে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। সাড়াশব্দ নেই। মনে হয় যেন, নিশ্বাস পড়ছে না। ওলেঙ্কা ভাবে, সাত-সকালে বেচারার ঘুম ভাঙানো যে কী কষ্টের!

বড় কষ্ট নিয়েই ওলেঙ্কাকে বলতে হয়, "সাসেঙ্কা, সোনা বাবা। ওঠো। স্কুলে যাবার সময় হয়েছে।

সাসা ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা করে, স্কুলে যাবার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিয়ে চা খেতে বসে। তিন গ্লাস চা, দুটো বড় বিস্কুট, মাখন রুটি খায়। তখনও ওর ঘুম কাটেনি, আড়মুড়ি ভাঙে।

"সাসেঙ্কা, তুমি ঠিকমতো পড়াশুনো করোনি।" একথা বলার সময় ওলেঙ্কা এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে যে, মনে হয় সাসেঙ্কা যেন বহু দূরের পথ পাড়ি দেবার জন্যে এখন বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। "ঝামেলা তোমাকে নিয়ে। লক্ষ্মী সোনা, মাস্টারদের কথা সব শুনে চলবে। খুব খাটতে হবে, লেখাপড়া করতে হবে।"

"ওঃ, যেতে দাও না," সাসা বলে ওঠে।

স্কুলের পথে সে বেরিয়ে পড়ে। ছোট্ট ছেলে, মাথায় বড় একটা টুপি, পিঠে বাঁধা বই-ভর্তি ব্যাগ। ওলেঙ্কা নিঃশব্দে ওর পিছনে পিছনে যায়।

"সাসেঙ্কা।"

সে পিছন ফিরে তাকায়। ওলেঙ্কা একটা ফল কিংবা সন্দেশ ওর হাতে দেয়। স্কুলের রাস্তায় পেঁছে সাসা আবার ঘুরে দেখে, ওলেঙ্কা ওর পিছন-পিছন আসছে। একজন লম্বা, শক্তপোক্ত মহিলার এভাবে ওর পিছনে আসাটায় লজ্জা পায় সাসা। সে হাত নেড়ে বলে: "মাসী, তুমি বাড়ি যাও। বাকি রাস্তাটা আমি নিজে যেতে পারব।"

ওলেঙ্কা তবু দাঁড়িয়ে থাকে। স্কুলের ফটক দিয়ে ভেতরে ঢোকা পর্যন্ত যতক্ষণ সাসাকে দেখা যায়, ততক্ষণ ওলেঙ্কা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ওলেঙ্কা ওকে কী ভালই না বাসে! ওর জীবনের আর কোনও বন্ধনই এত গভীর হয়নি। এখন ওর মাতৃত্ববোধ পুরো জেগে উঠছে। জীবনে এমন সম্পূর্ণ ও স্বার্থশূন্যভাবে সে নিজেকে কখনও কারও কাছে সমর্পণ করেনি, পায়নি এমন আনন্দ। যে ছেলে ওর নিজেরও নয়, তার জন্যে সে নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত। ছোট্ট ছেলেটির ভাঙা গাল, মাথার টুপি—এসব ওর বড় মায়ামমতার জিনিস। কেন? কিন্তু কেন?

জিমনাসিয়ামে সাসাকে পেঁছে দিয়ে ওলেঙ্কা বাড়ি ফিরল। ওর মনে এখন স্বর্গীয় পরিতৃপ্তি। ভালোবাসা উপছে পড়ছে ওর মনে। হাসিতে ঝলমল করছে.

মুখ, গত ছ'মাসে এই মুখের বয়সই যেন কমে গিয়েছে। লোকেরা এখন যারা ওলেংকাকে দেখেছে, তারাই খুশী।

"কেমন আছো গো তুমি, ওলগা সেমাইওনোভ্না? লক্ষ্মী ওলগা আমাদের, দিনকাল কেমন কাটছে?"

"এখন জিমনাসিয়ামে লেখাপড়াটা খুব কঠিন। ঠাট্টা নয়। গতকাল প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের একটা উপাখ্যান মুখস্থ করতে হয়েছে, লাতিন অনুবাদ করতে হয়েছে, তাছাড়াও ছিল জটিল অংকের সমস্যা। ছোট্ট একটা ছেলের পক্ষে কি এত করা সম্ভব?" বাজারের লোকদের বলল ওলেংকা।

শিক্ষক, পড়াশোনা, পাঠ্য বই নিয়েই সে এখন কথা বলে। সাসা যা যা বলে, ঠিক সেই কথাগুলোরই সে পুনরাবৃত্তি করে।

বেলা তিনটেয় খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে সন্ধেয় ওরা একসঙ্গে পড়া তৈরি করল। পড়া কঠিন লাগায় সাসা কেঁদে ওঠে, ওর সঙ্গে ওলেংকাও কান্না জুড়ে দেয়। সাসাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে, সে অনেকক্ষণ ধরে ওর গায়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে আর বিড় বিড় করে প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওলেংকা তারপর আবছা সুদূর এক ভবিষ্যতের ছবি কল্পনা করে। সাসা লেখাপড়া শেষ করে তখন ডাক্তার কিংবা এঞ্জিনিয়ার হয়েছে, ওর একটা বিশাল বাড়ি হয়েছে, হয়েছে গাড়ি, ঘোড়া আরও কত কী। সাসা বিয়েথা করেছে, ছেলেপুলে হয়েছে। ঘুমিয়ে খুমিয়েও সে ওই একই ছবি কল্পনা করে, বন্ধ দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কালো বেড়ালটা ওর পাশে শুয়ে থাকে আর মাঝে-মধ্যে মিউ মিউ করে ডাকে।

হঠাৎ দরজায় খুব জোরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। ঘুম ভেঙে যায় ওলেংকার। ভয়ে বুক ধড়ফড় করে ওঠে। দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। আধ মিনিট পর আবার কড়া নাড়ার শব্দ।

"খারকভ থেকে টেলিগ্রাম," সে ভাবল। সারা শরীর কাঁপছে। "সাসার মা চায়, সাসা খারকভে ওর কাছে এসে থাকুক। হায়, ভগবান!"

হতাশ হয়ে পড়ে ওলেংকা। ওর মাথা, পা, হাত সব ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সে ভাবে, পৃথিবীতে আমার চেয়ে অসুখী আর কেউ নেই। মিনিটখানেক পরেই সে গলার শব্দ শুনতে পেল। ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছে পশু-চিকিৎসক।

"দোহাই ঠাকুর," সে মনে মনে বলল। ক্রমে বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল, আর সে আবার স্বস্তি অনুভব করল। সাসার কথা ভাবতে ভাবতে সে আবার বিছানায় ফিরে গেল। পাশের ঘরে সাসা ঘুমোচ্ছে, ঘুমের মধ্যেই কখনও কখনও চিৎকার করে ওঠে:

"তোমাকে দিচ্ছি। নিয়ে যাও। দুঃখ ছাড়ো।"

ব্যস্ত শেয়ার-ব্যবসায়ীর প্রেম

ও হেনরি (১৮৬২-১৯১০)

শেয়ার-ব্যবসায়ী হারভী ম্যাক্সওয়েলের অফিসের গোপনীয় বিষয় সম্বন্ধীয় কেরানী পিচারের সাধারণভাবে ভাবলেশহীন মুখে পিচার একটু সামান্য আগ্রহ এবং বিস্ময় ফুটতে দিল যখন সে সকাল সাড়ে-নটায় দ্রুত পায়ে তার মনিবকে তার নবীনা মহিলা স্টেনোগ্রাফার সহ অফিসে ঢুকতে দেখল। ছোট্ট একটা 'গুড মর্নিং পীচার' বলেই ম্যাক্সওয়েল তার ডেস্কের দিকে, মনে হ'ল যেন পারলে ডেস্কটা এক লাফে পেরিয়ে যেতে চায়, এবং শিগ্‌গীরই অপেক্ষমাণ চিঠি এবং টেলিগ্রামের মধ্যে ডুবে গেল।

নবীনা মহিলা ম্যাক্সওয়েলের স্টেনোগ্রাফারের কাজ করছেন বছর-খানেক। ভদ্রমহিলা সুন্দরী এবং তার সৌন্দর্য একেবারেই স্টেনোগ্রাফারদের সৌন্দর্য বিরোধী। চুল ফাঁপিয়ে সুন্দরী হবার চেষ্টা সে করে না। তার গলায় হার নেই, হাতে নেই বালা, লকেটও সে পরে না। তাকে দেখলে মনে হয় না কেউ নেমন্তন্ন করলেই সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে খেতে বেরিয়ে পড়বে। পরনে ধূসর রঙের সাদাসিধা বেশ, কিন্তু তার শরীরের সঙ্গে মানানসই এবং সভ্য আর ভদ্র দেখতে। পাগড়ির মতো দেখতে কালো টুপিতে একটি সোনালী সবুজ মাকাও পাখির পালক আটকানো। আজ সকালে তাকে সামান্য উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল, সঙ্গে মেশানো একটু লজ্জা। চোখটা স্বপ্নালু উজ্জ্বল, গণ্ডদেশ সত্যিকারের গোলাপফুলের মতো রাঙা আর স্মৃতিবিধুর খুশীতে তার মুখখানি ভরে আছে।

পীচার সামান্য কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করল আজ সকালে তার কাজের ধারাটা একটু আলাদা। সোজা পাশের ঘরে যেখানে ওর ডেস্ক রয়েছে সেখানে না গিয়ে কিছুটা অস্থির ভাবে বাইরের দিকে পায়চারি করল। একবার তো ম্যাক্সওয়েলের এতটা কাছে চলে গেল যে তার বোঝা উচিত ছিল ভদ্রমহিলার উপস্থিতি।

কিন্তু যে যন্ত্রটি ডেস্কে বসে সে তখন আর মনুষ্য-পদবাচ্য নেই। সে একজন নিউ ইয়র্কের ব্যস্ত শেয়ার-ব্যবসায়ী। তাকে চালনা করতে প্যাঁচানো স্প্রিং আর ঘুরন্ত চাকা লাগে।

অনুবাদ : সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

"কী, কী ব্যাপার। কিছু হয়েছে?" ম্যাক্সওয়েল বেশ তীক্ষ্ম স্বরে প্রশ্ন করলো। তার টেবিলে তখন বরফের পাহাড়ের মতো খোলা চিঠির স্তূপ। তার চোখ তখন আর অন্য কিছুতেই নেই, অন্যমনস্ক ভাবে ক্ষণিকের জন্য, স্টেনোগ্রাফারের দিকে তাকালো।

"কিছু না" বলে ঈষৎ হেসে ভদ্রমহিলা সরে এলেন।

"মিঃ পিচার, গতকাল কি মিঃ ম্যাক্সওয়েল নূতন স্টেনোগ্রাফার নেওয়া সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেছেন?" মহিলার প্রশ্ন।

"হ্যাঁ বলেছিলেন" পিচার উত্তর দিল, "উনি আরেকজনকে যোগাড় করতে বলেছিলেন। আমি এজেন্সিকে জানিয়েছি কালই বিকেলে। কিছু নমুনা পাঠাতে বলেছিলাম আজ সকালে। এখন সকাল ৯-৪৫ মিনিট, কোনো সুন্দরীর টুপির দেখা তো পেলাম না এখনো।"

নবীনা তখন বললেন, "আমিই তাহলে যেমন করি সেভাবে কাজ করে দিই যতক্ষণ না কাউকে পাওয়া যায়।" সঙ্গে সঙ্গে মহিলা তার টেবিলে চলে গেলেন। আর যথাস্থানে তাঁর সোনালী ম্যাকাও পাখির পালক লাগানো কাল পাগড়িটা ঝুলিয়ে রাখলেন।

যে ব্যক্তি কাজের চাপের মধ্যে একজন ম্যানহাটনের শেয়ার-ব্যবসায়ীকে দেখবার সুযোগ পান নি তিনি নৃতত্ত্ববিদ হতে পারবেন না কোনদিন। কবি "গৌরবময় জীবনের কর্মময় প্রহর" জয়গান গেয়েছেন। শেয়ার-ব্যবসায়ীর পল-অনুপল পর্যন্ত কাজ দিয়ে ঠাসা। শুধু তাই নয়, কাজ যেন উপচে পড়ে।

আর এই দিনটা হারভী ম্যাক্সওয়েলের একখানা ব্যস্ত দিন ছিল বটে। টিকারের ভিতর দিয়ে বলকে বলকে কাগজের টুকরো বেরিয়ে আসছিল। ডেস্কের টেলিফোনটার ঘণ্টা বাজানোর অসুখ হয়েছিল—বাজনা তার থামছিলও না। তার অফিসে মানুষের ভিড়ের অন্ত ছিল না। বাইরে থেকেও বহু লোক তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করছিল। কেউ হাসিমুখে কথা বলছিল, কেউ ক্ষেপে ছিল, কেউ গালিগালাজ করছিল, কেউ বা উত্তেজিত ছিল। অল্পবয়সী ছেলেরা ছোটাছুটি করছিল খবর নিয়ে টেলিগ্রাম নিয়ে। অফিসের মধ্যে কেরানীরা ঝড়ে-পড়া নাবিকদের মতো লাফাচ্ছিল। এমন কি মিঃ পিচারের মুখটাকেও মনে হচ্ছিল যেন খানিকটা জ্যান্ত ভাব পেয়েছে।

শেয়ার এক্সচেঞ্জে, তখন ঝঞ্ঝা, ধস, বরফঝড়, হিমবাহ অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছিল আর তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল শেয়ার-ব্যবসায়ীদের অফিসে। ম্যাক্সওয়েল তখন চেয়ারটাকে দেয়ালের দিকে ঠেলে দিয়ে বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে নেচে নেচে কাজ করছে। একবার টিকার থেকে ঝাঁপ দিয়ে গেল টেলিফোনে তার পরেই দৌড়চ্ছে ডেস্ক থেকে দরজার দিকে। সার্কাসের ক্লাউনই একমাত্র এত ক্ষমতা রাখে।

এত কর্মকাণ্ডের মধ্যে হঠাৎ ম্যাক্সওয়েল দেখল তার খুব কাছে একগুচ্ছ

গোটানো সোনালী চুল। চুলের ওপর ভেলভেটের সামিয়ানা, তাতে উটপাখির নখ লাগানো। এছাড়াও রয়েছে নকল সীলমাছের একটা জোব্বা আর একটা বড়-বড় বাদামের মালা যেটা প্রায় মাটিতে গিয়ে ঠেকেছে আর তার প্রান্তে একটা রুপোর হৃদয় লটকানো রয়েছে। এ-সমস্তর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন একজন আত্মস্থ ভদ্রমহিলা আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মিঃ পিচার।

"মহিলা স্টেনোগ্রাফার'স এজেন্সি থেকে কাজটার জন্য দেখা করতে এসেছেন," পিচার বললো।

ম্যাক্সওয়েলের হাতভর্তি তখন চিঠিপত্র আর টিকারের কাগজ। অর্ধেকটা ঘুরে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, "কাজ—কোন কাজ?"

"স্টেনোগ্রাফারের কাজ। গতকাল আপনি ওদের টেলিফোন করে আজ সকালে একজন লোক পাঠাবার কথা বলতে বলেছিলেন আমায়।" পিচারের উত্তর।

"তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে পিচার," ম্যাক্সওয়েল বললো, "আমি তোমাকে কী জন্যে এ কাজ করতে বলব? এক বছর মিস্ লেসলী এখানে কাজ করছেন, আমরা তাঁর কাজে পরিপূর্ণ ভাবে তুষ্ট। তিনি যতদিন চান ততদিন এখানে থাকতে পারেন। ম্যাডাম, এখানে কোনো কাজ খালি নেই। এজেন্সিকে বলো, পিচার, আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই আর আমার কাছে অন্য কাউকে এনো না।"

রুপোর হৃদয় অফিস ত্যাগ করলেন রেগে এবং অফিসের আসবাবে ঠোক্কর খেতে খেতে। পিচার একটু সময় পেতে খাজাঞ্চিকে বলল, 'বুড়ো' প্রতিদিনই আরো অন্যমনস্ক আরো ভুলোমনের হচ্ছে।

কাজের চাপ আর গতি আরো বাড়তে লাগল। বাজারে আধ ডজন শেয়ার, যাতে ম্যাক্সওয়েলের মক্কেলরা অনেক টাকা খাটিয়েছে, মার খাচ্ছিল। কেনাবেচার হুকুম প্রায় বলাকার গতির মতো যাতায়াত করছিল। ওর নিজের কিছু শেয়ারে অবস্থাও খারাপ ছিল আর লোকটা কাজ করছিল একটা যন্ত্রের মতো—তেমনি টানটান, তেমনি গতি, তেমনি শক্ত এবং তেমনি মসৃণ। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ, ঠিক নির্দেশ দিচ্ছিল ঘড়ির কাঁটার মতো। এ এক অন্য জগৎ—এখানে শুধু আছে স্টক আর বণ্ড, ধার আর তমসুক, লাভ আর বন্ধকী—এটা বিত্তের রাজ্য, এখানে মানুষ আর প্রকৃতির ঠাঁই নেই।

দুপুরের খাবারের সময় এগিয়ে এলে কাজের চাপটাও থিতিয়ে এল।

ম্যাক্সওয়েল দাঁড়িয়ে আছে তার ডেস্কের পাশে। হাতভর্তি টেলিগ্রাম আর নির্দেশনামা। ডান কানের ওপর একটা কলম গোঁজা, চুলগুলো এলোমেলো ভাবে এসে পড়েছে কপালের ওপরে। সামনের জানলাটা খোলা কারণ ধরাধামে প্রিয় ঋতু বসন্ত সমাগতা ফলে বাতাসে ঈষৎ উষ্ণতার আভাস।

জানলা দিয়ে ভেসে এল একটা সুগন্ধ। একটু হারিয়ে যাওয়া একটু মিষ্টি মৃদু একটা গন্ধ। লাইলাক ফুলের। কিছুক্ষণের জন্য ব্যস্ত ব্যবসায়ী স্থাণু হয়ে গেল। গন্ধটা মিস্ লেসলীর সঙ্গে যুক্ত। একমাত্র তারই নিজস্ব আর কারুর না।

গন্ধটা তাকে একদম স্পষ্ট ভাবে হাজির করল যেন সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিত্তের জগৎ ছোট হয়ে ধূলিকণা হয়ে গেল। সে তো পাশের ঘরে—কুঁড়ি পা গেলেই।

ম্যাক্সওয়েল অনুচ্চ স্বরে বলল, "দুত্তোরি, এখনই করব। এখনই ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। এতদিন যে কেন করিনি কে জানে।"

ছুটে সে পাশের ঘরে ঢুকলো কিন্তু চেষ্টা করলো তার তাড়াটাকে লুকোতে। সটান গিয়ে হাজির হল স্টেনোগ্রাফারের ডেস্কের সামনে।

মহিলা মুখ তুললো। হাসিমুখ। গণ্ডদেশে একটা রক্তিম আভা ছড়িয়ে গেল। চোখদুটো মমতায় ভরা, বিশ্বাসে ভরপুর। ম্যাক্সওয়েল ডেস্কের ওপর একটা কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়াল। হাতে তখনো কাগজগুলো ধরা। কানে গোঁজা কলম।

"মিস্ লেসলী" খুব তাড়াতাড়ি শুরু করল সে, "আমার হাতে সামান্য একটু সময় আছে। আর সেই সময়টুকুর মধ্যে আমি একটা কথা তোমায় বলতে চাই। তুমি কি আমায় বিয়ে করবে? যে ভাবে মানুষ সাধারণত প্রেম করে সে ভাবে করবার সময় আমার নেই, কিন্তু আমি তোমায় খুউব ভালবাসি। তাড়াতাড়ি উত্তর দাও, লক্ষ্মীটি—ওদিকে ইউনিয়ন প্যাসিফিককে ওরা মেরে তক্তা বানিয়ে দিল।"

"তুমি কী বলছ কী" নবীনা বলে উঠল। সে উঠে দাঁড়াল আর গোল-গোল চোখ করে ম্যাক্সওয়েলের দিকে তাকিয়ে রইল।

ম্যাক্সওয়েল ওদিকে অস্থির হয়ে উঠেছে। সে বলল, "বুঝছ না কেন? আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। আমি তোমায় ভালবাসি মিস্ লেসলী। সময় খুঁজছিলাম কথাটা বলার জন্য। একটু ফুরসত পেতেই তোমায় বলতে ছুটে এলাম। ওই ফোন বাজছে। পিচার, ওদের একটু ধরতে বলো। তুমি রাজী হবে না মিস্ লেসলী?"

স্টেনোগ্রাফার বড্ড অদ্ভুত ব্যবহার করলো। প্রথমটা সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারপর তার বিস্মিত চোখে নেমে এলো অশ্রুধারা। আর তারপর সেই চোখের জলে মিশল আলো-করা হাসি। অতি মমতাভরে এক হাত দিয়ে সে ব্যবসায়ীর গলা জড়িয়ে ধরল।

নম্রকণ্ঠে বললো, "এখন বুঝতে পারছি। এই বিচ্ছিরি ব্যবসার চাপে আর সব কিছু তুমি ভুলে গেছ। আমি না প্রথমটা একটু ভয় পেয়েছিলাম। হারভী, তোমার মনে নেই গতকাল সন্ধ্যাবেলা আটটার সময় আমাদের পাড়ার গীর্জায় তোমার আর আমার বিয়ে হয়ে গেছে।"

বাঁদরের থাবা

ডবলিউ ডবলিউ জেকব্‌স (১৮৬৩-১৯০০)

রাত্রে ঠান্ডা ছিল না। ভিজে আবহাওয়াও নয়। তবু লেক্সনাম ভিলার ছোট্ট বৈঠকখানার পর্দাগুলো টানা ছিল। আগুনও জ্বলছিল বেশ উজ্জ্বলভাবে। দাবা খেলতে বসেছিলেন বাবা আর ছেলে। বাবা মিঃ হোয়াইট দাবা খেলার ব্যাপারে নানারকম মৌলিক পরিবর্তন আনার কথা প্রায়ই ভাবতেন। কিন্তু তিনি তাঁর রাজাটিকে এমন এক জায়গায় চাললেন যে তাঁর স্ত্রী মিসেস হোয়াইটও কথা না বলে থাকতে পারলেন না। সাদা চুলের বুড়িটি এতক্ষণ আগুনের পাশে একমনে সেলাই করে যাচ্ছিলেন।

খুব দেরি হয়ে গেলেও মিঃ হোয়াইট বুঝলেন তিনি মারাত্মক ভুল করে বসেছেন। তিনি বলে উঠলেন, 'কিসের শব্দ ভেসে আসছে না?' তিনি চাইছিলেন তাঁর ভুল যেন ছেলে দেখতে না পায়।

ছেলে হার্বার্ট মনোযোগ দিয়ে ছকটি দেখতে দেখতে বলল, 'হ্যাঁ শুনছি।' তারপর হাতটা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, কিস্তি।'

মিঃ হোয়াইট দাবার ছকের উপর তাঁর হাতটা বাড়িয়ে রেখে বললেন, 'মনে হয় না তিনি আজ রাত্তিরে আসবেন।'

ছেলে হার্বার্ট শুধু উত্তরে বলল, 'কিস্তিমাত'।

মিঃ হোয়াইট হঠাৎ যেন রেগে উঠলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'এত দূরে থাকার কোনো মানে হয়! অনেক জঘন্য পাঁকে ভরা, পোড়ো জায়গা দেখেছি বাবা, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি। ফুটপাতগুলো খানায় খন্দে ভরা— রাস্তায় যেন জলের স্রোত বইছে। জানি না লোকেরা কী ভাবে। মনে হয় তাদের কিছু এসে যায় না। কেননা রাস্তার মাত্র দুটো বাড়িই তো থাকবার মতো।'

স্ত্রী মিসেস হোয়াইট সান্ত্বনা দেওয়ার মতো বললেন, 'মন খারাপ কোরো না। পরের গেমে তো তুমিও জিততে পারো।'

মা ছেলের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় হল। সেদিকে চোখ পড়ল মিঃ হোয়াইটের। তিনি চুপ করে গেলেন। অপরাধীর মতো মুখ করে তিনি হাসার চেষ্টা করলেন। তাঁর পাতলা ধূসর দাড়ির মধ্যে সেই হাসি মিলিয়ে গেল।

অনুবাদ : সমর মিত্র

গেট খোলার শব্দ হল জোর। দরজার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল একটা ভারী পদধ্বনি। 'ওই যে তিনি আসছেন।' বলল হার্বার্ট হোয়াইট।

মিঃ হোয়াইট তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন, দরজা খুলে দিলেন এবং তাঁর আসতে কষ্ট হয়েছে বলে দুঃখপ্রকাশ করতে লাগলেন। নবাগত অতিথিও স্বীকার করলেন তাঁর একটু কষ্ট হয়েছে। মিসেস হোয়াইট ঘর থেকেই এসব কথা শুনে লজ্জিত হয়ে পড়লেন। মিঃ হোয়াইট লম্বা, মোটাসোটা ছোট ছোট চোখ এবং লালমুখ একজন লোককে সঙ্গে করে ঘরে ঢুকলেন। আস্তে করে কাশলেন মিসেস হোয়াইট।

মিঃ হোয়াইট বললেন, 'ইনিই সার্জেণ্ট মেজর মরিস।'

সার্জেণ্ট মেজর করমর্দন পর্ব সারলেন। বসে পড়লেন আগুনের পাশে একটা চেয়ারে। হুইস্কি এবং গ্লাস বার করলেন মিঃ হোয়াইট। তামার কেটলিটা আগুনের উপর। মরিসের দৃষ্টি এ সবের দিকেই।

তৃতীয় গ্লাস হাতে নিয়ে সার্জেণ্ট মেজরের চোখগুলো আরও জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল। তিনি কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁর চওড়া কাঁধ চেয়ারে ছড়ানো। তিনি বলে চলছিলেন অদ্ভুত সব দৃশ্যের কথা। তাঁর সাহসে ভরা কাজের কথা, যুদ্ধ প্লেগ এবং অদ্ভুত সব মানুষের কথাও।

মিঃ হোয়াইট স্ত্রী আর পুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একুশ বছর হয়ে গেল। যখন মরিস চলে যায় তখন ও সদ্যযুবক। আর আজ ওকে দেখ।'

মিসেস হোয়াইট মৃদুস্বরে বললেন, 'কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে তো মনে হয় না।' 'আমি নিজে একবার ভারতে যেতে চাই,' বললেন মিঃ হোয়াইট, 'নিজের চোখে সব কিছু দেখব আর কি।'

সার্জেণ্ট মেজর মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বেশ তো আছেন এখানে।' তিনি খালি গ্লাসটা মুখ থেকে নামালেন। হালকা একটা নিশ্বাস ফেললেন। মাথা ঝাঁকালেন আবার।

মিঃ হোয়াইট বললেন, 'আমি ওইসব পুরনো মন্দির, ফকির আর যাদুকরদের দেখতে চাই। আচ্ছা মরিস, আপনি সেদিন বাঁদরের থাবা না কী একটা জিনিসের কথা বলতে শুরু করেছিলেন না?'

মরিস তাড়াতাড়ি বললেন, 'কিছু না। শোনার মত কিছুই নয়।'

মিসেস হোয়াইট উদ্গ্রীব হয়ে বললেন, 'বাঁদরের থাবা?'

সার্জেণ্ট মেজর তাড়াতাড়ি বললেন, 'আপনারা বোধ হয় একে ভোজবাজি বলতে পারেন।'

তিনজন শ্রোতা সাগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। মরিস অন্যমনস্ক-ভাবে খালি গ্লাসটাই তাঁর মুখে তুলে ধরে আবার সেটি টেবিলে নামালেন। খালি গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিলেন মিঃ হোয়াইট।

সার্জেণ্ট মেজর পকেট হাতড়াতে লাগলেন। বললেন, 'একটা ছোট্ট সাধারণ থাবা। শুকিয়ে মমি হয়ে গেছে।'

তিনি পকেট থেকে জিনিসটি বার করলেন। রাখলেন সামনে। মিসেস হোয়াইট একটু পিছিয়ে গেলেন ভয়ে। কিন্তু ওঁর ছেলে হাতে নিল ওটা। দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

ছেলের হাত থেকে থাবাটি নিলেন মিঃ হোয়াইট। ভালো করে দেখলেন, তারপর বললেন, 'এর বিশেষত্বটা কি?' টেবিলের উপর রাখলেন থাবাটি।

'একজন বুড়ো ফকির এই থাবাটিকে মন্ত্র পড়ে জাগিয়েছিলেন! ফকিরটি ছিলেন খুব ধার্মিক। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন ভাগ্যই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। যাঁরা একে আটকাতে চায়, তারা শুধু দুঃখকেই ডেকে আনে। তিনি থাবাটিকে মন্ত্রপূত করেছিলেন, থাবাটি তিনজন মানুষের তিনটি করে ইচ্ছাপূরণ করবে।'

এই সব কথা শুনতে শুনতে ওঁদের মুখে একসময় হাল্কা হাসি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর কথা বলার ভঙ্গীটি এতই মনোরম ছিল যে, একসময় তাঁদের মনে হল, এমনভাবে হাসা ঠিক হয়নি।

হার্বার্ট বুদ্ধিমানের মতো বলল, 'আচ্ছা, আপনি আপনার তিনটে ইচ্ছের কথা বলেন নি কেন?'

প্রগল্‌ভ তরুণদের দিকে যেভাবে মধ্যবয়স্করা তাকায়, ঠিক সেইভাবেই মরিস তাকালেন হার্বার্টের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি বলে-ছিলাম।' তাঁর ব্রণে ভরা মুখটি সাদা দেখাল।

মিসেস হোয়াইট জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি কি আপনার তিনটে ইচ্ছেই পূরণ হয়েছিল?'

'হয়েছিল,' বললেন সার্জেণ্ট মেজর। শক্ত দাঁতে গ্লাসটি তিনি ঠক্‌-ঠক্‌ করে ঠুকলেন।

'আর কেউ কি কিছু চেয়েছিল?' বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন।

'একজন তার তিনটে ইচ্ছের কথা প্রকাশ করেছিল।' সার্জেণ্ট মেজর উত্তর দিলেন। 'প্রথম দুটি ইচ্ছে কী ছিল জানি না। তৃতীয়টিতে সে চেয়েছিল তার মৃত্যু। আর তারপর থাবাটি চলে আসে আমার হাতে।'

মরিসের গলার স্বর ছিল গম্ভীর। তাই পরিবেশ হয়ে উঠেছিল থমথমে। সবাই অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করে মিঃ হোয়াইট বললেন, 'মরিস, এর প্রয়োজন তো আপনার কাছে ফুরিয়ে গেছে; তাহলে আর এটাকে আপনার সঙ্গে রেখেছেন কেন?'

মরিস তাঁর মাথা নাড়লেন তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'নিছক শখ বলতে পারেন। ভেবেছিলাম এটাকে বিক্রি করে দেব। কিন্তু বিক্রি হবে বলে মনে হয়

না। অপকার যা করার তা ইতিমধ্যেই থাবাটি করে ফেলেছে। তাছাড়া কেউ এটা কিনতেও চাইবে না। কারণ সবাই মনে করে এটা একটা গল্পকথা। কেউ কেউ হয়ত অন্য কিছু ভাবে। কিন্তু তারাও চায় আগে পরখ করে দেখতে। তারপর টাকার কথা।'

মিঃ হোয়াইট ভালোভাবে মরিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি তো আপনার আরও তিনটে ইচ্ছের কথা বলতে পারেন? সেগুলো কি পূরণ হবে?'

মরিস বললেন, 'আমি জানি না, সত্যি আমি জানি না।'

তিনি থাবাটি হাতে নিলেন। দুটি আঙুলে টিপে ধরে দোলাতে লাগলেন সেটিকে। তারপর হঠাৎ ছুঁড়ে দিলেন আগুনের উপর। মুখে ছোট্ট একটা শব্দ করে উঠলেন হোয়াইট। তারপর ঝুঁকে পড়ে থাবাটি ছিনিয়ে নিলেন।

'এটা বরং পুড়েই যাক,' শান্ত আর গম্ভীর গলায় বললেন মরিস।

'মরিস, আপনি তো আর থাবাটাকে চান না। তাহলে এটা আমার কাছেই থাক,' মিঃ হোয়াইট বললেন।

মরিস কঠোর গলায় বললেন, 'না, আমি আগুনে ফেলে দেব থাবাটাকে। আপনি সঙ্গে রাখতে পারেন। কিন্তু যা ঘটবে তাতে আমাকে যেন দোষ দেবেন না। তাই বলি, বুদ্ধিমান লোকের মত থাবাটিকে ফের আগুনেই ফেলে দিন।'

হোয়াইট মাথা নাড়লেন। খুব খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তাঁর নতুন সম্পত্তিটিকে। তারপর বললেন, 'আচ্ছা বলুন তো এবার, কীভাবে ইচ্ছের কথা বলতে হয়।'

'থাবাটাকে ডান হাতে তুলে ধরুন তারপর আপনার ইচ্ছের কথা জোরে বলুন,' সার্জেণ্ট মেজর বললেন, 'কিন্তু ফের এর ফল সম্পর্কে আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি।'

'একেবারে আরব্যরজনীর মতো মনে হচ্ছে,' বললেন মিসেস হোয়াইট। তিনি উঠে পড়লেন। রাত্রের খাবারগুলো সব ঠিকঠাক করতে হবে। একটু হেসে তিনি বললেন, 'তুমি যেন আমার জন্যে চার জোড়া হাত চেয়ে বোসো না।'

মিঃ হোয়াইট পকেট থেকে থাবাটি বার করলেন। সার্জেণ্ট মেজর তাঁর হাতটি ধরে ফেললেন তাড়াতাড়ি। কর্কশ গলায় বলে উঠলেন, 'যদি কিছু চাইতেই হয়, তাহলে বরং ভালো কিছু চান।' তিনি যেন সবাইকে সাবধান করে দিতে চাইছিলেন। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে তিনজনেই হেসে উঠলেন।

মিঃ হোয়াইট ফের তাঁর পকেটেই পুরে ফেললেন থাবাটি। চেয়ারগুলো ঠিকঠাক করা হল। সবাই উঠে গেলেন খাবার টেবিলে। খাওয়া-দাওয়া চলতে লাগল। থাবাটির কথা প্রায় ভুলেই গেলেন সবাই। তিনজন শ্রোতা ভারতে মরিসের সৈনিক জীবনের দুর্ধর্ষ সব ঘটনার কথা মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন।

মরিস ঠিক সময়েই থামলেন। কারণ তাঁকে শেষ ট্রেনটি ধরতে হবে। মরিস চলে গেলেন। বাড়ির দরজা বন্ধ হল।

হার্বার্ট বলল, 'উনি যে সব গল্প বলছিলেন তার চেয়ে বোধ হয় এই বানরের থাবার গল্পটা বেশি বিশ্বাসযোগ্য নয়। এটাকে নিয়ে তোমার খুব একটা লাভ হবে না বাবা।'

মিসেস হোয়াইট বললেন, 'এর জন্যে তুমি কি ওঁকে কিছু দিয়েছ?'

'সামান্য কিছু,' তিনি একটু বাড়িয়ে বললেন, 'মরিস নিতে চান নি। আমি ওঁকে জোর করেই দিলাম। উনি আবার আমাকে বললেন ওটাকে ফেলে দিতে।'

হার্বার্ট ভয়ের ভান করে বলল, 'ভালই বলছিলেন।' তারপর হালকাভাবে সে বলল, 'কেন আমরা তো বড়লোক হয়ে যাব। চারিদিকে নাম ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের সুখের আর শেষ থাকবে না। বাবা, তুমি বরং প্রথমে রাজা হতে চাও। তাহলে দেখবে তোমাকে আর মায়ের কথামত ওঠ-বোস করতে হবে না।'

রাগের ভান করে মিসেস হোয়াইট চেয়ারের ঢাকনাটা হাতে নিয়েই ছেলের দিকে তেড়ে গেলেন। হার্বার্ট টেবিলের অন্যদিকে গিয়ে লুকলো।

মিঃ হোয়াইট তাঁর পকেট থেকে থাবাটি বার করলেন। সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইলেন জিনিসটার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'এর কাছে যে কী চাইব তা আমি জানি না। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হচ্ছে আমি যা চাই, সব পেয়ে গেছি।'

হাবার্ট বলল, 'বাড়িটার ব্যাপারে দেনা শোধ হলেই তো তুমি খুশি হও, তাই না! তাহলে এক কাজ করো তুমি। দুশো পাউণ্ড চাও। ওতেই কাজ মিটে যাবে।'

ছেলের হাত বাবার কাঁধে। মিঃ হোয়াইট তাঁর এই বিশ্বাসপ্রবণতার জন্য লজ্জিত হলেন। সেই লজ্জা তাঁর হাসিতেও ফুটে উঠল। তিনি থাবাটি ডান হাতে নিয়ে উপরে তুলে ধরলেন। হার্বার্ট গম্ভীর মুখ করে পিয়ানোর ধারে বসে পড়ল। বেশ কয়েকটা ভালো সুর তুলল। এরই মধ্যে মায়ের দিকে তাকিয়ে সে একবার চোখ টিপল।

মিঃ হোয়াইট স্পষ্ট গলায় বললেন, 'আমার চাই দুশো পাউণ্ড।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা সুন্দর গান বাজাল হার্বার্ট। আর মিঃ হোয়াইট ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। মিসেস হোয়াইট আর হার্বার্ট দৌড়ে গেলেন তাঁর দিকে।

ভীষণ ভয় পাওয়া গলায় তিনি বললেন, 'নড়ছিল ওটা।' মেঝেতে পড়েছিল থাবাটি। তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আবার বললেন, 'যখন আমি ওই কথাগুলো বললাম তখন থাবাটা আমার হাতের মধ্যে সাপের মত কিলবিল করে উঠল।'

হাবার্ট থাবাটি তুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর বলল, 'কই, তোমার টাকা কই ? আমি হলফ করে বলতে পারি ওই টাকা আর আসবে না।'

মিসেস হোয়াইট উদ্বেগের চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি বললেন, 'থাবা আবার নড়বে কেন ? ওটা তোমার ধারণা।'

মিঃ হোয়াইট মাথা নাড়লেন। বললেন, 'যাক্‌গে। ও কিছু নয়। এতে তো কোন ক্ষতি হয়নি। আমি কিন্তু চমকে গিয়েছিলাম।'

আগুনের ধারে তাঁরা আবার বসলেন। বাবা ও ছেলের মুখে পাইপ। বাইরে জোরে বাতাস বইছিল। ওপরতলার একটা দরজায় জোর শব্দ হচ্ছিল।

মিঃ হোয়াইটের চোখে ভয় ফুটে উঠল। একটা অস্বাভাবিক নীরবতা এবং অবসাদ যেন সবাইকে গিলে ফেলল। শেষে হোয়াইট দম্পতি উঠে পড়লেন। তাঁদের শোবার সময় হয়ে গেছে।

হাবার্ট তাঁদের শুভরাত্রি জানাল। বলল, 'মনে হচ্ছে তোমাদের বিছানার মাঝখানে একটা বড় থলের মধ্যে তোমরা টাকাটা পেয়ে যাবে। আর বাবা, তুমি যখন ওই টাকাটা পকেটে পুরবে, তখন দেখবে ওয়ার্ডরোবের ওপর থেকে একজোড়া ভয়ংকর চোখ তোমার ওপর নজর রাখছে।'

॥ ২ ॥

শীতের সকালের ঝলমলে রোদ টেবিলের উপর যেন খেলা করছিল। ব্রেক-ফাস্টে বসেছিলেন ওঁরা তিনজন। হাবার্ট গতরাত্রের ঘটনা নিয়ে হাসিঠাট্টা করছিল। সত্যি, সকালে ঘরটিতে বিন্দুমাত্র ভয়ের ছায়া ছিল না। আগের রাতটা ছিল কিন্তু ঠিক এর বিপরীত। আলমারির তাকের উপর অযত্নে পড়ে ছিল নোংরা, কোঁচকানো সেই থাবাটি। যেন নির্দোষ, নির্গুণ একটা জিনিস।

মিসেস হোয়াইট বললেন, 'অবসর নেওয়া সব সৈনিকই দেখছি সমান। আর আমরাও বোকার মত বসে বসে সব শুনলাম। আজকের দিনে ইচ্ছা পূরণের ঘটনা ঘটে ? তাই-ই যদিবা হল তবে ওই দুশো পাউন্ড তোমার ক্ষতি করতে পারে কিভাবে।'

হালকা গলায় হাবার্ট বলল, 'হয়ত আকাশ থেকেই বাবার মাথার উপর টাকাগুলো খসে পড়বে।'

মিঃ হোয়াইট বললেন, 'মরিস বলেছিলেন ঘটনাগুলো এত স্বাভাবিকভাবে ঘটে যে তোমরা ব্যাপারগুলোকে ইচ্ছে করলে দৈবের মত কোন ঘটনা না মনে করতেও পারো।'

হাবার্ট টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, 'আমি ফেরার আগে যেন টাকাটা

কোনোদিকে না তাকিয়েই ভদ্রলোক কথাগুলো বললেন।

কেউ কোনো উত্তর দিলেন না! মিসেস হোয়াইটের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টি স্থির। তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দও যেন শোনা যাচ্ছিল না। আর মিঃ হোয়াইট ভাবছিলেন, সার্জেণ্ট মেজরের কথাগুলো হয়ত এইভাবেই ফলতে শুরু করল।

ভদ্রলোক বলে চললেন, 'আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ম অ্যাণ্ড মেগিন্স সব দায়িত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের কোন দায়িত্বই নেই। কিন্তু আপনাদের পুত্রের কাজের স্বীকৃতিতে তাঁরা আপনাদের কিছু টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে চেয়েছেন।'

মিঃ হোয়াইটের শিথিল হাত থেকে তাঁর স্ত্রীর হাত পড়ে গেল। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। চোখমুখে আতঙ্ক নিয়ে তিনি তাকিয়ে রইলেন আগন্তুকের দিকে। তাঁর ঠোঁট শুকিয়ে গেল। কোন রকমে তিনি বলতে পারলেন, 'কত?'

'দুশো পাউণ্ড,' উত্তর এল।

মিসেস হোয়াইট চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু সে চিৎকার মিঃ হোয়াইটের কানে গেল না। তাঁর মুখে হাসির ছোঁয়া। তিনি অন্ধের মত তাঁর হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে। তারপর জ্ঞান হারিয়ে তালগোল পাকিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

॥ ৩ ॥

দু-মাইল দূরের নতুন বড় কবরখানায় তাঁদের প্রিয় পুত্রকে সমাহিত করে হোয়াইট দম্পতি বাড়ি ফিরে এলেন। বাড়িটি এখন শোকের ছায়া আর নির্জনতায় ভরা। ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে তাঁরা যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাঁদের মনে হচ্ছিল, হয়ত আরও কিছু ঘটবে। তাঁদের এই পাষাণভার হাল্কা হয়ে যাবে। এই বয়সে ওই ভার আর তাঁরা বইতে পারছিলেন না। কিন্তু দিন বয়ে চলল। আশা করতে করতে এক সময় তাঁরা যেন সব কিছু ঈশ্বরের পায়ে ছেড়ে দিলেন। তাঁদের এই আশাহীন আত্মসমর্পণ অনেক সময় ভুল করে অনেকে উদাসীনতা বলে মনে করল। অনেক সময় তাঁরা নিজেদের মধ্যেও কথা বলতেন না। কারণ তাঁদের কথা বলার আর কিছু ছিল না। তাঁদের দিনগুলি ছিল দীর্ঘ ক্লান্তিতে ভরা।

প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল। একদিন রাত্রে হঠাৎ মিঃ হোয়াইটের ঘুম ভেঙে গেল। হাত বাড়িয়ে তিনি বুঝতে পারলেন বিছানায় তিনি একা। ঘরে কোন আলো ছিল না। জানলার ধার থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ আসছিল। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তারপর নরম গলায় বললেন, 'বিছানায় এসো। তোমার

ঠাণ্ডা লাগবে।'

'কত আর ঠাণ্ডা লাগবে,' মিসেস হোয়াইট বললেন। ফের ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।

কান্নার শব্দ আর মিঃ হোয়াইটের কানে গেল না। গরম বিছানায় তাঁর চোখ জোড়া যেন জড়িয়ে আসছিল। তাঁর তন্দ্রা এসে গেল। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ পাগলের মতো চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। মিসেস হোয়াইট পাগলের মতো চিৎকার করে বললেন, 'বাঁদরের থাবা! বাঁদরের থাবা!'

মিঃ হোয়াইট চমকে উঠলেন। তাঁর চোখে মুখে ভয়। বললেন, 'কোথায় বাঁদরের থাবা? কী হল?'

মিসেস হোয়াইট টলমল করতে করতে তাঁর দিকে ছুটে এলেন। শান্ত গলায় বললেন, 'আমি সেটা চাই। তুমি নষ্ট করে ফেল নি তো?'

'বৈঠকখানায় রেখেছি, তাকের উপর। কিন্তু কেন?' তাঁর গলায় বিস্ময়।

মিসেস হোয়াইট কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি হেসে উঠলেন। নিচু হয়ে স্বামীর গালে ঠোঁট ছোঁয়ালেন।

প্রলাপের মতো তিনি বললেন, 'আমার কেবল এখনই মনে পড়ল। আগে কেন মনে পড়েনি? হ্যাঁ গো, তোমার কেন আগে একথা মনে হয় নি?'

'কিসের কথা তুমি বলছ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'কেন বাকি দুটো ইচ্ছের কথা? আমাদের তো কেবল একটা ইচ্ছে পূরণ হয়েছে।'

মিঃ হোয়াইট রেগে বললেন, 'যা হয়েছে, তা-ই কি যথেষ্ট নয়?'

'না,' জোর গলায় বললেন মিসেস হোয়াইট। আমাদের আরো একটা ইচ্ছে রয়েছে। নীচে যাও। থাবাটা তাড়াতাড়ি আনো। আর সেটা হাতে নিয়ে বলো, আমাদের বাছা আবার বেঁচে যাক।'

মিঃ হোয়াইট বিছানায় উঠে বসলেন। চাদরটা গা থেকে ছুঁড়ে ফেললেন। তারপর যেন ভয় পেয়ে চিৎকার করে বললেন, 'হে ভগবান, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

'নিয়ে এসো ওটা। শিগগির নিয়ে এসো। হাতে নিয়ে তোমার ইচ্ছের কথা বলো। আহা রে বাছা আমার,' বললেন মিসেস হোয়াইট।

মিঃ হোয়াইট দেশলাই জ্বেলে বাতি ধরালেন। গলায় জোর পেলেন না। তবু তিনি বললেন, 'বিছানায় চলে এসো। তুমি কী বলছ তা তুমি বুঝতে পারছ না।'

'আমাদের প্রথম ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। দ্বিতীয়টা পূরণ হবে না কেন?' যেন ঘোরের মধ্য থেকে বললেন মিসেস হোয়াইট।

মিঃ হোয়াইট শুধু বলতে পারলেন, 'ওটা ঘটে গেছে কোনক্রমে।'

'যাও ওটা নিয়ে এসো, তোমার ইচ্ছের কথা বলো,' চিৎকার করে বললেন মিসেস হোয়াইট। স্বামীকে দরজার দিকে ঠেলে দিলেন তিনি।

মিঃ হোয়াইট অন্ধকারে নীচে নামলেন। হাতড়ে হাতড়ে পেঁাছে গেলেন বৈঠকখানায়। তারপর সেই তাকে। থাবাটি সেখানেই ছিল। তাঁর ভীষণ ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল ঘর থেকে বেরুবার আগেই হয়ত তাঁর ক্ষতবিক্ষত ছেলে তাঁর সামনে এসে হাজির হবে। তিনি কাঁপছিলেন। হঠাৎ দেখলেন দরজায় যাবার পথ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। তাঁর ভ্রু ঘামে ঠাণ্ডা হয়ে এল। টেবিলের চারদিকে ঘুরে দেওয়াল ধরে ধরে তিনি বাইরে এলেন। হাতে তাঁর সেই অস্বস্তিকর জিনিসটি।

তিনি ঘরে ঢুকলেন। ত‌াঁর স্ত্রীর মুখের চেহারাই যেন পালটে গেল। মিঃ হোয়াইটের চোখেমুখে ভয় ফুটে উঠল। তিনি দেখলেন ত‌াঁর স্ত্রী অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে থাবাটির দিকে তাকিয়ে আছেন।

মিসেস হোয়াইট শক্ত গলায় বললেন, 'তোমার ইচ্ছার কথাটা বলো।'

'এটা ভালো হচ্ছে না, বোকার মত কাজ হচ্ছে,' কথাটা যেন মিঃ হোয়াইটের গলায় আটকে গেল।

'বলো তুমি,' ফের বললেন মিসেস হোয়াইট।

মিঃ হোয়াইট ত‌াঁর হাতটা তুলে ধরলেন। তারপর চিৎকার করে বললেন, 'আমার ছেলে আবার বেঁচে উঠুক।'

থাবাটা মেঝেতে পড়ে গেল। ভয়ে শিউরে উঠে মিঃ হোয়াইট থাবাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একসময় ক‌াঁপতে ক‌াঁপতে তিনি চেয়ারের মধ্যে ডুবে গেলেন। আর ত‌াঁর স্ত্রী জ্বলন্ত একজোড়া চোখ নিয়ে জানলার একধারে এসে দ‌াঁড়ালেন! টেনে খুলে দিলেন পর্দাটা।

মিঃ হোয়াইট বসে রইলেন। ঠাণ্ডায় যেন তিনি জমে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি তাকাচ্ছিলেন ত‌াঁর স্ত্রীর আবছা চেহারার দিকে। মিসেস হোয়াইটের দৃষ্টি জানলার বাইরে। বাতিটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। একটা ভৌতিক ছায়া পড়ছিল সিলিং আর ছাদের উপর। হঠাৎ দপ করে বাতিটা নিভে গেল। মিঃ হোয়াইট হ‌াঁফ ছেড়ে ব‌াঁচলেন।

না, থাবাটা এবারে আর কাজ দিল না। তিনি ত‌াঁর বিছানায় ফিরে এলেন। দু-এক মিনিট পরে ধীর পায়ে বিছানায় এলেন মিসেস হোয়াইটও। পাশে শুয়ে পড়লেন উদাসীনভাবে।

কেউ কোনো কথা বলছিলেন না। নীরবে ত‌াঁরা ঘড়ির টিকটিক শব্দ শুনে যাচ্ছিলেন। সিঁড়িতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হল। একটা ইঁদুর কিচমিচ করতে করতে দেওয়াল দিয়ে ছুটল। অন্ধকারটা যেন বুকে চেপে বসেছিল। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর মনে সাহস আনার জন্য মিঃ হোয়াইট দেশলাইয়ের

বাক্সটা নিলেন। একটা কাঠি জ্বাললেন। তারপর বাতি আনতে চললেন নীচে। সিঁড়ির গোড়ায় এসে দেশলাই কাঠিটা নিভে গেল। আর একটা কাঠি জ্বালবার জন্য তিনি যখন তৈরি হচ্ছেন ঠিক তখনই ঠক্-ঠক্ করে একটা শব্দ হল। শব্দটা হল খুব আস্তে। এত আস্তে যে কষ্ট করে শুনতে হয়। শব্দটা আসছিল একেবারে প্রথম দরজা থেকে।

দেশলাইটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। তিনি পাথরের মতো নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এমন সময় শব্দ হল আর একবার। তিনি পিছু ফিরলেন। দৌড়ে চলে এলেন ঘরে। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। ফের আওয়াজ হল ঠকঠক। সেই শব্দ সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল।

চমকে উঠে মিসেস হোয়াইট চিৎকার করে উঠলেন, 'কিসের শব্দ হচ্ছে?'

'একটা ইঁদুর। সিঁড়িতে আমায় পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল,' কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন মিঃ হোয়াইট।

মিসেস হোয়াইট বিছানার উপর উঠে বসলেন। কান তাঁর খাড়া। বেশ জোরে ঠকঠক করে শব্দ হল। সারা বাড়ি গমগম করে উঠল সেই শব্দে।

'আমার হার্বার্ট! আমার হার্বার্ট এসেছে,' চিৎকার করে বলে উঠলেন মিসেস হোয়াইট।

তিনি দৌড়ে চলে গেলেন দরজার দিকে। তাঁর সামনে তাঁর স্বামী। মিঃ হোয়াইট স্ত্রীর হাতটা জোর করে ধরে রইলেন।

খসখসে চাপা গলায় তিনি বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ?'

যন্ত্রের মতো হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে মিসেস হোয়াইট চিৎকার করে বললেন, 'আমার বাছা, আমার হার্বার্ট এসেছে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম—দু মাইল পথ পার হতে তো একটু দেরি হবেই। হ্যাঁ গো, তুমি কেন আমায় মিছি-মিছি ধরে রেখেছ। আমাকে যেতে দাও লক্ষ্মীটি। দরজাটা খুলতে দাও।'

'ভগবানের দোহাই, ওকে তুমি আসতে দিও না,' ঠক-ঠক করে কেঁপে উঠলেন মিঃ হোয়াইট।

'তুমি তোমার ছেলেকে ভয় পাচ্ছ। হার্বার্ট, আমি যাচ্ছি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে যেতে দাও।'

দরজায় আর একবার ঘা পড়ল। আর একবার। মিসেস হোয়াইট হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন। তারপর দৌড়লেন। মিঃ হোয়াইট সিঁড়ি পর্যন্ত এলেন। বলতে লাগলেন, 'দোহাই, তুমি যেও না, ফিরে এসো।' শিকল খোলার খড়খড় শব্দ কানে এল তাঁর। তলার শক্ত খিলটাও আস্তে আস্তে খুলে গেল। তারপর মিসেস হোয়াইটের ক্লান্ত হাঁফ-ধরা গলা তিনি শুনতে পেলেন—'এই খিলটার নাগাল পাচ্ছি না। তুমি এসো তো একবার।'

তখন মিঃ হোয়াইট তাঁর হাঁটু আর হাতের উপর ভর দিয়ে পাগলের মত

মেঝেতে থাবাটা খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। বাইরে যে আছে, সে ঘরে ঢোকার আগেই থাবাটিকে খুঁজে পেতে হবে।

সারা বাড়িতে ঠক-ঠক শব্দ ছড়িয়ে পড়ছিল। মিসেস হোয়াইট টানতে টানতে একটা চেয়ার আনলেন। দরজার সামনে রাখলেন। খিলটা ক্যাঁচ করে খুলে গেল। ফিরে এল নিজের জায়গায়। আর ঠিক সেই সময়েই থাবাটি হাতে ঠেকল মিঃ হোয়াইটের। তিনি পাগলের মতো চিৎকার করে বলে উঠলেন তাঁর তৃতীয় ও শেষ ইচ্ছার কথা।

হঠাৎ সেই শব্দ থেমে গেল। শুধু রয়ে গেল তার প্রতিধ্বনি। মিঃ হোয়াইট শুনতে পেলেন চেয়ার সরানোর শব্দ। শুনলেন দরজাটা খুলে গেল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। হতাশায় দুঃখে হাহাকার করে উঠলেন মিসেস হোয়াইট। মিঃ হোয়াইট সাহস ফিরে পেলেন। তিনি দৌড়ে গেলেন স্ত্রীর পাশে। তারপর আস্তে আস্তে গেট খুলে বাইরে। শব্দহীন জনহীন রাস্তার আলোগুলোকেই তিনি জ্বলজ্বল করে জ্বলতে দেখলেন।

স্বপ্ন

১৯১৭ সালের আগস্টে আমাকে একবার নিউ ইয়র্ক থেকে পেত্রোগ্রাদ যেতে হয়েছিল। তখন আমি যে কাজে নিযুক্ত ছিলুম সেই কাজের সুবাদে, এবং নিরাপত্তার কথা ভেবে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ভ্লাদিভোস্তকের পথে যেতে। আমি সেখানে সকালেই পেঁাছে গিয়েছিলুম এবং যতটা সম্ভব সুন্দর-ভাবে একটা অলস দিন কাটালুম। আমার যতদূর মনে পড়ছে সাইবেরিয়া পার হওয়া ট্রেনটার ছাড়ার কথা ছিল রাত নটায়। দুপুরের খাওয়াটা আমি স্টেশনের রেস্তোরাঁতেই সেরে নিলুম। রেস্তোরাঁটায় খুব ভিড় ছিল এবং আমি একটা ছোট টেবিল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাগ করে নিলুম যার হাবভাবে আমার বেশ মজা লাগছিল। লোকটি রাশিয়ার; লম্বা, কিন্তু অদ্ভুত স্বাস্থ্যবান চেহারা। আর তার ভুঁড়িটা এতই প্রকাণ্ড ছিল যে বাধ্য হয়ে তাকে টেবিল থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে বসতে হয়েছিল। তার শরীরের তুলনায় ছোট হাতগুলো দলাপাকানো চর্বিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। তার লম্বা কালো চুলগুলো এমন যত্ন করে মাথার মাঝখান দিয়ে উল্টে আঁচড়ানো ছিল যাতে টাকটা আড়াল হয়, আর, পরিষ্কার করে কামানো তার জোড়া থুতনিওলা বিশাল হলদে মুখটা তো তোমার অশ্লীল উলঙ্গ বলে মনে হবে। তার নাকটা ছিল ছোট যেন মাংসপিন্ডের ওপর একটা ছোট্ট কিম্ভুত বোতাম বসানো। কালো চকচকে চোখ দুটোও ছিল ছোট। কিন্তু তার মুখের গর্তটা ছিল বড়, লাল এবং কামুকের মত। একটি কালো পোশাকে সে যথেষ্ট পরিপাটি ছিল। সেটা ছেঁড়া না হলেও পুরনো; দেখে মনে হচ্ছিল গায়ে চড়ানোর পর থেকে সে ওটাকে না করেছে ইস্ত্রি না লাগিয়েছে বুরুশ।

রেস্তোরাঁয় পরিবেশনের ব্যবস্থাটা ছিল খুবই খারাপ এবং একজন পরি-চারকের মনোযোগ আকর্ষণ করা ছিল প্রায় অসম্ভব। আমরা খুব তাড়াতাড়ি আলাপ জমিয়ে ফেললুম। রাশিয়ান ভদ্রলোকটি বেশ ভাল এবং অনর্গল ইংরিজি বলছিল। তার উচ্চারণ অন্যরকম হলেও বিরক্তিকর নয়। সে আমার সম্পর্কে এবং আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী বিষয়ে নানান প্রশ্ন করেছিল, যার উত্তর (আমার পেশায় সতর্কতা একটা গুণ বলে ধরা হয়) আমি অন্তরঙ্গতার ভান করে দিয়েছিলুম। আমি তাকে বললুম, আমি একজন সাংবাদিক। সে আমায়

অনুবাদ: তাপস চৌধুরী

জিগ্যেস করল আমি গল্প লিখি কি না এবং যখন কথাপ্রসঙ্গে আমি স্বীকার করলুম লিখি, তখন সে সাম্প্রতিক রুশ ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করে দিল। সে বেশ বুদ্ধিমানের মত কথা বলছিল। এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে সে একজন শিক্ষিত মানুষ।

ইতিমধ্যে আমরা পরিচারককে আমাদের জন্যে কিছুটা বাঁধাকপির ঝোল আনতে বলে দিয়েছি এবং আমার পরিচিত মানুষটি তার পকেট থেকে একটা ভদকার ছোট বোতল বার করে তার থেকে কিছুটা নেওয়ার জন্য আমায় আমন্ত্রণ জানালো। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলুম না ভদকা না স্বাভাবিক কথার তোড় কোন্‌টা ওকে বেশ খোলামেলা করে তুলেছে। আপাতত সে আর কোনো প্রশ্ন না করে আমার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। সে একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয়, এটাই তাকে পেশায় আইনজীবী ও মৌলিক করে তুলেছে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছু ঝামেলা হওয়ায় তার দূর বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু এখন সে তার ঘরের পথে। ব্যবসাই তাকে ভ্লাদিভোস্তকে আটকে দিয়েছে, কিন্তু সপ্তাহখানেকের মধ্যে সে মস্কোয় যেতে পারবে বলে আশা করছে এবং আমি যদি সেখানে যাই সে আমায় দেখতে পেলে খুব খুশি হবে।

'আপনি বিয়ে করেছেন?' সে আমায় জিজ্ঞেস করল।

আমি খুঁজে পেলুম না এটার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু আমি তাকে বললুম, 'করেছি।' সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আমি একজন বিপত্নীক,' সে বলল। 'আমার স্ত্রী ছিল সুইজারল্যাণ্ডবাসী, জন্ম জেনেভায়। সে ছিল খুবই সুরুচিসম্পন্ন মহিলা। নিখুঁতভাবে ইংরিজি, জার্মান ও ইতালি ভাষায় কথা বলতে পারত। ফরাসি তো তার মাতৃভাষাই ছিল। আর রুশ ভাষার জ্ঞান একজন বিদেশীর তুলনায় যথেষ্ট ভাল ছিল। কদাচিৎ তার উচ্চারণে বেয়াড়া ঝোঁক খুঁজে পাওয়া যেত।'

ত্রে-ভীর্তে থালা সাজিয়ে একজন পরিচারক যাচ্ছিল, সে তাকে ডেকে জিগ্যেস করল, আমার মনে হয়—সেই সময় আমি খুব কম রাশিয়ানকেই চিনতুম—পরের খাবারটা পেতে আমাদের আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে? পরিচারকটি দ্রুত কথায় পুনরায় আশ্বস্ত করল এবং চলে গেল, আর আমার বন্ধুটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তারপর থেকে রেস্তোরাঁয়-রেস্তোরাঁয় ঘুরে বেড়ানো, অপেক্ষা করা আমার জীবনের একটা বীভৎস ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।' সে তার বিংশতিতম সিগারেটটি ধরালো এবং আমি আমার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সামান্য চমকে উঠে ভাবলুম, আমার চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে, তার আগে একটা বেশ তৃপ্তিকর খাবার নেওয়া দরকার।

'আমার স্ত্রী অসাধারণ মহিলা ছিল,' সে আবার কথা শুরু করল।

পেত্রোগ্রাদের অভিজাত ব্যক্তিদের কন্যারা যে সব ইস্কুলে পড়তো সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল ইস্কুলে সে ভাষা শিখেছিল। অনেকগুলো সুন্দর বছর আমরা সম্পূর্ণ বন্ধুর মত একসঙ্গে ছিলুম। সে যে কোন কারণেই হোক, সন্দিগ্ধমনা হয়ে উঠেছিল এবং দুর্ভাগ্যবশত সে আমায় উন্মাদ করার জন্যেই যেন ভালবাসত।'

মুখটাকে তুলে সোজা করে রাখা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। আমি যত কুৎসিত মানুষ দেখেছি তার মধ্যে সে পড়ে। কখনো-সখনো একজন লাল-মুখো আমুদে মোটা মানুষ নিশ্চয়ই আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু এইরকম একটা বিষণ্ন স্থূল ব্যাপার ছিল বেশ বিরক্তিকর।

'আমি যে তার প্রতি খুব বিশ্বস্ত এরকম কোনো ভান করতুম না। আমি যখন তাকে বিয়ে করেছিলুম তখন সে যুবতী ছিল না এবং আমরা দশ বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেছিলুম। সে ছিল ছোটখাটো রোগা, এবং তার গায়ের রঙও ভাল নয়। তার কথাবার্তাও বেশ বিশ্রী ছিল। সে ছিল এমন একজন মহিলা যে নিজের অধিকার ভোগ করার জন্যে একটা উগ্র আবেগে ভুগতো, এবং তাকে ছাড়া আমি অন্য কারো দিকে একটু মনোযোগ দিলে সে আমায় সহ্য করতে পারতো না। আমি জানি শুধুমাত্র মহিলাদের ব্যাপারেই নয়, আমার বন্ধুবান্ধব, আমার বেড়াল এবং আমার বইগুলোকেও সে হিংসে করতো। আমার অনুপস্থিতিতে সে একবার আমার একটা কোট বিলিয়ে দিয়েছিল, কারণ ঐ কোটটাই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু আমি একজন সমভাবাপন্ন মানসিকতার মানুষ। আমি অস্বীকার করব না সে আমায় ক্লান্ত করতো, আমি তার উগ্র মেজাজ একটা দৈব ঘটনা মনে করে মেনে নিতুম এবং এর বিরুদ্ধাচারী হওয়ার কথা মনেও আনতুম না, তার চেয়ে বরং খারাপ আবহাওয়া বা মাথায় ঠাণ্ডা লাগার বিরুদ্ধে যাওয়া আমার পক্ষে বেশি সহজ ছিল। যতদূর সম্ভব আমি তার অভিযোগগুলো অস্বীকার করতুম, এবং যখন সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠতো, আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিগারেট টেনে যেতুম।

'আমাকে নিয়ে সে যেভাবে একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়ে যেত তা আমাকে খুব বেশি প্রভাবিত করতো না। আমি আমার নিজের মত চলতুম। বস্তুত, কখনো-কখনো আমার জানার কৌতূহল হত যে এটা আমার ওপর তার প্রগাঢ় ভালবাসা, না যাচ্ছেতাই ঘৃণা। আমার মনে হত ভালবাসা ও ঘৃণা হয়তো খুবই কাছাকাছি সম্পর্কের।

'এইভাবে আমরা শেষ অধ্যায় পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যেতেও পারতুম যদি না একরাত্রে একটা দারুণ অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতো। আমার স্ত্রীর একটা মর্মভেদী আর্তনাদে আমি জেগে উঠলুম। চমকে উঠে জিগ্যেস করলুম কী হয়েছে। সে আমাকে বলল যে একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছে; সে স্বপ্ন

দেখেছিল আমি তাকে খুন করার চেষ্টা করছি। আমরা একটা বিশাল বাড়ির সবচেয়ে উঁচু তলায় থাকতুম, এবং ওপরে ওঠার ঘোরানো সিঁড়িগুলো ছিল বেশ চওড়া। সে স্বপ্ন দেখেছিল আমরা নিজেদের ঘরের ফ্লোরে পেঁছনোমাত্র আমি তাকে চেপে ধরে রেলিংয়ের ওপর দিয়ে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছি। নিচে পাথরের মেঝে, এবং এটা ছ'তলায়—এর অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু।

'সে ভীষণভাবে কাঁপছিল। আমি তাকে শান্ত করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলুম। কিন্তু পরের দিন সকালে এবং দু-তিন দিন পরেই সে আবার ঐ ঘটনাটার উল্লেখ করল, এবং আমি ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও দেখলুম যে, এটা তার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। এই স্বপ্নটা দিয়ে আমাকে এমনকিছু বোঝানো হচ্ছে যা আমি কখনোই সন্দেহ করিনি—এছাড়া আমি এটার সম্পর্কে অন্য আর কিছু ভাবতে পারছিলুম না। সে ভাবছিল আমি তাকে ঘৃণা করি, সে ভাবছিল আমি তার হাত থেকে মুক্তি পেলে খুশি হব; স্বাভাবিকভাবেই সে জানতো যে সে ছিল আমার কাছে অসহ্য, এবং কোনও এক সময় তার মনের মধ্যে এইরকম একটা ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, আমি তাকে খুন করতে পারি। মানুষের চিন্তা অসংখ্য এবং এমন সব ধারণা আমাদের মনের মধ্যে ঢুকে যায় যা স্বীকার করতে আমরা লজ্জা পাই। একেক সময় আমি চাইতুম যে সে তার কোনো প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে যাক, কখনো-কখনো কামনা করতুম একটা যন্ত্রণাহীন আকস্মিক মৃত্যু এসে আমাকে মুক্তি দিক; কিন্তু কক্‌খনো আমার মাথায় এ চিন্তা আসেনি যে কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এই অসহনীয় বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করবো।

'স্বপ্নটা আমাদের দুজনকার মনেই একটা অদ্ভুত ধারণার জন্ম দিয়েছিল। এটা আমার স্ত্রীকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল! সে কিছুটা তিক্ত ও বেশ সহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। কিন্তু যখন আমি আমাদের ঘরে যাবার জন্যে সিঁড়ি ভাঙতাম তখন রেলিংগুলোকে মন দিয়ে লক্ষ্য না করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠত। মনে হত সে যা স্বপ্ন দেখেছে সেটা করা কত সহজ। রেলিংগুলো ছিল বিপজ্জনকভাবে নিচু। একটা দ্রুত অঙ্গভঙ্গিতে এটা প্রকাশ পেত এবং ব্যাপারটা ঘটে যেত। আমার মন থেকে এই চিন্তাটাকে বাইরে বার করে দেওয়া শক্ত ছিল। তারপর কয়েক মাস পরে এক রাত্রে আমার স্ত্রী আমাকে ঘুম থেকে জাগালো। আমি খুব ক্লান্ত ছিলুম এবং রেগে গেলুম। সে ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল এবং কাঁপছিল। সে আবার ঐ স্বপ্নটা দেখেছে। সে হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লো এবং আমায় জিজ্ঞেস করলো আমি তাকে ঘৃণা করি কিনা। রাশিয়ায় যত সিদ্ধপুরুষ আছে আমি তাঁদের সবার নামে দিব্যি করে বললুম যে আমি তাকে ভালবাসি। অবশেষে সে আবার ঘুমতে গেল। আমার যা করণীয় ছিল তার থেকে আমি অনেক বেশি করেছিলুম। আমি জেগে শুয়ে রইলুম। আমার

মনে হচ্ছিল সিঁড়ির অনেক ওপর থেকে তাকে নিচে পড়তে দেখছি। তার তীক্ষ্ণ চিৎকার ও পাথরের মেঝেতে আছড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেলুম। আমি তাকে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারলুম না।'

রাশিয়ান ভদ্রলোকটি চুপ করলো, তার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল। সে কাহিনীটা এতই সুন্দরভাবে এবং স্বচ্ছন্দে বলে গিয়েছিল যে আমি মনোযোগ দিয়ে না শুনে পারিনি। বোতলে কিছুটা ভদ্‌কা পড়ে ছিল; সে সেটাকে ঢেলে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেললো।

'তা, আপনার স্ত্রী শেষ পর্যন্ত কিভাবে মারা গেলেন?' আমি খানিকটা ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলুম।

সে একটা নোংরা রুমাল বার করলো এবং তার কপালের ঘাম মুছলো।

'ঘটনাটি অদ্ভুতভাবে মিলে গিয়েছিল, কিছুদিন পরে, এক রাত্রে, তাকে ঘাড়-ভাঙা অবস্থায় একেবারে নিচের তলায় পাওয়া গেল।'

'কে তাকে দেখতে পেয়েছিল প্রথমে?'

'ভাড়াটেদের মধ্যেই একজন তাকে দেখতে পেয়েছিল, দুর্ঘটনা ঘটার একটু পরেই সে সেখানে এসে পড়েছিল।'

'আপনি তখন কোথায় ছিলেন?'

আমার কথা শুনে সে আমার দিকে এমন একটা ঘৃণা-মেশানো চতুর দৃষ্টিতে তাকালো যে আমি তার বর্ণনা দিতে পারবো না। তার ছোট কালো চোখ দুটো দিয়ে আগুন ঠিকরে বার হচ্ছিল।

'আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমি সেই সন্ধেটা কাটাচ্ছিলুম। দুর্ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে আমি সেখানে আসিনি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে পরিচারক আমাদের জন্যে মাংসের ডিশ নিয়ে এল যা আমরা আনতে বলেছিলুম এবং রাশিয়ানটি ক্ষুধার্তের মত তা খেতে আরম্ভ করেছিল। সে খাবারগুলো বড় চামচ দিয়ে পরিষ্কার করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রাসে মুখে ঢোকাতে লাগলো।

আমি অবাক হয়ে গেলুম। এইরকম একটা কষ্ট করে লুকনো শিষ্টাচারের মধ্যে দিয়ে সে কি আমাকে সত্যিই বলতে চাইছে যে সে-ই তার স্ত্রীকে খুন করেছিল? ঐ মোটা আর কুঁড়ে লোকটাকে কিছুতেই একটা খুনীর মত দেখাচ্ছিল না; আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলুম না যে তার এত সাহস হবে। নাকি আমার সঙ্গে একটা স্থূল রসিকতা করলো?

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার ট্রেন ধরার সময় হয়ে গেল। আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিলুম এবং তারপর আর কখনোই তাকে দেখিনি। কিন্তু আমি কোনদিনই আমার মনটাকে স্থিরভাবে বোঝাতে পারিনি যে সে সত্যি কথা বলছিল, নাকি ঠাট্টা করছিল!

বিস্ময়-বালক

টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫)

বিস্ময়-বালকটি প্রবেশ করতে হলঘর শান্ত হয়ে গেল।

এই নিঃশব্দের পর, একপাশে কোথাও শ্রোতাদের মধ্যে অগ্রণী একজন, জাত-সংগঠকও বটে, প্রথমে হাততালি দিলেন, আর তারপরই শ্রোতাদের হাততালি শুরু হয়ে গেল। শ্রোতারা কিছুই শোনেনি এখনো, তবু হাততালি দিচ্ছে। শক্তিশালী এক প্রচার-সংগঠন ওর সম্পর্কে প্রচার করেছে, ফলে জেনে না-জেনে আগে থেকে ওরা সম্মোহিত হয়েছিল।

রাজকীয় ফুল ও সাধারণ ফুলের সুন্দর কারুকাজকরা উজ্জ্বল পর্দার পেছন থেকে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে বালকটি মঞ্চের ওপর উঠে এল, এমনভাবে, যেন স্নানের জন্যে হাততালির ভেতরে ঝাঁপ দেবে এখনই, সামান্য ঠাণ্ডা ও কাঁপুনি স্নান হলেও চেনা পরিবেশের ভেতরে। মঞ্চের খুব সামনে এগিয়ে এল সে, হাসল এমন যেন এখানি ওর ছবি তোলা হবে। ছোট্ট মেয়ের মতই সুন্দর ও লাজুক ওর শুভেচ্ছাভঙ্গি।

সম্পূর্ণ সিল্কের পোশাকে ওর দাঁড়ানো শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। ছোট্ট সাদা কোট মানানসই তৈরী করা। কোটের ভেতরে আরো একটা কাপড় পর্দার মত, এমন কি জুতো জোড়াও সিল্কের তৈরী। সাদা মোজার ওপরে পায়ের খোলা অংশ বাদামী, কারণ সে একজন গ্রীক বালক।

সবাই ওকে বিবি স্যাকেল্লাফাই লাক্কাস বলে ডাকে, বাস্তবিক এটাই তার নাম। বিবি ওর ডাক নাম কিনা ব্যবস্থাপক ছাড়া কেউ জানে না এবং ব্যবসার কারণেই তা গোপন রাখা হয়েছে। বিবির মসৃণ কালো চুল কাঁধ পর্যন্ত জড়ানো, দুপাশে সরিয়ে সরু গম্বুজের মত কপাল থেকে সিল্কের ফিতে দিয়ে পেছনে বাঁধা রয়েছে। সরল ঠোঁটদুটো, নাকের গঠন অসম্পূর্ণ এখনো, সব মিলিয়ে ওর মুখ পৃথিবীর সবচেয়ে নির্দোষ বালকের মত। ঘনকালো চোখের মণিদুটো, ইঁদুরের মত ঐ চোখদুটোর নিচে সামান্য ক্লান্তির রেখা এর মধ্যে স্পষ্ট। বিবির বয়েস যদিও আট কিন্তু সাতবছরের ছেলে বলে ঘোষণা হয়েছে, যদিও সবাই বিশ্বাস করেছে একথা বলা শক্ত। এখন ন'বছরের বালকের মত দেখাচ্ছে ওকে। সম্ভবত সবাই এটা জানে. তবু মেনে নিয়েছে, অধিকাংশ ব্যাপারে যেমন ঘটে থাকে, সাধারণ মানুষ ধরেই নেয় সৌন্দর্যের সঙ্গে মিথ্যে একটু থাকবেই। সামান্য

অনুবাদ : অতীন্দ্রিয় পাঠক

ভানটুকুও যদি রাখতে না পারি, প্রতিদিনের একঘেয়ে জীবন থেকে কিভাবে আমরা উত্তেজনা পাব ? সাধারণ মানুষের এ ধরনের ভাবনা খুব অসংগত একথা বলা যায় না।

হাততালি চলল যতক্ষণ, বারবার নত হয়ে বিবি অভিনন্দন গ্রহণ করল, তারপর বড় পিয়ানোর সামনে উঠে গেল। শ্রোতারা আর একবার অনুষ্ঠানের অংশগুলি দেখে নিচ্ছে, প্রথমে 'মাশ কলোনেল', তারপর 'রেভেরি', তারপর 'লা ইবু এলে মনো', নিজের দেওয়া সুর এবং সবকটি সে একাই বাজাবে। খুবই স্বাভাবিক, স্বরলিপি সে নিজে তৈরী করতে পারে নি কিন্তু তার অসাধারণ ছোট্ট মাথায় এই সুরগুলি এসেছে। যথার্থ শিল্পের তাৎপর্য বহন করছে এই সুরগুলি, অন্তত অনুষ্ঠানসূচিতে এমন গম্ভীর ও নির্দিষ্ট প্রচার করা হয়েছে। প্রচারের ভাবখানা এই, কঠিন পরিশ্রমের পরই ব্যবস্থাপক এমন একটা ব্যাপার ঘটাতে পেরেছেন।

বিস্ময়-বালক এবার ঘোরানো টুলটির ওপর বসল, পাদুটো প্যাডেল ছুঁতে চেষ্টা করছে, ওগুলি কায়দা করে তোলা যাতে ওর পা ছুঁতে পারে। বিবির এটা নিজস্ব পিয়ানো, সব জায়গায় সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কাঠের পায়ার ওপর আটকানো, বারবার বয়ে বয়ে পালিশ নষ্ট হয়েছে, তবু সব মিলিয়ে ব্যাপারটা আকর্ষণীয়।

সিল্কের জুতো-পরা পা-দুটো প্যাডেলে রাখবার সময় বিবি বেশ দক্ষ মুখভঙ্গিতে শ্রোতাদের দেখল এবং ডানহাত তুলল। ছোট্ট বালকের বাদামী হাত কিন্তু কব্জিগুলো শক্ত এবং শিশুর মত নয়, পরিণত হাড় দিয়ে তৈরী।

এইরকম ভঙ্গি তাকে করতে হয় কারণ বিবি জানে, শ্রোতাদের একটু আনন্দ দিতে হবে। এতে ব্যক্তিগত ভাল লাগার ব্যাপারও থাকে, অন্যদের কাছে কখনো প্রকাশ করতে পারে না। এই খোলা পিয়ানোর সামনে যখনই সে মুখোমুখি হয়, সেই খোঁচা দেওয়া আনন্দ, আতঙ্কিত অথচ গোপন সুখ, এসব তার সঙ্গী হয়েছে। এবং এখানে সেই চাবিফলকটি আবার, সেই সাতটি সাদা ও কালো অষ্টক, যেখানে অন্তহীন রোমাঞ্চকর অভিযানে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, অথচ চাবিফলকটি প্রতিবারই দেখায় পরিচ্ছন্ন স্পর্শহীন একটি কৃষ্ণফলক মাত্র। সেই সঙ্গীতের সাম্রাজ্য তার সামনে ছড়িয়ে থাকে, তার সমুদ্রে সে ঝাঁপ দেয় আনন্দে, সাঁতার কাটে, নিজেকে নতুন করে জন্ম দিয়ে স্বচ্ছন্দে বয়ে যেতে দেয়, সেখানে রাত্রিতে, ঝড়ে আচ্ছন্ন হয়ে যেতে যেতেও বিন্যস্ত নিয়ন্ত্রণে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে—শূন্যে ভারসাম্য রেখে তার ডান হাত, যেন এই ভাবটিই প্রকাশ করছে এখন।

কিভাবে প্রথম সুরটি আসবে ?—হলঘরে শ্রোতারা এখন এই রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে আছে। অবশেষে শুরু হল, বিবির তর্জনী পিয়ানো থেকে প্রথম সুরটা টেনে আনল, অপ্রত্যাশিত, মধ্যমাত্রায় বেশ শক্তিশালী সুর, প্রায়

ঢাকের শব্দের মত। এরপর সুর এগিয়ে চলল, একটা সূচনা তৈরী হতে শ্রোতারা স্বস্তিতে ফিরে এল।

প্রথম শ্রেণীর এক কেতাদুরস্ত হোটেলে চমৎকার ও বিরাট হলঘরে বাজনার আয়োজন হয়েছে। দেয়ালগুলিতে সলজ্জ দেহবাদী ঘরানার ছবি, ছবিগুলির ফাঁকে ফাঁকে আয়না বসানো, ফ্রেমগুলি সোনালী রঙের আরবী নক্সা করা। অলংকৃত স্তম্ভগুলি ওপরে উঠে ছাদ ছুঁয়েছে। তার নিচে বৈদ্যুতিক আলোময় এক ব্রহ্মাণ্ড যেন, আলোর স্তবকগুলি দিনের আলোর চেয়ে বেশী উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে, সমস্ত ঘরে সূক্ষ্ম সোনালীরঙের কাঁপুনি আলো। একটিও বসার জায়গা খালি ছিল না, অনেকে পাশের ফাঁকা জায়গায় ও পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম সারির আসনগুলি বারো মার্কের, ব্যবস্থাপকের বিশ্বাস, ভালো জিনিস দেখার জন্যে যথাযথ মূল্য দিতে হয়। এই আসনগুলি অভিজাত লোকেরাই সংগ্রহ করেছেন কারণ এদের মধ্যেই উৎসাহ বেশী লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ঐ সারিতে শিশুরাও বসেছে, চেয়ারে বসে ওদের পাগুলি সহজভাবে দুলছে, উজ্জ্বল চোখে ওরা স্থিরভাবে দেখছে ওদের সমবয়সী সাদা পোশাকের ঐ প্রতিভাবান বালকটিকে।

সামনে বাঁ দিকে বসেছেন বালকটির মা, প্রসাধন-করা জোড়া চিবুক, পালকের টুপি মাথায় অস্বাভাবিক মোটা চেহারার মহিলা। তাঁর পাশে ব্যবস্থাপক, প্রাচ্যদেশীয় চেহারা, জামার আস্তিনে চোখে পড়ার মত সোনার বোতাম। প্রথম সারির মাঝখানে রানী বসেছেন, ছোট্ট চেহারা কিন্তু বয়েস হয়েছে, সামান্য কোঁচকানো চামড়া। শিল্পের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক, বিশেষত যদি তা ভাবপ্রবণ হয়। মখমল-আঁটা হাতল-অলা চেয়ারে তিনি বসেছেন, পায়ের সামনে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে পারস্যদেশীয় গালিচা। মাথা একদিকে কাত হয়ে সিল্কশোভিত বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে রাখা, বিস্ময়-বালকের অনুষ্ঠান তিনি দেখছেন, সব মিলিয়ে তাঁর ভঙ্গিতে মার্জিত ও সংহত দৃশ্যের একটি ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর পাশে সবুজ ডোরাকাটা সিল্কের গাউন-পরা রানীর সহচরী। একমাত্র সহচরী বলেই চেয়ারে অত্যন্ত সোজা, উঁচু হয়ে তাঁকে বসতে হয়েছে।

বিবি শেষ করল দুর্দান্ত। কী আশ্চর্য শক্তিতে ঐ পুঁচকে ছেলেটা চাবিফলককে হয়রান করল। শ্রোতারা যেন নিজেদের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কুচকাওয়াজের বিষয়টা, তার ব্যাপ্ত দোলানো সুর, সহসা যেন মূর্ত হয়ে, আগাগোড়া ছন্দে সাহসী ও দৃশ্যময়। প্রতি সুরক্ষেপেই কোমর থেকে শরীরটা পিছিয়ে যাচ্ছিল এমন যেন কোনো বিজয়-মিছিলে সত্যিই সে কুচকাওয়াজ করছে। দ্রুত লয়ে শেষ করার পর শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকল। তারপর টুলের একপাশ থেকে নেমে হাততালির অপেক্ষায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে হাততালির বিস্ফোরণ। বিবির সৌজন্যভঙ্গি ছোট্ট মেয়ের মত, এবং সামনের সাধারণ শ্রোতারা ভাবল, 'কতটুকু পাছা ছেলেটার। হাততালি দাও, হাততালি দাও, দারুণ হে ছোট্ট খোকা, অ্যাক্রোফাইলাক্স বা যা খুশী হোক তোমার নাম। একটু দাঁড়াও, হাতের দস্তানাটা খুলে নিই আগে—সত্যিই কি দুষ্টু ছেলে।'

হাততালি শেষ হবার আগে বিবিকে অন্তত তিনবার পর্দার পেছন থেকে বেরিয়ে আসতে হল। কয়েকজন দেরিতে হলঘরে ঢুকেছে, ওরা বসার জায়গা খুঁজছে। এরপর অনুষ্ঠান আবার শুরু হল। বিবির 'রেভেরি' সুরটা একই পর্দায় বারবার ঘুরে-ফিরে একটা সুরের রেশ তার ওপরে যেন ভাঙা ডানায় কখনো কখনো ভেসে উঠছে। এরপর 'ল্য ইকু এলে মনো,' এই অংশটা চমৎকার সফল, সবার মনেই গভীর দাগ কাটল। এটি ছোটবেলার গভীর থেকে তুলে আনা স্বপ্ন, সবার মনে আশ্চর্য প্রতিফলিত হতে পেরেছে। যাদের সুরে পেঁচার প্রতিরূপ, আচ্ছন্ন চোখদুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিমর্ষ বসে আছে। সুরটা চড়ায় উঠতেই নির্লজ্জ ও ভীত চড়ুইপাখির কিচিরমিচির শব্দ। যখন শেষ করল, শ্রোতাদের উচ্ছ্বাসের সামনে বিবিকে বারবার আসতে হল। হোটেলের একটি ছোকরা বেয়ারা, তার পোশাকের বিভিন্ন অংশে চোখে পড়ার মত উজ্জ্বল বোতাম, বড়-বড় তিনটে মালা বয়ে নিয়ে গেল মঞ্চে। বিবি যখন ধন্যবাদ জানাতে মাথা নিচু করছিল, ঠিক তখনি তার গলায় মালাগুলি পরিয়ে দিচ্ছে। এমন কি রানীও এই হাততালিতে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁর হাতের তালুদুটো পরস্পরের মধ্যে হাল্কা ও নিঃশব্দ আঘাত করছিল।

শ্রোতাদের কিভাবে উসকে দিতে হয় ছোট্ট শয়তানটা সত্যিই তা জানে। পর্দার পিছনে ও দাঁড়িয়ে থাকে, শ্রোতারা যখন ওর জন্যে অপেক্ষা করছে, মঞ্চের সিঁড়িটায় ও একটু দেরি করে, ফুলের স্তবকগুলির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়—যদিও এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা ওকে যথেষ্ট ক্লান্ত করেছে। খুবই চমৎকার ওর মাথা নোয়ানোর ভঙ্গি, উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে শ্রোতাদের যথেষ্ট সময় দেয়, কেননা ও জানে, এই হাততালি মূল্যবান এবং তা সংক্ষিপ্ত করানো কখনোই উচিত নয়। 'ল্য ইকু-ই আমার তুরুপের তাস ;' সে ভাবল—এইরকম ভাবতে ব্যবস্থাপক ওকে শিখিয়েছে। 'এবার আমি ফ্যাণ্টাসীটা বাজাব, এটা ল্য ইকু থেকে যথেষ্ট ভাল, বিশেষ করে সি শার্প অংশটা। কিন্তু তোমরা বোকারা ইকু-কেই পছন্দ করলে যদিও আমার সবকটা সুরের মধ্যে এটা প্রথম এবং সবচেয়ে কাঁচা।' এই সব ভাবতে ভাবতেই সে তখনো হেসে মাথা নুইয়ে যাচ্ছিল।

এরপর বাজাল 'মেডিটেশন,' তারপর 'এতুক'—সমস্ত অনুষ্ঠান বেশ গোছানো। 'মেডিটেশন' অনেকটা রেভেরির মত—অন্তত ওর বিপরীত কিছু নয়—এবং 'এতুকে' বিবির যাবতীয় শিল্পদক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে

স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভাবনীশক্তির কিছু ঘাটতি ছিল। এবং তারপর এই 'ফ্যান্টাসী'। এটা তার সবচেয়ে প্রিয়, প্রতিবারই একটু-আধটু বদলে নেয়, একটু স্বাধীন হতে চেষ্টা করে এবং কখনো কখনো সুন্দর সন্ধ্যায় নিজের এই উদ্ভাবনী-শক্তিতে নিজেই বিস্মিত হয়।

একা, সবার থেকে আলাদা, বিশাল কালো পিয়ানোর সামনে বসে কত উজ্জ্বল সাদা এইটুকু ছেলেটা বাজাচ্ছে এখন। ওর চোখের নিচে ছড়িয়ে আছে অবিন্যস্ত মুখের সমুদ্র, বোধহীন ঐ ভারী মূর্তিগুলির জন্যে পরিশ্রম করছে ওর বিচ্ছিন্ন ও একক শিল্পীসত্তা। সাদা সিল্কের ফিতেয় বাঁধা কালো চুলের গুচ্ছ কপালে এসে পড়েছে, ওর দক্ষ ছোট কব্জিগুলো ভেঙে যাচ্ছে যেন, তামাটে কচি গালে ফুটে উঠছে মাংসপেশীগুলি।

ওখানে বসে কখনো সে বিস্মৃতির ভেতরে চলে গিয়ে, তখন তার ইঁদুরের মত চোখদুটি, চোখের নিচে বড় বড় বলয়। ওর দৃষ্টি নিজেকে হারিয়ে ছবির মত মঞ্চটা যেন ভেদ করে শূন্যে চলে যায়, যেখানে ভিড় করে আছে অস্পষ্ট অপরিচিত মুখগুলি। আর তারপরই চকিতে চোখের কোণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে, হলঘরে শ্রোতাদের মধ্যে ফিরে আসে আবার।

'আনন্দ ও দুঃখ, মহৎ এবং গভীর, এটাই আমার ফ্যান্টাসী।' ভাবতে ভাল লাগছিল তার। 'এই হচ্ছে শার্প অংশটা।' শুরুটা দীর্ঘ করে বুঝতে চাইল কেউ এটা লক্ষ্য করছে কিনা। কিন্তু না, খুবই স্বাভাবিক, ওরা বুঝবেই বা কিভাবে এবং সে তার চোখদুটো ওপরের দিকে সুন্দর করে তুলে দিল, শ্রোতারা যদি সেখানে অন্তত দেখবার মত কিছু খুঁজে পায়।

নানা ধরনের শ্রোতা নিজের নিজের আসনে বসে, তাঁদের চোখের সামনে বালকটির ঐ বিস্ময়-প্রতিভা, ওঁরা যে যার মতই ভাবছিলেন। সাদা-দাড়ি এক ভদ্রলোক, আঙুলে তাঁর মোহর-বসানো আংটি, ওর মাথার এক জায়গায় আগের মত ফুলে ওঠে, একটু অস্বাভাবিকই লাগছে। তিনি নিজের মনে ভাবছিলেন, 'বাস্তবিক, প্রত্যেকেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। আহা, তুমি আমার প্রিয়তম অগাস্টিন।' এর বেশী কিছু প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং এখানে এখন নিজে এক ধূসর বৃদ্ধ বসে আছেন আর দেখছেন, বুড়ো আঙুলে নাচতে পারে এমন শিশুটি বিস্ময় সৃষ্টি করে যাচ্ছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, এটা ঈশ্বরেরই দান, এটা মনে রাখা উচিত। ঈশ্বর তাঁর দান কখনো মঞ্জুর করেন, কখনো করেন না, একজন সাধারণ মানুষ হওয়ায় লজ্জার কিছু নেই। বালক যীশুর মতই তো এই শিশুটি। —একটি শিশুর সামনে লজ্জিত না হয়ে নতজানু হওয়া যায়। শুধু আশ্চর্য এই, এ ধরনের চিন্তা এত তৃপ্তিকর—এমনি সুন্দর-ভাবে সে বলতেও পারত যদি তার মত শক্ত মনের বৃদ্ধের পক্ষে সেটা বেমানান না হত। যাই হোক, তিনি এই সবই ভাবছিলেন।

ভোঁতা-নাক সেই ব্যবসায়ী ভাবছিলেন, 'শিল্প, তা জীবনে কিছু আনন্দ দেয় বৈকি, কিছুটা ভাল সিল্কের কাপড় আর কিছুটা তাক-ধি-না-ধিন। বাস্তবিক, ছেলেটা খুব খারাপ একটা বাজায় না। বারো মার্ক দামের পঞ্চাশটা আসন পুরোপুরি ভর্তি, তার মানে মোট ৬০০ মার্ক, এছাড়া অন্যান্যগুলি তো আছেই। হলঘরের ভাড়া, আলো ও অন্যান্য খরচ বাদ দিয়েও এক হাজার মার্ক নিশ্চয়ই লাভ থাকছে। এটাই যথেষ্ট।'

'এইমাত্র যেটা বাজাচ্ছিল তা শো প্যান,' তীক্ষ্ম নাক এক পিয়ানো শিক্ষিকা মনে মনে বললেন, তার এমন বয়েসে প্রত্যাশা কমতে কমতে বোধগুলি তীক্ষ্ম হয়। তিনি ভাবছিলেন, 'শুনতে ভাল লাগলেও বলতে হবে খুব বেশী মৌলিক নয়। এছাড়া হাত রাখার ভঙ্গিটাও পেশাদারী হয় নি এখনো। হাত এমনভাবে রাখতে হবে যেন তার পেছনে একটা মুদ্রা সহজে থাকতে পারে। আমি হলে ওর ওপরে একটা রুলার ব্যবহার করতাম।'

তখন সেখানে এক তরুণী, আর্ত-উন্মুখ, সচেতন তার ঐ বয়েসে খুব গোপনীয় ভাবনাগুলি মনের ভেতরে ভিড় করবে, এটা স্বাভাবিক, নিজের মনে সে ভাবছিল, 'ছেলেটা কী বাজাল ওটা? কোনো আবেগের তীব্র প্রকাশ হয়ত কিন্তু ও তো একটা শিশু। আমাকে যদি ও চুমু খায় মনে হবে ছোটভাই এসে চুমু খেল, চুমুই নয় ওটা। জাগতিক কোনো বিষয় ছাড়া নিজে থেকে গড়ে উঠবে আবেগ কি এমনই ছেলেখেলা? কী মুর্খতা! আমি যদি এসব চেঁচিয়ে বলতে যাই ওরা হয়ত আমার দিকে কিছুটা কড-লিভার তেলই এগিয়ে দেবে। এমনই জীবন।'

একটি থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন অফিসার, বিবির সাফল্য দেখে ভাবছিলেন, 'তুমি একজন কেউকেটা যেমন আমিও, অবশ্য যে যার মত।' তাই তিনি গোড়ালিদুটো পরস্পর ঠৌকিয়ে তাকে সম্মান জানালেন, যা সমস্ত ক্ষমতাবানদেরই প্রাপ্য বলে তিনি মনে করেন।

একজন সমালোচক ছিলেন সেখানে, তাঁর উজ্জ্বল কালো কোট আর কাদা-মাখা কোঁচকানো প্যাণ্ট, আসনের জন্যে কোনো প্রবেশমূল্য দিতে হয় নি তাঁকে। তিনি ভাবছিলেন, 'ওর দিকে দেখ, বিবি নামে ঐ বাচ্চা ভিখিরীটা। ব্যক্তি হিসেবে আরো পরিণত হতে হবে, যদিও এক ধরনের সম্পূর্ণতা এসেছে ওর মধ্যে, উঁচুদরের শিল্পীর মতই। ওর ভেতরে আমি দেখতে পাচ্ছি শিল্পীর সমস্ত মহৎ গুণগুলি এবং ওর স্পষ্ট অপদার্থতা, ওর ভণ্ডামি এবং ভেতরের পবিত্র আগুন, ওর জ্বলন্ত অবজ্ঞা এবং গোপন আনন্দ। এসব যদিও আমি লিখব না কেননা বেশ ভাল ভাল কথা এগুলি। আসলে এই সমস্ত ব্যবসাগুলি যদি স্পষ্ট না দেখতাম, আমার শিল্পী হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।'

বিস্ময়-বালক যখন বাজনা শেষ করল হলঘরে যথার্থ একটি ঝড় উঠল।

পর্দার পেছন থেকে বারবার তাকে বেরিয়ে আসতে হল। উজ্জ্বল বোতাম-অলা লোকটি আরো ফুলের তোড়া বয়ে নিয়ে গেল—জলপাই পাতার চারটে মালা, বেগুনী ফুল দিয়ে তৈরী বাজনা-যন্ত্র, গোলাপ-স্তবক। এসব গ্রহণ করতে যথেষ্ট হাত তার ছিল না। ওকে সাহায্য করতে ব্যবস্থাপক নিজে মঞ্চে উঠে বিবির গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। আদর করে কালো চুল নাড়িয়ে, এবং তারপরই, অভিভূত তিনি নিচু হয়ে বিবির মুখ জুড়ে সশব্দ চুম্বন করলেন। এতে ঝড় আরো উত্তাল হল। চুম্বনের শব্দটি বিদ্যুতের ধাক্কার মত লোকেদের মজ্জায় আঘাত করে, ওদের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কাঁপন নেমে গেল। অসহায় কোলাহলের মধ্যে ওরা অবধারিত নিক্ষিপ্ত হল এবং তীব্র চিৎকারগুলি মিশল উন্মাদ হাততালির শব্দের সঙ্গে। বিবির ছোট্ট বন্ধুরা রুমাল নাড়াতে থাকছে। কিন্তু সমালোচকটি তখন ভাবছিলেন, 'এই চুম্বনটা খুবই স্বাভাবিক, পুরনো কায়দা। কিন্তু হে ভগবান, শুধুমাত্র একজন যদি এসবের ভেতর দিয়ে প্রকৃত ব্যাপারটা না দেখতে পেত।'

এবং এইভাবেই অনুষ্ঠান শেষ হল। সাড়ে সাতটায় শুরু হয়ে এখন সাড়ে আটটা। মালার স্তূপে মঞ্চ বোঝাই, পিয়ানোর বাতিদানের ওপরে দুটো ফুলদানি। বিবি সবার শেষে 'গ্রীক র‍্যাপসডি' বাজিয়েছে, যা পরিণত হয় গ্রীসের জাতীয় সঙ্গীতে। ওর দেশের লোকেরা এই বাজনার সঙ্গে গলা মেলাতে পারত অন্য শ্রোতারা যদি তেমন বিশিষ্ট না হতো। তার বদলে ওরা জোর গোলমাল এবং হৈ-হল্লা করল—উত্তেজনা প্রকাশ করতে এটাই ওদের জাতীয় রীতি। এবং সেই বুড়ো সমালোচকটি ভাবছিলেন, 'হ্যাঁ, এই সুরটা অনিবার্য ছিল। প্রতিটি সূত্র থেকে ফয়দা তুলে নিতে হয়, কোনো ব্যাপারটাই প্রচারের ক্ষেত্রে খাটো করে দেখা চলে না। তবু আমি সমালোচনা করব কারণ এসব শিল্পগত কোনো ব্যাপার নয়। কিংবা আমারই ভুল, সবকিছুর মধ্যে এটাই হয়ত সবচেয়ে বেশী শৈল্পিক। একজন শিল্পী অর্থে কী? নেহাতই একটি বাক্সবন্দী খেলনা। সমালোচনা এর চেয়ে অনেক উঁচুদরের জিনিস। কিন্তু এসব তো আমি বলতে পারব না।' এবং লোকটি তার কাদামাখা প্যাণ্টের ভেতরে ফিরে গেল।

ন'দশবার শ্রোতাদের ডাকে সাড়া দেবার পর বালকটি পর্দার পেছন থেকে আর বেরিয়ে এল না, নিচে যেখানে তার মা ও ব্যবস্থাপক বসেছিলেন সেখানে চলে গেল। ওদের চেয়ারগুলি ঘিরে শ্রোতারা কখনো হাততালি দিচ্ছে এবং আরো কাছ থেকে বিবিকে দেখবার জন্যে ঠেলাঠেলি করতে থাকছে। কেউ কেউ আবার রানীকে দেখতে উৎসুক ছিল। এতে দুটো ঘন বৃত্ত তৈরী হল, একটি বালককে ঘিরে, আরেকটি রানীকে ঘিরে এবং কে যে বেশী স্বীকৃতি পাচ্ছিল, বলা শক্ত! কিন্তু রানীর সহচরীকেই বিবির কাছে যেতে বলা হল। সে তার সিল্কের জ্যাকেট একটু ঢিলে করে সামান্য নামিয়ে দিল যাতে তার এই কাজ মানানসই হয়। বিবিকে

হাত ধরে রানীর কাছে নিয়ে এল সে, এবং আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে রানীর হাতে চুমু খেতে বলল। 'তুমি এসব কেমনভাবে কর বাছা,' রানী ওকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি যখন বাজাও এসব নিজে থেকে তোমার মাথায় চলে আসে?' 'হ্যাঁ মহাশয়া,' বিবি উত্তর দিল, মনে মনে সে ভাবল, 'উঃ কী বোকা এই বুড়ো রানীটা।' তারপর একটু লাজুক ভঙ্গিতে এবং কিছুটা তাচ্ছিল্য দেখিয়েই সে তার নিজের মা-র কাছে চলে গেল।

ক্লোক-রুমের বাইরে লোকজনের ভিড় বাড়ছে! ওদের নগ্ন হাতগুলি সেখান থেকে পশমের পোশাক, শাল, জুতো ইত্যাদি নিচ্ছে। পরিচিতদের মধ্যে দাঁড়িয়ে পিয়ানো-শিক্ষিকা তাঁর মন্তব্য রাখছিলেন। 'ও খুব একটা মৌলিক কিছু নয়।' বেশ জোরে কথাগুলি বলে চারপাশে একবার দেখে নিলেন।

বড় আয়নাগুলির একটার সামনে মার্জিতরুচি এক তরুণী তার সন্ধেবেলার পোশাকে এবং তার দুই ভাই, দুজনেই লেফটেনাণ্ট, পশমের জুতো পরে দাঁড়িয়ে ছিল। রীতিমত সুন্দরী, তার ইস্পাতনীল চোখে ও মুখে সম্ভ্রান্তবংশের পরিচ্ছন্ন ছাপ। সত্যিই একজন অভিজাত মহিলা। সে নিজে তৈরী হয়ে, ভাইদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। 'আয়নার সামনে এতক্ষণ দাঁড়িয়ো না এডল্‌ফ', সে তার এক ভাইকে মৃদুভাবে বলল! ভাই তখন তার সরল ও সুন্দর তরুণ চেহারার ছবিটি থেকে চোখ সরাতে পারছিল না; কিন্তু লেফটেনাণ্ট এডল্‌ফ্‌ ভাবল, কী ধৃষ্টতা! আয়নায় দেখে তার ওভারকোটের বোতামগুলো মাত্র লাগিয়ে নিচ্ছে! এরপর তারা বাইরে বেরিয়ে এল, সেখানে বিদ্যুতের আলোগুলি সাদা কুয়াসার ভেতরে মৃদুভাবে জ্বলছে। কোটের কলার তুলে লেফটেনাণ্ট এডল্‌ফ্‌, ওভারকোটের ঢালু পকেটে তার হাতদুটো, জমাট বরফের ওপর নিজেকে গরম করে নেবার জন্যে ছোট একটা নিগ্রো-নাচ শরীরে জাগিয়ে তুলল।

ঠিক এদের পেছনে অপরিচ্ছন্ন চুলে দোলানো-হাত একটি মেয়ে বেরিয়ে আসছে। মেয়েটি ভাবল, নেহাতই একটি শিশু। একটি চমৎকার শিশু। কিন্তু ওখানে সে এক আতঙ্কজনক অবস্থায় ছিল ··এবং অবসাদের সুরে উঁচু গলায় সে বলল, 'আমরা সকলেই বিস্ময়-বালক, আমরা শিল্পীরা।'

সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, যে কখনো অগাস্টিনের চেয়ে যোগ্যতর কাউকে পিয়ানোর সামনে বসাতে পারে না, এখন সে মাথার আবটি টুপি দিয়ে ঢেকে নিয়েছে, বলল, 'ঈশ্বর বরং আমায় আশীর্বাদ করুন। এসব কথায় কী বোঝাচ্ছে? মেয়েটির আচরণ বেশ ইঙ্গিতময়।' বিষণ্ণ ছেলেটি কিন্তু ঠিকই বুঝেছে, ধীরে ধীরে সে তার মাথা নাড়ছে।

এরপর ওরা চুপচাপ হল। অপরিচ্ছন্ন চুলের মেয়েটি সেই ভাইবোনদের চলে যাওয়া দেখছিল। তাদের প্রতি ওর অবজ্ঞা যদিও তবু ওদের চলে যাওয়া দেখতে থাকল, রাস্তার মোড়ে ওদের বাঁক নেওয়া পর্যন্ত।

কবি

গল্পটা চীনা কবি হান ফুকের। কবি হব—এই ছিল তাঁর কৈশোরের বাসনা। পদ্যরচনার কৌশল আর তার আনুষঙ্গিক সবকিছুই আয়ত্ত করতে হবে। হতে হবে পারঙ্গম। পীত নদীর ধারে নিজের ছোট্ট শহরটায় এক প্রেমিকা ছিল তাঁর। স্নেহপাগল মা-বাবার সায় ছিল বিয়েতে। দিনক্ষণও আসছিল এগিয়ে। কুড়ি বছরের সুদর্শন যুবক হানকে চেনে অনেকেই। কবিরা তো বটেই। সে শুধু তাঁর ধীর আর নম্র স্বভাবের জন্য নয়। ও'র লেখা চমৎকার কিছু পদ্যের জন্য। ঠিক ধনী নন, তবু আয়েসেই চলে যাচ্ছিল হানের। হয়ত তা বাড়ত আরও। বিয়েতে যৌতুক রয়েছে। আছে অঢেল সুখের প্রতিশ্রুতি। ভাবী স্ত্রী রীতিমত সুন্দরী। গুণবতীও বটেন। তবুও, কেন যেন পুরোপুরি খুশি নয় হান। কবিত্বের বাসনা তাঁকে কুরে কুরে খায়।

তারপর একদিন। তখন রোশনাই উৎসবের সময়। পীত নদীর জলে আলোর চকমকি। ওপারে তীর ঘেঁষে হাটছিলেন হান। একা-একা। এমন সময় জলে নুয়ে-পড়া এক গাছের গুঁড়ির কাছে এসে জলের দিকে তাকাতেই চমকে ওঠেন তিনি। নদী যেন হাজারো বাতির বিছানা। খুশির নেশায় অন্যপারের মানুষরা পাগল। নৌকায়, বজরায় যুবক-যুবতীরা মাতোয়ারা। উৎসবের পোশাকে তাদের দেখায় বাগিচার ফুলের মতন। দূরে নারীকণ্ঠের গান। বীণায় বাঁশিতে আকুল সুর। আর সব কিছুকে ঢেকে নীল আকাশ। যেন এক পবিত্র মন্দির। অপার বিস্ময়ের এই সৌন্দর্যের মাঝখানে খেয়ালী যুবকের বুক দুরুদুরু করে। নিঃসঙ্গতার মাঝে দাঁড়িয়ে একবার ইচ্ছে করে অন্যপারে যেতে। যেখানে বন্ধুরা খুশিতে পাগল। কিংবা প্রেমিকা প্রতীক্ষায়। আবার মনে হয় থাক। আরও তীব্র এক বাসনা গ্রাস করে তাঁকে। ইচ্ছে করে সীমাহীন সৌন্দর্যের সবটুকু রস নিংড়ে নিতে। আহা, এই মোহিনী রূপকে যদি ধরা যেত সঠিক কোনও কবিতায়। এই রাত্রির নীলিমা, বিস্মিত আলো, খুশির জোয়ার কিংবা পাড়ে-বসে-থাকা যুবকের বাসনা। মনে হল সুখ নেই এ উৎসবে। তৃপ্তি নেই পৃথিবীর তাবৎ আনন্দে। জীবনের এই বহতা নদীর মাঝেও বুঝি-বা কাটাতে

অনুবাদ : পথিক গুহ

হবে একাকী। দূরের দর্শকের মতো। মনে হল তাঁর হৃদয় যেন অন্যদের চেয়ে আলাদা। পৃথিবীর রূপ কিংবা নিজের গোপন বাসনা অনুভবের জন্য একাকিত্ব ছাড়া গতি নেই বুঝিবা। এইসব ভাবনা বিষণ্ণ করে তোলে তাঁকে। মনে হয় প্রকৃত সুখ কিংবা গভীর তৃপ্তি ছিল কবিতা রচনায়। এমন কবিতা যাতে বিস্মিত হত বিশ্ব চরাচর। তার সবটুকু সারাংশ। নিখাদ এবং চিরস্থায়ী।

হান জানতেন না ঘুমিয়ে ছিলেন কিনা। হঠাৎ শুনলেন পাতার মর্মর। চোখ মেলে দেখেন গাছের গুঁড়ির আড়ালে এক আগন্তুক। বেগুনী বসনে আবৃত সৌম্যদর্শন এক বৃদ্ধ। উঠে দাঁড়ালেন হান। নমস্কার করলেন তাঁকে। হাসলেন আগন্তুক। বললেন কিছু কথা। আশ্চর্য, হানের এতক্ষণের চিন্তার বিষয়ই যেন বাণীরূপ পেল তাঁর মুখে। চমৎকার এবং অনুপুঙ্খ। যেমনটা মানায় শ্রেষ্ঠ কবিদের। যুবক-হৃদয় হল অভিভূত।

'কে আপনি?' শুধোলেন তিনি। 'হে আগন্তুক, আপনি অন্তর্দ্রষ্টা; আপনার কবিতা আমার সমস্ত শিক্ষকের রচনার চেয়েও মনোহারী।' আগন্তুক হাসলেন। অনির্বচনীয় সেই হাসি। বললেন, 'তুমি কবি হতে চাও? তাহলে এসো আমার কাছে। আমার পর্ণকুটির পীতনদীর উৎসের পাশে। সেই উত্তর-পশ্চিম পর্বতমালায় আমি শব্দগুরু।'

বৃদ্ধ তারপর অদৃশ্য হলেন, গাছের ছায়ায় হান খুঁজলেন বৃথাই। অবশেষে দেখা না পেয়ে ভাবলেন বুঝিবা সবটাই অবসাদজনিত ভ্রম। সারবাঁধা নৌকোর ওপর দিয়ে তিনি এগোলেন উৎসবের দিকে। সেখানে কোলাহল নিরন্তর। বীণার ঝংকার। তবুও ছাপিয়ে গেল সবকিছু। একা একা হান শুনে চললেন আগন্তুকের সেই রহস্যময় কণ্ঠস্বর। যেন চুরি গেছে তাঁর হৃদয়। স্বপ্নালু চোখে তিনি রয়ে গেলেন দূরে, মজারুদের উপহাস এড়িয়ে।

ক'দিন পরে হানের বাবা তোড়জোড় শুরু করলেন। আত্মীয়রা আসবেন। ঠিক হবে শুভদিন। পাত্র কিন্তু নিমরাজী। বললেন, 'ক্ষমা করুন আমায়। হয়ত আমি পালন করছি না পুত্রের কর্তব্য। কিন্তু আপনি তো জানেন আমার বাসনার কথা। আমি অনন্য হতে চাই কবিতা রচনার শৈলীতে। হয়ত আমার বন্ধুরা প্রশংসা করছেন আমার পদ্যের। কিন্তু আমি জানি এ আমার হাতেখড়ি। যাত্রাপথের শুরু। প্রার্থনা করি আমায় একাকিত্বের পথে অগ্রসর হতে দিন। আমি নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই শিক্ষায়। স্ত্রী ও সংসার আমায় দূরে টেনে নেবে এসব থেকে। আমি এখনও বন্ধনহীন। কিছুটা সময় থাক কবিতাচর্চায়। সেই হবে আমার খ্যাতি ও সুখের উৎস।'

আশ্চর্যান্বিত পিতা খুশি হলেন হানের কথায়। বললেন, 'সত্যিই কবিতা তোমার প্রিয়তম বিষয়। এরই জন্য তুমি পিছোতে চাও বিয়ে। জানি না তোমার ও ভাবী স্ত্রীর মধ্যে মাথাচাড়া দিয়েছে কি-না কিছু। বলতে পার আমাকে।

আমি ঘটাতে পারি বিরাগের অবসান। অথবা নির্বাচন করতে পারি নতুন কোন পাত্রী।'

হান দিব্যি কাটলেন। বাগদত্তার প্রতি আকর্ষণ তাঁর কিছুমাত্র কমেনি আগের চেয়ে। বিবাদ-বিসম্বাদ তো নয়ই। তখন হান খুলে বললেন সব। দীপাবলীর ঘটনা। বললেন স্বপ্নে দেখা সেই স্থিতপ্রাজ্ঞের কথা। বললেন পৃথিবীর তাবৎ সুখের চেয়ে শ্রেয় তাঁর কাছে সেই বৃদ্ধের শিষ্যত্ব। 'তাই হোক,' বললেন হানের বাবা। 'তোমায় এক বছর সময় দিলুম। হয়ত বা তোমার সেই স্বপ্ন ঈশ্বরপ্রেরিত। যাও তোমার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে।'

'দু-বছরও লাগতে পারে,' বললেন দ্বিধাগ্রস্ত হান। 'কে বলতে পারে?' ব্যথিতহৃদয়ে বিদায় দিলেন পিতা। হান চিঠি লিখলেন তাঁর বাগদত্তাকে। 'বিদায়।'

দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে হান পেঁাছলেন সেই নদীর উৎসে। সেখানে এক নিভৃত কোণে এক বাঁশের কুঁড়েঘর। স্বপ্নে দেখা সেই বৃদ্ধ বসে আছেন কুটিরের সামনে। বীণা বাজাচ্ছিলেন তিনি। আশ্চর্য, অতিথিকে দেখে বিচলিত হলেন না বৃদ্ধ। মৃদু হাসলেন শুধু। তাঁর সুন্দর আঙুল ব্যস্ত রইল সুরের মূর্চ্ছনাসৃষ্টিতে। তাঁর জাদুকরী সঙ্গীত রুপোলী মেঘের মত ভেসে চললো উপত্যকার আকাশে-বাতাসে। আর তাঁর দর্শনপ্রার্থী যুবা গভীর বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর সামনে। ওর মনে রইল না আর কিছু। এমনিই চললো কিছুক্ষণ। তারপর একসময় সেই বৃদ্ধ সরিয়ে রাখলেন তাঁর বীণাখানি। ঢুকলেন আপন কুটিরে। হান অনুবর্তী হলেন তাঁর। যেন তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য। অথবা কতকালের প্রিয় শিষ্য।

কেটে গেল মাস। হান ক্রমেই ভুলে গেলেন এতদিনের লেখা নিজের কবিতা-গুচ্ছ। নিশ্চিন্ত অবজ্ঞায়। আরও পরে মন থেকে মুছে ফেললেন সেই গীতিমালা যা তিনি শিখেছিলেন গুরুগৃহে। বৃদ্ধের পদতলে মৃদুভাষণে এগিয়ে চললো তাঁর শিক্ষা। প্রায় বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি হানকে শেখালেন বীণা বাজাতে। অনুপম সঙ্গীতে আপ্লুত হলো শিষ্যের হৃদয়। একসময় হান লিখেছিলেন ছোট্ট একটা কবিতা। শরতের আকাশে দুটি পাখির বিচরণ ছিল তাঁর সেই প্রিয় কবিতার বিষয়। এতদিন সাহস হয়নি গুরুকে দেখানোর। তবু একদিন যখন হান সন্ধ্যাবেলা একাকী আবৃত্তি করছিলেন সেটি তখন তিনি নীরবে মন দিয়ে শুনলেন সবটা। তারপর বাজাতে লাগলেন তাঁর বীণা। বাতাসে নেমে এল শীতলতার স্পর্শ। আর চারপাশ ছেয়ে গেল গোধূলির ম্লান আলোয়। মধ্য-গ্রীষ্মেও আকাশ হয়ে উঠলো ধূসর। তার মাঝে দুটি বক উড়ে চললো দিক-চক্রবালে। শিষ্যের কল্পরচনার সেই ছবি বাস্তবে হয়ে উঠলো আরও সুন্দর, আরও নিখুঁত। হান নীরবে শুধু কাঁদলেন। নিজেকে অপদার্থ মনে হল তাঁর।

দেখতে দেখতে কেটে গেল বছর। হান অনেকটা পারদর্শী হয়ে উঠলেন বীণায়, কিন্তু কবিতা রচনা তেমনই কঠিন রয়ে গেল তাঁর কাছে।

এভাবে দু'বছর কাটলে ঘরে ফেরার টান অনুভব করলেন হান। নিজের শহর, পরিবার—আর বাগদত্তার কাছে যেতে মন চাইলো। গুরুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন তিনি।

গুরু অনুমতি দিলেন হাসিমুখে। 'তুমি স্বাধীন,' বললেন তিনি, 'যেতে পারো যেখানে মন চায়। ইচ্ছে হলে ফিরে এসো আবার। অথবা থেকো দূরে। যেমনটি চাও।'

শিষ্য পাড়ি দিলেন তাঁর পথে। চললেন ক্রমাগত। তারপর একদিন সকালে পৌঁছলেন শহরের কাছে। তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখলেন শহরে ঢোকার সেই ধনুকের মত সাঁকোটি। সবার অলক্ষ্যে হান পৌঁছলেন নিজেদের বাগানে। সেখানে একপাশে জানালায় দাঁড়ালে ঘুমন্ত পিতার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। চুপিসারে তিনি পোঁছে গেলেন তাঁর প্রেমিকার ফুলবাগিচায়। জানলার পাশে গাছে উঠে দেখলেন সুন্দরী কেশচর্চায় মগ্ন। এইসব দৃশ্য গুরুগৃহে থাকাকালীন তাঁর মানসকল্পনার চেয়ে ঢের আলাদা। তখনই তাঁর মনে হল সৌন্দর্যের আসল ঠাঁই কবির কল্পনাতেই। সেই সৌন্দর্য, সেই মোহাবেশ কেবল কবিই পারেন দিতে। বাস্তবে ওসব খোঁজা বৃথা। এই সব চিন্তা আবার পাগল করে তুললো হানকে। ফের মনে হল কবি তাঁকে হতেই হবে। তখন সেই বাগান, শহর এবং সাঁকো পেরিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল। লক্ষ্য সেই উপত্যকা। সেখানে গুরু আপন কুটির-প্রাঙ্গণে তেমনি বসে। বাজিয়ে চলেছেন বীণাখানি। এবারও হানকে অভ্যর্থনা জানালেন না তিনি। বরং আবৃত্তি করলেন দুটি কবিতা। শিল্পের মহিমা নিয়ে। বিষয়ের গভীরতা ও সুরের মহিমায় আপ্লুত হলেন হান। তাঁর দুচোখে নেমে এল জল।

আবার পুরানো জীবনে ফিরে গেলেন হান। প্রভুর কাছে। ওঁকে বীণায় পারঙ্গম হতে দেখে গুরু ওঁর হাতে তুলে দিলেন, তারপর আর কিছু খেয়াল রইল না মাসের পর মাস কেটে গেল। রোদের মুখে বরফগলার মতন। ক্রমে আবার ঘরের টান অনুভব করলেন হান। পরপর দুবার। একবার তো লুকিয়ে পালিয়েই গেলেন রাতের অন্ধকারে। কিন্তু হল না পালানো। উপত্যকার শেষ বাঁকে এসে আটকে গেলেন। রাতের হিমেল বাতাস তখন আছড়ে পড়ছিল কুঁড়েঘরের দরজায় ঝোলানো মৃদঙ্গে। তারই সুরে হাতছানি দিয়ে ডাকলো তাঁকে। এড়ানো গেল না সেই আকুল-করা আহ্বান। দ্বিতীয়বার মন খারাপ হল এক স্বপ্ন দেখে। ঘুমের মধ্যে হান দেখলেন তিনি নিজের বাগানে রয়েছেন। পাশে স্ত্রী এবং সন্তানরা। চারাগাছে জল দিচ্ছেন। ভেঙে গেল ঘুম, রাত

গভীর, চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। রীতিমত ক্রুদ্ধ হান উঠে দাঁড়ালেন। পাশের ঘরে গুরু তখনও ঘুমোচ্ছেন। তাঁর সাদা দাড়িতে খেলে যাচ্ছে হাওয়া। হঠাৎ তীব্র বিদ্বেষে ভরে গেল হানের মন। মানুষটির দিকে তাকিয়ে ওঁর মনে হল সব নষ্টের মূলেই উনি। ওই মানুষটি নষ্ট করেছেন ওঁর জীবন, লুটে নিয়েছেন ভবিষ্যৎ। ঝাঁপিয়ে পড়ে গুরুকে হত্যা করতে যাচ্ছিলেন হান। হঠাৎ চোখ খুললেন সেই পক্ককেশ বৃদ্ধ। মৃদু হাসিতে ভরে গেল তাঁর মুখ। সে হাসিতে এক কোমল বিষাদময়তা, শিষ্য কেমন বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

'মনে রেখো হান,' গুরু বললেন ধীরকণ্ঠে, 'তুমি যা খুশি করতে পারো। ফিরে যেতে পারো নিজের ঘরে। ঘৃণা করে মেরেও ফেলতে পারো আমায়। কিছুই এসে যায় না আমার।'

'হায়, আমি কি পারি আপনাকে ঘৃণা করতে?' হান শুধোলেন। 'সে তো স্বর্গকে ঘৃণা করার সামিল।' হান রীতিমত বিহ্বল।

রয়ে গেলেন হান। মৃদঙ্গ ছেড়ে ধরলেন বাঁশি। তারপর গুরুর শিক্ষাধীনে কবিতাচর্চা। ধীরে ধীরে তিনি আয়ত্ত করলেন মনের কথা আপন করে বলার কায়দা। এমনভাবে যাতে শ্রোতার হৃদয় যায় কেঁপে। মৃদু হাওয়ায় যেমন কাঁপে জল। এইভাবে হান বর্ণনা করলেন সূর্যোদয়। ভোরের আকাশ আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার আগে পাহাড়চুড়োয় রবির উঁকিঝুঁকি। নদীর জলে মাছেদের নিঃশব্দ সাঁতার। বসন্তে দারুবৃক্ষের হিল্লোল। শ্রোতাদের কাছে সেই সব কবিতা হয়ে রইল দৃশ্যাকল্পের চেয়েও বেশি কিছু। মনে হল ওটা কবিতা নয়, যেন স্বর্গ-মর্তের দ্বৈত সঙ্গীত। হানের পদ্য ওঁর শ্রোতাদের নিয়ে গেল ভাবনার জগতে। সে ভাবনা দুঃখের এবং সুখের। শিশুর কাছে যেমন খেলাধুলো। যুবকের কাছে প্রেয়সী। বৃদ্ধের কাছে মৃত্যু।

কেটে গেল বছরের পর বছর। খেয়াল রইল না হানের। পীত নদীর উৎসে সেই উপত্যকায় কোন-কোনদিন ওঁর মনে হত যেন ওখানে পেঁাছেছেন আগের দিন সন্ধ্যাবেলায়। আবার কখনও মনে হত যুগযুগান্ত অতিক্রম করে এসেছেন তিনি। যেন সময় এক মায়া।

তারপর এক ভোরে হঠাৎ ঘুম ভাঙলো ওর। কুটিরে আর কেউ নেই। চারপাশে খুঁজেও পাওয়া গেল না গুরুকে। হঠাৎই কোথা থেকে এসে পড়লো শরৎ। হিমেল হাওয়া বয়ে এল কুটিরে। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে দেখা গেল দূরের পাখিদের। হান অবাক। এখন তো এসবের সময় নয়।

পাহাড় থেকে নেমে এলেন হান। সঙ্গে বীণাখানি। দেশে পৌছে প্রশংসা কুড়োলেন তিনি। খানিকটা সম্মানও। বয়স্ক এবং বিশিষ্টজনেরা যেমন পেয়ে থাকেন। নিজের শহরে এসে দেখলেন বদলে গেছে সব। বেঁচে নেই মা-বাবা। এমনকি তাঁর বাগদত্তা ও অন্যান্যরাও। ওঁদের বাড়িঘরে অন্যদের বাস। সেদিন

সন্ধ্যায় রোশনাই উৎসব। আয়োজন হল যথারীতি। নদীর পাড়ে জুটলো হাজার মানুষ। কবি হান রইলেন দূরে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে, নদীর অন্যপারে। জলের কোলঘেঁষে এক প্রাচীন গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। ঠিক যেমনটি ছিলেন বহুকাল আগের এক সন্ধ্যায়। তারপর এক সময় বীণার তারে হাত রাখলেন কবি। সুরের পরশ লাগলো আকাশে-বাতাসে। সে সুরে মাতোয়ারা হল যুবতীরা। যুবকেরা খুঁজতে লাগলো পাগল-করা যন্ত্রীকে। কেউ খুঁজে পেল না তাঁকে। বদলে চারিদিকে শুধু গ্রাস করে নিল অশ্রুতপূর্ব সেই সুর। অবিচল হান শুধু হাসলেন। আর তাকালেন জলের দিকে। সেখানে তখন হাজার বাতির প্রতিচ্ছবি। দেখতে দেখতে তিনি গুলিয়ে ফেললেন বস্তু আর বিশ্বের প্রভেদ। সব কিছু যেন একাকার হয়ে গেল তাঁর চোখে। আজকের এই উৎসব ফিরিয়ে দিল বহু বছর আগেকার স্মৃতি। মনে হল কোনোই ফারাক নেই সেদিনের খুশি আর আলোর জোয়ারের সঙ্গে। সেই সেদিন যেদিন এক যুবক কবি দাঁড়িয়ে ছিলেন নদীতীরে গাছের তলায়। আর অবাক বিস্ময়ে শুনছিলেন এক আগন্তুকের বাণী।

একটি ঘটনা

লু সুন (১৮৮১-১৯৩৬)

গ্রাম থেকে এই রাজধানীতে এসেছি ছ'বছর হয়ে গেল। এ সময়ে কত রাষ্ট্রীয় ঘটনা দেখেছি, শুনেছি। কিন্তু এসবের কোনটাই আমার মনে ছাপ ফেলতে পারেনি। এ সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হলে, উত্তরে শুধু বলতে পারি: এইসব অভিজ্ঞতা আমার মেজাজকে খিট্‌খিটে করে তুলেছে। আমি আরও মানুষ-বিদ্বেষী হয়ে পড়েছি।

যাই হোক একটা ঘটনা আমার কাছে খুব অর্থবহ মনে হয়েছে। আমার বদ-মেজাজও অনেকটা দূরে হয়েছে। ঘটনাটা এখনো ভুলতে পারিনি। ১৯১৭ সালের শীতকাল। কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া বইছিল। কিন্তু জীবিকার সন্ধানে খুব ভোরেই আমাকে বেরুতে হলো। রাস্তায় কাউকেই চোখে পড়লো না। অনেক কষ্টে 'এস্‌-গেটে' যাওয়ার একটা রিক্‌শা পেলাম। হাওয়া একটু কমে এসেছিল। সব হাল্‌কা ধুলো উড়ে যাওয়ায় রাস্তাঘাট অনেকটা শুন্‌সান, পরিষ্কার। রিক্‌শা একটু তাড়াতাড়ি যাচ্ছিল। আমরা 'এস্‌-গেটে'র দিকে এগুচ্ছিলাম। এমন সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে, কেউ একজন আমাদের রিক্‌শায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। ছেঁড়া ময়লা পোশাক, মাথা ভর্তি সাদা-কালো চুল এক বৃদ্ধা মহিলা। জানান না দিয়েই সে ফুটপাথ ছেড়ে আমাদের সামনে দিয়ে রাস্তা পেরুচ্ছিল। রিক্‌শাওয়ালা তাকে চলে যাওয়ার রাস্তা দিয়েছিল। কিন্তু তার ছেঁড়া বোতামহীন জামা হাওয়ায় উড়তে উড়তে রিক্‌শার চাকায় জড়িয়ে গেল। ভাগ্যিস রিক্‌শাওয়ালা গাড়িটা সময়মতো তুলে ধরেছিল, নইলে বুড়ী সাংঘাতিকভাবে পড়ে যেত। খুব চোট পেত।

বুড়ী মাটিতেই পড়ে রইলো। রিক্‌শাওয়ালাও দাঁড়িয়ে পড়লো। মনে হলো না, বুড়ীর খুব লেগেছে। ঘটনার কোনো সাক্ষীও নেই। তাই রিক্‌শাওয়ালার এই গায়ে পড়ে উপকার করা, আমার ভাল লাগলো না। সে ঝামেলায় পড়তে পারে। আমিও আটকে যাব।

বললাম,—ঠিক আছে, চলো—

এ কথায় সে কান দিল না। বোধহয় শুনতেও পায়নি। রিক্‌শা থামিয়ে

অনুবাদ: আশিস ঘোষ

বুড়ীকে সে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলো। এক হাতে তাকে ধরে রেখে জিজ্ঞেস করলো,—ঠিক আছেন তো ?

—আমার লেগেছে—

আমি কিন্তু দেখেছি, বুড়ী কত আস্তে পড়েছে। ওর লাগতেই পারে না। বুড়ী নিশ্চয়ই ভান করছে। এটা বিরক্তিকর। রিক্‌শাওয়ালা ঝামেলা চেয়েছিল, তাই পেয়েছে। ওকেই এখন বাঁচার রাস্তা বের করতে হবে।

কিন্তু বুড়ী জখম হয়েছে বলায়. রিক্‌শাওয়ালা এক মুহূর্তও ইতস্তত করলো না। বুড়ীর হাত ধরে আস্তে আস্তে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করলো।

অবাক হলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, একটা থানা। ঝোড়ো হাওয়ার জন্যে বাইরে কেউ ছিল না। রিক্‌শাওয়ালা বুড়ীকে থানার গেট পর্যন্ত যেতে সাহায্য করলো।

হঠাৎ আমার এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো। লোকটার ক্রমশ দূরে সরে যাওয়া নোংরা চেহারাটা যেন বড়ো হয়ে যাচ্ছে। শেষে মাথা উঁচু করে ওকে দেখতে হলো। লোকটা যেন আমাকে প্রভাবিত করছিল, ভয় হচ্ছিল, ফার কোটে ঢাকা আমার সত্তা যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। মন হচ্ছে সব শূন্য।

চুপচাপ বসে রইলাম। জীবনীশক্তি যেন ফুরিয়ে আসছিল। থানা থেকে একজন পুলিশ বেরিয়ে আসতেই রিক্‌শা থেকে নেমে দাঁড়ালাম।

পুলিশটি আমার কাছে এসে বললো,—আপনি অন্য রিক্‌শা নিন। ও আপনাকে আর নিয়ে যেতে পারবে না।—

কিছু না ভেবেই কোটের পকেট থেকে এক মুঠো খুচ্‌রো পয়সা বের করে পুলিশটিকে দিলাম।—দয়া করে ওকে দেবেন—

হাওয়া একেবারে থেমে গেলেও, রাস্তা তখনো বেশ নির্জন। নানা কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলাম। কিন্তু নিজেকে নিয়ে কিছু চিন্তা করতে ভয় হচ্ছিল। যা ঘটেছে সে সব বাদ দিলেও একমুঠো পয়সা দেওয়ার কী মানে হয় ? এটা কি পুরস্কার ? রিক্‌শাওয়ালাকে বিচার করার আমি কে ? কোন উত্তর খুঁজে পেলাম না।

ঘটনাটা আমার স্মৃতিতে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে। এ জন্যে দুঃখ হয়। নিজের সম্পর্কে ভাবায়। ছেলেবেলায় পড়া সব ধ্রুপদী সাহিত্য যেমন ভুলে গেছি, সেই সব বছরের সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনাগুলিও মনে নেই। জীবনের সব বাস্তব ঘটনার চাইতেও অনেক বেশী স্পষ্টভাবে মনে পড়ে এই ঘটনাটা। এটা আমাকে লজ্জা পেতে এবং শুধরোতে শেখায়। নতুন আশা আর সাহস জোগায়।

ইভলেইন

জানলায় বসে ইভলেইন রাস্তায় সন্ধ্যার নেমে আসা দেখছে। মাথাটা তার জানলার পর্দায় হেলান, আর নাকে আসছে পর্দার ধুলো মাখা ছিটের গন্ধ। বড় ক্লান্ত সে।

রাস্তায় লোকজনের চলাফেরা কমে এসেছে। শেষ বাড়ির লোকটাকে হাঁটতে দেখা গেল নিজের বাড়ির দিকে ; বাঁধান ফুটপাথ দিয়ে তার পায়ের খটখট শব্দ কানে এল, এবং একটু পরে এল নতুন, লাল বাড়িগুলির সামনে ঝামার রাস্তার উপর দিয়ে, তাঁর হাঁটার মচমচ শব্দ। ঐ বাড়িগুলির জায়গায় মাঠ ছিল এক সময়। মাঠটায় তারা প্রতি সন্ধ্যায় অন্যান্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে খেলাধুলো করত। তারপর বেলফাস্ট থেকে আসা একটা লোক মাঠটা কিনে নিয়ে সেখানে তুলল এই বাড়িগুলি—তাদের ছোট-ছোট তামাটে রঙের মত বাড়ি নয়, ঝকঝকে ইট আর উজ্জ্বল ছাদের সব বাড়ি। এখানকার ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেলা করত ঐ মাঠে—ডেভিন, ওয়াটার এবং ডান পরিবারের ছেলেমেয়েরা, ছোট্ট বিকলাঙ্গ শিশু কিয়োখ, এবং সে নিজে আর তার ভাইবোনেরা। তার ভাই আর্নেস্ট অবশ্য কখনই খেলেনি, তাদের তুলনায় সে তখন একটু বড়। হাতে কালো কাঁটাগাছের ছড়ি নিয়ে তার বাবা তাদের মাঠ থেকে তাড়াতেন শিকারির মত করে ; কিন্তু ছোট্ট কিয়োখ সব সময় চোখে চোখে থাকত, আর বাবাকে আসতে দেখা মাত্র তাদের সাবধান করে দিত চিৎকার করে। সব মিলিয়ে, আনন্দেই ছিল তারা তখন। তার বাবাও তখন এতটা খারাপ ছিলেন না ; তা ছাড়া, তার মা-ও তখন বেঁচে। অনেক দিন আগের কথা এসব ; এবং এখন তার মা-ও আর বেঁচে নেই। টিজী ডানও এখন মৃত, এবং ওয়াটার পরিবার ফিরে গেছে ইংল্যান্ডে। সব কেমন পালটে যায়। এখন সেও অন্যদের মত দূরে চলে যাচ্ছে, বাড়ি ছেড়ে।

বাড়ি ! ঘরটার চারপাশে নতুন করে চোখ বোলাল ইভলেইন, ঘরের ভিতরের সমস্ত পরিচিত জিনিসপত্রের দিকে, যাদের সে বেশ কয়েক বছর ধরে সপ্তাহে একদিন ঝেড়েমুছে আসছে, আর এত ধুলো যে কোথা থেকে আসে ভেবে প্রতিবারই অবাক হয়েছে। সম্ভবত আর কোনদিনই সে তার এই পরিচিত জিনিসপত্রকে দেখতে পাবে না। ওদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি

অনুবাদ : দেবর্ষি সারগী

সে। অথচ, এই ঘরেই, ভাঙা হারমোনিয়মের উপরের দেওয়ালে এবং পবিত্র-আত্মা মার্গারেট মেরি অ্যালাককের প্রতি উচ্চারিত অঙ্গীকারের রঙিন প্রিন্টের পাশে, ঝুলছে এক যাজকের একটা হলদেটে ছবি। ঐ যাজকের নাম এত বছরেও সে উদ্ধার করতে পারেনি। স্কুলে তিনি বাবার সহপাঠী ছিলেন। বাইরের কাউকে বাবা যখনই ঐ ছবিটি দেখান, মুখে দিয়ে একটু উদাসীনভাবে উচ্চারণ করেন ঃ

'ও এখন মেলবোর্নে আছে।'

ইভলেইন চলে যেতে রাজি হয়েছে, নিজের বাড়ি ছেড়ে। এটা কি ঠিক হল ? প্রশ্নটার আগাপাশতলা ভাবার চেষ্টা করল সে। বাড়িতে যা হক একটা আশ্রয় ছিল, খাবার-দাবার জুটত ; চারপাশে ছিল সেই সব মানুষজনেরা, যাদের সে দেখে আসছে সারা জীবন ধরে। এটা অবশ্য ঠিক যে খুব খাটতে হত এখানে তাকে, বাড়ির খাটনি, চাকরির খাটনি। যেখানে সে কাজ করে সেই স্টোর্সের লোকেরা কী বলবে যখন শুনবে একজনের সঙ্গে পালিয়ে গেছে সে ? হয়ত বলবে, বোকা ছিল ইভলেইন ; আর তারপর বিজ্ঞাপন দিয়ে তার জায়গায় নিয়োগ করে নেবে নতুন লোক। মিস গ্যাভান ত খুব খুশি হবে। মেয়েটি চিরদিনই তার মাথার উপর খবরদারি করে এসেছে, বিশেষ করে যখন সে দেখে যে লোকজনের কান তারই দিকে। মিস গ্যাভান তখন ইভলেইনের উদ্দেশে চেঁচাবে ঃ

'মিস হিল, দেখতে পাচ্ছ না এই ভদ্রমহিলারা তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন ?'

'মুখটাকে খুশি-খুশি রাখ মিস হিল, দয়া করে !'

এই স্টোর্সের চাকরি ছেড়ে চলে যেতে চোখ দিয়ে বেশি জল গড়াবে না তার।

কিন্তু তার নতুন বাড়িতে, দূরবর্তী অচেনা দেশে, নিশ্চয়ই এ-রকম হবে না। তখন ত বিবাহিতা নারী সে—ইভলেইন তখন বিবাহিতা। লোকজন তখন তার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলবে। তার মায়ের মত করে তখন তার সঙ্গে ব্যবহার করা হবে না। এমন কি এখনও, বয়স উনিশ পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, তার মনে হয় মাঝে মাঝে যে বাবার হিংস্রতার কবল থেকে পুরোপুরি মুক্ত হয়নি সে। সে জানে তার বুকে যে মাঝে মাঝে কাঁপুনি ওঠে তা বাবার হিংস্রতার কথা ভেবেই। যখন তারা ছোট ছিল, তখন অবশ্য তার সঙ্গে বাবা দুর্ব্যবহার করেননি, যতটা হিংস্র হয়েছেন হ্যারি ও আর্নেস্টের উপর, হয়ত মেয়ে বলেই রেহাই পেয়েছে সে ; কিন্তু পরের দিকে বাবা ধমকাতে শুরু করলেন তাকেও, জানিয়ে দিতেন তার মৃত মায়ের কথা ভেবে কতটা ধমকাবেন তাকে আর কতটা রেহাই দেবেন। আর এখন ত তাকে বাঁচাবারও কেউ নেই—আর্নেস্ট মারা গেছে আর হ্যারি শুরু করেছে চার্চ ডেকোরেশনের ব্যবসা এবং প্রায় সব সময়ই গ্রামের দিকে ব্যস্ত থাকে সে। তা ছাড়া, প্রতি শনিবারের রাত্রে টাকা নিয়ে বাড়িতে

যে খিটিমিটি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে খুব বিধ্বস্ত তাতেও। নিজের সাত শিলিং রোজগারের সবটাই সে সংসারের খরচায় দিয়ে দেয়, হ্যারিও তার সাধ্যমত কিছু টাকা পাঠায়, কিন্তু বাবার কাছ থেকে টাকা বার করাটাই সবচেয়ে শক্ত। তাঁর মতে, টাকা নষ্ট করে ইভলেইন, কোন বুদ্ধিসুদ্ধি নেই তার, এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে রাস্তায় ফেলে দেবার জন্য তাঁর কষ্টোপার্জিত টাকা তিনি কিছুতেই ইভেলেইনকে দিতে পারেন না, এবং আরও অনেক কিছু বলেন, কেননা শনিবারের রাতগুলিতে তাঁর মেজাজ থাকে এমনিতেই খুব রুক্ষ। অনেকক্ষণ খিটিমিটি করার পর বাবা শেষ পর্যন্ত টাকা দেবেন তার হাতে আর জিজ্ঞেস করবেন রোববারের খাবার কেনার জন্যই সে টাকাটা চাইছে কি না। টাকাটা পেয়ে ইভলেইনকে সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হয় বাজারে, কাল চামড়ার পার্সটাকে শক্ত করে হাতে ধরে এবং কনুইয়ের ধাক্কায় ভিড় ঠেলতে ঠেলতে বাজার সেরে বোঝা হাতে যখন বাড়ি ফেরে, দেখে বেশ দেরি হয়ে গেছে। মোট কথা, বাড়িতে খুব খাটুনি তার। সংসারটার ঠিকমত দেখাশোনা আছে, দেখতে হয় দুটো ছোট ভাইবোনকে, যাদের ভালমন্দের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকেই, যাতে নিয়মিত স্কুলে যায়, নিয়মিত খেতে পায়। খুব খাটতে হয় ইভলেইনকে—খুব কঠোর জীবন—তবু এখন, বাড়ি ছেড়ে যাবার কথা যখন ভাবছে, তার মনে হল জীবনটা এখানে নেহাত খারাপ ছিল না।

ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে ইভলেইন পেতে চলেছে অন্য জীবনের অভিজ্ঞতা। ফ্র্যাঙ্ক খুব হৃদয়বান, পুরুষালি, খোলামেলা। আজ রাত্রির মোটরবোটে সে তার সঙ্গে পাড়ি দিচ্ছে তার বউ হবার উদ্দেশে, বুয়েনস এইরিসে তার সঙ্গে থাকার উদ্দেশে, যেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছে ফ্র্যাঙ্কের বাড়ি। ফ্র্যাঙ্ককে প্রথম দেখার দিনটা স্পষ্ট মনে আছে তার; প্রধান সড়কের একটা বাড়িতে থাকত ফ্র্যাঙ্ক এবং ইভলেইন ঐ রাস্তা দিয়ে যেত প্রায় রোজই। সম্ভবত কয়েক সপ্তাহ আগেরই কথা। ফ্র্যাঙ্ক তার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে, ঝালর দেওয়া টুপিটা মাথায় অনেকটা তুলে পিছন দিকে হেলান, চুলগুলি এগিয়ে এসে লুটোপুটি খাচ্ছে ব্রোঞ্জের মত মুখটায়। দুজনের আলাপ হল এক সময়। স্টোর্সের বাইরে ফ্র্যাঙ্ক প্রতি সন্ধ্যায় অপেক্ষা করত তার জন্য, তারপর দেখা করত বাড়িতে এসেও। একদিন তাকে নিয়ে গেল 'দ্য বোহেমিয়ান গার্ল' নামক নাটকটা দেখাতে। হলের অনভ্যস্ত আসনে ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে বসতে পেরে আনন্দে ভরে উঠেছিল তার মন। গানের খুবই ভক্ত ফ্র্যাঙ্ক, তার কাছে একটা গানের দু-এক কলি গাইলে সবাই জানল প্রেমে পড়েছে তারা। এবং ফ্র্যাঙ্ক যখন গাইত ঐ গানটা, যেটায় নাকি এক কুমারী মেয়ে এক নাবিকের প্রেমে পড়েছে—ইভলেইনের মাথাটা ভরে উঠত কেমন মধুর, কেমন দুর্বোধ্য এক অস্বস্তিতে। মাঝে মাঝে মজা করে ফ্র্যাঙ্ক তাকে ডাকত 'পপেনস্' বলে। প্রথম দিকে ইভলেইন একজন সঙ্গী পাওয়ার

নিছক উত্তেজনাটাই বেশি উপভোগ করত, কিন্তু আস্তে আস্তে তার ভেতর জন্মাতে লাগল ফ্র্যাঙ্কের প্রতি অনুরাগ ও প্রেম। ফ্র্যাঙ্ক একদিন তাকে নানা অচেনা দেশের গল্প বলল। জানাল সে তার জীবন শুরু করে জাহাজে ডেক-বয় হিসেবে, মাসে এক পাউন্ড মাইনে, অ্যালান লাইনের ঐ জাহাজটা ভাসত কানাডার দিকে। যে-সব জাহাজে সে চড়েছে সেগুলির নাম বলল, জানাল মোট কত রকম জাহাজি চাকরি আজ পর্যন্ত করেছে সে। বলল ম্যাগিলানের প্রণালির ভেতর দিয়ে সে গেছে, শোনাল প্যাটাগোনিয়ানদের রোমহর্ষক গল্প-গুলি। তারপর বলল শেষ পর্যন্ত তার ভাগ্যোদয় হয় বুয়েনস এইরিসেই, এবং ইভলেইনদের প্রাচীন দেশে সে এসেছে নিছক ছুটি কাটাতে। যা হবার, একদিন ইভলেইনের বাবা জেনে ফেললেন তাদের প্রেমের ব্যাপারটা এবং ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে কোন রকম কথাবার্তা বলতে সরাসরি নিষেধ করলেন তাকে।

'আমি এই নাবিক ছোকরাদের ভালই চিনি!' তার বাবা বলেছিলেন।

একদিন ফ্র্যাংকের সঙ্গে ঝগড়াও করে বসলেন বাবা। ঐ ঘটনার পর থেকে ইভলেইন লুকিয়ে দেখা করা শুরু করল ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে।

রাস্তায় অন্ধকার আরও গাঢ় হল। ক্রমে আবছা হয়ে এল তার কোলে ফেলে রাখা দুটো সাদা চিঠির রঙ। একটা হ্যারির উদ্দেশে; অন্যটা লেখা বাবাকে। আর্নেস্টকে খুবই ভালবাসত সে, কিন্তু ভালবাসে হ্যারিকেও। বাবা ইদানীং বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, সে লক্ষ্য করেছে; তার অনুপস্থিতিতে হয়ত কষ্ট পাবেন তিনি। মাঝে মাঝে বাবা দারুণ ভাল হয়ে যান। বেশি দিনের কথা নয়, একদিন সারাটাদিন ধরে তাকে যখন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল অসুখের জন্য, বাবা তাকে একটা ভূতের গল্প পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন, আগুনে সেঁকে দিয়েছিলেন তার জন্য গরম টোস্ট। আর একদিন, তাদের মা তখন বেঁচে, সবাই মিলে পিকনিকে গিয়েছিল হাউদ পাহাড়ে। তার মনে আছে, নিজের ছোট-ছোট সন্তানদের হাসাবার জন্য বাবা সেদিন মায়ের লেডিস টুপিটা নিয়ে নিজের মাথায় পরেছিলেন।

সময় বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ইভলেইন আগের মতই বসে রইল জানলার ধারে, মাথাটা পিছনে, জানলার পর্দায় হেলান, নাকে আসছে ধুলো মাখা ছিটের বিশ্রী গন্ধ। রাস্তায়, খুব দূর থেকে, তার কানে ভেসে এল অর্গানের সুর, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বাজাচ্ছে কেউ। সুরটা তার চেনা। যা আশ্চর্যের, আজও ঐ ধ্বনিটাই আবার কানে এল তার, যেন মায়ের কাছে করা তার প্রতিজ্ঞাটাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। মায়ের কাছে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে যত দিন সম্ভব এই পরিবারকে ঠিকমত বেঁধে রাখবে। তার মনে পড়ল মায়ের মৃত্যুর আগের রাতটাঃ অসুস্থ মাকে রাখা হয়েছিল হলঘরের অন্য পাশে অবস্থিত ছোট, অন্ধকার ঘরটায়, এবং রাস্তা থেকে মায়ের কানে ভেসে এসেছিল ইতালিয়

সঙ্গীতের এক বিষন্ন সুর। ছ পেনি ছুড়ে দেবার পর অর্গানবাদকটিকে সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে চলে যেতে হুকুম দেওয়া হয়েছিল। হুকুমটা দিয়ে, তার মনে আছে, বাবা গটগট করে হেঁটে মায়ের ঘরে ফিরে এসেছিলেন, মুখে বলছেন ঃ

'যত সব শয়তান ইতালিয়ানদের দল! আর জায়গা পেল না।'

এসব কথা ভাবার সময় মায়ের করুণ স্মৃতি আচ্ছন্ন করে ফেলল ইভলেইনের সমস্ত সত্তা, তার রক্তমাংসের ভেতরটা পর্যন্ত—মায়ের ঐ জীবন, যা ছোট-ছোট দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিণতি পেয়েছিল মস্তিষ্ক-বিকৃতিতে। ভয়ে এই মুহূর্তে কাঁপছে ইভলেইন, আর তার কানে ভেসে আসছে মায়ের গলা, নির্বোধ দৃঢ়তায় মা গেয়ে চলেছে ঃ

'ডিরিভণ, সিরণ। ডিরিভণ সিরণ!'

হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে ইভলেইন উঠে দাঁড়াল জানলার গা থেকে। পলায়ন! তাকে অবশ্যই পালাতে হবে! ফ্র্যাঙ্ক তাকে বাঁচাবে। নতুন জীবন দেবে তাকে ফ্র্যাঙ্ক, সম্ভবত ভালবাসাও। সে যে বাঁচতেই চায়। অসুখী সে কেন হতে যাবে? সুখে তারও অধিকার আছে। ফ্র্যাঙ্ক তাকে বুকে টেনে নেবে, দু-হাতের মধ্যে মুড়ে নেবে তাকে। তাকে বাঁচাবে।

নর্থওয়াল স্টেশনে, ঢেউয়ের মত দুলতে থাকা ভিড়ের মধ্যে, এখন দাঁড়িয়ে ইভলেইন। ফ্র্যাঙ্ক তার একটা হাত ধরে আছে। ইভলেইন বুঝতে পারছে ফ্র্যাঙ্ক কথা বলছে তার উদ্দেশেই, তাকে ঘুরে ফিরে তাদের যাত্রাপথ সম্পর্কে বোঝাচ্ছে। স্টেশনে ঘোরাফেরা করছে অসংখ্য সৈনিক, সঙ্গে বাদামি রঙের মালপত্র। শেডের বড়-বড় ফাঁক দিয়ে ইভলেইন চকিতে দেখতে পেল একটা কালো বস্তুপিণ্ডের মত পড়ে রয়েছে মোটরবোটটা, পাশে জেটির দেওয়াল, মোটরবোটের ছোট-ছোট জানলাগুলি আলোকিত। ফ্র্যাঙ্কের কথার কোন জবাব দিল না সে। হঠাৎ নিজের গালদুটোকে তার খুব পাণ্ডুর ও ঠাণ্ডা বলে মনে হল, এবং হতবুদ্ধিকর কষ্ট সহ্য না করতে পেরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল যাতে পথ দেখান তিনি, বলে দেন তার কী করা উচিত। কুয়াশা ছিঁড়ে একটা দীর্ঘ, বিষন্ন বাঁশির আর্তনাদ ছাড়ল বোটটা। যদি যায় সে, তবে আগামীকাল এই সময় থাকবে ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে সমুদ্রের বুকে, তাদের জাহাজ তখন এগিয়ে চলেছে বুয়েনস এইরিসের দিকে। জাহাজে জায়গাও সংরক্ষিত করেছে ফ্র্যাঙ্ক। তার জন্য ফ্র্যাঙ্ক এত সব করার পর এখন কি আর পিছিয়ে আসতে পারে সে? চাপা কষ্টে কেমন গা গুলিয়ে উঠল ইভলেইনের, আর তার কাঁপতে থাকা ঠোঁট দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছিল ঈশ্বরের প্রতি নিঃশব্দ ঐকান্তিক প্রার্থনা।

ইভলেইনের বুকে এসে ধাক্কা মারল একটা ঘণ্টাধ্বনি, আর সে অনুভব করল, ফ্র্যাঙ্ক তার একটা হাত চেপে ধরেছে ঃ

'এসো !'

পৃথিবীর সমস্ত সাগর ছুটে এসে আছড়াল ইভলেইনের বুকটায়। ফ্র্যাঙ্ক তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অনন্ত সাগরের মধ্যে। তাকে ডুবিয়ে দেবে ফ্র্যাঙ্ক। ইভলেইন লোহার রেলিংটাকে দু-হাতে চেপে ধরল।

'এসো !'

না ! না ! না ! এ অসম্ভব ! ইভলেইনের হাতদুটো উন্মত্তের মত আঁকড়ে ধরল লোহাটাকে। তার বুক থেকে উঠে সমুদ্রের ভিতর মিশে গেল একটা আর্তনাদ।

'ইভলেইন ! ইভি !'

ফ্র্যাঙ্ক বাইরে চলে গেল রেলিং টপকে, ইভলেইনকে বলল অনুসরণ করতে। ফ্র্যাঙ্ককে চিৎকার করে এগিয়ে যেতে বলল ইভলেইন, কিন্তু ফ্র্যাঙ্ক তখনও তাকে অনুসরণ করতে বলছে ! ইভলেইন নিজের ফ্যাকাশে মুখটা তুলে ধরল ফ্র্যাঙ্কের দিকে, সম্পূর্ণ অবশ সে, অসহায় পশুর মত। ফ্র্যাঙ্কের দিকে স্থির হয়ে থাকা তার দৃষ্টিতে কোন প্রেম ছিল না, বিদায়ের শুভেচ্ছা ছিল না, স্বীকৃতিও না।

গ্রামের এক স্কুলশিক্ষক

ফ্রান্‌জ কাফ্‌কা (১৮৮৩-১৯২৪)

আমিও তাদের মধ্যে একজন, যারা এমনকি একটি সাধারণ আকৃতির মূষিককেও বিরক্তিকর বলে মনে করে। সম্ভবত, তারা বিরক্তিতে মারা যেত, যদি তারা সেই বড়ো আকারের মূষিকটিকে দেখত ; যেটি আমাদের প্রতিবেশী একটি গ্রামে কয়েক বছর আগে দেখা গিয়েছিল। এবং স্বভাবতই যেটি একরকম অল্পকালস্থায়ী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। তারপর অনেকদিন হল ঘটনাটি বিস্মৃতিতে ডুবে গেছে। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র কিছু অস্পষ্টতা থেকে গেছে যা ব্যাখ্যা করা একেবারেই অসাধ্য। কিন্তু স্বীকার করা উচিত, সেটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য সাধারণ মানুষ খুব একটা কষ্টস্বীকার করেনি। এবং তাই, যে বিষয়টি নিয়ে তাদের ভাবা উচিত ছিল, যেহেতু তারা অনেক বেশী তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ইতিপূর্বে প্রচুর আগ্রহ দেখিয়েছে, সেইসব বিশেষ এলাকার মানুষদের এ সম্বন্ধে দুর্বোধ্য উদাসীনতার ফলাফল হিসেবে, যথেষ্ট অনুসন্ধান ছাড়াই এই মূষিকঘটিত কেচ্ছাটি ভুলে যাওয়া হয়েছে।

যাই হোক না কেন, এটা কোনো কাজের কথা নয় যে রেলগাড়িতে চেপে সেই গ্রামটিতে পেঁছিনো যায় না। বহু লোক গ্রামটিতে পেঁছেছিলেন খাঁটি অনুসন্ধিৎসাতাড়িত হয়ে। যাদের মধ্যে এমনকি কিছু বিদেশীও ছিলেন। তাঁরাই শুধু এসে উঠতে পারেননি অনুসন্ধিৎসা ছাড়া যাঁদের আরো বেশী কিছু দেখানোর কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, যদি কয়েকজন একেবারেই সাধারণ মানুষ, দৈনন্দিন কাজকর্ম যেসব মানুষদের কদাচিৎ এক মুহূর্তের অবসর দেয়, যদি এই সমস্ত লোকেরা একেবারে কৌতূহলশূন্যভাবেও ঘটনাটিকে না নিতেন, তাহলে এই প্রাকৃত ঘটনার গুজবটি কখনই গ্রামের এলাকা ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়তো না। আসলে গুজব জিনিসটা এমনই, যাকে সাধারণত সীমানার ভেতর ধরে রাখা যায় না। যা আসলে এক্ষেত্রে, খুব মন্থরগতিতে ছড়াতে শুরু করেছিল। আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে, তাতে যদি কোনো ধাক্কা না দেওয়া হত, তাহলে তা মোটেই ছড়াতো না। কিন্তু, তবুও, এটাও কোনো টেঁকসই কারণ নয়, যার জন্য ঘটনাটি অনুসন্ধানের ব্যাপারে অসম্মত হওয়া যায়। তার বদলে বলা

অনুবাদ : আশিস মুখোপাধ্যায়

যায়, এই দ্বিতীয় অবস্থাটিকেও অনুসন্ধান করে দেখা উচিত ছিল। যদিও তা হয়নি। গ্রামের সেই বুড়ো শিক্ষকমশায়ই একমাত্র ঘটনাটির খাতায় কলমে একটা দলিল রেখেছিলেন। নিজের পেশায় তিনি ছিলেন একজন চমৎকার লোক। তবু তাঁর দক্ষতা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা কখনোই এমন ছিল না যাতে তিনি ঘটনাটির একটা সামগ্রিক বর্ণনা গড়ে তুলতে পারেন যা অন্যের কাছে এ ব্যাপারে একটা ভিত্তি হিসেবে রাখা যাবে। তাই এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘটনার প্রকৃত ব্যাখ্যার চেয়ে অন্য জাতের একটা কিছু। তাঁর ছোট পুস্তিকাটি ছাপা হয়েছিল। আর সেইসময়ে গ্রামে বেড়াতে আসা কিছু দর্শকের কাছে বেশ কিছু সংখ্যক পুস্তিকা বিক্রিও হয়েছিল। পুস্তিকাটি জনসাধারণের কাছে সামান্য স্বীকৃতিও পায়। কিন্তু শিক্ষকমশায় একথা বোঝার মতো যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন যে, তাঁর এই খণ্ডিত পরিশ্রম, যার জন্য কেউ তাঁকে সমর্থন করেনি, শেষ পর্যন্ত মূল্যহীন। তবুও তিনি হাল ছেড়ে দেননি। এবং তাঁর সারাজীবনের কাজ হিসেবে ব্যাপারটিকে নিয়েছিলেন। যদিও বছরের পর বছর এটা স্বাভাবিকভাবেই আরও নিরাশাব্যঞ্জক হয়ে উঠছিল। তা থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে, একদিকে ঐ বৃহৎ মূষিকটির আবির্ভাব কি প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং অপরদিকে এও লক্ষণীয় যে, নিজের বিশ্বাসে কতটা পরিশ্রমী অভিনিবেশ আর সততা একজন বৃদ্ধ ও অখ্যাত গ্রাম্য স্কুলশিক্ষকের মধ্যে থাকতে পারে। কিন্তু তিনি যে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের নিরুত্তাপ আচরণে গভীরভাবে বেদনাহত হয়েছিলেন একথা প্রমাণ হয় একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা থেকে। যার বহু বছর পরে তাঁর আলোচ্য পুস্তিকাটি প্রকাশ পায়। এতোদিনে প্রায় কারুরই মনে থাকার কথা নয় আসল ব্যাপারটা কি ছিল। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়, তিনি মানুষের মধ্যে যে বোঝাপড়ার অভাব লক্ষ্য করেছিলেন, তার জন্য অভিযোগ করেন। এই অভাবগুলি ঐসব লোকেদের মধ্যে একেবারেই আশা করা যায় না। তাঁর এই দৃঢ়প্রত্যয়ী অভিযোগে প্রকাশের সততা যতটা ছিল, বলবার মুন্সীয়ানা ততটা নয়। এইসব লোকদের সম্বন্ধে তিনি যথার্থই বলেছিলেন, 'আমি নয়, আসলে তারাই গ্রাম্য স্কুলশিক্ষকদের মতো কথাবার্তা বলে থাকে।' এবং আরো অনেক কথার মধ্যে তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তির মতামতের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। যাঁর কাছে তিনি নিজেই ব্যাপারটা সহজভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। সেই পণ্ডিত ভদ্রলোকের নাম যদিও উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঘটনা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, তিনি কে ছিলেন। নানান প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও, সেই শিক্ষকমশায় যখন তাঁর কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন, তখনি তিনি বুঝে যান, যে ঘটনাটির বিষয়ে ঐ পণ্ডিত ভদ্রলোকটির ইতিমধ্যেই একটা গভীর প্রতিকূল ধারণা তৈরী হয়ে গেছে। আমাদেব শিক্ষকমশায়, পুস্তিকাটি হাতে নিয়ে, দীর্ঘ প্রতিবেদনটি তাঁকে শোনান। সেটি শোনার সময়ে ঐ ভদ্রলোক যে

মানসিকভাবে কতটা অনুপস্থিত ছিলেন, তা বোঝা যেতে যারে, তাঁর থেমে থাকার পর যেন হঠাৎ তৈরী করা কপট মন্তব্য থেকে ঃ 'তোমাদের পাশ্ববর্তী এলাকার মাটি বিশেষরকম কালো এবং উর্বর। তাই এর থেকে ঐ মূষিকেরা বেশ ভালো সমৃদ্ধ খাবারদাবার পেয়ে থাকে। এবং সেজন্য এগুলি অস্বাভাবিক বড়ো হয়।'

'কিন্তু ঠিক ওরকম বড়ো মাপের হয় না,' শিক্ষকমশায় বলে উঠেছিলেন। এবং তিনি, মূষিকটির মাপ কিছুটা অতিরঞ্জিত করেই, ভদ্রলোককে খানিকটা খুঁচিয়ে তোলার জন্য, দেওয়ালের গায়ে দু'গজ-প্রমাণ মেপে দেখিয়েছিলেন। 'তাই নাকি। না হবারই বা কি আছে?' পণ্ডিত ব্যক্তি, যিনি অবশ্য পুরো ব্যাপারটাকেই একটা তামাসা হিসেবে দেখেছিলেন, উত্তর করেছিলেন। তাঁর এই রায় গ্রহণ করেই শিক্ষকমশায়কে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছিল। কেমন করে তাঁর স্ত্রী ও ছয়টি শিশু রাস্তার ধারে তুষারপাতের মধ্যে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল, এ কথাও তিনি বলেছেন। এবং কেমন করে তাঁর সমস্ত আশাভরসার শেষ হয়ে যাওয়া তাদের কাছে স্বীকার করতে হয়েছিল, এ কথাও।

যখন আমি ঐ বৃদ্ধের প্রতি পণ্ডিত মানুষটির ব্যবহারের কথা পড়লাম, তখনো আমি শিক্ষকমশায়ের পুস্তিকার কথা জানতাম না। কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলাম, ঘটনাটি নিয়ে যে খবরাখবরগুলি আবিষ্কার করা যায় তা সংগ্রহ করতে ও ঢেলে সাজাতে। পণ্ডিত ব্যক্তিটির ওপর শারীরিক বলপ্রয়োগ করতে না পারলেও অন্তত শিক্ষকটির হয়ে কিছু লিখতে পারতাম। বা আরো ভালোভাবে বলা যায়, একজন সৎ কিন্তু প্রভাবহীন মানুষের সদিচ্ছাগুলির হয়ে কিছু বলতেই পারতাম। আমি স্বীকার করছি যে পরে এই সংকল্পের জন্য আমি অনুতপ্ত হই। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, এই চিন্তাকে কার্যকর করতে গিয়ে আমি এক অদ্ভুত বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছি। একদিকে শিক্ষিত ব্যক্তিদের এমনকি সাধারণের মতামতকেও পরিবর্তন করে শিক্ষকমশায়ের হয়ে কিছু বলানোর মতো যথেষ্ট ক্ষমতা আমার একেবারেই ছিল না। অপরদিকে শিক্ষকমশায়ও লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর মূল লক্ষ্যের ব্যাপারে আমি কমই উদ্বিগ্ন ছিলাম। তাঁর সততাকে সমর্থন করার আমার কোনো চেষ্টা ছিল না। তিনি যা প্রমাণ করতে যাচ্ছিলেন, তা হল যে পেল্লায় মূষিকটিকে সত্যিই দেখা গেছে। ঘটনাটা তাঁর নিজের কাছে তো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তাই কোনো সমর্থনও চায় না। অতএব, শিক্ষকমশাই আমাকে নিশ্চিত ভুল বুঝতে যাচ্ছিলেন। যদিও তাঁর সঙ্গে আমি সহযোগিতা করতেই চাইছিলাম। কিন্তু তাঁকে সাহায্য করার পরিবর্তে অনেক সময়ে যেন আমারই সমর্থনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অথচ যা পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, এ ব্যাপারে যা স্থির করেছি, তা আমার ওপর বেশ বোঝার মতো চেপে বসবে। জনসাধারণকে

বোঝানোর কাজে আমি শিক্ষকমশায়ের সাহায্য ভিক্ষা করতে পারি না। কারণ তিনি নিজেও তাদের কিছু বোঝাতে পারেন নি। তাঁর পুস্তিকাটি পড়লে আরো সর্বনাশের দিকেই এগোনো হত। তাই যতক্ষণ না নিজের পরিশ্রমের কাজগুলি শেষ হয়ে যায় ততক্ষণ এটি পাঠ করা থেকে আমি বিরত থাকি। এমনকি এই অবসরে আমি শিক্ষকমশায়ের সংস্পর্শেও আসিনি। একথা সত্য, তিনি লোকমুখে আমার এই অনুসন্ধানের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে আমি তাঁর পক্ষে অথবা বিপক্ষে কাজ করছিলাম। আসলে, তিনি সম্ভবত দ্বিতীয় কথাটিই ভাবতেন এবং পরে যদিও তা অস্বীকার করতেন। কারণ, আমার কাছে প্রমাণ আছে যে তিনি আমার কাজের রাস্তায় অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলেন। তা করা অবশ্য তাঁর পক্ষে খুবই সহজ ছিল। তিনি যে অনুসন্ধানগুলি ইতিমধ্যে করেছিলেন সেগুলি নতুন করে করতে আমি বাধ্য ছিলাম। এবং তিনি সবসময় গোপনে আমার ওপর লক্ষ্য রাখতেন। অবশ্য আমার অনুসন্ধান পদ্ধতির মধ্যে এটাই একমাত্র জায়গা যেটা নিয়ে সত্যিই আপত্তি করা যেতে পারে। কিন্তু যে সতর্কতা ও আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্য দিয়ে আমি আমার অনুসন্ধানের সমাপ্তি টেনেছিলাম তাতে আমার বিরুদ্ধে আর আপত্তি টেঁকে না। এগুলি বাদ দিলে আমার পুস্তিকাটি শিক্ষকমশায়ের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল। সম্ভবত, এ কারণেই আমি সকলের কাছে একটু বেশীমাত্রায় দ্বিধাগ্রস্তভাব দেখিয়েছিলাম। আমার কথা থেকে যে-কেউ ভাবতে পারে যে, আর যাই হোক, আগে কেউ বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান চালায়নি। এবং আমিই ছিলাম প্রথম লোক, যে, যারা মূষিকটিকে দেখেছিল অথবা তার সম্বন্ধে শুনেছিল, তাদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছিল। আমিই প্রথম এ সম্বন্ধে পাওয়া সূত্রগুলির মধ্যে একটা সাযুজ্য আনার চেষ্টা করেছিলাম। আমিই প্রথম অনুসন্ধানের ভেতর দিয়ে একটা সমাপ্তি টেনেছিলাম। পরে আমি শিক্ষকমশায়ের পুস্তিকাটি পড়ি। এটির একটি বেশ বিষয়ানুগত শিরোনাম ছিল—'একটি মূষিক, পূর্বে দেখো যে-কোনো মূষিকের থেকে আকারে বৃহৎ'। পুস্তিকাটি পড়ে আমি দেখলাম, আসলে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুতে একমত হতে পারিনি। যদিও, আমরা দুজনেই বিশ্বাস করি, আমরা মূল জায়গাটিতে আঘাত করতে পেরেছি। তার মানে, মূষিকটির উপস্থিতি সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই নেই। সমস্ত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও, আমি শিক্ষকমশায়ের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু তাঁর সঙ্গে তফাতগুলি সে রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে তিনি আমার সম্বন্ধে বেশ বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলছিলেন। একথা সত্যি যে আমার প্রতি ব্যবহারে তিনি বেশ নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। কিন্তু তা যেন আসলে আমার প্রতি তাঁর প্রকৃত মানসিকতাকে আরো স্পষ্ট করে তোলে। অন্যভাবে বলা যায়, তাঁর এরকমই

ধারণা ছিল যে আমি তাঁর কৃতিত্বকে খর্ব করছি। এবং আমি যে গোড়া থেকেই তাঁর প্রতি সহযোগিতাপূর্ণ ছিলাম ও ভবিষ্যতেও থাকব, এসব বড়োজোর সরলতাপ্রসূত কথাবার্তা বলে মনে হয়। আসলে তা হয়তো কৃত্রিম ও গায়ে-পড়া একটা চেষ্টা দেখানো। তিনি এরকমই বলতে ভালোবাসতেন যে, তাঁর আগেকার শত্রুরা হয় কেউ বিরোধিতা প্রকাশ করেনি, কেউ বা গোপনে কিছুটা করেছে, অথবা কেউ বড়ো জোর মুখের কথায় কিছু বলেছে। একমাত্র আমিই নাকি আমার বিরুদ্ধ মতামতকে একেবারে চেপে ফেলার কথা বিবেচনা করেছি। তাছাড়া, তার আরো কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বী, যাঁরা আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে সত্যিই নিজেদের ব্যস্ত রেখেছিলেন, তাঁরা অন্তত কপটভাবেও শিক্ষকমশায়ের মতামত শুনতেন। তার পরে তাঁরা নিজেদের মতামত স্থাপন করতেন। আর আমি, অসংবদ্ধভাবে সাজানো ঘটনা ও কিছু ভুল প্রমাণ হাতে নিয়ে, শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই নয়, জনসাধারণের মধ্যে, আমার মতামত প্রকাশ করেছিলাম। মূল বিষয় সম্বন্ধে আমার ব্যক্ত মতামতে সত্যতা থাকা সত্ত্বেও তা অবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। কিন্তু এ নিয়ে যা-যা ঘটতে পারে, তার মধ্যে সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হল, মূষিকটির অস্তিত্ব এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়, এমন আভাস ইঙ্গিত পাওয়া।

এইসব লজ্জাকর ব্যাপারগুলি, যা এতদিন অন্ধকারে ঢাকা ছিল, তার থেকে আমি খুব সহজে একটা উত্তর বার করে নিয়েছিলাম। যেমন, তাঁর নিজের পুস্তিকাটি তীব্রতমভাবে অবিশ্বাস্য। যাই হোক, তাঁর, ক্রমাগত সন্দেহ সত্ত্বেও এগিয়ে যাওয়া খুব সোজা ছিল না। তাই তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে খুব সংযত ছিলাম। মূষিকটির অস্তিত্ব জনসাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার ব্যাপারে তিনিই প্রথম লোক হিসেবে চিহ্নিত হতে চাইতেন। তিনি খুব আন্তরিকভাবে মনে করতেন, আমি তাঁর নামযশ কেড়ে নিতে চাইছি। এখন যদিও তাঁর তেমন যশ-টশ ছিল না, কেবল এক অদ্ভুত কুখ্যাতি, তাও আবার ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল। এরকম পরিস্থিতিতে আমার অবশ্য প্রতিযোগিতায় নামার মতো কোনো আগ্রহ ছিল না। তাছাড়া পুস্তিকাটির ভূমিকায় আমি খুব পরিষ্কার ঘোষণা করেছিলাম যে, শিক্ষকমশাইকেই চিরকালের জন্য আমরা মূষিকটির আবিষ্কর্তা হিসেবে মনে রাখব।' যদিও তিনি তা ছিলেন না। তাঁর দুর্ভাগ্যের প্রতি সমব্যথী হয়েই এসব লেখার প্রেরণা পেয়েছিলাম। 'এটাই হল এই পুস্তিকাটির লক্ষ্য.'—আমি খুব ভাবাবেগের সঙ্গে শেষ করেছিলাম। যদিও সে সময়ের মানসিক অবস্থার সঙ্গে তা সত্যিই বেশ মিলে গিয়েছিল। 'শিক্ষকমশায়ের বইটি যাতে ন্যায্যতই অধিকসংখ্যক জনগণের কাছে পৌঁছতে পারে, তার জন্য সাহায্যের ব্যাপারে যদি আমি কৃতকার্য হই, তাহলে মুহূর্তে আমার নাম, এখান থেকে মুছে যাবে। যে নাম, আমি মনে করি, নিতান্তই কিছু সময়ের জন্য এবং

পরোক্ষভাবে, এই সমস্যাটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল—এভাবেই, আমি খুব সরাসরি ঘটনাটিতে নিজের বেশীরকম অংশগ্রহণের কথা অস্বীকার করেছিলাম। যেভাবেই হোক আমি যেন আগে থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার প্রতি তাঁর অবিশ্বাস্য ভর্ৎসনা। তা সত্ত্বেও, তিনি সেই বিশেষ অনুচ্ছেদটিতে আমার বিরুদ্ধে বলবার মতো তেমন কিছু দেখেননি। তিনি যা বলেছিলেন, বা বলা ভালো, যে ইঙ্গিতটুকু দিয়েছিলেন, তা যে কিছুটা ন্যায়সঙ্গত ছিল, একথা আমি অস্বীকার করি না। অবশ্য মাঝে মাঝে আমার এরকম মনে হয়েছে, যে, যে ব্যাপারগুলো আমারও ভাববার ছিল, সেগুলি সম্বন্ধে, তিনি বেশ তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁর পুস্তিকায়। তিনি মনে করতেন, আমার পুস্তিকার ভূমিকাটি ছিল ভণ্ডামিতে ভরা। যদি আমি আন্তরিকভাবেই তাঁর পুস্তিকাটিকে বিজ্ঞাপিত করতে চাইছিলাম, তবে কেন শুধুমাত্র তিনি ও তাঁর পুস্তিকাটি নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম না? কেন আমি এটির শ্রেষ্ঠত্বর কথা বড়ো গলায় জানাইনি? কেন আমি এই উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারটির ওপর জোর দেওয়া ও তা বোঝাবার কাজেই শুধু নিজেকে ব্যাপৃত রাখিনি? তার বদলে কেন আমি পুস্তিকাটিকে একেবারেই অবহেলা করে এটাকে এমনি একটা সাধারণ আবিষ্কার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলাম? ইতিপূর্বেই কি এটি আবিষ্কৃত হয়নি? এ ব্যাপারে নতুন করে করার মতো কিছু কি বাকি আছে? কিন্তু যদি আমি সত্যিই মনে করে থাকি, এটি পুনরাবিষ্কারের প্রয়োজন আছে, তবে কেনই বা আমি আমার প্রস্তাবনাটিতে অত জাঁকাল গাম্ভীর্যের সঙ্গে মূল আবিষ্কারটির ওপর জোর দিয়েছি। যে-কোনো লোক এটাকে মিথ্যে বিনয় বলে মনে করবে। যদিও আসলে এটা তার চেয়েও খারাপ কিছু। আসলে, তাঁর ধারণায়, আমি তাঁর আবিষ্কারটিকে হেয় করতেই চাইছিলাম। আমি এটির প্রতি মানুষের নজর কাড়তে চাইছিলাম কেবল এর গুরুত্বকে কমিয়ে দেওয়ার জন্যই। অথচ তিনিই কিনা অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সম্ভবত ঘটনাটি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিল। এখন আমিই আবার এ নিয়ে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলেছি। কিন্তু একইসঙ্গে শিক্ষকমশায়ের জায়গাটিও আগের থেকে জটিলতর করে তুলেছি। তাঁর সততাকে কে সমর্থন করলো না করলো তাতে তাঁর কি আসে যায়? তাঁর একমাত্র ভাবার হল ঐ ব্যাপারটা এবং একমাত্র ওটাই। ব্যস। কিন্তু আমি যেহেতু ব্যাপারটা ভালো বুঝতাম না তাই এতে আমার ক্ষতি ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। আমি এটিকে প্রকৃত মূল্যে পুরস্কৃত করতে পারিনি। কারণ এর প্রতি আমার কোনো সত্যিকার দরদ ছিল না। এটা ছিল একেবারেই আমার বুদ্ধিগ্রাহ্যতার বাইরে। তিনি আমার সামনে বসেছিলেন! এবং আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর বয়স হয়ে যাওয়া কোঁচকানো মুখটিতে এক স্থির ও আত্মসংবৃত ভাব। কিন্তু তবুও, তিনি

এই কথাগুলিই ভাবছিলেন। যদিও একথা সত্য ছিল না যে তিনি এই বিষয় ভাবনাতেই নিজেকে বেঁধে রেখেছিলেন। আসলে তিনি বড়ো যশোলোভী ছিলেন। এবং ব্যবসা থেকেও তিনি টাকা করার কথা ভাবতেন। যদিও তাঁর বড়ো সংসারের কথা ভেবে তাঁর লোভের যুক্তিসঙ্গত কারণগুলি বোঝা যায়। তবুও বিষয়টা নিয়ে তঁার তুলনায় আমার আগ্রহ এত তুচ্ছ বলে মনে হত যে তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন, এ ব্যাপারে তঁার আর কোনো আগ্রহ নেই এরকম ঘোষণা করবেন। যদিও ঘটনাটির সত্যতা সম্বন্ধে তঁার ধারণা থেকে তিনি একচুলও নড়েননি। আমি আমার আভ্যন্তরীণ দ্বিধাগ্রস্ত ভাব কাটিয়ে তুলে নিজেকে স্থির করতে পারছিলাম না, কারণ কেবলই মনে হচ্ছিল আমার প্রতি এই মানুষটির নিন্দাবাদের নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। কেননা তিনি এই মুষিক-সংক্রান্ত ব্যাপারটি একরকম দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তাই অন্য কেউ যদি এদিকে সামান্যতমও এগোয় তাহলে তঁার চোখে তাকে বিশ্বাসঘাতক মনে হওয়া যুক্তিযুক্ত। কারণ এ কথা সত্য ছিল না। লোভ, শুধুমাত্র লোভের কথা তুলেই তঁার মনোভাবকে সঠিক বিশ্লেষণ করা যাবে না। দীর্ঘকালীন শ্রম ও সম্পূর্ণ অসাফল্য তঁার মধ্যে যে স্পর্শকাতরতার জন্ম দিয়েছিল সেদিকে তাকাতে হবে। আবার তঁার স্পর্শকাতরতাই সব কিছু ব্যাখ্যা করে না। সম্ভবত এ নিয়ে আমার আগ্রহ সত্যই খুব তুচ্ছ ছিল। বিদেশী আগন্তুকদের মধ্যে এ নিয়ে আগ্রহের অভাবে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। এটাকে তিনি এক সর্বব্যাপী ক্ষতিকর ব্যাপার হিসেবে দেখতেন। কিন্তু তা নিয়ে আর বিশেষ দুশ্চিন্তা করতেন না। একবার একজন এলেন। আশ্চর্যের কথা, তিনি ব্যাপারটায় হাত লাগালেন। যদিও তিনি এ নিয়ে কিছুই জানতেন না। এরকম হঠাৎ নাক গলানোর ব্যাপারে আমি কোনো প্রতিরোধ তৈরি করতে পারিনি। আমি কোনো প্রাণিতত্ত্ববিদ্ নই। তবুও যদি আমি ব্যাপারটার আবিষ্কর্তা হতাম তাহলে সর্বান্তঃকরণে ঝঁাপিয়ে পড়তাম। কিন্তু সত্যিই তো আর আমি আবিষ্কার করিনি। এই দৈত্যবৎ মুষিকটি অবশ্যই এক বিস্ময়ের বস্তু। তবুও সারা পৃথিবীর মানুষের একটানা অবিচ্ছেদ্য আগ্রহ পাওয়ার কথা ভাবা যায় না। যখন নাকি এর অস্তিত্বের কোনো সম্পূর্ণ ও অকাট্য প্রমাণই নেই। আর তা বোধহয় সম্ভবও নয়। এবং আমি স্বীকার করি, যদি আমিই আবিষ্কর্তা হতাম তাহলেও আমি অত আনন্দপূর্ণ চিত্তে ও স্বেচ্ছায় মুষিকটির হয়ে ওকালতি করার জন্য এগিয়ে আসতাম না, শিক্ষকমশায়ের মত।

এখন আমার ও শিক্ষকমশায়ের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির পালা হয়তো সহজেই শেষ হয়ে যেত যদি আমার পুস্তিকাটি সফলতা পেতো। কিন্তু তা ঘটে নি। হয়তো বইটি ভালো মত লেখা হয়নি। বইটি যথেষ্ট চিন্তা উদ্রেককারীও নয়। আমি একজন ব্যবসায়ী লোক। হয়তো শিক্ষকমশায়ের তুলনায় এই

ধরনের পুস্তিকা রচনা করার ব্যাপারে আমার দক্ষতা অনেক সীমিত ছিল। যদিও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ব্যাপারে আমি তাঁর চেয়ে অনেক উঁচুতে ছিলাম। তাছাড়া আমার অকৃতকার্যতাকে অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যে সময়ে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়, সম্ভবত সে সময়টি শুভ ছিল না। তাই মূষিকটির সেই আবিষ্কার লগ্নে বৃহৎ জনসাধারণকে স্পর্শ করতে পারেনি। তা অবশ্য এমন কিছু বেশীদিনের কথা নয় যে তা একেবারে ভুলে যেতে হবে। আমার পুস্তিকাটির দ্বারাই আবার তার নতুন করে জীবন পাওয়া সম্ভব। আবার আরেকদিকে সেই তুচ্ছ ঘটনাটি সম্বন্ধে যে সামান্য আগ্রহ ছিল তা ফুরিয়ে যাওয়ার পক্ষে ধীরে ধীরে অনেক সময় কেটে গেছে। যাঁরা সামান্যও গুরুত্ব দিয়ে আমার পুস্তিকাটি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা নিজেদের মধ্যে সেই একঘেয়ে কথাবার্তাই বলাবলি করতেন, যে একঘেয়েমি শুরু থেকেই এই বিতর্কটিকে চিহ্নিত করেছিল; যে, এখন আবার সেই পুরনো প্রশ্নের ওপর পুরনো অপ্রয়োজনীয় পরিশ্রমের কাজ শুরু হতে যাচ্ছে। কেউ কেউ এমনকি আমারটির সঙ্গে শিক্ষকমশায়ের পুস্তিকাটি গুলিয়েও ফেলেছিল। একটি প্রথম শ্রেণীর কৃষিসংক্রান্ত পত্রিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়—বৃহৎ মূষিকের ওপর লেখা পুস্তিকাটি আর একবার আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে। বেশ মনে পড়ে কয়েক বছর আগে আমরা এটা নিয়ে খুব প্রাণখোলা হাসাহাসি করেছিলাম। তারপর এতদিনে আর ব্যাপারটা তেমন পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। আমরাও আর বোঝাবুঝির জন্য তেমন পরিশ্রম করিনি। কিন্তু আমরা আর দ্বিতীয়বার এ নিয়ে হাসাহাসি করতে রাজী নই। তার পরিবর্তে আমরা আমাদের শিক্ষক সমিতিগুলিকে জিগ্যেস করবো, আমাদের গ্রামের শিক্ষকদের জন্য এইসব মূষিক শিকার করে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো প্রয়োজনীয় কাজ কি পাওয়া যায় না? সৌভাগ্যবশত এই মন্তব্যটি ছিল পত্রিকাটির একদম শেষে ও ছোট ছোট অক্ষরে ছাপা। শনাক্তকরণের বিভ্রান্তির, এটি একটি ক্ষমার অযোগ্য উদাহরণ। তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি পুস্তিকাই পড়েননি। এবং এই তাচ্ছিল্যপূর্ণ ভাঙা-ভাঙা প্রকাশ, 'অতিকায় মূষিক' এবং 'গ্রাম্য স্কুলশিক্ষক'—এই দুটি কথাই এইসব জনগণের-স্বার্থরক্ষা প্রতিনিধি ভদ্রলোকদের কাছে, এ বিষয়ের ওপর কিছু বলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই আক্রমণের প্রতিবিধানের জন্য কার্যকর কিছু করাই যেত। কিন্তু আমার ও শিক্ষকমশায়ের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবের জন্য এ ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নেওয়া সম্ভবই হল না। তার পরিবর্তে, যতদিন সম্ভব এই সমালোচনাটির কথা তিনি যাতে জানতে না পারেন, আমি তারই চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি যে এ কথা জেনে গেছেন তা আমি জানতে পারি, তাঁর একটি চিঠির একটি বাক্য থেকে। সেই চিঠিতে তিনি বড়দিনের ছুটির সময়ে

আমার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'পৃথিবী আসলে মানুষের বিদ্বেষ কামনায় ভরা। এবং মানুষেরা ক্রমশই সে রাস্তাকে আরো মোলায়েম করে তুলছে।' এর দ্বারা তিনি এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে আমিও এইসব অশুভ কামনাকারীদের একজন। কিন্তু নিজের সহজাত বিরুদ্ধতায় খুশি না হয়ে, পৃথিবীতে এর পথটিকে আরও চমৎকার করে তোলার চেষ্টা করছি। আসলে, এমন চেষ্টা চালাচ্ছি, যাতে সর্বসাধারণের মধ্যে এই বিদ্বেষভাবনার বিকাশ ঘটে এবং তা যেন পরিশেষে জয়যুক্ত হয়। ভালোই। তাঁর প্রয়োজনীয় এই সিদ্ধান্তটি আমি জানতে পেরেছিলাম। এবং খুব স্থিরচিত্তে তাঁর জন্য অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি উপস্থিত হলে খুব সংযতভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাই। এখন তাঁকে অন্যান্য সময়ের তুলনায় আচরণের দিক দিয়ে কিছুটা কম মার্জিত বলে মনে হল। পুরনো ঢঙের ফুলোফুলো ওভারকোটের বুকপকেট থেকে তিনি খুব সাবধানতার সঙ্গে পত্রিকাটি বার করলেন। এবং এটিকে খুলে আমার হাতে দিলেন। 'আমি দেখেছি,' পত্রিকাটি না পড়ে, তাঁর হাতে ফেরত দিয়ে আমি উত্তর করলাম। 'তাহলে তুমি দেখেছ,' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তিনি বললেন। বৃদ্ধ শিক্ষকদের ধরনে তাঁরও অভ্যাস ছিল অপ্রীতিকর উত্তরগুলির পুনরাবৃত্তি করা। 'যদিও ঠিক কথা, আমি এর মধ্যে হতাশ হয়ে পড়ার মতো কিছু দেখি না'—আমার দিকে পরিষ্কার সরাসরি তাকিয়ে এবং উত্তেজিত আঙুলে পত্রিকাটিতে আঘাত করতে করতে তিনি কথা বলছিলেন। যেন আমি এ নিয়ে অন্য কোনো ভাব পোষণ করি। আমি এখন যা বলবার জন্য মনে মনে তৈরী হচ্ছিলাম, অবশ্যই সে সম্বন্ধে তাঁর কিছু ধারণা ছিল। কারণ, আমার মনে হয়, আমি সেটা লক্ষ্য করেছি। তাঁর কথা থেকেই যে, তা নয়। কিন্তু অন্য সব চিহ্নগুলি থেকে। আমার ভাবনাচিন্তাগুলি বোঝার ব্যাপারে তাঁর সত্যিকার সহজাত শক্তি আমি প্রায়ই লক্ষ্য করেছি। যদিও তিনি কখনই তা প্রকাশ করেন না। এবং নিজের লক্ষ্য থেকে চ্যুত হন না। তাঁকে যে কথাগুলি বলেছিলাম তা আমি শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে দিতে পারি। কারণ এই সাক্ষাৎকারের কিছু পরেই আমি তা লিখে রেখেছিলাম। 'আপনি যা ভালো বোঝেন, তাই করুন।'—আমি বলেছিলাম। 'এই মুহূর্ত থেকে আমাদের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল। আমার মনে হয়, আপনার কাছে তা অভাবনীয় বা অনভিপ্রেত কোনো খবর নয়। এই পত্রিকাটির সমালোচনা অবশ্য আমাকে এই ধরনের সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য করেনি। এটা কেবলমাত্র শেষপর্যন্ত আমার সিদ্ধান্তটিকে আরও দৃঢ় করেছে। প্রকৃত কারণটি হল এই-রকম : প্রথমদিকে আমি ভেবেছিলাম এক্ষেত্রে আমার হস্তক্ষেপ আপনার কিছু কাজে লাগতে পারে। আজ কিন্তু আমি স্বীকার না করে পারছি না সবদিক

থেকেই আমি আপনার ক্ষতি করেছি। কেন যে এমন হল তা বলতে পারি না। সাফল্য ও অসাফল্যের কারণগুলি সবসময়েই এমন অনিশ্চিত। কিন্তু আমার অক্ষমতার পুরোপুরি ব্যাখ্যা খুঁজতে যাবেন না। ভাবুন না, আপনারও এ নিয়ে যথেষ্ট সদিচ্ছাই ছিল। তবুও, কারো ঘটনাটা সম্বন্ধে আপত্তি থাকতে পারে। এবং আপনাকে অকৃতকার্য হতে হয়। এটা নিয়ে আমার রসিকতা করার কোনো ইচ্ছে নেই। এ নিয়ে রসিকতা করলে তা আমারই বিরুদ্ধে যাবে। কেননা আমি বলছি আমার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ দুর্ভাগ্যবশত আপনার অসাফল্যকে আরো ঘোষিত করবে। যদি আমি ব্যাপারটা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিই, তাহলে তা কোনো ভীরুতা বোঝায় না। কিংবা বিশ্বাসঘাতকতাও নয়। আসলে এর মধ্যে অনেকখানি আত্মত্যাগই রয়েছে। আমার পুস্তিকাটিই প্রমাণ করে আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে কতটা শ্রদ্ধা করি। এক অর্থে এখন আপনাকে আমার শিক্ষক বলেই মনে হয়। এবং বলতে পারেন আমি ঐ মুখিকাটির প্রায় অনুরক্ত হয়ে পড়েছি। তাহলেও আমি সরে দাঁড়াবার কথা ভেবেছি। আপনিই হলেন এর আবিষ্কর্তা। এবং আপনার সম্ভাব্য খ্যাতির পথে প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আমি তো আর কিছুই করতে পারছি না। আমি শুধু অসাফল্যকেই আকর্ষণ করে আনছি। আর তা আপনার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছি। অন্তত, আপনারও তো তাই মনে হয়। যাক্, অনেক হয়েছে। এখন, আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করে আমার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত আমি করতে পারি। এবং আমি শুধু এইটুকু চাই যে, যে স্বীকারোক্তি আপনার কাছে করলাম, তা এই পত্রিকায় আপনি প্রকাশ করুন।'

এরকমই আমি বলেছিলাম। কথাগুলি অবশ্য সম্পূর্ণ আন্তরিক ছিল না। কিন্তু তার মধ্যে আন্তরিকতা যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল। আমি কিছুটা অনুমান করতে পারছিলাম যে আমার ব্যাখ্যা তাঁকে প্রভাবিত করেছে। অধিকাংশ বৃদ্ধের মধ্যেই, অল্পবয়সী লোকেদের সঙ্গে ব্যবহারে কিছু কিছু প্রবঞ্চনা, কিছুটা বিশ্বাসঘাতকতা থাকে। তাঁদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই ভালো। ধরা যাক, তাঁদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব ভালো। আপনি তাঁদের বিশেষ বিশেষ সংস্কারগুলির কথা জানেন। তাঁদের থেকে সর্বদা সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার পান। সবই নয় মেনে নেওয়া গেলো। কিন্তু যখনই কোনো প্রবঞ্চনার কারণ ঘটে, এতদিনের লালন করা শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক কার্যকর হওয়ার বদলে, হঠাৎ, এই বৃদ্ধ মানুষগুলিকে আপনার অচেনা বলে মনে হবে। তাঁদের আরো গভীর এবং শক্তিশালী আত্মপ্রত্যয়ী বলে মনে হবে এবং এই প্রথমবার, আক্ষরিক অর্থেই, তাঁরা তাঁদের আসল রূপটি মেলে ধরবেন। এবং আতঙ্কগ্রস্ত দৃষ্টিতে আপনি তার নতুন অনুশাসনগুলি দেখতে পাবেন। এই সন্ত্রাসের প্রধান কারণ হল, এখন এই বৃদ্ধ যা বলছেন,

তা তাঁর আগের কথাগুলি থেকে অনেক বেশী সত্য এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য। যেন মনে হবে দ্রষ্টার যুক্তির নানা তারতম্য রয়েছে। এবং কথাগুলি অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশী স্পষ্ট। কিন্তু তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে মূল প্রবঞ্চনাটি লুকিয়ে রয়েছে এইখানেই যে মূলত তাঁরা সেকথাই বলতে চাইছিলেন, যা তাঁরা এখন বলছেন। সম্ভবত আমি ভালোভাবেই শিক্ষকমশায়কে বিদ্ধ করতে পেরেছিলাম। এবং দেখলাম তাঁর পরবর্তী কথাগুলি আমাকে একেবারেই বিস্মিত করছে না। আমার হাতে হাত রেখে, এবং ধীরে ধীরে চাপড় দিয়ে তিনি বললেন, 'শোনো—'এ ব্যাপারে মাথা গলানোটা তোমার নিজের কেমন লাগে?—যে মুহূর্তে আমি তোমার অনুপ্রবেশের কথাটা শুনলাম, আমি এ নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করলাম।' তিনি টেবিল থেকে চেয়ারটাকে একটু ঠেলে দিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। এবং হাতদুটিকে সামনে ছড়িয়ে দিলেন। এবং তিনি মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যেন তাঁর ছোট্ট একটুখানি স্ত্রী সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আর তিনি তাঁকেই কথাগুলি বলছেন। 'আমরা এতদিন একা-একাই সংগ্রাম করেছি,' তিনি তাঁকে বলছিলেন।—'এখন মনে হচ্ছে শহরে আমাদের একজন মহৎ রক্ষাকারীর উদয় হয়েছে। সেই শ্রী অমুক কুমার তমুক একজন ভালো ব্যবসায়ীও বটে। এর জন্য আমাদের নিজেদেরই পরস্পরকে অভিনন্দন জানানো উচিত। তাই নয় কি? একজন বোকা চাষী আমাদের বিশ্বাস করলো বা এ নিয়ে কি বললো না বললো, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু শহরের একজন ব্যবসায়ীর কথা নাক সিঁটকে ওড়ানো যায় না। একজন চাষী কি বললো বা কি করলো, তার কোনো মূল্য নেই। সে যদি বলে যে বৃদ্ধ শিক্ষকমশায় ঠিকই বলছেন বা সে যদি ঘৃণায় থুতুও ছেটায়, ফলাফল দুয়েরই সমান। আবার যদি একজন চাষার বদলে দশহাজার চাষা আমাদের পক্ষে এককাট্টা হয়ে দাঁড়ায়, তার ফলাফল (যদি এরকম সম্ভব হতো), খারাপ হতেই বাধ্য। কিন্তু একজন শহরের ব্যবসায়ী লোক, তার কেতাই আলাদা। এসব লোকের কতরকম যোগাযোগ থাকে। সে এলেবেলেভাবেও যা বলে, তা লোকে গ্রহণ করে এবং তা নিয়ে ভাবে। নতুন পৃষ্ঠপোষকরা এ-ধরনের সমস্যায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কেউ আবার এমন মন্তব্যও করতে পারে, 'দেখ, একজন বৃদ্ধ গ্রাম্য শিক্ষকের কাছেও অনেক কিছু শেখার আছে।' এবং পরের দিন দেখা যাবে বিশাল জনতা এ নিয়ে বলাবলি করছে। তাদের দেখলে বোঝা যাবে না, যে তারা এসব নিয়ে কথা বলতে পারে। তারপর এক বিরাট কাণ্ডকারখানার জন্য টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একজন ভদ্রলোক চারদিক থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে লেগে যাবেন। আর অন্যেরা বৃষ্টির মতো তাঁর ওপর তা বর্ষণ করতে থাকবে। তারা স্থির করবে যে গ্রামের এই

শিক্ষকমশাইকে তাঁর এই গোপনতা থেকে টেনে বার করা উচিত। তারা এখানে পেঁাছে যাবে। তারা তাঁর বাহ্য চেহারাটা দেখে অবশ্যই নাক সেঁটকাবে না। তারা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরবে। এবং যেহেতু তাঁর স্ত্রী ও শিশুরা তাঁর ওপরেই নির্ভরশীল তারা তাদেরও গ্রহণ করবে। তুমি কি কখনো শহুরে মানুষদের দেখেছ? তারা সব সময় কি যে বকবক করতে পারে। যখন তারা একসঙ্গে অনেকে জড়ো হয়, তুমি তাদের বকবক শুনতে পাবে। ডাইনে বাঁয়ে পেছনে ওপরে নীচে সর্বত্র। এই হৈচৈ-এর ভেতরেই তারা আমাদের ঠেলে গাড়ির ভেতর বসিয়ে দেবে। আমরা সকলকে অভিবাদন জানাবার প্রায় সময়ই পাব না। চালকের আসনে বসা ভদ্রলোকটি তাঁর চশমা ঠিক করে নেবেন, হাতের চাবুক বাগিয়ে ধরবেন এবং আমাদের যাত্রা শুরু হবে। তারা সকলে গ্রামের প্রতিও বিদায়সূচক অভিনন্দন জানাবে। যেন আমরা তাদের সঙ্গে নয়, এ গ্রামের মানুষজনের ভিড়েই রয়ে গেছি। শহরের বিশিষ্ট মানুষেরা তাদের গাড়িতে করে, আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, শহর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকবেন। আমরা যতো সেদিকে এগোতে থাকব, তাঁরা তাঁদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন এবং ঘাড় সোজা করে আমাদের দেখবেন। এদিকে যে ভদ্রলোক অর্থ-সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি বেশ যথাযথ ও সুশৃঙ্খলভাবে সবকিছু সাজিয়ে ফেলেছেন। আমরা যখন শহরের ভেতর এগোচ্ছিলাম দেখে মনে হচ্ছিল যানবাহনগুলির এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা। আমাদের মনে হতে পারে, জনতার অভ্যর্থনা বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু যখন আমরা হোটেলে পেঁাছব, তখনই আসলে তার শুরু হবে। আমাদের পেঁাছনোর সংবাদ ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সীমাহীন জনতার ভিড় তৈরী হয়ে যায়। যা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে তোলে। তারা পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গী জেনে নেয়। এবং নিমেষে অন্যের কাছ থেকে জেনে নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গীকে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী করে নেয়। যেসব লোকেরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গাড়িতে করে শহর থেকে বেরিয়ে পড়তে পারেনি, তারা সকলেই তখন হোটেলের সামনে অপেক্ষা করছে। আরো অনেকে ছিল, যারা যেতেই পারতো, কিন্তু তারা বড়ো বেশী আত্ম-সচেতন। তারাও অবশ্য অপেক্ষা করছে। সেই ভদ্রলোক, যিনি অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি সবদিকে যেভাবে নজর রাখছেন ও সবকিছু পরিচালনা করছেন, তা বিস্ময়কর।'

আমি তাঁর কথাগুলি ঠাণ্ডা মাথায় শুনলাম। অবশ্য তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমি ক্রমশই আরো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিলাম। টেবিলের ওপর আমার সংগ্রহে থাকা আমার পুস্তিকার কপিগুলি জড়ো করে রেখেছিলাম। মাত্র কয়েকটি কপি সেখানে ছিল না। কারণ যে সব কপিগুলি বাইরে ছড়িয়ে গেছে সেগুলি ফিরে পাবার জন্য আমি গত সপ্তাহে একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করি। এবং

প্রায় সব কপিগুলিই ফেরত পেয়েছি। একথা সত্যি, কয়েকটি মহল থেকে আমি বেশ শিষ্ট টীকা-সম্বলিত চিঠি পেয়েছি। যেমন, অমুক কুমার তমুক এ ধরনের পুস্তিকা পেয়েছেন বলে মনে করতে পারছেন না। যদি সত্যিই তা তাঁর কাছে পাঠানো হয়ে থাকে, তিনি খুব দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করছেন যে তিনি নিশ্চয়ই তা হারিয়ে ফেলেছেন। তবু ভালো। মনে মনে আমি তো এরচেয়ে বেশী কিছু আশা করিনি। কেবল একজন পাঠক, কৌতূহলী হয়ে, পুস্তিকাটি নিজের কাছে রেখে দেবার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন। আমার বিজ্ঞপ্তিটির সারকথা অনুযায়ী, তিনি যে বিশ বছরের মধ্যে এটি কাউকে দেখাবেন না, এই অঙ্গীকার করেছেন। গ্রামের শিক্ষকমশাই এখনো আমার বিজ্ঞপ্তিটি দেখেন নি। তাঁর বলা কথাগুলিই যে তাঁকে এটা দেখাবার পথ সহজ করে দিল, একথা ভেবে আমি খুশী হলাম। কোনো উদ্বেগ ছাড়াই আমি তা করতে পারতাম। যেভাবেই হোক, তাঁর উপকারের কথা ভেবেই, খুব সতর্কতার সঙ্গে, এটা আমায় করতে হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটির সবচেয়ে বিতর্কিত অনুচ্ছেদটি এইরকমঃ আমি পূর্বে যে ধারণাটি সমর্থন করেছিলাম, এখন তা প্রত্যাহার করছি বলেই এখন এই পুস্তিকাটি ফিরিয়ে নিতে চাই, তা নয়। বা কোনো জায়গায় ধারণাটিকে প্রমাণের অতীত বা ভ্রমাত্মক বলেও মনে করছি না। আমার এ অনুরোধের একান্ত ব্যক্তিগত ও জরুরী কারণ রয়েছে। কিন্তু তা থেকে সমগ্র ঘটনাটির প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কোনো স্থির ধারণায় পেঁছনো যাবে না। এই জায়গাটিতেই আপনাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। আমি খুশী হবো যদি আপনারা এ সত্যকে ভালোভাবে বুঝতে পারেন।

আমার হাত কিছুক্ষণের জন্য বিজ্ঞপ্তিটির ওপর পড়ে রইল। বললাম, 'আপনার হৃদয়ে আমার জন্য ঘৃণা ছাড়া কিছু নেই। কারণ আপনি যেমন আশা করেছিলেন, ঘটনা তেমন ঘটেনি। আর কেন? আমাদের এই শেষ মুহূর্তকটি আর তিক্ত করে তুলে লাভ নেই। বরং ভাবা ভালো, যদিও আপনি একটি আবিষ্কার করেছেন, তবু অন্য যে-কোনো আবিষ্কারের তুলনায় তা আর এমন বিশেষ কি মহৎ। এবং তাই যে অবিচার আপনি পেলেন তা অন্য যে-কোনো বড়ো অবিচারের থেকে বেশী। সংস্কৃত সমাজের রীতিনীতি আমি জানি না। আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে যে অভ্যর্থনার বর্ণনাটি করেছিলেন, তার সঙ্গে দূরতম সাদৃশ্যও থাকতে পারে, এমন কোনো অভ্যর্থনা, যথেষ্ট অনুকূল পরিস্থিতিতেও আপনি পেতে পারতেন বলে বিশ্বাস করি না। যেখানে আমি নিজেই ভেবে এসেছি, আমার পুস্তিকাটি থেকে অন্তত কিছু সুরাহার রাস্তা হবে। সবচেয়ে বেশী আশা করেছিলাম, হয়তো আমাদের সমস্যাটির প্রতি একজন অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো। যাতে তিনি কিছু

তরুণ ছাত্রকে এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের ভার দিতে পারেন। কোনো ছাত্র আপনার সঙ্গে দেখা করবে। এবং আরেকবার ঘটনাস্থলে গিয়ে আপনার ও আমার অনুসন্ধানগুলি নিজস্ব পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখবে। অবশেষে তার ফল যদি তার বিবেচনায় উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়, হয়তো সে নিজেই একটি পুস্তিকা লিখবে। যাতে আপনার আবিষ্কারগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে দেখানো হবে। যদিও আমাদের ভুলে যাওয়া ঠিক নয়, সমস্ত তরুণ ছাত্ররাই নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী। যদি আমার সে আশা কার্যকর হতো, তাহলেও যে তেমন বড়ো কিছু লাভ হতো, মনে হয় না। একই ব্যাপার। ছাত্রটির পুস্তিকাটি, এইরকম বিচিত্র মতবাদকে সমর্থন করার জন্য, সম্ভবত উপহাসের বিষয় হবে। আপনি যদি তার নমুনা হিসেবে এই কৃষিসংক্রান্ত পত্রিকাটি দেখেন, বুঝতে পারবেন কি সহজেই তা করা সম্ভব। আর এসব ব্যাপারে বিজ্ঞান বিষয়ক কাগজগুলো তো আরো সাংঘাতিক। এ তো জানা কথা, অধ্যাপক মানুষেরা নিজেদের প্রতি যথেষ্ট দায়িত্বপরায়ণ। বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁদের দায়িত্ব আছে। উত্তরপুরুষের জন্য দায়িত্ব আছে। তাঁরা যে কোনো নতুন আবিষ্কারকেই সহজে বুকে তুলে নিতে পারেন না। আমাদের মতো লোকেদের বরং সেসব সুযোগ-সুবিধে আছে। কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। মনে করি ছাত্রটির পুস্তিকাটি স্বীকৃতি পেল। তার পরে কি ঘটতে পারে? সম্ভবত আপনি সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ্য হবেন। যেহেতু আপনি একজন শিক্ষক, আপনার এই পেশার ব্যাপারটাও কাজ দিতে পারে। মানুষ বলবে, 'আমাদের গ্রামের শিক্ষকদের কেমন তীক্ষ্ন দৃষ্টিশক্তি। এবং এই পত্রিকাটি (যদি বলেন, পত্রিকারও স্মৃতি কিংবা বিবেক-টিবেক রয়েছে), এই পত্রিকাটি, আপনার কাছে, সর্বসাধারণের সামনে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হবে। আর কোনো শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপকেরও দেখা মিলবে, যিনি আপনার জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। তাঁরা আপনাকে শহরে যাবার কথাও বলতে পারেন। সেখানকার কোনো বিদ্যালয়ে আপনার জন্য একটি পদের ব্যবস্থাও করতে পারেন। এবং একটি শহরের সব বৈজ্ঞানিক সম্পদাদি ব্যবহারের সুযোগ আপনাকে দেওয়া হতে পারে, যাতে আপনি নিজের উন্নতিসাধন করতে পারেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এই সমস্ত কিছু করার শুধুমাত্র চেষ্টা করেই তাঁরা পরিতৃপ্ত থাকবেন। তাঁরা আপনাকে ডেকে পাঠাবেন। আপনি যাবেন। কিন্তু অন্যান্য অসংখ্য সাধারণ আবেদনকারীর মতোই আপনি হাজির হবেন। খুব একটা সমারোহের সঙ্গে নয়। তারা আপনার সঙ্গে কথা বলবে। আপনার সৎ প্রচেষ্টার প্রশংসা করবে। কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও ভেবে দেখবে যে আপনার বয়স হয়েছে। এই বয়সের একজন মানুষের পক্ষে বিজ্ঞানচর্চা শুরু করা কোনো কাজের কথা নয়। আর তাছাড়া, আপনি তো আর ধরেবেঁধে একটা আবিষ্কার করে

ফেলেননি। ঘটনাটা হঠাৎই ঘটে গেছে। এই একটা ব্যাপার ছাড়া আরো অন্য আবিষ্কারের জন্য শ্রম দেবার মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আপনার নেই। এসব কারণে সম্ভবত তারা আপনাকে আবার আপনার গ্রামে ফিরিয়ে দেবে। অবশ্য, আপনার আবিষ্কারটি নিয়ে আরো দূর এগোনো হবে। কারণ, একবার স্বীকৃতি পাবার পর, তা যে আবার ভুলে যাওয়া হবে, এটা এত তুচ্ছ ব্যাপার নয়। কিন্তু আপনি সে নিয়ে আর তেমন কিছু শুনতে পাবেন না। এবং আপনি যা শুনবেন, তা আপনি কদাচিৎ বুঝতে পারবেন। যে-কোনো নতুন বস্তু আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডারে জমা পড়ে যায়। তখন, এক অর্থে, এটা যে একটা আবিষ্কার, সে ধারণাটা চাপা পড়ে যায়। আবিষ্কারটি এক সমগ্রতার মধ্যে মিশে যায়। হারিয়ে যায়। দক্ষ বৈজ্ঞানিকের চোখ ছাড়া পরে তা চিনতে পারা সম্ভব নয়। কারণ, যে মূল সত্যের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত তার অস্তিত্বের কথা আমরা প্রায় জানিই না। এবং বিজ্ঞানের বিতর্কে তাকে এই সত্যের পরিমণ্ডলে জায়গা দেওয়া হবে। আমরা কি করে এসব জিনিস বোঝবার আশা করতে পারি। প্রায়ই আমরা যখন কোনো জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনবো, আমাদের মনে হতে পারে, যে আলোচনা আপনার আবিষ্কার প্রসঙ্গে। যদিও হয়তো তা সম্পূর্ণ আলাদা কোনো বিষয়ে। আবার অন্য সময়ে, যখন আমরা ভাববো, এবারের আলোচনা নিশ্চয়ই অন্য প্রসঙ্গে ; আপনার আবিষ্কার প্রসঙ্গে একেবারেই নয়। হয়তো দেখা যাবে, সেটা আপনার বিষয়টি নিয়েই, শুধু সেটি নিয়েই।

'আপনি কি বুঝতে পারছেন না ? আপনি আপনার গ্রামেই পড়ে থাকবেন। হয়তো বাড়তি টাকা দিয়ে আর একটু ভালোভাবে আপনার পরিবারের জন্য আহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করতে পারবেন। কিন্তু আপনার আবিষ্কার আপনার হাতের বাইরে চলে যাবে। অথচ ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদের কোনো ক্ষমতাই আপনার হাতে থাকবে না। কারণ এটা কেবল শহরেরই জিনিস হয়ে সেখানেই আটকে থাকবে। মানুষ অবশ্য আপনার প্রতি একেবারে অকৃতজ্ঞ হবে না। যে জায়গাতে আবিষ্কারটি ঘটেছিল, ঠিক সেই জায়গাটিতে, তারা সম্ভবত একটি ছোটো সংগ্রহশালা বানাবে। একদা এটাই গ্রামটির একটি দ্রষ্টব্য হয়ে উঠবে। আপনাকে সংগ্রহশালার চাবি সংরক্ষণের ভার দেওয়া হবে। এবং যাতে আপনি সম্মানের বাহ্য নিদর্শনটুকুর জন্য অভাববোধ না করেন, আপনার কোটের ওপর বুকের কাছটিতে ধারণ করার জন্য তারা একটি ছোটো পদক দিতে পারে। বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলির পরিচারকেরা যে ধরনের পরে আর কি। এগুলি সবই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আপনি কি এই-ই চেয়েছিলেন ?' তাঁর উত্তর কি হতে পারে ভাববার সময় না দিয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'তাহলে কেবল এইগুলিই তুমি আমার জন্য আদায় করতে চেয়েছিলে ?'

'হয়তো তাই।' আমি বললাম, 'সে সময়ে খুব মনোযোগ দিয়ে ঠিক কি যে করেছিলাম, তা আর এখন পরিষ্কার বলতে পারবো না। কিন্তু সেসব বৃথা গেছে। এরকম বিশ্রীভাবে আর কখনও হেরে যাইনি। সে কারণেই এখন আমি সরে দাঁড়াতে চাই। আর যতটা সম্ভব আমার কাজগুলি নষ্ট করে দিতে চাই।'

'ঠিক আছে, ভালোই,' শিক্ষকমশায় বললেন। তিনি তাঁর পাইপটি বার করলেন। এবং সমস্ত পকেটগুলিতেই যে খোলা তামাক তিনি ভরে এনেছিলেন, তা দিয়ে পাইপ ঠাসতে লাগলেন। 'তাহলে এই ফালতু কাজের ভার তুমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলে? এখন আবার স্ব-ইচ্ছাতেই তুমি সরে যেতে চাইছ। ঠিক আছে।'—তিনি বললেন।

'আমি খুব একটা অবাধ্য লোক নই,' আমি বললাম, 'আমার প্রস্তাবটিতে আপত্তিকর কিছু কি দেখছেন?'

'না একেবারেই তা নয়,' শিক্ষকমশায় বললেন। তাঁর মুখের পাইপটি জ্বলছিল। তামাকের দুর্গন্ধ আমার সহ্য হচ্ছিল না। তাই উঠে দাঁড়ালাম। এবং ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পায়চারি শুরু করলাম। তাঁর সঙ্গে পুরোনো সাক্ষাৎকারগুলি থেকেই, কথাবার্তার ব্যাপারে তাঁর চরম অনিচ্ছায় আমি অভ্যস্ত। এবং তা সত্ত্বেও, একবার আমার ঘরে এলে, সেখান থেকে নড়বার তাঁর একটুও আগ্রহ রয়েছে বলে মনে হবে না। ব্যাপারটা আগে আমাকে প্রায়ই বিরক্ত করতো। এইসব সময়ে আমি প্রতিবারই ভাবতাম, তিনি আরও কিছু চান। আমি তাঁকে টাকার প্রস্তাব দিতাম। সত্যি কথা, সেটা তিনি ঠিকই জেনে নিতেন। কিন্তু যতক্ষণ না তা যথেষ্ট সুবিধামতো পেতেন, ততক্ষণ তিনি চলে যেতেন না। সাধারণত তাঁর পাইপটি সে সময়ে ধূম উদ্গিরণ করেই যেত। তারপর তিনি খুব আনুষ্ঠানিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে চেয়ারটিকে টেবিলের দিকে ঠেলে দিতেন। একবার তার চারদিক দিয়ে ঘুরে আসতেন। এককোণে রাখা তাঁর ছড়িগাছাটি তুলে নিতেন। তারপর খুব আবেগের সঙ্গে আমার হাতে চাপ দিতেন। এবং চলে যেতেন। কিন্তু আজকে এই যে তিনি বসে আছেন, তাঁর নীরব উপস্থিতি আমার কাছে প্রকৃত অত্যাচার বলে মনে হচ্ছে। যখন কেউ কাউকে শেষ বিদায় জানিয়ে দিয়েছে, যেরকম আমি তাঁকে জানিয়ে দিয়েছি, যে বিদায় ভালো মনে গ্রহণ করাও হয়েছে; নিশ্চয়ই এবার বাকি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া যেগুলি বাকি আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেরে ফেলা উচিত। এবং কারোরই উচিত নয়, নিজের নীরব উপস্থিতি দিয়ে অহেতুক বাড়ির কর্তার কাছে বোবার মতো হওয়া। কিন্তু সেই টেবিলের সামনে বসে থাকা অদম্য ছোটোখাটো বৃদ্ধটিকে দেখে মনে হল, হয়তো কখনোই তাঁকে আর বাইরে যাওয়ার দরজাটি দেখানো যাবে না।

ওয়াশ

সাটপেন খড়ের বিছানার সামনে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল। খড়ের শয্যায় মিলি শুয়েছিল সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে। কোঁচকানো কাঠের পাটাতনের দেয়াল। তার ফাঁক দিয়ে পেন্সিলের রেখার মতো সকালের সূর্যালোক আড়াআড়িভাবে সাটপেনের দুই পায় ও হাতে ধরা চাবুকের ওপর পড়ে ভেঙে গিয়ে মিলির নিথর শরীরের ওপর স্থির হয়ে ছিল। মিলির পাশে একখণ্ড রংচটা কাপড়ে মোড়া ছিল নবজাতক। সাটপেনের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল গোমড়া চোখ মেলে। খানিকটা দূরে আগুনের কুণ্ডের পাশে বসেছিল আধবুড়ো নিগ্রো দাই। কুণ্ডে ধূমায়িত হচ্ছিল এক টুকরো জীর্ণ আগুন।

সাটপেন বলল, 'বড় দুর্ভাগ্যের কথা মিলি যে তুমি মাদী ঘোড়া নও। নইলে আস্তাবলে তোমার জন্যে একটা ভাল জায়গা দেওয়া যেত।'

খড়ের বিছানায় তবু কোনও স্পন্দন নেই। একই রকম ভাবলেশহীন মুখে সাটপেনের দিকে সে চেয়ে রইল। বত্রিশ নাড়ির বাঁধন ছেঁড়ার যন্ত্রণা সহ্য করার ধকল তার সারা মুখে। সাটপেন এবার নড়ে উঠল, রোদের রেখা এখন তার মুখের ওপর ভাঙছে—ষাট বছর বয়স্ক একটা লোকের মুখ। শান্ত স্বরে দাইকে সে জানাল, 'আজ সকালে গ্রিমেণ্ডারও বাচ্চা হয়েছে, জানিস?'

'মদ্দা না মাদী?'

'মদ্দা। একটা দারুণ সুন্দর মদ্দা।' সাটপেন বলল। তারপর হাতে ধরা ঘোড়ার চাবুকটি দিয়ে সামনের ঘরের বিছানা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখানেরটা কী? এটা মদ্দা না মাদী?'

'এটা তো মাদীই।'

'এঃ হে।' সাটপেনের গলা শোনা গেল, 'তবে গ্রিমেণ্ডার বাচ্চাটা যা হয়েছে না। বড় হলে ঠিক রব রয়ের মতো হবে। ৬১ সালে উত্তরের লড়াইয়ে যার পিঠে চড়ে আমি গিয়েছিলাম। তোর মনে আছে?'

'আজ্ঞে মনে আছে হুজুর।'

'যাকগে।' চলে যেতে যেতে মেঝের বিছানার দিকে ফিরে সাটপেন এক ঝলক দেখে নিল। মিলি কি এখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে? কে জানে। চাবুকটা তুলে বিছানার দিকে দেখিয়ে দাইকে লক্ষ্য করে সাটপেন বলল, 'ওদের জন্যে যা যা করার দরকার, করিস।' বলেই আর দাঁড়ালো না সে। ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে গেল। লতানে আগাছার ঝোপঝাড় মাড়িয়ে সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে গেল। এগুলো কেটে সাফ করার জন্যেই মাস-তিনেক আগে ওয়াশ তার কাছ থেকে কাস্তেটা চেয়ে নিয়েছিল। সেই লতাঝাড়ে ঢাকা সিঁড়ির ধাপ নেমে সাটপেন সোজা চলে গেল যেখানে তার ঘোড়া তার জন্যে অপেক্ষা করছিল আর অপেক্ষা করছিল ওয়াশ, ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে।

কর্নেল সাটপেন যখন ইয়াংকিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গিয়েছিল, ওয়াশ কিন্তু তার সঙ্গে যায়নি। না যাওয়ার কারণ যারা তাকে জিজ্ঞেস করত এবং যারা করত না তাদেরও সকলকে ডেকে ডেকে ওয়াশ শোনাত, 'আমি কর্নেলের খামার এবং নিগ্রো মজুরদের দেখাশোনা করার জন্যে রয়ে গেছি।' ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কৃশকায়, বিবর্ণ জিজ্ঞাসু চোখ, ওয়াশকে তখন ৩৫ বছরের ছোকরা বলে মনে হতো, যদিও সবাই জানত, তার যে শুধু একটা মেয়ে আছে তা নয়, ৮ বছর বয়সের এক নাতনীও আছে। ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়েসের যে সামান্য কয়েকজন থেকে গিয়েছিল তারা প্রায় সকলেই জানত যুদ্ধে না যাওয়ার যে কৈফিয়ৎ ওয়াশ শোনাচ্ছে, আসলে তা ডাহা মিথ্যে। কেউ কেউ অবশ্য মনে করত ওয়াশ নিজেও এই মিথ্যে কথাটা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তবে তারা এটাও জানত যে সাটপেনের স্ত্রী বা তার খামারের দাসমজুরদের দেখাশোনা করার চেয়ে ভাল কিছু করার ক্ষমতা ওয়াশের আছে। কিন্তু তার কোনও উদ্যম নেই এবং সে খুবই অলস। সাটপেনের খামারের সঙ্গে তার একমাত্র যোগসূত্র হল, গত কয়েক বছর ধরে কর্নেল সাটপেন তাকে খামারের মধ্যে দিয়ে বয়ে-যাওয়া খালের খাতে কাদাপাঁকের জলার ওপর তৈরি বিদ্ঘুটে কুঠরিটায় বসে থাকতে দিয়েছে। বিয়েশাদী করার আগে মাছ ধরার জন্যে সাটপেন নিজেই এই কিম্ভূত ঘরটা বানিয়েছিল। পরিত্যক্ত অব্যবহৃত ওই ঘরটা ভেঙেচুরে এমন হয়েছে, এখন দেখলে মনে হয় কোনও রুগ্ন বা বুড়ো বুনো জন্তু মরার আগে জল খাওয়ার জন্যে ঘষটে ঘষটে এখানে এসে স্থির হয়ে গেছে।

সাটপেনের দাসরাও ওয়াশ-এর বক্তব্য শুনেছিল। শুনে হেসেছিল : ওয়াশকে নিয়ে এই প্রথম যে তারা হাসিঠাট্টা করল, তাও নয়। কৃষ্ণাঙ্গ দাসরা বরাবরই আড়ালে ওকে 'সাদা আবর্জনা' বলে ডাকে। সামনে ওরা ছোট ছোট

দলে ভাগ হয়ে ওয়াশকে রাস্তার ওপর ঘিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করত কেন সে যুদ্ধে যায়নি। থমকে গিয়ে ওয়াশ তার প্রশ্নকর্তাদের কালো মুখগুলোর বলয়ের দিকে তাকাত, তাদের ঝকঝকে সাদা চোখ ও দাঁতের আড়ালে যেন উপহাস ঝিলিক দিচ্ছে। বলত, 'যাইনি, কারণ একটা মেয়ে ও পরিবারের দেখাশোনা আমায় করতে হয়। রাস্তা ছাড়, ব্যাটা নিগ্রোর দল!'

'নিগ্রো, অ্যা? আমরা নিগ্রো? আর, কে বলছে?' হো-হো করে হেসে উঠত দাসরা।

'হ্যাঁ আমি বলছি। আমি। আমি যুদ্ধে চলে গেলে তোরা নিগ্রোরা কি আমার বেটি-ছাওয়ালদের দেখাশোনা করতিস?'

'আমরাও কি তোমার ওই খালপারের ভাঙা কুঁড়ে দখল করে নিতাম, ভেবেছো? আমাদের ভারি বয়েই গেছে।'

রেগে যেত ওয়াশ। শাপ-শাপান্ত করতো। মাঝে মাঝে মাটি থেকে ডাল কুড়িয়ে নিয়ে তাড়া করত ওদের। ওরা ছড়িয়ে যেত, যেন এক্ষুনি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। পরক্ষণেই আবার চারদিক থেকে গোল হয়ে ঘিরে ধরত। ঠাট্টা করত, উপহাস করত, ধরতে গেলেই নাগাল এড়িয়ে সরে যেত, কিন্তু সহজে রেহাই দিত না। এক সময় তখন রাগে আর ক্লান্তিতে হাঁপাতে হাঁপাতে ওয়াশ হাল ছেড়ে বসে পড়ত। একবার তো সাটপেনের বিশাল বাড়ির পেছনের উঠোনেই এরকম হয়েছিল। সেবার টেনেসি পর্বত ও ভিক্সবার্গ থেকে মর্মান্তিক দুঃসংবাদ আসছিল। খামারে এসেছিল শেরম্যান এবং তার সঙ্গে খামার ছেড়ে চলে গিয়েছিল বেশির ভাগ নিগ্রো দাস। যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, যুক্তরাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনী তাও নিয়ে চলে যায়। সাটপেনের স্ত্রী নিজে তাকে খবর দিয়েছিলেন, বাড়ির পিছনের উঠোনের গাছ থেকে সে যেন পাকা ফলগুলো পেড়ে নিয়ে যায়। সেবারে বাদ সেধেছিল খামারের দাস নয়, বাড়ির ঝি। যে সামান্য কয়েকজন নিগ্রো থেকে গিয়েছিল তাদের একজন। রান্নাঘরের সিঁড়ি থেকে ঝি-টা তীক্ষ্ম কণ্ঠে চিৎকার করেছিল—'আর এক পাও নড়বে না, বুঝলে সাহেব, এক পাও নয়। যেখানে আছো, সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। হুজুর কর্নেল থাকতে তুমি কখনও এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোওনি, এখনও ডিঙোবে না।'

নিগ্রো ঝির ভর্ৎসনার কথাগুলো মিথ্যেও নয়। কিন্তু এটা ওয়াশের এক ধরনের গর্ব ছিল। ওয়াশ কখনও এ বাড়ির চৌকাঠ মাড়ায়নি ঠিকই, কিন্তু ও বিশ্বাস করত, বাড়িতে এলে সাটপেন তাকে স্বাগত জানাবে ঢুকতে দেবে। তবু ও কখনো আসত না, আর সেজন্য একধরনের গর্ববোধ ছিল তার। ও উত্তেজিত হয়েছিল এই ভেবে যে ও কোথায় যেতে পারবে না-পারবে, একটা নিগ্রো ক্রীতদাসী সেটা বলবার কে? তা বলে কর্নেল ফিরে এলে তার কাছে

এ নিয়ে নালিশ করার কথাও সে ভাবেনি। তার জন্যে একজন সামান্য ক্রীতদাসী গালাগাল খাবে, এটাও তার মনঃপূত নয়। অথচ সেই সব বিরল রবিবারগুলো, যখন বাড়িতে কেউ থাকত না, ওয়াশ তখন সাটপেনের সঙ্গে বসে একাধিক অপরাহ্ন একসঙ্গে কাটিয়েছে। মনে মনে সে জানত যে সাটপেনের করার মতো কোনও কাজকম্মো নেই, অখণ্ড অবসর, অথচ নিজের সঙ্গ অর্থাৎ একাকিত্ব সে একেবারেই সহ্য করতে পারে না। সে সময় একের পর এক বিকেল খিড়কির উঠোনে চুপচাপ গড়িয়ে গেছে, সাটপেন একটা দড়ির দোলনায় গা এলিয়ে পড়ে থাকত, ওয়াশ বসত মাটিতে, কোনও খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে। দুজনের মাঝখানে বালতিভর্তি জল—আর কুঁজোভর্তি মাদক পানীয়। একই পাত্র থেকে দুজনেই ঢেলে নিত নিজের নিজের অংশ। এটা অবশ্য শুধু কয়েকটা দুর্লভ রবিবারের স্মৃতি। বাকি দিনগুলো তার কাটত একটি সুন্দর কালো ঘোড়ার পিঠে এক সুপুরুষ সওয়ারের চমৎকার চেহারা দেখে দেখে। বয়স দুজনেরই একই হবে। কিন্তু ওয়াশের যেহেতু নাতনী রয়েছে আর সাটপেনের যুবক পুত্র সবে স্কুলে পড়ে, তাই দুজনের কেউই পরস্পরকে সমবয়সী ভাবতে পারত না। খামারে ঘুরে বেড়ানো সাটপেনের দৃপ্ত অশ্বারোহী মূর্তিটা ওয়াশ মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখত। কী এক অদ্ভুত শান্ত অহংকারে ভরে উঠত তার মন। সে ভাবত বাইবেলের কথা যা তাকে শিখিয়েছে, নিগ্রোরা ঈশ্বরের সৃষ্টি হলেও ঈশ্বর তাদের অভিশপ্ত করেছেন শ্বেতাঙ্গদের দাস হয়ে থাকতে। সেই নিগ্রোরাও তার চেয়ে ভাল বাড়িতে থাকে, ভাল খায়, ভাল জামাকাপড় পরে এবং তাকে নিয়ে উপহাস করে। অশ্বারোহী সাটপেনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই অপমানের গ্লানি সে ভুলে যেত, মনে হতো তার নিজের এই দৈন্য ও হীনমন্যতা আসলে একটা প্রহেলিকা, একটা মিথ্যে মায়ার জগৎ। সত্য ও বাস্তব শুধু ওই সামনের প্রান্তরে ভ্রাম্যমাণ কালো ঘোড়ার সওয়ার, ওই সাটপেন, যে তার একান্ত নিজস্ব সত্তার নিঃসঙ্গ মহিমান্বিত অশ্বারোহী! আহা! স্রষ্টা স্বয়ং যদি এখন মর্ত্যে নেমে আসতেন, চাইতেন নশ্বর কোনও মানবদেহ ধারণ করতে, তাঁরও নিশ্চয় মনে হতো, ওয়াশের যেমন মনে হয়, ওই রকম এক অশ্বারোহীর গর্বিত মূর্তিই কেবল ঈশ্বরিক মহিমায় বরণীয়।

সেই কালো ঘোড়ার পিঠে চেপেই ১৮৬৫ সালে সাটপেন ফিরে এল। মনে হল তার বয়েস বুঝি দশ বছর বেড়ে গেছে। ইতিমধ্যে তার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। যে শীতে তার ছেলে যুদ্ধে মারা গেল, সেই শীতেই বিপত্নীক হয় সাটপেন। যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জেনারেল লীর হাত থেকে মানপত্র নিয়ে সাটপেন ফিরে এল তার খামারে, এখন যার চেহারা একেবারে বিধ্বস্ত। তার মেয়ে গত একবছর হল বেঁচে-বর্তে আছে কোনওমতে সেই লোকটির দয়ায়, ১৫ বছর আগে যাকে খালপাড়ের পরিত্যক্ত মাছ ধরার মাচাবাড়িতে আস্তানা গাড়ার

অনুমতি দিয়েছিল সাটপেন নিজেই, কিন্তু যার অস্তিত্বটাই সে বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছে। সাটপেন তাকে ভুলে গেলেও বিশ্বস্ত ওয়াশ কিন্তু তাকে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়িয়েছিল। ওয়াশের কোনও পরিবর্তন হয়নি, আগের মতোই কৃশকায়, বয়সহীন, বিবর্ণ, জিজ্ঞাসু পরিচিত দৃষ্টি নিয়ে। 'তারপর কর্নেল! ওরা আমাদের অনেককে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু শেষ করে দিতে পারেনি, কী বল?'

পরের পাঁচ বছর ওয়াশ-সাটপেন সংলাপ এই একই খাতে বয়ে চলেছে। এখন তাদের পানীয় যে হুইস্কি, যুদ্ধের আগের তুলনায় তা নিকৃষ্ট। শৌখিন আধার নয়, পাথরের জগ থেকে ঢেলে খায় দুজনে। আড্ডাটাও বাসা পাল্টেছে। এখন বড় রাস্তার ওপর সাটপেনের তৈরি একটা ছোট ভাঁড়ার ঘরের পিছনে মজলিস বসে। ভাঁড়ারের সামনের দিকে নানা আকারের তাক। খদ্দেররা আসে কেরোসিন কিনতে, শুকনো খাবারদাবার, খয়াটে পুরনো মিছরি আর রুদ্রাক্ষের শস্তা গুটি সওদা করতে। বিক্রি করে সাটপেন, ওয়াশ এখন তার কুলি ও কেরানি দুইই। কেনে ওয়াশের মতোই হতদরিদ্র আর বাউণ্ডুলে শ্বেতাঙ্গ আর নিগ্রোরা। পাইপয়সার জন্যে তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুচ্ছ ক্লান্তিকর দরকষাকষি চালায় সাটপেন, একদিন যে তার দশ মাইল বিস্তীর্ণ উর্বর খামারের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত কালো ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে দাপিয়ে বেড়াত, এই সেদিনও যে যুদ্ধে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছে। ঘোড়াটা অবশ্য এখনও বেঁচে আছে এবং যে আস্তাবলে সে থাকে, তার প্রভুর বাড়ির চেয়ে সেটা এখন বেশি বাসযোগ্য। মেরামতির অভাবে সাটপেনের বাড়ি এখন ভগ্নস্তূপ। দরকষাকষি করতে করতে বিরক্ত বীতশ্রদ্ধ ক্ষিপ্ত হয়ে সাটপেন একসময় দোকান খালি করে সব বেচে দেয়। ঝাঁপ বন্ধ করে ভিতর থেকে তালা লাগিয়ে দেয়। তারপর সে ও ওয়াশ নিকৃষ্ট হুইস্কির জগ নিয়ে পিছন দিকটায় চলে আসে, বসে যায়। পানীয়ে চুমুক দিতে দিতে বাক্যালাপ চলে। তবে আগের মতো নয়। আগে দড়ির দোলনায় গা এলিয়ে উদ্ধত সাটপেন একতরফা স্বগতোক্তি ঝাড়ত আর ওয়াশ তার খুঁটিতে হেলান দিয়ে হো-হো করে হাসত। এখন সেসব দিন গেছে। দুজনেই মুখোমুখি বসে, যদিও একমাত্র চেয়ারটা সাটপেনই দখল করে আর ওয়াশ হাতের কাছে যে-কোনও একটা বাক্স-টাক্স পেলে টেনে নিয়ে বসে যায়। তবে এই বসাটাও কিছুক্ষণের ব্যাপার। কেননা, হুইস্কির প্রভাবে শীঘ্রই সাটপেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তার নির্বীর্য আক্রোশ আর ক্ষিপ্ত পরাজয়হীনতা নিয়ে টলতে টলতে ঘোষণা করে—এবার সে একাই তার পিস্তল খাপে পুরে কালো ঘোড়ায় চড়ে ওয়াশিংটনে যাবে এবং লিংকন ও শেরম্যানকে হত্যা করবে। চিৎকার করে ওঠে 'মারো শালাদের। কুত্তাগুলোকে কুকুরের মতোই গুলি করে মারো।' সাটপেনের হুঁশ নেই যে নিগ্রো ক্রীতদাসদের মুক্তিদাতা আব্রাহাম

লিংকন ইতিমধ্যেই নিহত এবং শেরম্যানও রাজনীতি থেকে পরিপূর্ণ অবসর নিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের একান্ত নিভৃতে ফিরে গেছেন। উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে সাটপেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। 'শান্ত হও কর্নেল, শান্ত হও' বলতে বলতে ওয়াশ তাকে ধরে ফেলে। তারপর রাস্তা দিয়ে যে-কোনও ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পেলে তাকে দাঁড় করায়, না পেলে নিকটতম প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে আনে, তারপর সেই গাড়িতে সাটপেনকে তুলে বাড়ির দিকে রওনা হয়। আজকাল ওয়াশ সাটপেনের বাড়ির ভিতরে ঢোকে, বেশ কিছু দিন ধরে ঢুকছে। নেশাগ্রস্ত, মুহ্যমান সাটপেনকে তার দোকান থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা তার নৈমিত্তিক কাজ! পথে অর্ধচেতন, বাহ্যজ্ঞানহীন সাটপেনের সঙ্গে বিড়বিড় করে সারাক্ষণ বকতে বকতে আসে, তার কথা শুনলে মনে হয় সে কোনও ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলছে, কথা বলে, আদর করে, চাপড় মেরে ঘোড়াকে ছোটাবার চেষ্টা করছে। সাটপেনের মেয়ে বাড়ির দরজা খুলে দেবে কোনও কথা না বলে। ওয়াশ সাটপেনকে টানতে টানতে যেখান দিয়ে ঢোকে, একসময় সেটাই ছিল কারুকার্যখচিত শৌখিন সদর দরজা, দরজা পেরিয়ে যে মেঝে একদা ভেলভেটের কার্পেটে মোড়া ছিল তার ঠাণ্ডা এবড়োখেবড়ো বুকের ওপর দিয়ে ঘষটাতে ঘষটাতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে তুলে একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দেয়, খুলে দেয় জুতো-জামা। তারপর বিছানার পাশে একটা চেয়ারে নিজে চুপচাপ বসে থাকে। ততক্ষণে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, একটু পরে সাটপেনের মেয়ে যখন জিজ্ঞাসু চোখে ঘরের দরজায় আসে, ওয়াশ বলে ওঠে— 'সব ঠিক আছে, তুমি কিছু চিন্তা কোরো না মিস জুডিথ।'

ক্রমে অন্ধকার গাঢ় হয়। কিছুক্ষণ পরে সাটপেনের বিছানার পাশে মেঝেতেই ওয়াশ শুয়ে পড়ে। ঘুমোনোর জন্যে নয়, কারণ মধ্যরাত্রির কিছু আগে বিছানা মড়মড় করে ওঠে এবং দুতিনবার অস্ফুট গোঙানির পর সাটপেনের গলা শোনা যাবে—'ওয়াশ!'

'আমি এখানে কর্নেল! তুমি ঘুমোও নিশ্চিন্তে, ঘুমোও। এখনও তো ব্যাটারা আমাদের কাবু করতে পারেনি। তুমি আর আমি দুজনে মিলে ঠিক ওদের শায়েস্তা করতে পারব; দেখো।'

এর আগেই অবশ্য ওয়াশ তার নাতনীর কোমরে পরা রিবনটা দেখেছে। নাতনী তো এখন আর আট বছরের খুকি নয়, পনের বছরের উদ্ভিন্নযৌবনা। দেখেই ওয়াশ বুঝতে পেরেছে কার কাছ থেকে রিবনটা এনেছে। নাতনী গোপন করলেও সে বুঝতে পারত। কিন্তু মেয়েটা কিছুই গোপন করেনি। উদ্ধত সাপিনীর মতো খোলাখুলিই সব বলেছে। ওয়াশ নাতনীকে বলেছে, 'কর্নেল যদি তোকে কিছু দিতে চায়, তুইও নিশ্চয়ই সেজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিবি।'

মুখে এ কথা বললেও ওয়াশ মনে মনে গম্ভীর হয়ে যায়। বিকেলে যখন

ঝাঁপ বন্ধ করে সাটপেন তাকে হুইস্কির জগ নিয়ে আসতে বলে রোজকার মতো, হঠাৎ সে বলে ওঠে—'দাঁড়াও। একটু পরে আনছি। তার আগে, এক মিনিট, কথা আছে।'

সাটপেনও গোপন করেনি যে সেই পোশাকটা ওয়াশের নাতনীকে দিয়েছে। 'দিয়েছি তো তাতে হয়েছেটা কী?'

সাটপেনের উদ্ধত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে ওয়াশ বলে, '২০ বছর ধরে আমি তোমাকে চিনি, জানি। এই দীর্ঘ সময়ে তুমি আমাকে যখন যা বলেছ, তাই করেছি। এখন আমার বয়স প্রায় ষাট। আর নাতনীটা তো পনের বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে বৈ কিছু নয়।'

'তুমি কি বলতে চাও, আমি মেয়েটার কোনও ক্ষতি করব? যেহেতু আমিও তোমার প্রায় সমবয়সী, অর্থাৎ আধবুড়ো?'

'তুমি যদি অন্য কেউ হতে, তাহলে তোমাকে আমি আমার নিজের মতোই বুড়োটে ভাবতাম। আর বুড়ো হোক, ছোকরা হোক, অন্য কেউ ওই পোশাক উপহার দিলে নাতনীকে আমি কিছুতেই সেটা পরতে দিতাম না, কাছে রাখতেও দিতাম না। শুধু তুমি দিয়েছ বলেই····· তুমি তো অন্য সবার মতো নয়, তুমি আলাদা।'

'কিরকম? আলাদা কিরকম শুনি!' সাটপেনের এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ওয়াশ তার রুগ্ন জিজ্ঞাসু শান্ত চোখে চেয়ে থাকে।

'ও, এইজন্যেই তুমি আমায় ভয় পাও?' সাটপেনের এই কথায় ওয়াশের দৃষ্টির জিজ্ঞাসা মুহূর্তে অন্তর্হিত হল। এখানে সে চোখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি আর আস্থার দীপ্তি। 'না। তোমাকে আমি ভয় পাই না। কারণ তুমি কাপুরুষ নও, তুমি সাহসী। এমন নয় যে জীবনের কোনও এক বিশেষ দিনের একটি বিশেষ মুহূর্তে তুমি হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠেছিলে, যার জন্যে জেনারেল লী তোমায় স্বীকৃতিপত্র লিখে দিয়েছেন। আসলে বরাবরই তুমি বীর, সাহসী। তোমার সাহস তোমার শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই সত্য, অমোঘ। এইখানেই তুমি অন্য সবার চেয়ে আলাদা। আমার কাছে তোমার সাহস আর পৌরুষ এত স্বতঃসিদ্ধ যে তার জন্য কোনও সার্টিফিকেটের দরকার নেই। আর আমি জানি, যা কিছুই তোমার হাতে পড়ুক, সে একটা ফৌজী রেজিমেণ্ট হোক, একটা শিকারী কুকুর হোক, কি একটা অবোধ বালিকাই হোক, সকলকেই তুমি ঠিক পথে নিয়ে যাও। কোনও ব্যতিক্রম হয় না।'

এবার কিন্তু ওয়াশের চোখ এড়িয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকার পালা সাটপেনের। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে চকিতে ওয়াশের দিকে ফিরে আদেশের গলায় সাটপেন বলল, 'জগটা নিয়ে এসো।'

'ঠিক আছে কর্নেল। যা তুমি ভাল বোঝ।'

এর দু-বছর পরে সেই রবিবারের ভোরে তিন মাইল দূর থেকে ডেকে আনা নিগ্রো দাইকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে এবং ভিতর থেকে নাতনীর যন্ত্রণার কাতরানি শুনতে শুনতে ওয়াশ মনে মনে উদ্বিগ্ন হলেও শান্ত ও আত্মমগ্ন ছিল। ওয়াশ তো জানতই সাটপেনের দোকানের আশপাশে ঘুরঘুর করা লগ কেবিনের নিগ্রো আর লোফার বাউণ্ডুলে শ্বেতাঙ্গরা কী সব কানাঘুষো করত। দোকানে তো তখন তিনজনেরই আড্ডা—ওয়াশ, সাটপেন আর ওয়াশের নাতনী। যত দিন যাচ্ছিল, নাতনীর মধ্যদেশ যত স্ফীত হচ্ছিল, ততই সে তার ঔদ্ধত্য ও লজ্জা-হীনতা নিয়ে বেপরোয়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল দুই বুড়োর সঙ্গে সর্বত্র, যাদের একজন তার দাদু আর অন্যজন···। যেন একই নাটকের একই পরিণতির দিকে অগ্রসরমান তিন মঞ্চাভিনেতা। ওয়াশ ভাবত, সবাই কী কানাকানি করছে তা সে জানে : সবাই ঠিক একথাই বলছে যে, এতদিনে শেষ পর্যন্ত ওয়াশ জোন্স সাটপেনকে বাগে পেয়েছে, এজন্যে তাকে কুড়ি বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পেরেছে।

এখনও পুরোপুরি ভোরের আলো ফোটেনি। বাড়ির ভিতরের মৃদু দীপের আলোয় নাতনীর আর্তনাদ ভেসে আসছিল ওয়াশের কানে, ঘড়ির আওয়াজের তালে তালে গোঙানির শব্দ ওয়াশের মাথার ভিতরে, চেতনার ভিতরে, সমগ্র অস্তিত্বের ভিতরে সেই শব্দের অনুষঙ্গ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিগন্ত থেকে অগ্রসরমান এক দ্রুতগামী অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে, সেই বিশাল কালো সুন্দর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আছে এক সাহসী পরিচিত সুপুরুষ, এগিয়ে আসছে সেই নিঃসঙ্গ গর্বিত মহিমান্বিত অশ্বারোহী। তারপর হঠাৎই এই চলচ্চিত্রটা ঘুলিয়ে গেল, মস্তিষ্কের কোষে কোষে আছড়ে পড়ল সেই অশ্বক্ষুরধ্বনি। আর পবিত্র, আত্মস্থ অপাপবিদ্ধ ওয়াশের মনে হল : 'সাটপেন অনেক বড়। যে ইয়াংকিরা তার ছেলে ও বউকে মেরে ফেলেছে, কেড়ে নিয়েছে তার নিগ্রো দাসদের, ধ্বংস করেছে তার উর্বর খামার, তাদের সকলের চেয়ে বড়। এমনকি এই গ্রামসমাজ যা তার ছোট্ট দোকান চালাতেও বাগড়া দেয়, সেটাও ওর মাপে তৈরি নয়, ও তার চেয়েও বড়। যে বঞ্চনা ওকে সহ্য করতে হয়েছে, ওর তৃষিত ঠোঁটের সামনে তুলে ধরা হয়েছে যে বিষের পানপাত্র সে সবের চেয়ে ও বড়। ওর এত কাছে, এত দীর্ঘদিন ধরে বাস করেও আমার কি কিছু লাভ হয়নি? ও কি আমাকেও কিছুটা পাল্টে দেয়নি গত কুড়ি বছরে? হয়ত আমি ওর মতো অতো বড় নই, ওর মতো ঘোড়ার সওয়ার হয়ে যুদ্ধে যাইনি। কিন্তু ওর সঙ্গে তো থেকেছি, ছায়ার মতো পিছনে পিছনে ঘুরেছি। ও আর আমি দুজনে মিলে কিছু একটা এখনও করতে পারি।'

ততক্ষণে অন্ধকার কেটে গেছে। সকালের শুভ্র আলোয় হঠাৎই ওয়াশের চোখের সামনে গোটা বাড়িটা ভেসে উঠল। দেখল মাঝবয়সী নিগ্রো দাই তার

দিকে তাকিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে ওর খেয়াল হল, নাতনীর গোঙানি তো আর শোনা যাচ্ছে না। দাই বলল—'মেয়ে হয়েছে। চান তো কর্তাকে গিয়ে বলে আসুন।' বলেই দাই বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল।

'মেয়ে হয়েছে, মেয়ে?' ওয়াশ বিড়বিড় করছিল। ও আবার ধাবমান ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল। তার গর্বিত চমৎকার চেহারা নিয়ে টগবগিয়ে ছুটে যাচ্ছে, যুগান্তরের মধ্যে দিয়ে, অনন্ত সময়ের ভিতর দিয়ে, কোষমুক্ত তরবারি এবং বজ্রগর্ভ গন্ধকের স্বর্ণছটায় আলোকিত আকাশে ছিন্ন কেতনের নিচ দিয়ে দিগন্তে লীন হয়ে যাচ্ছে। জীবনে এই প্রথম ওয়াশের মনে হল, তার মতোই সাটপেনও বুড়িয়ে গেছে, নইলে কি আর মেয়ের বাপ হয়। অ্যা? শেষ পর্যন্ত সাটপেনের মেয়ে হল, আর আমি কিনা 'প্রপিতামহ' হলাম।

বাড়ির ভিতরে ঢুকল ওয়াশ, পা টিপে টিপে, যেন সে আর এখানে থাকে না, যেন এক্ষুনি যে শিশুটি ভূমিষ্ঠ হয়েছে সে তাকে চিনতে চাইবে না, তার সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করবে না, যদিও তার নিজের রক্ত তো শিশুর শিরাতেও বইছে। কিন্তু খড়ের শয্যার দিকে চেয়ে নাতনীর পরিশ্রান্ত বিধ্বস্ত মুখটাই শুধু দেখতে পেল ওয়াশ। আগুনের কুণ্ডের কাছে বসে থাকা দাই বলে উঠল—'এখন তো সকাল হয়ে গেছে, আপনি বরং হুজুরকে খবরটা জানিয়ে আসুন।'

কিন্তু তার দরকার ছিল না। বাইরের বারান্দার কোণে এসে ঘুরতেই ওয়াশ দেখতে পেল সেই কালো ঘোড়ার পিঠে সাটপেন নিজেই এগিয়ে আসছে। ওয়াশ যেখানে দাঁড়িয়ে সাটপেনকে দেখতে পেল, সেখানেই পড়েছিল কাস্তেটা, যেটা বারান্দার সিঁড়ির লতাঝোপ কেটে পরিষ্কার করার জন্যে মাসতিনেক আগে সে সাটপেনের কাছে চেয়ে এসেছিল। সাটপেন কী করে খবর পেল তা ভেবে অবাক হল না ওয়াশ। ও ধরেই নিল, সাটপেন নিশ্চয়ই এজন্যেই সাতসকালে এসে হাজির হয়েছে, নইলে এমনিতে রোববারের সকালে এত আগে তো ওর ঘুমই ভাঙে না। সাটপেন ঘোড়া থেকে নামলে ওয়াশ তার লাগাম ধরে দাঁড়াল। তার রুগ্ন চেহারায় ফুটে উঠল গাড়লের মতো বিজয়ীর হাসি—'মেয়ে হয়েছে কর্নেল। তুমিও আমার মতো বুড়ো হয়ে গেলে!' সাটপেন কিন্তু ওর কথা শোনার জন্যে দাঁড়ায়নি। ততক্ষণে একেবারে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেছে। লাগাম হাতে ওয়াশ দাঁড়িয়ে রইল। শুনল আর পায়ের আওয়াজে বুঝল, সাটপেন মেঝে মাড়িয়ে খড়ের বিছানার সামনে দাঁড়িয়েছে। তারপর তার কানে এল সাটপেনের কথা। আর তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াশের মনে হল, ওর হৃদ্‌পিণ্ড থমকে গেছে। নিজের কানকে ও বিশ্বাস করতে পারছিল না।

সূর্য এখন অনেকটা ওপরে। মিসিসিপি প্রান্তরের সূর্য চড়চড় করে ওপরে উঠে যায়। লাগাম হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওয়াশের মনে হল, ও এক অচেনা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। এই দৃশ্যপট, চারদিকের এই সব কিছু

কেমন অচেনা ঠেকছে, স্বপ্নে দেখা দৃশ্যের মতো আবছা অস্পষ্ট আধো চেনা। স্বপ্নটাও যেন কেমন অবাস্তব, যে কখনও কোথাও আরোহণ করেনি সে যেন নিচে গড়িয়ে পড়ার, পতনের স্বপ্ন দেখছে। 'এইমাত্র আমি যা শুনলাম,' ওয়াশ ভাবতে লাগল, 'তা কি সত্যি ? তা কি কখনও সত্যি হতে পারে ? অথচ এ কণ্ঠস্বর তো অচেনা নয়, কতকালের পরিচিত। এখনও তো তার কথা শোনা যাচ্ছে, নিগ্রো দাইকে ঘোড়ার বাচ্চা হওয়ার কথা বলছে। এইজন্যেই তাহলে ও সাতসকালে উঠে এসেছে ? শুধু এইজন্যে ? আমার জন্যে, আমার নাতনীর জন্যে, নাতনীর গর্ভে সঞ্জাত তার নিজের ঔরসের সন্তানের জন্যে আসেনি। তাদের জন্যে ওর তাহলে কোনও মাথাব্যথা নেই।'

ততক্ষণে সাটপেন বাড়ির বাইরে চলে এসেছে। লতাঝোপ মাড়িয়ে বেশ দ্রুত নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। ওয়াশের দিকে পুরোপুরি না তাকিয়েই বলে উঠল, 'এখানে যা যা করা দরকার দাই সেসব করবে। তুমি বরং·' হঠাৎ ওয়াশের মুখের চেহারা দেখে সাটপেন থমকে গেল। জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার ?'

'এইমাত্র তুমি আমার নাতনীকে বলছিলে, ও যদি একটা মাদী ঘোড়া হতো তাহলে আস্তাবলে ওকে একটা ভাল থাকার জায়গা করে দিতে ?' নিজের গলার আওয়াজও ওয়াশের কাছে কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছিল।

'তো, যদি বলেই থাকি'—সাটপেন বলতে বলতেই অবিশ্বাসী তেরছা চোখে দেখল ওয়াশ একটু ঝুঁকে তার দিকে এগিয়ে আসছে। ক্ষণিকের জন্যে সাটপেন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। গত কুড়ি বছর ধরে এই লোকটাকে সে দেখছে, তার কালো ঘোড়াটার মতোই আদেশ ছাড়া নিজে থেকে কখনও কোনও কাজ করেনি। সাটপেনের দৃষ্টিতে তখনও অবিশ্বাস। সে ঠিক দেখছে তো ? হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সাটপেন—'খবর্দার। আর এক পাও এগোবে না!'

ওয়াশ কিন্তু থামেনি। আস্তে আস্তে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে আসতে সে তার শান্ত মৃদু নরম গলায় বলল, 'আজ আমি তোমায় শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব, কর্নেল। আজ তোমার নিস্তার নেই।'

সাটপেনের হাতের চাবুক দুলে উঠল! নিগ্রো দাই চেঁচামেচি শুনে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সাটপেন বলল, 'খবরদার ওয়াশ, আর এক পা যদি এগিয়েছো।' প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার চাবুক আছড়ে পড়ল। নিগ্রো দাই ভয় পেয়ে গিয়ে একলাফে বারান্দা থেকে মাটিতে পড়েই ছুটে পালিয়ে গেল। আবার চাবুক তুলল সাটপেন, এবার ওয়াশের মুখের ওপর আড়াআড়িভাবে আঘাত করল। হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল ওয়াশ। উঠে দাঁড়াল যখন, ওর এক হাতে ঝকঝক করছে সেই লম্বা কাস্তেটা, তিনমাস আগে যেটা ও চেয়ে এনেছিল সাটপেনের কাছ থেকে, এবং আর কোনদিনই যেটা সাটপেনের আর কোনও কাজে লাগবে না।

ওয়াশ যখন এই দ্বিতীয়বার বাড়ির ভিতর ঢুকল, খড়ের ওপর ওর নাতনীর

নড়াচড়া শোনা গেল। 'বাইরে কী গোলমাল হচ্ছিল?' জানতে চাইল মিলি।

'কীসের গোলমাল?'

'ওই যে এতক্ষণ ধরে যা সব হচ্ছিল?'

'ও কিছু নয়' বলে ওয়াশ হাঁটু গেড়ে বসে মিলির কপাল স্পর্শ করল, তারপর জানতে চাইল এখন সে কিছু চায় কিনা।

'জল চাই, একটু জল।' ঝগড়ুটে গলায় মিলি বলল, 'সেই কখন থেকে জল চেয়ে চেয়ে মরে যাচ্ছি। কেউ কানেই তোলে না।'

'আচ্ছা। আচ্ছা। দিচ্ছি'। উঠে গিয়ে জলের জায়গাটা নিয়ে এল ওয়াশ। নাতনীর মাথাটা তুলে ধরে মুখের সামনে জায়গাটা নিয়ে এল। খাওয়া হলে আস্তে আস্তে আবার শুইয়ে দিল। দেখল ভাবলেশহীন মুখে মিলি বাচ্চার দিকে ধীরে ধীরে পাশ ফিরছে। কিন্তু খানিক পরেই ওয়াশ বুঝল নাতনীর চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে বলল, 'ওকি, আবার কাঁদছিস কেন? কাঁদে না। দাই তো আমায় বলল একটা সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। মেয়ে হয়েছে তো কী? তাই বলে কাঁদতে হবে। এখন তো আর কিছু করার নেই। কেঁদে কি করবি বল?'

ওয়াশের কথায় কাজ হল না। মিলি কেঁদেই চলল। ওয়াশ আর কি করে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ওর অস্বস্তি হচ্ছিল। নিজের বৌয়ের কথা মনে পড়ছিল, মেয়ের কথাও। দুজনেই মেয়ে প্রসব করেছিল। সেই মেয়েরই এখন আবার মেয়ে হয়েছে। 'মেয়েরা সত্যিই আশ্চর্য। আমার তো ধন্দ লেগে যায়। বাচ্চা হওয়ার আগে মনে হয়, ওরা মেয়েই চায়। অথচ মেয়ে হলে কেঁদে ভাসায়। এ আমি কিছুই বুঝি না। এ এক অদ্ভুত রহস্য সবার কাছেই।' ভাবতে ভাবতে ওয়াশ সরে গেল। জানলার ধারে একটা চেয়ার টেনে এনে তাতে বসে পড়ল।

সারা সকাল ধরে জানলার ধারে বসে রইল ওয়াশ, যেন কিসের অপেক্ষায়। মাঝে মাঝে পা টিপে টিপে বিছানার কাছে যায়। মিলি অঘোরে ঘুমুচ্ছে, বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে। এখনও তার মুখে শ্রান্তির ছাপ স্পষ্ট। পা টিপে টিপেই নিজের চেয়ারে ফিরে আসে সাটপেন। তারপর অপেক্ষা করতে থাকে। ভাবে, এত দেরি হচ্ছে কেন ওদের আসতে? অবশেষে মনে পড়ে যায়, আজ রবিবার। চারদিক জেগে উঠতে অন্য দিনের তুলনায় এমনিতেই আজ একটু বেশি সময় লাগবে। দুপুরের দিকে একটা শ্বেতাঙ্গ ছেলে ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির কাছে এসে পড়েছিল। হঠাৎ মৃতদেহটা দেখে আঁতকে ওঠে, মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে চেয়ারে বসে ওয়াশ তাকে দেখছে। তারপর পেছন ফিরেই দৌড়। এরপর ওয়াশ আবার বিছানার কাছে যায়, আগের মতোই পা টিপে টিপে। দেখে মিলির ঘুম ভেঙে গেছে। হয়তো বাইরে ছেলেটার অস্ফুট আর্তনাদ ওর কাছে যেতেই জেগে

গেছে। ওয়াশ জিজ্ঞেস করল মিলির খিদে পেয়েছে কিনা। কোনও জবাব না পেয়ে নিজেই কুণ্ডের কাছে গিয়ে আগুন জ্বেলে খাবার বানাতে লাগল। কিন্তু মিলি প্রায় কিছুই খেতে পারল না। অগত্যা ওয়াশ নিজেই একা বসে বসে খাবারটা শেষ করল। ডিশটা না ধুয়ে যেমন ছিল রেখে দিয়ে জানলার ধারের চেয়ারে গিয়ে বসল।

আর এইবার তার মনে হতে লাগল কারা আসতে পারে—ওরা সবাই ঘোড়ায় চড়ে আসবে, হাতে থাকবে বন্দুক, সঙ্গে থাকবে কুকুর, কৌতূহলী আর প্রতিহিংসা পরায়ণ। সাটপেন সমাজের যে শ্রেণীর লোক, ওরাও সেই একই শ্রেণীর। বেঁচে থাকতে ওরাই ছিল সাটপেনের খাবার টেবিলের সঙ্গী, ওয়াশ নিজেও তার ধারে কাছে ঘেঁষতে সাহস পেত না। যুদ্ধে ওরা সকলেই বীরত্ব দেখিয়েছিল এবং, কে জানে, ওদের সবার কাছেই হয়তো সাহসিকতার জন্য দেওয়া জেনারেলের স্বীকৃতিপত্রও আছে। তারও আগে ওরা প্রত্যেকেই, নিজের নিজের খামারের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত উদ্ধত ঘোড়া ছুটিয়ে চারদিক দাপিয়ে বেড়াত—বীরত্ব ও আশার মূর্ত প্রতীক, একই সঙ্গে ধ্বংস ও হতাশার কারণও বটে।

সবাই আশা করবে, ওইসব লোকের কাছ থেকে, ওরা এখানে এসে হাজির হওয়ার আগেই, ওয়াশ পালিয়ে যাক। কিন্তু পালিয়ে ও যাবেটা কোথায়? এমন কোনও জায়গা কী আছে যেখানে ওই লোকগুলো নেই, ওই দুর্বিনীত, আত্মম্ভরী, প্রতিশোধপরায়ণ জিঘাংসার অপচ্ছায়াগুলো নেই? গোটা পৃথিবী জুড়েই তো ওরা রয়েছে। এখানে একদলের হাত থেকে পালিয়ে গেলে সেখানে আর একদল এইরকম লোকেরই পাল্লায় পড়তে হবে। তাছাড়া ওর বয়েস হয়েছে, কতদূরে পালাবে ও? যেখানে ওরা নেই, পৌঁছয়নি এখনও, ততদূরে কি ও যেতে পারবে। ষাট বছর বয়েসের একটা প্রৌঢ় কতদূর যেতে পারে? নিশ্চয়ই ততদূরে নয়, যেখানে ওই লোকগুলো সমাজশাসন করে না। জীবনযাপনের নিয়মনীতি নির্ণয় করে না। ভাবতে ভাবতে, হঠাৎই ওয়াশের মনে হল, এখন, এই প্রথম, ও বুঝতে পারছে কেন ইয়াংকিরা ওই লোকগুলোকে পযুর্দস্ত করতে পেরেছিল—ওই অহংকারী সাহসী লোকগুলোকে। ওদের মধ্যে বাছাই করা স্বীকৃত, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের কি করে যুদ্ধে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল! নিজে যদি ওদের সঙ্গে যুদ্ধে যেত তাহলে হয়তো অনেক আগেই ও এটা ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু কী লাভ হতো তাতে? এই লোকগুলোর আসল চেহারাটা যদি ও আগেই বুঝে ফেলত, জেনে যেত, গত পাঁচ পাঁচটা বছর ধরে তাহলে কী করত ও? কী করে বয়ে বেড়াত ওর অতীত জীবনের স্মৃতি?

বিকেল ফুরিয়ে আসছিল। নবজাতক শিশুকন্যাটি কাঁদছে। পা টিপে টিপে বিছানার কাছে গিয়ে ওয়াশ দেখল নাতনী বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াচ্ছে। তার মুখচোখ আগের মতোই বিপর্যস্ত, ভাবলেশহীন। ওয়াশ জানতে চাইল মিলির

খিদে পেয়েছে কিনা।

'না। আমার এখন কিছু চাই না।'

'কিন্তু কিছু তো তোকে খেতেই হবে, মা।' এবার মিলি কোনও উত্তরই দিল না। ওয়াশ আবার নিজের চেয়ারে ফিরে এল। ততক্ষণে সূর্য অস্ত গেছে। আর বেশি দেরি নেই, ভাবল সে। মনে হল, ও যেন অনুভব করতে পারছে ওরা কাছাকাছি এসে গেছে, ওই কৌতূহলী ও প্রতিশোধপরায়ণ লোকগুলো নিজেদের মধ্যে ওরা যা বলাবলি করছে, তাও বুঝি কান পাতলে শোনা যায়। ওরা যেন বলছে, 'বুড়ো ওয়াশের খেল খতম। ও ভেবেছিল সাটপেনকে ও হাতের মুঠোয় পেয়েছে; কিন্তু সাটপেন ওকে বোকা বানিয়েছে। ভেবেছিল কর্নেল এখন ওর হাতের মুঠোয়, হয় তাকে ওর নাতনীকে বিয়ে করতে হবে, নয় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু কর্নেল কোনটাই দিতে চায়নি।' 'কিন্তু তোমার কাছে আমি এটা আশা করিনি কর্নেল'—চিৎকার করে উঠল ওয়াশ। নিজের গলার স্বরে নিজেই চমকে গিয়ে ওর খেয়াল হল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, নাতনী এক দৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে আছে: 'কার সঙ্গে কথা বলছো?'

'ও কিছু নয় রে! আবোলতাবোল কী সব ভাবছিলাম। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

ক্ষণিকের আগ্রহ আর ভাব পরিবর্তন। আসক্তি ও উদাসীনতার মধ্যে, অনাগ্রহ ও নির্বিকারত্বে ফিরে যেতে যেতে মিলি বলে উঠল—'আরো জোরে ডাকতে হবে দাদু, আরো অনেক জোরে জোরে। তা নইলে ওই অত দূরের বাড়িতে ও শুনতে পাবে না, ওখান থেকে নিচে নেমে এখানে আসবেও না।'

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও নিয়ে তুই ভাবিস না।' মুখে একথা বললেও ওয়াশের চিন্তার স্রোত বইছে অন্যখাতে: তুমি তো জানতে কর্নেল আমি কখনও অমন কাতর হয়ে তোমায় ডাকিনি, অন্য কোনও জীবিত মানুষের কাছে কখনও হাত পেতে কিছু চাইনি, তোমার কাছে ছাড়া। সেও মনে মনে। মুখ ফুটে কখনও তো তোমায় কিছু চাইনি। ভেবেছিলাম চাইবার দরকারও হবে না। নিজের মনকে বলেছিলাম, চাওয়ার কী দরকার? তোমার কি বিশ্বাস হয় না ওয়াশ জোনস, স্বয়ং জেনারেল লী যার সাহসিকতার সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছেন, তাকে বিশ্বাস হয় না, তার ওপর ভরসা রাখতে পারো না? সাহসী? হুঃ, সাহস! তার চেয়ে ৬৫ সালে ওরা যদি কেউ ফিরে না আসত, ইয়াংকিদের সঙ্গে যুদ্ধে যদি সাবাড় হয়ে যেত ওইসব সাহসী আত্মম্ভরী লোকগুলো, অনেক ভাল হতো। অনেক ভালো হতো যদি কর্নেলরা না জন্মাত, আমার গোত্রের লোকরাও যদি কখনও পৃথিবীতে না আসত। আমাদের মতো আরও যারা এখনও বেঁচে আছে, তারা যদি সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত, তাহলে দ্বিতীয় কোনও ওয়াশ জোনসকে এই বঞ্চনার যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো না, আর কোনও

ওয়াশ জোনসের কাছ থেকে তার ছেঁড়াখোঁড়া জীবনটা এভাবে কেড়ে নিয়ে জীর্ণ তালিমারা কাপড়ের মতো সেটাকে আগুনের কুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হতো না।

ভাবতে ভাবতে থেমে গেল ওয়াশ, একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, পরিষ্কার, অমোঘ। নাঃ কোনও ভুল নেই। ওরা এসে গেছে। হ্যারিকেনের আলোগুলো দেখতে পেল ওয়াশ, দেখল মানুষের নড়াচড়া, আর বন্দুকের ঠাণ্ডা ঝকঝকে নলগুলো। তবু ও নড়ল না। অন্ধকার এখন বেশ গাঢ়। কথাবার্তার আওয়াজ ও নড়াচড়ার শব্দ শুনে বোঝা যায় ওরা বাড়িটা চারদিকে ঘিরে ফেলছে। একটা আলো এগিয়ে এল, লতাঝোপের মধ্যে পড়ে থাকা মৃতদেহটার ওপর স্থির হল। আলোর চারপাশে ঘোড়সওয়াররা দীর্ঘ ছায়ামানুষের মতো। একজন অশ্বারোহী নেমে মৃতদেহের সামনে দাঁড়াল। হাতে একটা পিস্তল। বাড়ির দিকে মুখোমুখি তাকিয়ে ডাকল—'জোনস।'

জানলার সামনে একই ভাবে বসে থাকে নির্বিকার ওয়াশ শান্ত জবাব দিল ঃ 'আমি এখানে।' আপনি নিশ্চয়ই মেজর।'

'বেরিয়ে এসো' আদেশের গলা এল বাইরে থেকে।

'ঠিক আছে। নাতনীকে একবার দেখে নিই।'

'ও সে আমরা দেখব। তুমি এক্ষুনি বেরিয়ে এস।'

'আচ্ছা মেজর, ঠিক আছে। এক্ষুনি যাচ্ছি, এক মিনিট।'

'আলো দেখাও। তোমার আলোটা জ্বালো।'

'এক মিনিট, মেজর।' বলতে বলতে ওয়াশ যে বাড়ির ভিতরের দিকে চলে গেল, বাইরের সকলেই শব্দ শুনে সেটা বুঝতে পারল। তবে ওরা দেখতে পেল না, কি ক্ষিপ্র গতিতে সে ফাটা চিমনির ফাটল থেকে বের করে আনল কসাইখানার ছুরিটা, ওয়াশের গোটা জীবনে, এলোমেলো বিপর্যস্ত জীবনে যত্নের সঙ্গে রেখে দেওয়া একমাত্র জিনিস যার জন্যে সে নিজেও বেশ গর্বিত ছিল। ক্ষুরধার ছোরাটা বাগিয়ে ধরে অন্ধকারে বিছানার দিকে এগিয়ে যেতেই নাতনী মিলির উদ্বিগ্ন স্বর শোনা গেল ঃ 'কে? কে ওখানে? আলোটা জ্বালাও তো দাদু।'

'আলো জ্বালার আর দরকার হবে না, মা। এক মিনিটও তো লাগবে না' বলতে বলতে নাতনীর গলার আওয়াজের দিকে এগিয়ে গেল ওয়াশ। হাঁটু গেড়ে বসতে বসতে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল—'তুই কোথায়, মা?'

'এই তো, এখানে। কোথায় আবার যাব? কী হল?' মিলির মুখটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল ওয়াশ, 'কী হল..... দাদু! দাদু..... '

'জোনস!' বাইরে থেকে শেরিফের ধমক শোনা গেল, 'বেরিয়ে এসো বলছি।'

'এক মিনিট, মেজর।' খড়ের বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল ওয়াশ। জানত

অন্ধকারে কোথায় কেরোসিনের পাত্রটা রয়েছে, জানত ওটা ভর্তি, কারণ মাত্র দু'দিন আগে ও নিজেই দোকান থেকে ওটা ভরে এনেছে। কুণ্ডতেও অনেক কয়লা রয়েছে দেখল। তাছাড়া এই বিদ্ঘুটে কাঠের বাড়িটাও তো আগাগোড়া দাহ্য। লেলিহান নীল আগুনের প্রভায় এক মুহূর্তে বিস্ফোরিত হল ওই জতুগৃহ। আর তার মুখোমুখি অপেক্ষমান লোকগুলো দেখল ধারালো লম্বা কাস্তে উঁচিয়ে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে ওয়াশ। ঘোড়াগুলো পিছু হটতে চাইল, লাগাম টেনে ওরা আবার জ্বলন্ত বাড়িটার মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু কী আশ্চর্য! ক্ষয়াটে পাণ্ডুর ম্যালেরিয়াজীর্ণ ওয়াশের চেহারাটা তবুও কাস্তে উঁচিয়ে ওদের দিকে ধাওয়া করছে কেন?

'হতভাগা জোনস্! থাম বলছি, নয়তো এক্ষুনি গুলি করব'—চেঁচিয়ে উঠল শেরিফ। তবুও রুগ্ন কৃশকায় ক্ষিপ্ত ওয়াশ লেলিহান আগুনের সুনীল প্রভা আর ক্ষ্যাপা হাওয়ার গর্জনকে পিছনে রেখে কাস্তে উঁচিয়ে ধেয়ে এল। তারপর তার উদ্যত কাস্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল···ঝাঁপিয়ে পড়ল · ঝাঁপিয়ে পড়ল··· ওই লোকগুলোর ওপর, ওই অপেক্ষমান অশ্বারোহীদের ওপর, তাদের দীর্ঘ সুন্দর ঘোড়াগুলোর বন্য বিস্ফারিত অক্ষিগোলকের ওপর, তাদের ঠাণ্ডা ঝকঝকে বন্দুকের নলের ওপর, নিঃশব্দে, অস্ফুটে, চকিতে।

একটি পরিচ্ছন্ন, ভালো-আলোকিত ঠাঁই

রাতও হলো অনেক। প্রায় সকলেই চলে গেছে। কাফেতে শুধু বসে আছে বুড়ো মানুষটি। বিজলী আলোর মধ্যে গাছের পাতাদের জন্যে যে ছায়া পড়েছে সেই ছায়াতে সে বসে আছে। একা।

দিনের বেলা পথটা ধুলোয় ভরা ছিলো। কিন্তু রাতের বেলার শিশির এখন থিতু করেছে ধুলোকে। বুড়ো একা-একা অত রাতেও বসে ছিল, কারণ অনেক রাত অবধি বসে থাকতে তার ভালো লাগে। কানে সে শোনে না। দিনের বেলায় শোরগোল থাকে। থাকে প্রথম রাতেও। কিন্তু এখন গভীর রাতে তার বধির কানেও সে সময়ের তফাতটা বোঝে। তাইই ভালো লাগে তার বসে থাকতে। কাফের ভিতরের বেয়ারা দুজন বুঝতে পারছিলো যে বুড়োর একটু বেলা হয়েছে। খদ্দের হিসেবে বুড়ো ভাল কিন্তু বেশি খেয়ে ফেললেই পয়সা না দিয়েই যে চলে যাবে সে, তা ওরা জানে। তাই বুড়োর ওপর নজর রাখছিলো ওরা।

একজন বেয়ারা বলল, গত সপ্তাহে বুড়ো আত্মহত্যা করতে গেছিলো!

কেন? অন্য জন শুধোলো।

দুর্দশাতে! আর কেন?

কিসের?

কিছুরই না।

মানে, দুর্দশা; অথচ কিছুরই নয়, এ তুই জানলি কী করে?

বুড়োর প্রচুর পয়সা ছিলো।

বেয়ারা দুজন দেওয়ালের কাছের একটি টেবলের সামনে গিয়ে বসলো। টেবলটা দরজার কাছেই। ওরা ফাঁকা-হয়ে-যাওয়া বারান্দার দিকে তাকালো। কেউ নেই। শুধু বুড়ো একা বসে আছে পাতার ছায়ায়। হাওয়ায় গাছের পাতারা কাঁপছিলো, তিরতির করে তাই কাঁপছিলো ছায়াও। একটি মেয়ে আর একজন সৈন্য হেঁটে যাচ্ছিলো পথ বেয়ে। পথের আলো, সেই সৈন্যটির গলার কলারের পেতলের নাম্বারের উপর পড়ে চকচক করছিলো। মেয়েটি

অনুবাদ: বুদ্ধদেব গুহ

মাথায় কিছুই পরেনি, খালি। দ্রুত পায়ে সে হেঁটে চলেছিলো সৈন্যটির পাশে পাশে।

গার্ড ধরবে ব্যাটাকে ঠিক। দেখিস।

বেচারী যা করতে চায় তা না হয় করলোই বাবা।

মানে মানে ও ব্যাটা না পালালে গার্ড ওকে ধরলো বলে। পাঁচ মিনিটও হয়নি গার্ডরা গেছে এ পথ দিয়ে।

বুড়ো তার গ্লাসটা নিয়ে ডিশের ওপরে বাজালো। ছোকরা বেয়ারাটি বুড়োর দিকে এগিয়ে গেলো।

কী দেব ?

বুড়ো তার দিকে চাইলো। বলল, আরেকটা ব্রান্ডি।

নেশা হয়ে যাবে যে। বুড়ো চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। বেয়ারা চলে গেল।

ছোকরা বেয়ারাটি অন্য বেয়ারাটিকে বলল, বুড়ো আজ সারা রাত থাকবে। দেখিস। আমার যা ঘুম পেয়েছে না! রাত তিনটের আগে কি একদিনও শুতে পারি। বুড়ো গত সপ্তাহে আত্মহত্যা করলেই ভালো হতো।

বেয়ারা ব্রান্ডির বোতলটা নিয়ে, কাউন্টার থেকে অন্য একটা ডিশ নিয়ে ভেতর থেকে গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে বুড়োর কাছে এলো। টেবলের উপর ডিশ এবং ডিশের উপর গ্লাস রেখে গ্লাসভর্তি করে ব্রান্ডি ঢেলে দিলো বুড়োকে।

আপনি গত সপ্তাহে আত্মহত্যা করলেই ভালো করতেন। সে বলল কালা বুড়োকে। বুড়ো আঙুল নাড়িয়ে কী যেন দেখালো ; বলল, আরও একটু। গ্লাস কানায় কানায় ভর্তি হওয়ার পরেও আরো ঢাললো বেয়ারা। উপচে গিয়ে গ্লাসের গা গড়িয়ে নিচের ডিশে পড়লো কিছুটা।

ঠিক আছে। বুড়ো বলল। বেয়ারা বোতলটা নিয়ে কাফের কাউন্টারের ভিতরে রেখে এসে তার সঙ্গী যে টেবলে বসে আছে সেখানে গিয়ে বসল আবার।

তৈরী হয়ে গেছে এখন বুড়ো।

প্রতি রাতেই তো তাই-ই হয়।

কিসের জন্যে মারতে গেছিল বুড়ো নিজেকে ?

আমি জানব কী করে !

কি করে করতে গেছিল আত্মহত্যা ?

গলায় দড়ি দিয়েছিল।

তারপর ? বাঁচলো কি করে ?

ওর এক ভাইঝি আছে। সেই দেখতে পেয়ে দড়ি কেটে নামায়।

কেন বাঁচাল ?

বুড়োর প্রাণের জন্যে।

কত টাকা আছে বুড়োর ?

অনেক।

বয়স নিশ্চয়ই আশীটাশি হবে বুড়োর।

হবে ওরকমই।

এবার বাড়ি গেলেই পারে। কোনোদিনও রাত তিনটের আগে আমি শুতে পারি না। শুতে যাওয়ার কী সময়! আহা!

বুড়ো জেগে থাকে, বোধহয় ওর ভালো লাগে বলেই।

আসলে একা তো! কিন্তু আমি তো আর একা নই। আমার বৌ বিছানাতে আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

বুড়োরও বৌ ছিলো এক সময়।

বৌ থাকলেই বা এখন কী করত।

বলা যায় না রে। পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।

ওর ভাইঝিই দেখাশোনা করে ওকে। তা তুই বললি সেই-ই……

হ্যাঁ। সেই-ই তো বাঁচালো। আমি জানি। বললামই তো।

আমি কোনোদিন এমন বুড়ো হয়ে যেতে চাই না। বুড়ো মানুষরা ভারী নোংরা হয়। ঝামেলার।

সবসময় নয়।

এই বুড়ো কিন্তু খুবই পরিষ্কার। এমনকি মালও যখন খায় একটুও ফ্যালে-ট্যালে না। এখনও দ্যাখ্ না, তৈরী হয়ে গেছে; পুরো মাতাল, তবু…! দ্যাখ্।

দুস্স্। আমি ওর দিকে তাকাতেও চাই না। ও এখন বাড়ি গেলে বাঁচি। যারা নিরুপায় হয়েই কাজ করে তাদের প্রতিও মানুষটার একটুও মায়া-দয়া নেই।

বুড়ো গ্লাস থেকে চোখ তুলে বাইরে চৌমাথার দিকে চেয়ে ছিলো। তারপর চোখ ঘোরাল বেয়ারাদের দিকে। গ্লাসটা দেখিয়ে বলল, আরেকটা।

যে বেয়ারাটির তাড়া ছিলো বাড়ি যাবার সেই এগিয়ে এলো। তারপর লোকে মাতালদের সঙ্গে বা বিদেশীদের সঙ্গে যেমন করে ইচ্ছে করে বোকার মতো কথা বলে শর্টকাটে, তেমন করে বললো, আর নয় আজ। বন্ধ। এখন বন্ধ।

আরেকটা। বুড়ো বলল।

নাঃ। শেষ। বেয়ারা ঝাড়ন দিয়ে বার-কাউণ্টার মুছতে মুছতে মাথা নেড়ে বলল।

বুড়ো উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে ডিশগুলো গুনলো, পকেট থেকে চামড়ার একটা ব্যাগ বের করে গুনে গুনে ঝনঝনিয়ে পেসেটা গুনে দিলো।

আধ-পেসেটা বক্‌শিসও দিলো।

বেয়ারা তাকে পথ বেয়ে চলে যেতে দেখছিলো। খুবই বড়ো মানুষ একজন; এলোমেলো পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলো মানুষটা। কিন্তু সম্ভ্রমবোধ তার অটুটই ছিলো।

তুই বুড়োকে আর একটু থাকতে আর খেতে দিলি না কেন? বয়স্ক বেয়ারাটি শুধোলো, কাফের ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে; তখন তো আড়াইটে বাজেনি।

আমি এখন শুতে চাই।

আর এক ঘণ্টাতে কীই বা তফাৎ হতো?

হতো। আমার কাছে রাতের একটি ঘণ্টা অনেক সময়। বুড়োর কাছে না হতে পারে।

এক ঘণ্টা; সকলের কাছেই এক ঘণ্টা।

তুই বুড়ো মানুষের মতো কথা বলছিস। বুড়ো ইচ্ছে করলে একটা বোতল কিনে নিয়ে তো বাড়ি বসেও খেতে পারে।

বাড়িতে খাওয়া আর কাফেতে খাওয়া এক নয়।

তা নয়। বিবাহিত বেয়ারাটি বলল। আসলে ও বেচারীও শুধুমাত্র তাড়াতাড়ি করতেই চাইছিলো, বুড়োর প্রতি অন্যায় করার কোনো ইচ্ছাই তার ছিল না।

অন্য বেয়ারাটি বলল, আর তুই? তোর বুঝি যে-সময়ে ফেরার কথা সেই সময়ের আগে বাড়ি ফিরতে ভয় করে? কি রে?

তুই কি আমাকে ইনসাল্ট করছিস?

না। না। ঠাট্টা করে বললাম।

না। অন্যদিকের ঝাঁপ বন্ধ করার দরজা টানতে টানতে বিবাহিত বেয়ারাটি বলল: আমার নিজের উপরে বিশ্বাস আছে। পুরো বিশ্বাস আছে।

হ্যাঁ। তোর যৌবন আছে, চাকরি আছে, বিশ্বাস আছে। সবকিছুই আছে তোর।

আর তোর? তোর কী নেই?

কিছুই আমার নেই, শুধু এই কাজটি ছাড়া।

আমার যা আছে, তোরও তার সবই আছে।

না রে। বিশ্বাস আমার কখনোই ছিলো না। কখনো না। আর যৌবন তো আমার নেইই।

তুই বড় বাজে বকিস দাদা। থাম তো। নে। ওই দিকের দরজাটাতে তালা লাগা।

যারা অনেক রাত অবধি কাফেতে থাকতে ভালবাসে আমি তাদেরই একজন।

বয়স্ক বেয়ারাটি বলল। আমি হচ্ছি তাদেরই মতো যারা বাড়ি ফিরতে চায় না, বিছানাতে যেতে চায় না, যারা চায় সারারাত ; একটি আলো।

আমি নই। আমি চাই। বাড়িও যেতে চাই, শুতেও চাই।

আমরা দুজনে দু-রকমের। বয়স্ক বেয়ারাটি বলল। তারও জামাকাপড় পরা হয়ে গেছে বাড়ি যাবার জন্যে। ব্যাপারটা শুধুই বিশ্বাস আর যৌবনের নয়, যদিও ওসব খুবই সুন্দর। প্রতি রাতেই আমি কাফের দরজা বন্ধ করতে অনিচ্ছুক থাকি এই কথাই ভেবে যে, কারো হয়তো খুবই প্রয়োজন হতে পারে এটিকে।

সারা রাতই তো 'বোদেগা'গুলো সব খোলা থাকে। যাদের দরকার, তাদের অসুবিধের কি?

তুই বলছিস না। এই কাফেটা যে ভারী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ভালো-আলোয় উজ্জ্বল। এত চমৎকার আলো এখানে অথচ দ্যাখ, গাছের পাতারা ছায়াও দেয়, কী সুন্দর।

চললাম রে। গুড নাইট। বৌ-ওয়ালা বেয়ারা বলল।

গুড-নাইট। বয়স্ক বেয়ারা উত্তর দিল। তারপর আলোগুলো সব একে-একে নিভিয়ে দিয়ে সে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতে লাগলো: হ্যাঁ! আলোর তো দরকার ঠিকই! তবে জায়গাটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং মনোরমও হওয়া চাই। বাজনা চাই না। না, না। বাজনা একদমই চাই না। কোনো বার-এ গিয়ে তার কাউণ্টারের সামনে কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাও সম্ভব নয়। অথচ এখন তো কোনো কাফে আর খোলা নেই। ভয়টা কিসের ওর? না, না। ব্যাপারটা আসলে ভয়-টয়ের নয়। ব্যাপারটা যে কী তা ও নিজেও ঠিক জানে না। ব্যাপারটা আসলে কিছুই না, একজন মানুষও আসলে কিছুই না। এইই। যা দরকার তা শুধু আলো। আলো আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর শৃঙ্খলার এক বিশেষ মাত্রা। সমন্বয় এইটুকুই। অনেকেই এরই মধ্যে বাস করে যায় অথচ কখনও বোঝেও না এই কথাটা। কিন্তু ও ঠিকই জানে যে, এই সবই শূন্যতা, আর···সত্যিই শূন্যতা। আমাদের এই শূন্যতা, যার বাস শূন্যতারই মধ্যে, শূন্যতাই নাম তোমার, শূন্যতা; তোমারই এ সাম্রাজ্য শূন্যতা, তুমি শূন্যময় শূন্যতে যেমন শূন্য নিজেও, শূন্যতায়। আমাদের এই শূন্যতাই দিও। আমাদের প্রাত্যহিক শূন্যতা এবং আমাদের সব শূন্যতা; যেমন আমরা নিজেরাও শূন্য, আমাদের সব শূন্যতা এবং আমাদেরও নিজেদের নিংড়ে নিয়ে শূন্য করো কিন্তু এই শূন্যতা থেকে মুক্তও করো। যদিও বেশ এই শূন্যতা! বাঃ শূন্যতা। শূন্যকে কখনও জয়ধ্বনি দিও না, শূন্যময়, শূন্যও তো তোমারই।

ও হাসল। হেসে 'বার'-এর সামনে একটি ঝকঝকে এসপ্রেসো কফি-

মেসিনের পাশে দাঁড়ালো।

কী চাই?

সেই 'বার'-এর বারম্যান শুধোলো তাকে।

নাডা।

একটি বিরক্তিসূচক শব্দ করে বারম্যান কাউণ্টারের ভেতরে চলে গেলো।

ছোট্ট কাপে দিও। ও বলল, বারম্যানকে।

বারম্যান ঢেলে দিলো ওকে।

এখানের আলো খুব উজ্জ্বল, জায়গাটা বেশ কিন্তু 'বার'টা পালিশ করা হয়নি বহুদিন।

ও বলল।

বারম্যান তার দিকে চাইলো কিন্তু কথা বললো না। অত রাতে তার কথা বলার মতো অবস্থা ছিলো না। আরেকটা 'কাপটা' লাগবে আপনার?

বারম্যান শুধোলো।

না। ঠিক আছে। বলে, বেয়ারা বেরিয়ে গেল—বার থেকে। 'বার' আর 'বোদেগা' ওর এক দমই ভালো লাগে না। কোনো পরিষ্কার ভালো-আলো-ঝলমল জায়গার একটা আলাদা ব্যাপার আছে। এখন ও আর কিছু ভাববে না। ভাবাভাবি না করে ওর বাড়ি ফিরে যাবেও। তারপর একসময় নিজের ঘরে। বিছানাতে গা এলিয়ে দেবে অবশেষে, দিনের আলো ফুটলে তখন ঘুম নামবে ওর চোখে। ব্যাপারটা আসলে, ও নিজেকে বললো; হয়তো নিছকই অনিদ্রা। অনেকেরই অনিদ্রাতে ভোগা উচিত। অনেকেরই।

বেয়াড়া বুড়ী

বের্টল্ট ব্রেশ্ট (১৮৯৮-১৯৫৬)

আমার ঠাকুর্দা যখন মারা গেলেন তখন ঠাকুমার বয়স বাহাত্তর। ছোট্ট বাডেন শহরে ছোটখাটো লিথোগ্রাফির কারবার ঠাকুর্দার আর মারা যাবার আগে পর্যন্ত দু-তিনজন কর্মচারী নিয়ে কাজ করতেন। ঠিকে ঝি ছাড়াই ঠাকুমা এক হাতে সংসার চালাতেন ধড়ধড়ে পুরানো বাড়িটায় আর আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে ডজন খানেক লোকের রান্না রাঁধতেন রোজ।

রোগা ছিপছিপে চেহারা ছিল ঠাকুমার, কথাও বলতেন আস্তে কিন্তু চকচকে টিকটিকির চোখের মতো ছিল তাঁর চোখ দুটো। সামান্য সংস্থানে তিনি মানুষ করেছেন তাঁর সাতটির মধ্যে পাঁচটি সন্তান। তার ফলে যতো বয়স বেড়েছে ততো খয়াটে হয়ে গেছেন ঠাকুমা।

তাঁর দুটি মেয়েই আমেরিকা পাড়ি দিয়েছে আর দুই ছেলেও বিদেশে। আর ছোট ছেলেটার শরীর-স্বাস্থ্য ভালো ছিল না ; সে থেকে গেছে সেই ছোট শহরে। তার ছিল ছাপাখানা আর তার পরিবার যে রকম বাড়ন্ত তাতে তার আর্থিক অবস্থায় কুলাত না।

কাজেই ঠাকুর্দা যখন মারা গেলেন তখন গোটা বাড়িটায় ঠাকুমা একা। ছেলেমেয়েরা তখন চিঠি লেখালেখি শুরু করলে—এখন মাকে নিয়ে কী করা যায়? কেউ বললে তাদের মাকে তার বাড়িতে নিয়ে রাখবে আর ছাপাখানা-ওয়ালা তার গোটা পরিবার শুদ্ধ মায়ের কাছে উঠে আসতে চাইলে। কিন্তু এসব প্রস্তাবে কর্ণপাত করলেন না ঠাকুমা ; খালি হাত-খরচার জন্যে সাধ্যমতো যার যা দেবার তা নিতে রাজী হলেন। মান্ধাতা আমলের লিথোগ্রাফির কারবারটা জলের দরে বিকোল, আর ধারধোরও হোল বিস্তর।

ছেলেমেয়েরা বললে, আর যাই হোক, মাকে তো এমনি একলা ফেলে রাখা যায় না। কিন্তু তিনি যখন কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না এ-প্রসঙ্গে তখন অগত্যা তারা মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়েই ক্ষান্ত হোল। তাছাড়া, তারা ভাবলে যে একটা ছেলে তো অন্তত তাঁর হাতের কাছে আছে।

আর মাঝেমাঝেই ছাপাখানার কাকা তাদের মায়ের খবর জানিয়ে লিখত চিঠি

অনুবাদ : অসীম রায়

ভাইবোনদের। সেই বছর-দুই কেমন কেটেছিল তার খবর আমি পেতাম বাবাকে লেখা কাকার চিঠিতে আর ঠাকুমার কবরে যাবার সময় বাবা যখন গেলেন বাডেন শহরে দু-বছর পর তখন।

গোড়াতেই এটা স্পষ্ট যে ছাপাখানাওয়ালা বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল ঠাকুমা'র বেশ বড়সড় ফাঁকা বাড়িখানায় তাদের জায়গা হোল না বলে। তার তিনখানা ঘরে চার ছেলেমেয়ে নিয়ে সে থাকত। কিন্তু তার সঙ্গে তার মায়ের সম্পর্ক ছিল মামুলি। তিনি কেবল বাচ্চাদের প্রতি রোববার বিকেলে তাঁর সঙ্গে কফি খেতে ডাকতেন। ব্যস!

তিন-চার মাস অন্তর তাঁর একবার কাকার বাড়িতে পদার্পণ। তখন তিনি তাঁর বৌমাকে জ্যাম বানাতে সাহায্য করতেন। আর তরুণী গৃহবধূ তার শাশুড়ীর কথাবার্তায় জানলে যে এ বাড়ির ঘিঞ্জি পরিবেশ তাঁর মোটেই পছন্দ নয়। আর কাকা এ-কথাটা লিখতে গিয়ে একটা আশ্চর্য চিহ্ন জুড়ে দিত চিঠিতে।

বাবা কাকাকে লিখলে: বুড়ী এখন কী করছে? তাতে ছোট্ট জবাব এল, বুড়ী সিনেমায় যাচ্ছে আজকাল।

আর সিনেমার ব্যাপারটা ছেলেমেয়েদের চোখে খুব বাঞ্ছিত ছিল না। তিরিশ বছর আগে সিনেমা বলতে যা বোঝাত তা ছিল অন্যরকম। এগুলো পুরনো আলোবাতাসহীন স্যাঁতসেঁতে ঘরবাড়ি। আর বাইরে থাকত টাঙানো খুন-খারাপি আর রগরগে বিয়োগান্ত নাটকের লাল-নীল ডগডগে পোস্টার। বস্তুত এগুলো ছিল ছেলে-ছোকরাদের আস্তানা, আর কমবয়সী ছেলেমেয়েদের আড়ালে-আবডালে ফষ্টিনষ্টি করার জায়গা। বৃদ্ধার প্রবেশ এখানে চোখে পড়ার মতো।

আর সিনেমা যাওয়ার কথায় আর একটা কথাও ওঠে! প্রবেশপত্রের অবস্থা সস্তা ছিল তখন কিন্তু এ আনন্দ যখন অনেকের মতে সন্দেহজনক আনন্দ তখন তা পয়সা ওড়ানোরই সামিল। আর পয়সাওড়ানো নিশ্চয় সভ্যভব্য ব্যাপার নয়।

ঠাকুমা যে তাঁর নিজের ছেলের সঙ্গেই নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন না এমন নয়। তাঁর আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের কাউকে বাড়িতেও ডাকতেন না, নিজেও যেতেন না। সেই ছোট শহরে যে সব কফিপার্টি মাঝে-মাঝে বসত সেখানে তিনি পা মাড়াতেন না কস্মিনকালে। অথচ তিনি এক জুতোর কারিগরের দোকানে গিয়ে বসতেন যেটা ছিল একেবারে গরিব আর কুখ্যাত পাড়ায়। বিকেল হলেই সেখানে দলে দলে আসত কাজ-ছুট ঝিয়ের দল আর বেকার কারিগর। জুতোওয়ালা মাঝবয়সী; সে অনেক ঘাটের জল খেয়েছে কিন্তু কোনো হিল্লে হয়নি। তার মদেও আসক্তি ছিল। অন্তত এটা ঠিক আমার ঠাকুমার সমাজে সে অচল।

ছাপাখানার কাকা তার এক চিঠিতে জানিয়েছিল যে তার আপত্তি জানিয়ে

বিশেষ সুবিধে হয়নি। 'লোকটা তো অনেক কিছু জানেশোনে' এইরকম কেঠো জবাব পেয়েছিল তার মায়ের কাছ থেকে। আর ঠাকুমার আপত্তি থাকলে কোনো প্রসঙ্গে তাঁকে টেনে আনা ছিল অসাধ্য।

ঠাকুর্দা মারা যাবার মাস-ছয়েক পরেই বাবাকে লেখা কাকার চিঠিতে জানা গেল যে তাদের মা এখন একদিন অন্তর হোটেলে খাওয়াদাওয়া করছেন।

জবর খবর। ঠাকুমা যিনি আজীবন ডজনখানেক লোকের রান্না নিজে রেঁধেছেন আব সকলের পাতকুড়োনি খেয়ে জীবন কাটিয়েছেন তিনি এখন একদিন অন্তর হোটেলে খাচ্ছেন।

এর কিছুদিন পরেই কোনো কাজে বাবাকে বাডেন শহরের কাছাকাছি যেতে হয়েছিল। আর সেই সময় ঠাকুমার সঙ্গে দেখা হয় বাবার। ঠাকুমা তখন বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর টুপিটা খুলে রেখে এক গেলাস লাল মদ আর বিস্কুট দিলেন বাবাকে। বেশ স্থির মেজাজ দেখাচ্ছিল তাঁকে। খুব একটা উচ্ছ্বসিত ভাবও নয় আবার বেশী চুপচাপও নয়। খুব খুঁটিয়ে না হলেও আমাদের সকলের কথাই জিজ্ঞেস করলেন ঠাকুমা, আর আমরা চেরি ফল খাচ্ছি কিনা সে-প্রশ্নও বাদ গেল না। ঠিক আগের মতো লাগছিল তাঁকে। ঘরখানাও দেখাচ্ছিল খুব ফিটফাট আর তাঁকেও ভালই দেখাচ্ছিল।

ঠাকুমার নতুন জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া গেল তাঁর একটামাত্র কথায়—গীর্জার পাশে কবরখানায় তিনি আর বাবার সঙ্গে যেতে চাইলেন না। হাল্কাচালে বললেন, 'তুমি তো নিজেই যেতে পারবে। ঐ এগারোটা সারির পরে বাঁ দিকে তিন নম্বর। আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে।'

ছাপাখানার কাকা শুনে বললে, 'বোধহয় জুতোওয়ালাটার কাছে মা তখন দৌড়চ্ছে।' তার কথায় বেশ ঝাঁঝ ছিল।

'আর এইখানে, আমি একটা অন্ধকূপে পড়ে আছি। কাজও কমে এসেছে। তার ওপর আবার হাঁপানির টান বেড়েছে। ওদিকে বড় রাস্তার বড় বাড়িটা তেমনি ফাঁকা পড়ে আছে।'

যে হোটেলে ঠাকুমা খেতেন সেই হোটেলেই ঘর নিয়েছে বাবা। আর বাবা ভেবেছিল যে অন্তত কথায় কথায় একবার ডাকবেন তাকে। কিন্তু তার ধারকাছ দিয়েও গেলেন না ঠাকুমা। আর আগে যখন তাঁর বাড়িভর্তি লোক, সে অবস্থাতেও বাবা যদি এ শহরে এসে হোটেলেও উঠত তখন ঠাকুমা বলতেন, খামাখা হোটেলে কেন টাকা ওড়াচ্ছো?

এটা স্পষ্ট যে পারিবারিক জীবন থেকে তিনি সরে দাঁড়িয়েছেন আর এই জীবন-সায়াহ্নে এক নতুন পথে পা বাড়িয়েছেন। বাবা হাসিঠাট্টা করতে ছাড়ত না। বললে, 'বুড়ী আজকাল খুব উড়ছে।' আর কাকাকে বললে, 'ঠিক আছে। যা ইচ্ছে বুড়ীর করুক না।'

আর সত্যিই কী করতে চায় বুড়ী ?

এবার রিপোর্ট এল, ঠাকুমা জুড়িগাড়ি হাঁকাচ্ছে ! বেস্পতিবারে জুড়ি চেপে পিকনিকে গিয়েছে। জুড়ি মানে ঘোড়ায়-জোতা মস্ত গাড়ি যাতে পরিবার-শুদ্ধ লোক আরামে যেতে পারে। আগে আমরা যখন নাতি-নাতনিরা আসতাম তখন ঠাকুর্দা এইরকম জুড়ি ভাড়া করতেন। ঠাকুমা কখনো আমাদের সঙ্গ নিতেন না, হাত তুলে না করতেন বেজার মুখ করে।

পরবর্তী রিপোর্ট ঃ ঠাকুমা চলেছেন ট্রেনে চেপে পাশের শহরে। দু-ঘণ্টার রাস্তা। সে শহরে মস্ত রেস খেলা হোত। ঠাকুমা যাচ্ছেন রেসের মাঠে।

এবার ছাপাখানার কাকা আতঙ্কিত। পাগলের ডাক্তার ডাকবে কি না সে ভাবছে। বাবাও তার ভাইয়ের মতোই অবাক, কিন্তু ডাক্তার ডাকতে তার অনিচ্ছে।

ঠাকুমা একলা একলা রেসের মাঠে যাননি। কাকার চিঠি অনুযায়ী এক ছুকরিকে ভিড়িয়েছেন সঙ্গে। কাকার মতে, এ মেয়েটিরও মাথায় ছিট। যে হোটেলে ঠাকুমা খেতেন সেখানে রান্না করত মেয়েটি আর এখন থেকে দেখা যাচ্ছে ঠাকুমার জীবনে এই ছিটগ্রস্ত মেয়েটির প্রবল প্রভাব।

ঠাকুমা এই মেয়েটিকে আতুপুতু করে রাখতেন। তাকে নিয়ে সিনেমা আর জুতোর দোকানেও যেতেন। শোনা গেল জুতোওয়ালা একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাট। আরও শোনা গেল এই দুই মহিলা হোটেলে রান্নাঘরের টেবিলে বসে এক গেলাস মদের সঙ্গে তাস পিটছে।

আর কাকার সেই মরিয়ার মতো চিঠি ঃ এবার গোলাপ-লাগানো টুপি দিয়েছে পাগলিটাকে। আর আমাদের আনার গীর্জাতে যাবার মতো জামা নেই।

এরপর কাকার চিঠিগুলো মনে হোত হিস্টিরিয়া রুগীর লেখা। তাতে থাকত খালি ঠাকুমার বেয়াড়াপনার ফিরিস্তি ; আর কিছুই থাকত না। হোটেল-ওয়ালা নাকি চোখ মেরে নিচু গলায় তাকে বলেছে, 'মিসেস বি আজকাল খুব মজায় আছেন বলে শোনা যাচ্ছে।'

কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট, এই শেষ বয়সেও ঠাকুমা খুব অমিতব্যয়ী হয়ে পড়েননি। যখন হোটেলে না যেতেন তখন বাড়িতে খেতেন ডিমের সাথে বিস্কুট আর কফি। অবশ্য খাওয়ার সঙ্গে প্রতিবার ছোট গেলাসে এক গেলাস সস্তা লাল মদ খেতেন। শুধু নিজের শোবার ঘর আর রান্নাঘরটাই নয়, সারা বাড়িটাই খুব ফিটফাট রাখতেন। কিন্তু তাঁর ছেলেমেয়েদের অজান্তেই তাঁর বাড়িটা ইতিমধ্যে তিনি বন্ধক দিয়েছিলেন। আর এই বাড়িটার বন্ধক থেকে যে টাকা পেলেন সে টাকা গেল কোথায় জানা গেল না। মনে হচ্ছে তাঁর জুতোওয়ালা বন্ধুর গর্ভেই টাকাটা গিয়েছে। ঠাকুমার মৃত্যুর পর সেই লোকটা পাশের এক

শহরে হাতে তৈরী জুতোর এক পশারী কারবার ফাঁদিয়েছে।

এখন স্পষ্ট বোঝা যায়, পর-পর দুটো জীবন ঠাকুমা যাপন করেছেন। মেয়ে, স্ত্রী আর মা হিসেবে প্রথম জীবন। আর দ্বিতীয় জীবনে তিনি খালি মিসেস বি, কারুর সঙ্গে সম্পর্কবিরহিত; মোটামুটি সচ্ছল কিন্তু দায়দায়িত্ব নেই। প্রথম জীবনটা কেটেছে দীর্ঘ ষাট বছর। দ্বিতীয়টা মাত্র দু-বছর।

বাবা জানতে পেরেছিল যে তার জীবনের শেষ ছ-মাসে ঠাকুমার চালচলন মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। যেমন গরমের দিনে রাত তিনটেতে উঠে তিনি সেই ছোট শহরের জনমনুষ্যহীন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। আর এরকম কানা-ঘুসোও শোনা যেত যে তাঁকে সঙ্গ দেবার জন্যে স্থানীয় পাদ্রী তাঁর বাড়ি এলেই তিনি তাঁকে সিনেমায় যাবার জন্যে নেমন্তন্ন করতেন।

বাস্তবিক ঠাকুমা ঠিক একলা হয়ে পড়েননি। বরং অনেক মজাদার লোক জমত সেই জুতোর কারখানায়, সেখানে গল্পে গুজবে গুলজার হয়ে থাকত চারদিক। ঠাকুমার জন্যে সবসময় এক বোতল লাল মদ আলাদা থাকত, তা থেকে তিনি ছোট গেলাসে ঢেলে ঢেলে খেতেন আর চারপাশে তখন শহরের অফিসার বাবুদের কেচ্ছাকাহিনী জমে উঠত। সেই মদের বোতলটা থাকত অবশ্য তাঁর জন্যে রিজার্ভ, মাঝেসাঝে তিনি সাঙ্গোপাঙ্গদের কড়া মালও খাওয়াতেন।

হঠাৎ মারা গেলেন ঠাকুমা শরতের অপরাহ্ণে, তাঁর শোওয়ার ঘরে কিন্তু শুয়ে নয়, জানলার ধারে খাড়া চেয়ারে বসে। সেদিন সন্ধ্যেবেলা সেই ছিটগ্রস্ত মেয়েটাকে তিনি ডেকেছিলেন তাঁর সঙ্গে সিনেমা যাবার জন্যে। মৃত্যুর সময় সে মেয়েটি তাঁর পাশে ছিল। ঠাকুমার বয়স তখন চুয়াত্তর।

কবরে যাবার আগে তাঁর ছেলেমেয়েদের জন্যে ঠাকুমার একটা ফটো তোলা হয়েছিল। শায়িত অবস্থায় তোলা ছবি।

ছবিটায় চোখে পড়ে অজস্র খাঁজকাটা একখানা ছোট্ট মুখ, চওড়া চাপা ঠোঁট। ছোট কিন্তু ক্ষুদ্রতার সামান্য ছাপ নেই সে চেহারায়। ক্রীতদাস-জীবনের দীর্ঘ বছরগুলোর তিনি যেমন আস্বাদ গ্রহণ করেছেন তেমনি মুক্তির স্বল্পকালে শেষ চুমুক দিয়ে তিনি পান করে গেছেন এই জীবনটা।

ইশারা ও প্রতীক

ভ্লাদিমির নবোকভ

চিকিৎসার-বাইরে-চলে-যাওয়া একটি পাগল যুবককে জন্মদিনে কি উপহার দেওয়া যায়, এই নিয়ে চার বছরে চারবার ওরা একই সমস্যায় পড়ল। মানুষের তৈরি জিনিস তার কাছে পাপের মৌচাক—বদ চালচলনে টগবগ করছে। এসব শুধু সে একাই টের পায়। আর তা যদি না হয়, তাহলে মানুষের তৈরি জিনিসগুলো স্রেফ আরামের উপকরণ। তার অবাস্তব দুনিয়ায় সেগুলো কোন কাজে আসে না। ছেলে রাগ করতে পারে বা ভয় পেতে পারে (যেমন কলকব্জা জাতীয় যে-কোন জিনিস নিষিদ্ধ) এমন বেশ কয়েকটা উপহার নাকচ করার পর তার মা-বাবা একটি সুন্দর অথচ নিরীহ তুচ্ছ জিনিস পছন্দ করল ঃ একটি সাজিতে দশটি বোতলে দশ রকম ফলের জেলি।

ছেলের জন্মের সময়েই ওদের বিয়ে বহুদিনের পুরোনো হয়ে গেছে ঃ তারপর বিশ বছর কেটে গেছে, এখন ওরা রীতিমত বুড়ো। স্ত্রীর ধূসর চুল কোনরকমে গোছানো। সব সময়ে সস্তা কালো পোশাক পরে। বসন্ত-দিনের ছিদ্রান্বেষী আলোর সামনে ওর চেহারা কেমন সাদামাটা ফ্যাকাশে। অথচ ওর বয়েসী অন্যান্য মহিলারা (যেমন পাশের বাড়ির মিসেস সল্‌-এর মুখ রঙ মেখে কেমন টুসটুসে গোলাপী, আর তার টুপি যেন নদীতীরের এক গোছা ফুল) সেরকম নয়। দেশ-পাড়াগাঁয়ে থাকতে ওর স্বামী মোটামুটি দু-পয়সা লাভের ব্যবসা চালাচ্ছিল, কিন্তু এখন সে তার ভাই আইজাকের ওপরে পুরোপুরি নির্ভরশীল। আইজাক প্রায় চল্লিশ বছর ধরেই খাঁটি আমেরিকান। ওরা কদাচিৎ তার দেখা পায় ; আইজাককে ওরা আটপৌরে নাম দিয়েছে 'প্রিন্স'।

সেই শুক্রবারটায় সবকিছুই কেমন গোলমাল হয়ে গেল। দু-স্টেশনের মাঝে পাতাল রেলের বিদ্যুৎ উধাও হল, ফলে সিকি ঘণ্টা ধরে কোন শব্দ নেই—শুধু সুবোধ হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক আর খবরের কাগজের খসখস। এরপর যে বাস ধরার কথা তার জন্য ওদের ঠায় এক যুগ দাঁড়িয়ে থাকতে হল ; আর বাস যখন এল, দেখা গেল তাতে হাইস্কুলের কলবলানো বাচ্চাকাচ্চার ঠাসাঠাসি। বাদামী পথ ধরে স্বাস্থ্যনিবাসের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় বেশ জোরে বৃষ্টি

অনুবাদ : অনীশ দেব

পড়ছিল। সেখানে পৌঁছে আর এক দফা অপেক্ষা ; তারপর ওদের খোকা (বেচারির মুখে ব্রণের দাগ, গোমড়া হতবুদ্ধি ভাব, খোঁচা খোঁচা দাড়ি) রোজকার মত পা ঘষটে ঘরে ঢোকার বদলে শেষ পর্যন্ত ঢুকে পড়ল একজন নার্স। নার্সটি পরিচিত হলেও আমল দেয়নি ওরা। তবে সে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলল, খোকা আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। এখন ভাল আছে, কিন্তু কেউ দেখা-টেখা করলেই সে অস্থির হয়ে উঠতে পারে। জায়গাটায় কাজের লোকজন এত কম, আর জিনিসপত্র এত হারিয়ে যায়, ওলটপালট হয়ে যায় যে ওরা ঠিক করল উপহারটি অফিসে জমা না দিয়ে পরের বার এসে খোকার হাতে দেবে।

স্বামীর ছাতা খোলার জন্য স্ত্রী অপেক্ষা করল, তারপর স্বামীর হাত ধরল। এক বিশেষ ঢঙের খনখনে আওয়াজে স্বামী বারবার গলা সাফ করছিল। বিচলিত হলেই এরকমটা করে। রাস্তার ওপারে বাস স্টপের ছাদনাতলায় পৌঁছে স্বামী ছাতা বন্ধ করল। ফুট কয়েক দূরে একটা গাছ এপাশ-ওপাশ দুলছে, গা থেকে জল ঝরে পড়ছে। তার ঠিক নিচেই এক অঁাজলা জলে একটা ছোট্ট আধমরা পাখির ছানা অসহায় ভাবে ছটফটিয়ে উঠছে।

পাতাল-রেলের স্টেশনে যাওয়ার দীর্ঘ পথে ওদের মধ্যে একটিও কথা হল না। ছাতার হাতলের ওপরে স্বামীর বুড়ো হাত দুটো (শিরা-ফুলে-ওঠা বাদামী ছোপ ধরা চামড়া) আঙুলে আঙুল জড়ান, কাঁপছে। যতবারই সেদিকে চোখ পড়ল ততবারই স্ত্রী কান্নার চাপ টের পেল—চাপ ক্রমশ বাড়ছে। আনমনা হওয়ার চেষ্টায় ও চারপাশে চোখ বোলাল। দেখল, বাসের একটি মেয়ে, মাথায় কালো চুল আর নোংরা লাল পায়ের নখ, এক বয়স্ক মহিলার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদছে। করুণা ও বিস্ময় মেশানো একটা ছোট্ট ধাক্কা খেল ও। ঐ মহিলাকে দেখতে কার মত যেন? রেবেকা বরিসোভ্নার মত। তার মেয়ে বহু বছর আগে মিন্স্ক্-এ এক সোলোভাইশিক্কে বিয়ে করেছিল।

শেষ যেবার এদের খোকা আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেছিল, ডাক্তারের ভাষায় তার কায়দাটা নাকি ছিলো উদ্ভাবনী ক্ষমতার চরম নিদর্শন ; ও হয়ত পার পেয়েও যেত যদি না ওখানকারই আর এক হিংসুটে রোগী খোকা উড়তে শিখছে ভেবে ওকে থামাত। আসলে ওর জগতে একটা ফুটো করে সেখান দিয়ে ও পালাতে চাইছিল।

ওর বিভ্রান্তির ধরন-ধারণ নিয়ে কোন একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় বিস্তারিত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। তবে তার বহু আগেই ওরা স্বামী-স্ত্রীতে ওই ধাঁধার জট ছাড়িয়ে ফেলেছে। হারম্যান ব্রিঙ্ক বলেছেন এটা 'রেফারেন্শ্যাল্ ম্যানিয়া'। এ ধরনের বিরল ঘটনায় রোগী কল্পনা করে যে তার চারপাশে যা ঘটছে তার সঙ্গে তার ব্যক্তিত্ব ও অস্তিত্বের কোন প্রচ্ছন্ন সম্পর্ক আছে। আসল মানুষদের সে এই ষড়যন্ত্র থেকে বাদ দিয়ে দেয়—কারণ নিজেকে সে অন্যান্যদের

চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান ভাবে। সে যেখানেই যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকৃতি তাকে সেখানে অনুসরণ করে। ধু-ধু আকাশে মেঘের দল মন্থর ইশারায় একে অপরকে খবর পাঠায়—তার সম্পর্কে অবিশ্বাস্য-রকম খুঁটিনাটি সব খবর। রাত নেমে এলে ছায়া ছায়া গাছপালার দল অঙ্গভঙ্গী করে শরীরী অক্ষরে আলোচনা করে তার অন্তরতর ভাবনাগুলো। নুড়ি অথবা কোন দাগ কিংবা রোদের টুকরোগুলো নানান নক্‌শার মাধ্যমে ভয়ংকরভাবে এমন সব বার্তা তৈরি করে যেগুলো তাকে আটকাতে হবে, জানতে হবে। সবকিছুই যেন এক গুপ্ত-লিপি, আর সবকিছুর বিষয়ই হলো সে নিজে। কোন কোন গুপ্তচর আবার উদাসীন দর্শক, যেমন কাচের পাত ও শান্ত পুকুর ; অন্যান্যরা, যেমন দোকানের শো-কেসে ঝোলানো কোটগুলো হলো একচোখো সাক্ষী, বিনা বিচারে খতম করতে পারলেই ভেতরে ভেতরে খুশি হয় ; আবার কেউ কেউ (কুলু কুলু জল, ঝড়) প্রায় পাগলের মতো ক্ষিপ্ত ; তার সম্পর্কে বিকৃত ধারণা নিয়ে রয়েছে। তার প্রতিটি কাজকে তারা অদ্ভুতভাবে ভুল বোঝে। সব সময়েই তাকে সাবধান থাকতে হবে। বিভিন্ন জিনিসের ওঠানামার ঢেউয়ের অর্থ উদ্ধার করতে জীবনের প্রতিটি মিনিট প্রতিটি ছোট ছোট টুকরো তাকে খরচ করতে হবে। তার নিশ্বাসটুকু পর্যন্ত টুকে নিয়ে নথি-ভুক্ত করে ফেলা হয়। যে যে বিষয়ে সে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে সে-সব যদি শুধু তার আশ-পাশের জিনিসেই সীমাবদ্ধ থাকতো—কিন্তু হায়, তা তো নয়! দূরত্ব যত বাড়ে বাঁধন-ছেঁড়া কলঙ্কের প্রবল স্রোত তত আয়তনে বাড়ে, তত দ্রুত হয়। তার রক্তকণিকার ছায়া-পরিলেখ লক্ষ লক্ষ গুণ বড় হয়ে বিস্তীর্ণ সমতলভূমির ওপরে লঘুপায়ে এগিয়ে চলে ; এ-ছাড়া অসহ্য দৃঢ় উঁচু বিশাল পর্বত গ্র্যানাইট পাথর ও কাঁদুনে ফার গাছের ভাষায় তার অস্তিত্বের চরম সত্যটুকুর মোটামুটি বিবরণ দিয়ে দেয়।

॥ ২ ॥

ওরা যখন পাতাল রেলের গুম গুম শব্দ আর দম-আটকানো বাতাস থেকে বেরিয়ে এলো তখন দিনের শেষ তলানিটুকু রাস্তার আলোর সঙ্গে মিশে গেছে। রাতে খাবার জন্য একটু মাছ কেনার ছিল। সেই জন্য স্বামীর হাতে জেলির সাজিটা দিয়ে স্ত্রী তাকে বাড়ি যেতে বলল। সিঁড়ির তৃতীয় সমতল পর্যন্ত হেঁটে ওঠার পর স্বামীর খেয়াল হল সকালে স্ত্রীর কাছে সে চাবির গোছাটা দিয়েছিল।

চুপচাপ সে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল। মিনিট-দশেক পরে ক্লান্ত ভারী পা ফেলে স্ত্রী ফিরে এল—মুখে নিস্তেজ হাসি, নিজের বোকামির জন্য দুঃখ করে মাথা নাড়ছে। ওকে দেখে স্বামী আবার চুপচাপ উঠে দাঁড়াল। নিজেদের দু-ঘরের

ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ল ওরা। ঢুকেই স্বামী সোজা এগিয়ে গেল আয়নার কাছে। বুড়ো আঙুলে ঠোঁটের দু-কোণ টেনে ধরে, অনেকটা মুখোশের মত ভয়ঙ্কর ভাবে মুখ বিকৃত করে, নকল দাঁতের প্লেটটা বের করে নিল। প্লেটটা নতুন, তবে যাচ্ছেতাইরকম অস্বস্তিকর। প্লেট থেকে কয়েকটা লালার সুতো তার মুখে লেগে ছিল, সেগুলো ছিঁড়ে গেল। তারপর সে তার রুশ ভাষার খবরের কাগজটা পড়তে লাগল, আর স্ত্রী খাবার-টেবিল সাজাতে শুরু করল। পড়তে পড়তেই সে ফ্যাকাশে খাবারগুলো খেতে লাগল—এ-খাবার খেতে দাঁত লাগে না। স্ত্রী স্বামীর মন-মেজাজ বোঝে, তাই সে-ও চুপচাপ রইল।

স্বামী শুতে চলে গেলে স্ত্রী বসবার ঘরেই বসে রইল—সঙ্গে ময়লা তাসের প্যাকেট আর পুরোনো অ্যালবাম। সামনের সরু উঠোনে কয়েকটা তোবড়ানো ছাইয়ের টিনে বৃষ্টির ফোঁটা টুং-টাং শব্দ তুলছে অন্ধকারে। উঠোন পেরিয়ে জানলায় জানলায় নরম আলো। তারই একটায় দেখা যাচ্ছে, অগোছালো বিছানায় একটি লোক কালো প্যাণ্ট পরে দুটো খালি কনুই উঁচু করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। স্ত্রী জানলার আড়াল টেনে দিল, তারপর ফটোগুলো দেখতে লাগল। ছোটবেলায় বেশিরভাগ শিশুর তুলনায় খোকার মুখে বিস্ময়ের ভাবটা একটু বেশি ছিল। লিপ্‌জিগ-এ তাদের এক জার্মান পরিচারিকা ছিল। অ্যালবামের খাঁজ থেকে সে ও তার হোঁৎকা-মুখো প্রেমিক পড়ে গেল। মিন্‌স্ক্‌, বিপ্লব, লিপ্‌জিগ, বার্লিন, লিপ্‌জিগ, একটা হেলে-থাকা বাড়ির সামনেটার ঝাপসা ছবি। চার বছর বয়েসে, একটা পার্কে: উদাসীন লাজুকভাবে কপালে ভাঁজ ফেলে একটা আকুল কাঠবিড়ালির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে—যেমনটি করে অচেনা কোন লোকের সঙ্গে। রোজা পিসি—ব্যস্তবাগীশ, শক্ত ধাতের খ্যাপা-চোখো বুড়ি; তার গোটা জীবনটা কেটেছে খারাপ খবরের অস্থির দুনিয়ায়—দেউলিয়া হওয়া, ট্রেন দুর্ঘটনা, কর্কট রোগ; শেষ পর্যন্ত জার্মানরা তাকে মেরে ফেলে; আর যাদের নিয়ে রোজা পিসির দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না, তাদের সবাইকেও একই সঙ্গে শেষ করে দেয়। ছ'বছর বয়েসে—তখন খোকা মানুষের মত হাত-পা ওয়ালা চমৎকার চমৎকার সব পাখি আঁকত আর বয়স্ক লোকেদের মত অনিদ্রায় ভুগত। ওর এক জ্ঞাতি ভাই: এখন এক নামকরা দাবাড়ু। আবার খোকা, বয়েস আট, তখন থেকেই ওকে বোঝা মুশকিল হয়ে পড়েছিল; অলিন্দের দেওয়াল-ঢাকার রঙিন কাগজ দেখে ও ভয় পেত; একটা বইয়ের একটা বিশেষ ছবি দেখেও খোকা ভয় পেত; ছবিটায় আঁকা ছিল এক কাব্যময় নিসর্গদৃশ্য—পাহাড়ের গায়ে ছোট বড় পাথর, আর নিষ্পত্র একটা গাছের ডালে ঝুলছে একটা গরুর গাড়ির পুরনো চাকা।

দশ বছর বয়েস: সে-বছরেই ওরা ইওরোপ ছেড়ে চলে আসে। লজ্জা, দুঃখ, অপমানজনক নানান অসুবিধে; সেই বিশেষ স্কুলে খোকার সাথী কুৎসিত,

বদমেজাজী, হাবাগোবা সব ছেলেমেয়ের দল। আর তারপর ওর জীবনে এমন একটা সময় এল যখন ওর সেই ছোট-ছোট আতঙ্কগুলো জমাট বেঁধে তৈরি হল বিভ্রান্তির ঘন জঙ্গল ; বিভ্রান্তিগুলো আবার যুক্তিসম্মতভাবে একটা আর একটার সঙ্গে যুক্ত। ফলে ও চলে গেল সুস্থ মনের ধরাছোঁয়ার একেবারে বাইরে। তখন ও নিউমোনিয়া থেকে ধীরে ধীরে সেরে উঠেছিল। ওর আতঙ্ক বা বিভ্রান্তিগুলোকে ওর মা-বাবা অবুঝের মত ভাবত সেগুলো বোধহয় অস্বাভাবিক প্রতিভাবান কোন শিশুর খামখেয়ালিপনা।

এটা, এবং এরকম আরও অনেক কিছু স্ত্রী মেনে নিয়েছিল—কারণ বেঁচে থাকার অর্থই হল একটার পর একটা খুশির লোকসানকে মেনে নেওয়া। অবশ্য তার ক্ষেত্রে সেগুলো খুশিও ঠিক নয়—নিছকই ভালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল মাত্র। সে ভাবছিল ঃ যে কোন কারণেই হোক, সে ও তার স্বামীকে অন্তবিহীন যন্ত্রণার ঢেউ সহ্য করতে হয়েছে ; কল্পনা-করা-যায়-না এমনভাবে অদৃশ্য দানবের দল তার খোকাকে কষ্ট দিয়েছে ; পৃথিবীতে কত কচি-কোমল আছে তার কোন হিসেব নেই ; কিন্তু এই কচি-কোমলের এমনই কপাল যে সেটা থেঁতলে গেছে, বা নষ্ট হয়ে গেছে, কিংবা পালটে গেছে পাগলামিতে ; নোংরা ঘুপচিতে বসে অবহেলিত শিশুর দল নিজেদের মধ্যে গুনগুন করে কথা কইছে ; সুন্দরী আগাছা কৃষকের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না—অসহায়ভাবে তারা দেখে কৃষকের মর্কটসুলভ কোলকুঁজো ছায়া পিছনে ফেলে যায় দলিত ফুলের দল, আর তখন ভয়ঙ্কর আঁধার ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে।

॥ ৩ ॥

মাঝরাত তখন পার হয়ে গেছে। এ-ঘরে বসেই সে স্বামীর চাপা বিলাপ শুনতে পেল ; আর সঙ্গে সঙ্গেই সে টলতে টলতে ও ঘরে ঢুকল, পরনে রাত্রিবাসের ওপরে অ্যাসট্রাক্যান কলার দেওরা একটা পুরনো ওভারকোট—চমৎকার নীল স্নান-পোশাকটার চেয়ে এটা তার অনেক বেশি পছন্দ।

'আমি ঘুমোতে পারছি না,' সে আর্তস্বরে চেঁচিয়ে বলল।

'কেন, ঘুমোতে পারছ না কেন ?' স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, 'তোমার তো ভীষণ ক্লান্ত লাগছিল।'

'যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি তাই ঘুমোতে পারছি না,' বলে সে কাউচে শুয়ে পড়ল।

'পেটের গোলমাল ? ডাঃ সোলোভকে খবর দেব ?'

'না-না। ডাক্তারের দরকার নেই, ডাক্তারের দরকার নেই,' সে যন্ত্রণাবিদ্ধ স্বরে বলল ঃ 'ডাক্তারের নিকুচি করেছে! খোকাকে ওখান থেকে জলদি নিয়ে আসতে হবে। নইলে আমরাই দায়ী হব, আমরাই দায়ী হব!' বার বার একই

কথা বলে সে এক ঝটকায় মেঝেতে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসল, হাত মুঠো করে কপালে আঘাত করতে লাগল।

স্ত্রী শান্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে, কাল সকালেই ওকে বাড়িতে নিয়ে আসব।'

'একটু চা করে দাও তো,' বলে তার স্বামী বাথরুমে গেল।

কষ্ট করে নিচু হয়ে স্ত্রী মেঝে থেকে কয়েকটা তাস আর দু-একটা ফোটো তুলে নিল। ওগুলো কাউচ থেকে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে ঃ হরতনের গোলাম, ইস্কাপনের নওলা, ইস্কাপনের টেক্কা। এলসা ও তার জন্তু-মার্কা নাগর।

খোশ-মেজাজে জোরাল গলায় কথা বলতে বলতে স্বামী ফিরে এল ঃ 'আমি সব ঠিক করে ফেলেছি। আমরা শোবার ঘরটা ওকে ছেড়ে দেব। দুজনে পালা করে রাতের কিছুটা কাটাব ওর সঙ্গে, আর বাকিটা কাটাব এই কাউচে। ডাক্তারকে বলব সপ্তায় অন্তত দু-দিন যেন ওকে দেখতে আসে। প্রিন্স কি বলবে তাতে কিছু যায় আসে না। তা ছাড়া ওর খুব বেশি কিছু বলার থাকবেও না, কারণ এতে অনেকটা সস্তা হবে।'

টেলিফোন বেজে উঠল। এরকম অসময়ে ওদের টেলিফোন কখনও বেজে ওঠে না। স্বামীর বাঁ পায়ের চপ্পলটা খুলে গিয়েছিল। সে ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে শিশুর মত দন্তহীন মুখে হাঁ করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে পায়ের গোড়ালি ও বুড়ো আঙুল দিয়ে চপ্পলটা খুঁজতে লাগল। স্বামীর চেয়ে স্ত্রী ইংরিজি জানে বেশি, তাই সব সময় সে-ই ফোন ধরে।

'চার্লি আছে?' একটা মেয়ের অস্পষ্ট নিচু গলা শোনা গেল।

'আপনি কত নম্বর চাইছেন? না, এটা সেই নম্বর নয়।'

স্ত্রী রিসিভার আস্তে রেখে দিলো। নিজের পুরনো ক্লান্ত হৃৎপিণ্ডের ওপরে হাত গেল তার।

সে বলল, 'আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

স্বামী চকিত হেসে সঙ্গে সঙ্গেই আবার শুরু করল তার আবেগজর্জর স্বগত কথা। সকাল হলেই তারা ওকে নিয়ে আসবে। ছুরিগুলো সব সময়ে ড্রয়ারে তালা বন্ধ করে রাখতে হবে। খুব খারাপ অবস্থা হলেও খোকার কাছ থেকে অন্য লোকেদের কোন বিপদের ভয় থাকে না।

টেলিফোন দ্বিতীয়বার বেজে উঠল। সেই একই নিরাসক্ত উদ্বিগ্ন তরুণী কণ্ঠস্বর চার্লির খোঁজ করল।

"আপনার নম্বর ভুল হচ্ছে। বলছি আপনার গোলমালটা কোথায় হচ্ছে; আপনি শূন্যের বদলে 'ও' অক্ষরটা বার বার ঘোরাচ্ছেন।"

মাঝরাতের অপ্রত্যাশিত চায়ের উৎসবে বসে গেল ওরা দুজনে। জন্মদিনের উপহারটি রয়েছে টেবিলের ওপরে। স্বামী শব্দ করে চুমুক দিচ্ছিল; মুখ

লালচে ; থেকে থেকেই সে গ্লাসটা তুলে বৃত্তাকারে ঘোরাচ্ছে যাতে চিনিটা ভালো করে গলে যায়। তার টাকমাথার একপাশে একটা জরুল, সেখানে একটা শিরা চোখে লাগার মত ফুলে উঠেছে। আর সকালে দাড়ি কামালেও এখন তার থুতনিতে খোঁচা-খোঁচা রুপোলি দাড়ির আভাস। স্ত্রী আর এক গ্লাস চা স্বামীকে দিতেই সে চশমা চোখে দিয়ে হলদে, সবুজ, লাল রঙের উজ্জ্বল ছোট-ছোট শিশিগুলো বেশ তৃপ্তির সঙ্গে আবার খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। তার জড়ানো ভিজে ঠোঁট চমৎকার লেবেলগুলো বানান করে পড়তে লাগল ঃ খোবানি, আঙুর, বনকুল, নাশপাতি। সে যখন বুনো-আপেলের নামে পোঁচেছে ঠিক তখনই টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

বোর্হেস এবং আমি

যা-কিছু ঘটে তা অন্যজন। অন্য বোর্হেসের জীবনেই ঘটে। আমি বুয়েনস আইরিস-এর রাস্তা ধরে হাঁটি, কখনো কখনো হয়ত অভ্যাসবশেই ধনুকের মত বাঁকা প্রাচীন ফটক বা গ্রিলের দরজা দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ি; বোর্হেস সম্পর্কে চিঠিপত্রে খবর পাই, অধ্যাপকদের কমিটির মধ্যে অথবা জীবনী-অভিধানে তার নাম দেখি। আমার ভাল লাগে বালি-ঘড়ি, ম্যাপ, অষ্টাদশ শতাব্দীর মুদ্রণরীতি, শব্দের ব্যুৎপত্তি, কফির গন্ধ এবং স্টিভেনসনের গদ্য; অন্যজন এসব পছন্দ করে, কিন্তু এমন চটকদারি ঢঙে করে, যাতে এসব নাটুকে মুদ্রাদোষে পরিণত হয়। যদি বলি আমাদের দুজনের সম্পর্ক খারাপ তাহলে কথাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে; আমি বাঁচি, আমাকে বেঁচে থাকতে হয় যাতে বোর্হেস গল্প ও কবিতা বানাতে পারে, আর সে সব গল্প কবিতা আমারি বেঁচে থাকার কারণ। এটা আমার পক্ষে স্বীকার করা কঠিন নয় যে কয়েকটা মূল্যবান পাতা সে লিখে ফেলেছে, কিন্তু এই পাতাগুলো আমাকে রক্ষা করতে পারে না, তার কারণ হয়ত যা-কিছু ভাল তা কারো একার সম্পত্তি নয়, এমনকি অন্যজনেরও নয়, তা ভাষা এবং ঐতিহ্যের অন্তর্গত। যাইহোক, বিলুপ্ত হওয়াই আমার নিয়তি এবং আমার জীবনের কোন কোন মুহূর্ত কেবল অন্য-জনের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে। আস্তে আস্তে তার কাছে আমার সবকিছুই সমর্পণ করছি, যদিও আমি ভালভাবেই জানি যে তার বানিয়ে বলা এবং বাড়িয়ে বলার বিশ্রী অভ্যেস আছে। স্পিনোজার ধারণা ছিল সমস্ত বস্তু নিজেরা যা তাই হতে চায়, পাথর চিরকালই পাথর হতে চায়, বাঘ চায় বাঘ হতে। আমি বোর্হেসের মধ্যেই থাকব, নিজের মধ্যে নয় (যদি আমি অন্য কেউ হতাম), কিন্তু আমি অন্যকিছুর চেয়ে অথবা শ্রমসাধ্য গিটারের বাজনার চেয়ে বইয়ের মধ্যেই নিজেকে কম চিনতে পারি। অনেক বছর আগে আমি তার কাছ থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করেছিলাম এবং শহরের উপকণ্ঠে বস্তি এলাকার স্মৃতি ছেড়ে সময় ও অনন্তের খেলার মধ্যে চলে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে সব খেলা এখন বোর্হেসের জীবনের অংশ এবং আমাকে অন্যকিছু ভাবতে হবে। তাই আমার জীবন শুধু পালিয়ে বেড়ানো এবং আমি সবকিছুই হারিয়ে ফেলি এবং সবকিছুই চলে যায় বিস্মৃতি অথবা অন্যজনের কবলে।

আমাদের মধ্যে কে এই পাতাটা লিখেছে জানি না।

অনুবাদ: রমানাথ রায়

ইরসট্র্যাটাস

আপনাদের মানুষকে উঁচু থেকে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। আমি করি, ঘরের সব আলো নিভিয়ে, জানলার কাছে দাঁড়িয়েঃ আর এই উঁচু থেকে পর্যবেক্ষণ করলে তারা কিন্তু আপনাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করবে না। কেননা তারা যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে তখন শুধু সামনের দিকে তাকিয়েই হাঁটতে থাকে, পিছনেও অবশ্য কখনও-কখনও খেয়াল রাখে, তবুও তাদের সমস্ত খেয়াল হিসাব করা থাকে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি লম্বা কোন দর্শক পর্যন্ত। এর বেশি নয়। কে আর ভাবতে পারে সাততলা থেকে নিচের মানুষের মাথার ডার্বি টুপি কেমন দেখতে হয়? ফলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে-যাওয়া মানুষগুলি নিজেদের কাঁধ মাথা চোখ ঝলসানো পোশাকে ঢেকে রাখার জন্য একদম মন দেয় না, এমন কি এরা জানেও না কীভাবে নিষ্ঠুর অমানুষিক বোধের বিরুদ্ধে লড়তে হয়, অথচ সবসময়ই চোখের সামনে এইসব অধঃপতন লক্ষ্য করে। জানলার নিচের কাঠে ভর দিয়ে ঝুঁকে হেসে উঠিঃ কারণ নিচের রাস্তা দিয়ে দেখি মানুষগুলি কেমন সোজা হয়ে গর্বের সঙ্গে হাঁটতে থাকে, চলাফেরা করে। এত উঁচু থেকে মনে হয় তারা যেন ফুটপাতে ধাক্কা খায় এবং কাঁধ থেকে লম্বা দুটো পা ঝুলে থাকে।

সাততলার এই বারান্দায়, ভাবি আমার পুরো জীবনটাই কেটে যাওয়া দরকার। ভাবি, মানুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণগুলিকে কিছু-কিছু আদর্শ গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণের ভিতর দিয়ে ফোটানো প্রয়োজন। তা না হলে, গুণগুলি হারিয়ে যায়, মানুষ কোথায় তলিয়ে যায়। কিন্তু মানুষের কাছে আমার শ্রেষ্ঠ গুণের পরিচয় কী? তাদের মনে শুধু একটু জায়গা দখল করা, এ-ছাড়া আর কিছু নয়। আজকাল তাই একটা জিনিসই চর্চা করি তা হচ্ছে, মানুষের মনে ছাপ রাখার জন্য নিজেকে সর্বক্ষণ ভাবি মানুষের থেকে আমি যেন বহু দূরে বহু উঁচুতে। এর জন্যই আমি সবসময় নোতর দামের টাওয়ার, সুউচ্চ ইফেল টাওয়ারের প্ল্যাটফর্ম, সেক্রেক্যুর বা রু দেলাম্বর-এর চেয়ে আমার উঁচু ফ্ল্যাটকে মনে মনে বেশি ভালবাসি। উদাহরণ হিসাবে এরা আমার কাছে যথেষ্ট ভাল।

অনুবাদ: তীর্থংকর নন্দী

আমি মাঝে-সাঝে সাততলা থেকে নিচেও নামি। যেমন, অফিস যাবার সময়। তখন আমার দম বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে আমি যখন চলাফেরা করি, একই তলে যখন মানুষরাও হাঁটে তখন তাদেরকে অতি নগণ্য ক্ষুদ্র পিঁপড়ের সঙ্গে তুলনা করতে খুব অসুবিধা হয়ঃ কারণ তারা আমার হৃদয় স্পর্শ করে। একবার রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় এক মৃত ব্যক্তি চোখে পড়ে। মুখ থুবড়ে মাটিতে মানুষটি পড়ে থাকে। যারা খুন করে, তারা মানুষটিকে উপুড় করে রেখে পালিয়ে যায়, শরীর থেকে তখনও রক্ত বেরুতে থাকে ঃ আমি মানুষটির খোলা দুই চোখ, চোখের বাঁকা দৃষ্টি এবং আশেপাশে জমাট রক্ত মন দিয়ে দেখতে থাকি। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে মনে মনে ভাবি, "এ এমন কিছুই নয়, এই লাল রক্ত ভিজে লাল কোন রঙের থেকে বেশি কিছু মনে দাগ কাটে না। খুনীরা সেই লাল রঙই মানুষটির নাকে মাখিয়ে চলে যায়, এই যা।" তবুও আমি অনুভব করি আমার পা ঘাড় সব কেমন হালকা, এরপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর বুঝি, যারা মানুষটিকে খুন করে তারাই আমাকে একটা ওষুধের দোকানে নিয়ে যায়, চোখেমুখে জল দেয় শেষে মদ দেয়। এত রাগ হয় যে লোকগুলোকে শেষ করে দিতে পারতাম!

আমি জানি লোকগুলো আমার শত্রু। কিন্তু তারা এই জিনিসটা টের পায় না। এদের দেখে মনে হয় এরা সব একই গোত্রের। লোকগুলো যে যার হাতের কনুই ঘষতে থাকে, আমাকেও যেন ঘষতে বলে, এ রকমই তাদের মনোভাব যেন আমিও তাদের দলের একজন। অথচ তারা যদি ন্যূনতম সত্য জিনিসটাও ধরতে পারত তবে আমাকে মারধোর শুরু করে দিত। অবশ্য পরে আমায় তারা চিনতে পারে এবং মারধোরও করে। যখন তারা আমাকে বুঝতে পারে আমি আসল মানুষটি কেমন তখন তারা খুব শাস্তি দেয়। একটি স্টেশন-ঘরে নিয়ে গিয়ে তারা আমাকে সমানে দুঘণ্টা মারতে থাকে। কিল, চড়, ঘুষির সঙ্গে হাত মুচড়ে দেয়, টান দিয়ে প্যাণ্ট ছিঁড়ে ফেলে এবং মেঝেতে জল ঢেলে সেই জল চেটে-চেটে খাওয়ার জন্য জোর করতে থাকে, আমি যখন তাদের চারজনের মুখের দিকে চেয়ে থাকি তখন তারা আমাকে দেখে হেসে ওঠে এবং লাথি মারতে শুরু করে। এত মারধোর করতে থাকলেও আমি কেন যেন বুঝতে পারি এরা এক সময় এই মারধোর বন্ধ করবেই। অবশ্য আমি আবার এমন বলবান পুরুষও নই যে তাদের কাছ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারি। চার-জনের ভিতর কেউ-কেউ আমায় খুব লক্ষ্য করতে থাকে—তারা যেন দলের মধ্যে বয়সে বড়। রাস্তায় যখন মৃত মানুষটিকে দেখছিলাম তখন এই বয়স্ক লোকগুলো আমাকে ধাক্কা মারে, দেখতে চাইছিল মৃত মানুষটিকে নিয়ে আমি কী করি। আমি তাদের বলি, কিছুই না। বরং এমন ভাব করি যেন কিছুই জানি না। তবুও তারা আমাকে পাকড়াও করে। যখন পাকড়াও করে তখন

আমি খুব ভয় পাই। ভাবি—সামনে ঘোর বিপদ। যাকগে, আপনারা ভাববেন না লোকগুলোকে ঘৃণা, অবজ্ঞা করার মতন তেমন কোন বড় কারণ আমার হাতে ছিল না।

সেই ঘটনার পর, একদিন একটা রিভলভার কিনি এবং তখন আমি বেশ ভালভাবে রাস্তায় চলাফেরা করতে থাকি। আসলে এমন একটা জিনিস সাবধানে সঙ্গে রাখলে এবং যা নাকি যখন-তখন সশব্দে গর্জে উঠলে গোলমাল সৃষ্টি করতে পারে তখন বোধহয় আমার মতন আপনারাও নিজেকে সাহসী ভাবতে পারেন। প্রতি রবিবার এই জিনিসটিকে আমি সঙ্গে নিই। প্রতি রবিবার যখন আমি বুলেভার ধরে বেড়াই রিভলভারটিকে প্যান্টের পকেটে খুব সাধারণভাবে ভরে রাখি। হাঁটার সময় রিভলভারটিকে মনে হয় কাঁকড়ার মতন প্যান্টটাকে কামড়ে ধরে থাকে এবং উরুতে শীতল স্পর্শও বেশ টের পাওয়া যায়। কিন্তু হাঁটার সময়, যতই হাঁটতে থাকি রিভলভারটিও শরীরের ঘসায় ঘসায় বেশ গরম হয়ে ওঠে। ফলে, হাঁটার সময় শরীরটাকে সোজা করে রাখি। মাঝেমধ্যে হাত ঢুকিয়ে জিনিসটাকে স্পর্শ করি, ছুঁয়ে থাকি। বেড়াবার সময় প্রায়ই রাস্তার প্রস্রাবাগারে প্রবেশ করে খুব সন্তর্পণে, কেননা প্রস্রাবাগারেও কোন প্রতিবেশী উপস্থিত হতে পারে এই ভেবে, রিভলভারটিকে পকেট থেকে বার করি। করে এর ওজন, কালো নকশা করা হাতল এবং ট্রিগার চোখের সামনে ধরে খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করতে থাকি। ট্রিগারটিকে মনে হয় অর্ধ-নিমীলিত কোন মানুষের চোখের পাতা। প্রস্রাবাগারের সামনে দিয়ে যদি এইসময় কেউ হেঁটে যায় তবে তারা মনে করে সত্যি-সত্যিই আমি প্রস্রাব করায় খুব ব্যস্ত, অথচ বাইরের প্রস্রাবাগারে আমি কখনও প্রস্রাব করি না।

একদিন রাত্রিবেলায়, রিভলভারটি দিয়ে মানুষ গুলি করার কথা মাথায় আসে। শনিবারের এক সন্ধ্যায় রু মোঁপানাসের উপর অবস্থিত এক হোটেল থেকে লি নামে একজন সোনালী চুলের মেয়েকে, যে কিনা সেই হোটেলেই কাজ করে, তাকে তুলতে যাই। আমি কিন্তু কখনও কোনও রমণীকে সঙ্গম করিনি, কারণ আমি ভাবি আমি এর থেকে বঞ্চিত। অবশ্য জানি, নারীদের দিকে আপনারা বেশ এগিয়ে যান এবং এমনভাবে এগোন যেন নারীরা দীর্ঘ কেশবিশিষ্ট মাথা নিয়ে আপনাদের গিলে ফেলে আর এও শুনি যে সঙ্গমের অনেকটা সময় কেটে গেলে তারাই একমাত্র ভাল ফল পায়। আমি অবশ্য কাউকে কখনও এই ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করি না, কিছু বলিও না। যদিও এক সুন্দর ও শান্ত প্রকৃতির মেয়েকে আমি চিনি এবং যে কিনা বিরক্ত হলেও আমার সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারে। আমি প্রতি মাসের প্রথম শনিবার লি-কে নিয়ে হোটেল দ্যকুইজে-এর যে-কোনও ঘরে চলে আসি। সেই ঘরে লি পোশাক খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয় অথচ আমি তাকে একটুও স্পর্শ করি না, শুধু দু-চোখ দিয়ে তাকে

দেখতে থাকি। আর কখনও-কখনও নিজের পরিধেয় প্যান্টের ভিতর আরাম বোধ করি আবার কখনও কিছুই বোধ করি না, বাড়ি ফিরে যাই। এইরকমই মাসের এক প্রথম শনিবারের সন্ধ্যায় লি-কে দেখতে না পেয়ে হোটেলের সামনে আমি অপেক্ষা করতে থাকি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ভাবি,—হয়ত আজ লি ঠাণ্ডায় প্রচণ্ড আক্রান্ত। কেননা সময়টা ছিল জানুয়ারির প্রথম এবং দারুণ ঠাণ্ডা। লি-কে দেখতে না পেয়ে আমার ভীষণ একা-একা লাগতে শুরু করে। আসলে সন্ধ্যা থেকেই তো আমি কল্পনার রাজ্যে ডুবে বিচিত্র ধরনের সব স্বপ্নে নিজের মন ভরিয়ে রাখি। রু ওডেসার উপর এক কৃষ্ণবর্ণ নারী থাকে। নারীটিকে আমি প্রায়ই লক্ষ্য করি। দেখতে বেশ খাসা ও হৃষ্টপুষ্ট। আমি কিন্তু খাসা ভরাযৌবনা নারীদের ঠিক ঘৃণা করি না। তারা যখন নগ্ন হয় তখন শুধু মনে হয় তারা অন্যান্য নারীদের তুলনায় অনেক বেশি নগ্ন—। যাই হোক, ওডেসার এই যুবতী কিন্তু আমার চাওয়া সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। তাকে সঠিক কিছু জিজ্ঞাসা করতেও আমার ভয় হয়। ফলে, ওডেসার এই নতুন মুখ-চেনা যুবতীটির প্রতি অত বেশি মন দিই না, শুধু মনে হয় এইসব যুবতীরা খুব ধূর্ত হয়, তাদের বাড়ি গেলে আমার মতন পুরুষদের তারা বাড়ির দরজার পিছনে নিয়ে চোখের পলকে ঠকিয়ে দেবে। শেষে ঘরের ভিতর থেকে দুম্ করে একজন পুরুষমানুষ বেরিয়ে এসে সঙ্গে যা টাকা পয়সা থাকবে সব কেড়ে নেবে। আর যদি কপাল ভাল থাকে তবে মারধোর না খেয়ে কোনও ভাবে বেরিয়ে আসা যাবে। অথচ, সেই সন্ধ্যায় লি-কে না পেয়েও আমার মন বেশ শক্ত থাকে, আমি ওডেসার সেই কৃষ্ণবর্ণ রমণীর কাছে যাওয়ার এক সাহস পাই বুকে। ভাবি, দেখা যাক ভাগ্যপরীক্ষা করে। আমি তখন নিজেব বাড়ি ফিরে যাই রিভলভারটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার জন্য।

রিভলভারটিকে সঙ্গে নিয়ে আমি পনেরো মিনিট বাদে ওডেসার সেই সুন্দরী যুবতীর কাছে ফিরে আসি। সঙ্গে রিভলভার আছে তাই একদম ভয় পাই না। যুবতীটির সামনে এসে এমন মন দিয়ে তাকে দেখতে থাকি যে, সে কেমন যেন অসহায় বোধ করে। তাকে তখন আমার উল্টোদিকের কোনও প্রতিবেশীর মতন চেনা লাগে। ঠিক যেন মনে হয় আমার সেই প্রতিবেশী পুলিশ সার্জেন্টের স্ত্রীর মতন। মনে এত আনন্দ হয়—কারণ আমি বহুদিন ধরেই সার্জেন্টের স্ত্রীকে নগ্ন অবস্থায় দেখার জন্য অপেক্ষা করি। সার্জেন্ট যখন বাড়ি থাকে না তখন তার স্ত্রী জানলা খোলা রেখেই জামাকাপড় পাল্টায় আর আমি তখন আমার ঘরের পর্দার পিছনে নিজেকে লুকিয়ে রেখে দু-চোখ ভরে সেই দৃশ্য দেখতে থাকি। শুধু অপেক্ষা করি যদি অন্তত ক্ষণিকের জন্য হলেও নগ্ন শরীরটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু কোনও ফল হয় না ; কেননা মহিলা সবসময়ই উল্টো দিকে মুখ করে জামাকাপড় পাল্টায়।

হোটেল স্টেলায় সেইদিন মাত্র একটি ঘরই খালি। ছ-তলায়। আমি ও ওডেসার সেই খাসা হৃষ্টপুষ্ট যুবতী দুজনে ছ-তলায় উঠতে শুরু করি। যুবতীটি যেহেতু একটু মোটা তাই সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় প্রতি পদক্ষেপেই একবার করে দম নেয়। আর আমি যেহেতু তারের মতন ছিপছিপে, ফলে আরাম বোধ করি। পেটে চর্বি না থাকায় ছ-তলায় উঠতে আমার সময় লাগে পাঁচ মিনিটের কিছু বেশি। ছ-তলায় উঠে এলে যুবতীটি ডান হাত বুকে চেপে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে শুরু করে। আর বাঁ হাতে ঝুলতে থাকে ঘরের চাবি।

"অনেকটা পথ উঠে আসতে হয়,"—মহিলা মৃদু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলে। আমি কোনও উত্তর না দিয়ে তার বাঁ হাত থেকে চাবি নিয়ে ঘরের দরজা খুলি। পকেটে বাঁ হাতে রিভলভারটিকে চেপে ধরে রাখি এবং ঘরে ঢুকে আলো জ্বালা না অবধি হাতটাকে পকেট থেকে তুলি না। শেষে আলো জ্বাললে বোঝা যায় ঘরটা একদম ফাঁকা। হোটেলের লোকরা শুধু হাত ধোওয়ার বেসিনের উপর একটুকরো চৌকো সাবান রেখে দেয়। কেননা একজন পার্টির জন্য এই তো যথেষ্ট। সাবানের টুকরোটিকে দেখে আমি হেসে উঠি, হাসি এই কারণেই যে, এই হাত ধোওয়ার বেসিন সাবান কোনও কিছুই আমার কাজে লাগবে না। মহিলা তখনও আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়েই এক নাগাড়ে শ্বাস নিতে থাকে এবং এমনভাবে নিতে থাকে যাতে আমি সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ি। উত্তেজিত হয়ে যখন তার দিকে ঘুরে দাঁড়াই তখন সে তার ঠোঁট বন্ধ করে, শ্বাস ফেলা বন্ধ করে। ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে বলি,—"জামাকাপড় খোলো।"

ঘরে ঢাকনা দেওয়া এক আরাম-কেদারা। কেদারায় বসে আমি একটু জিরিয়ে নিই। এইসব সময় মনে হয় একটা সিগারেট ধরাই। মহিলাটি জামাকাপড় ছেড়ে একসময় আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্দেহের চোখে আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি একটু পিছনে হেলান দিয়ে বলি, "কী নাম তোমার।"

"রহ্‌নে," মহিলা জবাব দেয়।

"আচ্ছা, রহ্‌নে, নাও তাড়াতাড়ি করো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

"তুমি খুলবে না জামাকাপড়?"

"আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না,"—আমি বলি।

অবশেষে যুবতীটি পরনের প্যান্টিটাকেও হাত দিয়ে খুলে ফেলে, তারপর সমস্ত খুলে-ফেলা জামাকাপড় সযত্নে গুছিয়ে রাখে, এমন কি ব্রেসিয়ারটাকেও সযত্নে জামাকাপড়ের উপর রেখে দেয়, তারপর বলে ওঠে, "আসলে তুমি একজন অলস মানুষ, তাই না? তুমি কি চাও তোমার এই ছোট

মেয়েটিই সমস্ত কাজ করুক ?”

এই সব প্রশ্ন করতে করতে যুবতীটি আমার সামনে এগিয়ে আসে, আরাম-কেদারায় হাতদুটো রেখে চেষ্টা করে আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে। আমি বিরক্ত হয়ে কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। বলে উঠি, “নাহ্, এইসব, মানে এইভাবে তোমাকে হাঁটু ভেঙে বসতে হবে না।”

যুবতীটি খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, “ঠিক আছে, তা হলে তুমি আমাকে কী করতে বলো ?”

“কিছুই না। শুধু হাঁটো। চারিদিকে শুধু হেঁটে বেড়াও। এ-ছাড়া তোমার কাছ থেকে আর কিছু চাই না।”

ভীষণ কুৎসিতভাবে এরপর সে আমার চোখের সামনে হাঁটতে থাকে। জানি, মহিলারা যখন উলঙ্গ থাকে তখন তাদের হাঁটতে বললে তারা সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হয়। কারণ তখন সঙ্কোচ তাদের চেপে ধরে। ফলে মাটিতে সোজাভাবে গোড়ালিও ফেলতে পারে না। যাইহোক, যুবতীটি আমার সামনে হাত ঝুলিয়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়ানো দেখে ভাবি, আমি যেন স্বর্গসুখ লাভ করছি, মনে হয় সেই সুখের স্বর্গে আমি হাতল-অলা কেদারায় শান্তভাবে শুয়ে আছি, আমায় সমস্ত শরীর প্রায় গলা পর্যন্ত সুসজ্জিত পোশাকে ঢাকা, এমনকি হাতে দস্তানাগুলিও ঠিক পরা আছে, আর খাসা এই ভরাযৌবনা রমণীটি আমার নির্দেশ মতন নিজেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে আমার সামনে-পিছনে হেঁটেচলে বেড়ায়। ঘাড় ঘুরিয়ে আবার মাঝেসাঝে আমাকে দেখে, ছেনালের মতন হাসতে থাকে। কখনও প্রশ্ন করে, “তুমি কি ভাব আমি খুব রূপসী ? এইভাবে তুমি যা দেখছ তা কি তুমি খুব ভালবাস ?”

“তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না,”—আমি উত্তর দিই।

হঠাৎ মেয়েটি রেগে গিয়ে ফস করে কেমন বলে ওঠে,—“দেখ, এইভাবে কি তুমি অনেকক্ষণ ধরে আমায় একবার এদিক একবার ওদিক হাঁটতে বাধ্য করাবে ?”

“বসে পড়ো তা হলে,” আমি জবাব দিই।

আমার কথা শুনে মেয়েটি বিছানায় বসে পড়ে। তারপর শুধু দুজন দুজনকে চুপচাপ দেখতে থাকি। আমি খেয়াল করি মেয়েটির সমস্ত নগ্ন শরীরটা কাঁটা ফুটে ওঠায় কেমন যেন খসখসে। দেয়ালের ওপাশ থেকে ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ কানে ভেসে আসে। একসময় হঠাৎ বলে উঠি, “তোমার পা দুটো ফাঁক করো।”

এক মুহূর্ত দেরি করে মেয়েটি রাজী হয়। আমি ফাঁক করা দুপায়ের ভিতর কিছুক্ষণ চোখ রেখে নাকটা ঘুরিয়ে ফেলি। তারপর হেসে উঠি, এত জোরে হেসে উঠি যে, চোখে জল চলে আসে। একসময় তাকেও বলি, “ওইদিকে একবার তাকাও।” এই বলে, আবার হাসতে শুরু করি।

যুবতীটি বোকার মতন আমাকে দেখতে থাকে। তারপর হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে পা-দুটো সজোরে বন্ধ করে দেয়। বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, "অসভ্য, ছোটলোক!"

আমি তবুও জোরে জোরে হাসতে থাকি। এদিকে তখন মেয়েটি লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে ব্রেসিয়ার টেনে নেয়। ব্রেসিয়ার টানতে দেখে আমি বলি, "দেখ, এখনও কাজ শেষ হয়নি, একটু বাদেই আমি তোমায় পঞ্চাশ ফ্রাঁ দেব আর আমি সেই টাকা উশুল করতে চাই।"

আমার কথায় মেয়েটি একটু ইতস্তত করে প্যাণ্টিটাও তুলে নেয়। আমি আবার বলি, "নাও, ধরো এটা, আমার কাছে আরও অনেক আছে। আমি বুঝতে পারছি না তুমি কী চাও। তুমি যদি মনে করো আমাকে এখানে এনে বোকা বানাবে।"

আমি পকেট থেকে রিভলভারটি বার করি। তারপর তার সামনে নাচাতে থাকি। রিভলভার দেখে মেয়েটি খুব ঘাবড়ে যায়। একটাও কথা না বলে হাত থেকে প্যাণ্টিটা ফেলে দেয়। আমি তখন আদেশ করি, "হাঁটো, চারিদিকে হেঁটে বেড়াও।"

শেষে আমার সামনে বারাঙ্গনা যুবতীটি আরও পাঁচ মিনিট হেঁটে বেড়ায়। হাঁটা হয়ে গেলে তখন তাকে জামা কাপড় পরতে বলি। আমি যখন বুঝি আমার প্যাণ্ট ভিজে গেছে আমি তখন উঠে দাঁড়াই এবং একটা পঞ্চাশ ফ্রাঁ-র নোট তার দিকে বাড়িয়ে দিই। সে নোটটা নেয়। নোটটা দেওয়ার সময় প্রশ্ন করি, "অনেকক্ষণ কি, মনে হয় না এই অর্থের বিনিময়ে তোমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে বলেছি।"

ফাঁকা ঘরের মাঝখানে এরপর আমি উলঙ্গ যুবতীটিকে, তার এক হাতে ধরা ব্রেসিয়ার এবং অন্যহাতে ধরা পঞ্চাশ ফ্রাঁ নোটটি, এই অবস্থায় রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। বেরিয়ে ভাবি, এই অর্থ খরচ করার জন্য আমি আদৌ দুঃখিত নই। কারণ মেয়েটিকে তো আমি বোকা বানাতে পেরেছি, তাছাড়া একজন বারাঙ্গনাকে বোকা বানানো অত সহজও নয়। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ভাবতে থাকি,—"আমি তো এটাই চাই, ওদের সম্পূর্ণ বোকা বানাতে চাই।" নামার সময় আমার মনে হয় আমি যেন শিশুর মতন খুশিতে নাচছি। বাড়িতে যখন আসি তখন হোটেলের সেই চৌকো সাবানের টুকরোটাকে বার করি। গরম জলে আমার ভিজে-যাওয়া গুপ্তস্থানটি সেই সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করার চেষ্টা করি, পরিষ্কার হয়ে যাবার পরও কেন যেন আমার হাতের আঙুলের ভাঁজে ভাঁজে একধরনের চটচটে পাতলা পর্দা লেগে থাকে। মনে হয় কেউ বহুক্ষণ ধরে আঙুলগুলি চুষেছে আর তার ফলে গজিয়ে উঠেছে মিষ্টি গন্ধযুক্ত এই চটচটে পাতলা পর্দা।

সেই রাত্রিতে আমি কিন্তু ঘুমের ভেতরেও চমকে চমকে জেগে উঠি। আর জেগে উঠলেই প্রতিবার সেই যুবতী মেয়েটির মুখ মনে পড়ে যায়। সেই চোখ, সেই ভয়ার্ত অস্থির চোখ, যখন তাকে রিভলভারটা দেখাই। আর সেই উন্মুক্ত পেটের ভাঁজের লাফানো, যখন মেয়েটি আমার সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে থাকে, হাঁটতে থাকে।

আমি ভাবি, সত্যিই কী মুর্খ! আমার ভিতরে এক ধরনের অনুশোচনা জেগে ওঠে। জাগে এই কারণে যে, মেয়েটির সেই খোলা পেটে আমার গুলি করা উচিত ছিল, কারণ সেই ঘরে মেয়েটিকে আমি নগ্ন অবস্থায় হাতের কাছে পেয়েছিলাম। ফলে, সেই রাত্রিতে এমনকি পরপর তিনরাত্রি আমি স্বপ্নে দেখি, মেয়েটির খোলা নাভির চারিদিকে ছ-খানা লাল-লাল গোল গর্ত কেমন ঘন হয়ে আমার চোখের সামনে প্রায়ই ভেসে উঠছে।

যাই হোক. আমি আর কখনও বিনা রিভলভারে ঘর থেকে বার হই না। রাস্তায় বেরিয়ে যখন দেখি মানুষরা পিছন ফিরে হেঁটে চলেছে, তখন ভাবি তাদেরকে যদি এই দূরত্বে গুলি করা যায় তবে তারা নির্ঘাত মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। প্রতি রবিবারই শাটেলেট্-এ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শেষ হলে আমি আমার অভ্যাস মতন তার আশেপাশে ঘুরে বেড়াই। ঘড়িতে ছটা বাজলে আমার কানে ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসে। দেখি, শাটেলেট্-এর দ্বাররক্ষী হুকের সাহায্যে কাঁচ-দরজা পিছন থেকে বন্ধ করতে থাকে। তারপর এইভাবে শুরু: শ্রোতার ভিড় ধীরে ধীরে শাটেলেট্ থেকে বেরোতে থাকে, প্রত্যেকেই সঙ্গীতের আনন্দে রাস্তায় ভেসে ভেসে পা ফেলতে শুরু করে, চোখে তখনও লেগে থাকে সঙ্গীতের মেজাজ, এমনকি মনেও ভাবরসের মিষ্টি আমেজ জড়িয়ে থাকে। এমনও অনেকে থাকে যারা কিনা তখন বাইরের পৃথিবীটাকে বিস্ময়ের চোখে দেখতে শুরু করে মনের আনন্দে হেঁটে যায়, রাস্তাঘাট সবকিছু মনে হয় মায়াপুরীর মতন। সেই নেশার টানে এরা রহস্যের মতন হেসে উঠে এক জগৎ থেকে অন্য জগতে চলতে শুরু করে। আর আমি সেই সময় অন্য জগতে বসে এইসব মানুষদের জন্যই অপেক্ষা করে থাকি। ডান হাত দিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি ঢেলে পকেটের রিভলভারটি চেপে ধরি। কিছু সময় কেটে গেলে দেখি, আমি সেই মানুষদের উদ্দেশে গুলি চালাই। তাদের হালকা নরম শরীরে গুলি করলে, একজনের পর একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। গুলির শব্দে চতুর্দিকে শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে, সকলেই প্রাণ বাঁচাতে আবার শাটেলেট্-এর দিকে ছুটতে থাকে, বন্ধ কাঁচ-দরজায় আঘাত করলে কাঁচ ভেঙে যায়। এ এক দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ খেলা ; খেলা শেষ হলে বুঝতে পারি আমার হাত কাঁপতে থাকে এবং উত্তেজনা কমানোর জন্য তৎক্ষণাৎ আমি ভ্রেহারে ফিরে কনিয়াক পান করতে করতে নিজের ভিতর নিজেকে ডুবিয়ে রাখি।

আমি কিন্তু এইসব ভিড়ে স্ত্রীলোকদের খতম করি না। শুধু তাদের কিডনিতে গুলি করি। অথবা প্রসবস্থানে, যাতে তারা যন্ত্রণায় তখন নেচে ওঠে।

যাই হোক, এখনও আমি কিছুই স্থির করিনি। অথচ, আমার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে আছে, শুধু নিজের সিদ্ধান্তের জন্যই বসে আছি। তবে আমি খুব সামান্য কাজের ভিতর দিয়ে নিজেকে তৈরী করতে থাকি। যেমন, কী ভাবে অব্যর্থ গুলি চালাতে হয়, তা আমি দ'ফার্‌ত্‌-রশরু-র কাছে এক শুটিং গ্যালারিতে অভ্যাস করি। আমার লক্ষ্য অবশ্য খুব নিখুঁত নয়, আপনারা যখন শূন্যে গুলি চালান, আমি তখন নিশানা করি শুধু মানুষ। তারাই আমার লক্ষ্য। এরপর আমি এক প্রচারকার্যে নামি। মনে মনে একটা দিন ঠিক করি অর্থাৎ যেদিন কিনা অফিসের সহকর্মীরা সকলেই উপস্থিত থাকে। সেটা, সোমবারের সকাল। এমনিতে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তবুও, তাদের সঙ্গে করমর্দন করতে গেলে কেন যেন গা রি-রি করে। তারা যখন করমর্দন করতে এগিয়ে আসে, অখন দস্তানা খুলে ফেলে, আর খোলেও খুব কদর্যভাবে। দস্তানা খুলে আবার আঙুলের ভিতর দোলাতে থাকে। সেই মুহূর্তে ফুটে ওঠে তাদের ভাঁজওয়ালা হাতের শূন্য পুরু তালু। আমি কিন্তু কখনও হাত থেকে দস্তানা খুলি না।

সোমবার আমরা বিশেষ কাজকর্ম করি না। কমার্শিয়াল সার্ভিসের মহিলা টাইপিস্ট একসময় আমাদের জন্য রসিদ নিয়ে আসে। যখন সে আসে তখন লমারসিয়ে তার সঙ্গে একটু ঠাট্টা-তামাশা করে এবং ফিরে গেলে অন্যান্যরা তার রূপের মনভোলানো আকর্ষণ নিয়ে দারুণ খোশমেজাজে এবং দক্ষতার সঙ্গে গল্পে মেতে পড়ে। এই প্রসঙ্গ শেষ হলে এরা লিন্‌দ্‌বার্গ-এর প্রসঙ্গে ডুবে যায়। এরা লিন্‌দ্‌বার্গকে খুব পছন্দ করে। একসময় আমি বলি,— "আমি কিন্তু কালো বীরপুরুষদের বেশী পছন্দ করি।"

"তার মানে, নিগ্রোদের?" মাসে জবাব দেয়।

"না, কালো মানে যারা দুষ্ট ইন্দ্রজালে পটু, বীর। লিন্‌দ্‌বার্গ তো একজন সৎ বীরপুরুষ। সে আমায় টানে না।"

"গিয়েই দেখ, আতলান্তিক পার হওয়া অত সহজ কিনা," রুক্ষস্বরে বুস্কিন বলে।

আমি এরপর কালো বীরপুরুষদের একটা বর্ণনা দিলে লমারসিয়ে বলে, "এ তো অরাজকতার সমর্থক।"

"না, অরাজকতার সমর্থকরা নিজেদের মতন মানুষকে ভালবাসে।" শান্ত ভাবে আমি উত্তর দিই।

"তা হলে সে একজন দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ,"—লমারসিয়ে জবাব দেয়।

কিন্তু এদের ভিতর মাসে, যার কিছুটা শিক্ষা-দীক্ষা আছে, ব্যাপারটা চটপট বুঝে নিয়ে বলে ওঠে, "আমি জানি তোমার চরিত্র। তার নাম ইরসট্র্যাটাস। সে বিখ্যাত হতে চায়, আর অফেসাসের সেই মন্দিরকে পুড়িয়ে দেওয়া ছাড়া তার চোখে আর কিছুই ভাল লাগে না, অথচ এই মন্দিরই পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি।" আমি প্রশ্ন করি, "আর সেই মহান ব্যক্তিটির কী নাম, যে কিনা অফেসাসের মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন!"

মাসে জবাব দেয়, "আমার মনে নেই, তবে মনে হয় না কেউ সেই বিশেষ ব্যক্তির নামটা জানে।"

"তাই নাকি? এদিকে ইরসট্র্যাটাসের নামটা ঠিক মনে আছে; দেখ, এই ইরসট্র্যাটাস কিন্তু কিছুই খারাপ ইঙ্গিত করে যায়নি," আমি উত্তর দিই।

এইভাবে কথোপকথনের ভিতর দিয়ে আলোচনাটা শেষ হয়ে গেলে, আমি শান্ত হই। কেননা সময় হলেই এরা এর অর্থ বুঝতে পারবে। আমার কাছে, যে নাকি তখনও পর্যন্ত ইরসট্র্যাটাসের নামটা কখনও শোনে নি, তার গল্প খুব উৎসাহজনক মনে হয়। দুশো বছরেরও বেশি যার মৃত্যু হয়ে গেছে, তথাপি সেই মানুষটির কীর্তিকলাপ এখনও কালো হীরের মতন জ্বলজ্বল করছে সমানে। আমি ভাবি, আমার কপাল, আমার লক্ষ্য খুবই দুঃখজনক এবং সামান্য। প্রথম প্রথম সে আমাকে খুব ভয় দেখায় কিন্তু পরে অভ্যস্ত হয়ে যাই। বিশেষ কোনও দিক থেকে একে দেখলে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়, কিন্তু অপরদিকে চিন্তা করলে বুঝতে পারি, যতই সময় যায় ততই সে আমার মনে এক ধরনের সাহস ও উৎসাহ তৈরী করতে সাহায্য করে। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় শরীরে কেমন যেন জোর পাই। আসলে আমার কাছে একটা রিভলবার থাকে, যা সশব্দে গর্জে উঠলে শোরগোল তৈরী করতে বাধ্য। আমি অবশ্য এই বস্তুটির কাছ থেকে সাহস বা আশ্বাস পাই না, যা পাই তা মনের ভিতর থেকেই। আসলে আমি নিজেই একটা রিভলভার, কিংবা টর্পেডো বা বোমা। একদিন আমিও এই অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিষাদময় জীবনের শেষে ফেটে পড়তে পারি, গর্জে উঠতে পারি এবং গর্জে উঠলেই সমগ্র পৃথিবীটাকে এক মিনিটেই ম্যাগনেসিয়ামের চাইতেও জোরালো ও উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করে দিতে পারি। রাতের পর রাত আজকাল শুধু স্বপ্ন দেখি। আমি যেন একদম অরাজকতার সমর্থক। মনে হয় জারের মতন আর একটা পৈশাচিক যন্ত্র শুধু বয়ে চলেছি। একদিন নির্দিষ্ট সময় হলে, অনুচরবর্গ যখন অতিক্রম করে যায়, তখন বোমাটা ফাটে, আমার সঙ্গে জার ও সোনালী কেশবিশিষ্ট তিনজন অফিসার জনতার সামনে আকাশে ছিটকে যায়।

আজকাল অফিস কামাই করে প্রতি সপ্তাহে বেরিয়ে পড়ি। ঘোরাঘুরি করি। বুলেভার ধরে যখন ঘুরি তখন আগামী সেই শিকারের জন্য কখনও-

কখনও অনুসন্ধান করি, আবার কখনও একদম বাড়ি থেকে না বেরিয়ে ঘরে নিজেকে বন্দী রেখে শুধু পরিকল্পনার ছক মাথায় কষতে থাকি। তারপর অক্টোবরের প্রথম দিকে আমি টের পাই তারা মানে মানুষ আমার ভেতরে কেমন এক আগুন জ্বেলে দেয়, আমি জ্বলে উঠি। জ্বলে উঠলে আমি তখন নিম্নলিখিত এই চিঠিটার ভিতর সম্পূর্ণ ডুবে যাই। চিঠিটা মোট ১০২ খানা কপি করি। চিঠিটার বয়ান—

মঁসিয়,

আপনি একজন বিখ্যাত মানুষ, আপনার লেখা হাজার-হাজার মানুষ মনে রাখে, বিক্রি হয়। অবশ্য তা কেন বলছি। আপনি তো মানুষকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। আপনার রক্তেই মনুষ্যত্বের বীজ, তাই আপনি একজন ভাগ্যবান পুরুষ। মানুষের সঙ্গে আপনি যখন সময় কাটান তখন আপনি অনেক বড়, এমন কি পথেঘাটে কখনও কোনও নগণ্য মানুষ দেখলে তাকে যদি ভাল করে নাও চেনেন, তবুও আপনার সহানুভূতি জেগে ওঠে। আসলে কি জানেন, আপনি মানুষকে, মানুষের শরীরকে অত্যন্ত পছন্দ করেন ; তাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কেমন সুন্দরভাবে জোড়া লাগান, পা-দুটোর কথাই ধরুন না, কী অদ্ভুতভাবে তারা নিজেদের মতন খুলে যায়, বন্ধ হয়, সর্বোপরি, এমন কি তাদের হাতগুলিও অসাধারণ। কেননা, এই হাত আপনাকে খুব আনন্দ দেয়। এক-একটা হাতে পাঁচটা করে আঙুল, আর বুড়ো আঙুলটিকে কী সুন্দরভাবে মানুষ অন্য হাতের আঙুলে বসিয়ে দিতে পারে। কোনও প্রতিবেশী যখন টেবিল থেকে কাপ-টাপ তোলে তখন আপনি বেশ উল্লসিত হয়ে ওঠেন, কারণ এই তুলে নেওয়ার ভিতর আপনি এক বিশেষ পদ্ধতি লক্ষ্য করেন যা নাকি কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব, আপনি অবশ্য আপনার লেখায় প্রায়ই সেই কথা লেখেন, বর্ণনা দেন, বোঝান ঃ যেমন, একটি বানরের তুলনায় অনেক সহজে ও তাড়াতাড়িভাবে মানুষ কাজ করে, ফলে মানুষ কি বানরের তুলনায় অধিক বুদ্ধিমান নয়? আমি মনে মনে ভাবি, আপনি বোধহয় মানুষদের শরীরের মাংসটাও যেন খুব ভালবাসেন, তাছাড়া তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গি, যা কিনা অনবরত নতুন-নতুন ভাবনা-চিন্তায় ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে, মনে হয় প্রতি পদক্ষেপেই তারা একটা নতুন কিছু আবিষ্কারের কথা চিন্তা করে, এমন কি বন্য পশুরাও মানুষের এই দৃষ্টিকে ভয় পায়, তারাও যেন এটা সহ্য করতে পারে না। ফলে, একমাত্র আপনার পক্ষেই সম্ভব সঠিক এক মাধ্যমের অনুসন্ধান, যার সাহায্যে কিনা আপনি মানুষের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন। আর তা, বিনীত অথচ উত্তেজিত এক মাধ্যম। একটি হাতলওয়ালা চেয়ারে পাঠকরা নিজেদের শরীর ছেড়ে আপনার বইয়ের পাতায় লোভীর মতন হাজির হয়, পড়তে পড়তে তারা আপনার মহৎ ভালবাসার কথা চিন্তা করে, চিন্তা করে আপনার বিচক্ষণতার

কথা এবং অসুখের কথা। আপনার মনের কথা জানতে পেয়ে, সেই অনুপ্রেরণায় তারা নিজেদের ভাসিয়ে, কেউ হয়ে ওঠে একজন কুৎসিত মানুষ, কেউ কাপুরুষ, কেউবা প্রাপ্তবয়স্কা কোনও রমণীর স্বামী, আবার কেউ হয় এমন একজন মানুষ যে কিনা জানুয়ারির প্রথম দিনে কখনও উৎসাহ বা আনন্দ বোধ করে না। এই-সব পাঠকরাই আপনার শেষ বইটির সম্বন্ধে মন্তব্য করে—দারুণ ভাল বই। তাই আপনিই জেনে অবাক হবেন, এমন একজন মানুষ আছে যে কিনা একদম মানুষকেই পছন্দ করতে পারে না। আর সেই ব্যক্তিটি আমিই ; মানুষকে আমি এতই অপছন্দ করি যে, আমি খুব শিগ্গিরই আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আধডজন মানুষকে খতম করার পরিকল্পনা কষছি। আপনি নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন যে কেন মাত্র আধডজন, তাই না? আসলে কি জানেন, রিভলবারে মাত্র ছটা গুলিই ধরে। এটা কি বিকৃত মনের পরিচয় নয়? তা ছাড়া, যা কিনা সাঙ্ঘাতিক অযৌক্তিক? কিন্তু আপনাকে বলে রাখি, মানুষ আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি আপনি আমার এই ধারণাটিকে কীভাবে নিচ্ছেন। একটা কথা, মানুষের যা-যা আপনাকে আকর্ষণ করে সেইগুলিতেই আমার অরুচি। আপনার মতন আমিও খেয়াল করি, মানুষ যখন গাল নেড়ে কিছু চিবোয়, তখন তারা সবকিছুর ওপর এক তীক্ষ্ম দৃষ্টি সবসময় মেলে রাখে, বাঁ-হাতটা যেন সবকিছুকে ছোট করে এবং সংক্ষিপ্ত করে দেখানোর জন্যই দোলে। আপনি বলুন, আমি যদি কোনও বিশালাকৃতি সীল প্রাণীর খাওয়া লক্ষ্য করি, তা কি খুব অপরাধ? আপনি তো জানেন, মানুষ তার এই মুখ নিয়ে কিছুই করতে পারে না যদি না সে চরিত্র নির্ণয় খেলায় মেতে উঠতে পারে। যখন খাওয়ার সময় মানুষ চিবোয় তখন তার মুখ বন্ধ থাকে, মুখের গহ্বরের দুই কোণ ওপরে-নিচে ওঠা-নামা করে, মনে হয় তারা তখন প্রশান্তি থেকে এক বিষাদগ্রস্ত আশ্চর্য বস্তুর দিকে অবিরাম চলছে। আমি জানি, আপনি এইসব ভালবাসেন, এই জিনিসেরই বর্ণনা দেন—আত্মার জন্য একনিষ্ঠ মনোযোগ। অথচ আমি এইসব ব্যাপারে দুর্বল হয়ে যাই ; কেন তা জানি না ; আমি এই ভাবেই জন্মেছি।

আমাদের মধ্যে যদি রুচিরই একমাত্র তফাৎ থেকে থাকে, তবে আপনাকে সমস্যায় ফেলব না। অথচ, আপনি সবকিছুই বুঝতে পারেন, কিন্তু আমি কিছুই বুঝি না। আমি একজন এমন মানুষ যে গলদা চিংড়ির মালাইকারির পছন্দ-অপছন্দের বাইরে, কিন্তু আমি যদি মানুষ না-ই ভালবাসি তবে তো আমি এক হতভাগ্য পুরুষ এবং এই সৌরজগতে তাহলে কোনও স্থানই নেই। মনে হয়, আমি ছাড়া আর সকলেই এই জীবনের অর্থকে একচোটিয়া বুঝে ফেলেছে। আশা করি, আপনি বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাই। দীর্ঘ তেত্রিশ বছর ধরে আমি যেন এক রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করে চলেছি যেখানে কিনা লেখা আছে—

"কোনও জায়গা নেই যদি না মানুষ হও।" যা-কিছু আমি আজ অবধি গ্রহণ করেছি তা সবই পরিত্যাগ করেছি ; আমাকে তাই বেছে নিতে হয় ঃ হয় আমার এই প্রচেষ্টা অবাস্তব এবং দুর্ভাগ্যজনক নয়ত যত তাড়াতাড়ি বা দেরিই হোক না কেন—এর সুফল পাবই। আবার এও জানি, যদি এই চিন্তাভাবনা থেকে দূরে সরে যাই তবে সফল হব না। কিন্তু আমি আমার গন্তব্যকে, নিশানাকে সঠিক বোঝাতেও পারি না, তারা শুধু ভেতরে ভেতরেই কেমন কাজ করে যায়, এ-সব বোঝা যায় একমাত্র আমার হাবেভাবে। আমার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ভেতরে ; যেমন কথাবার্তায় ঃ আমি চাই নিজস্ব কণ্ঠস্বর। কিন্তু যখনই এটি প্রয়োগ করতে যাই তখনই আমায় টেনে হিঁচড়ে ফেলে দেওয়া হয় ; জানি না তা কতখানি বিবেক-সম্পন্ন। তা ছাড়া, এইসব তো অভ্যাসের দ্বারাই আমি অর্জন করে এসেছি, অন্যান্যদের কাছ থেকেই তো গ্রহণ করে মাথায় জমে উঠেছে, এইসব বিতৃষ্ণাই আমি এই লেখার মাধ্যমে আপনাকে আজ জানাচ্ছি। এটাই শেষ জানানো। আপনাকে বলে রাখি ঃ মানুষকে ভালবাসাই দরকার তা না হলে তারাও পাশ কাটিয়ে চলাটাকে সঠিক ভাবে। আমি কিন্তু আপনাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কথা ভাবি না। কেননা খুব তাড়াতাড়িই আমি আমার রিভলভারটা নিয়ে পথে নামার অপেক্ষায় আছি, পথে নেমে দেখার ইচ্ছা কোনও মানুষ কোনও মানুষের সঙ্গে এই ধরনের ব্যবহার করে কি না! বিদায়, হয়তো সেই প্রথম মানুষটি আপনিও হতে পারেন, আপনার সঙ্গেই প্রথম মুখোমুখি হতে পারি। কিন্তু আপনি কখনও জানতে পারবেন না এই মানুষটা আমি আপনার মাথায় আঘাত করে কত তৃপ্তির সঙ্গে সেইখান থেকে ঘিলু বার করে দিতে পারি। আর যদি ঠিক এইভাবে না ঘটে, তবে ঠিক এরই কাছাকাছি হবে, যা কিনা আপনি সংবাদপত্র থেকে জানতে পারবেন। জানবেন, পল হিলবার্ট নামে এক ব্যক্তি প্রচণ্ড আক্রোশের বসে বুলেভার এড্‌গার কুইনেত্‌-এর কাছে দুজন পথচারীকে গুলি করে হত্যা করে। আপনি তো অন্যান্যদের তুলনায় ভালই বোঝেন সংবাদপত্রের সংবাদের গুরুত্ব কেমন। তখনই বুঝবেন, আমি মোটেই 'উগ্র' নই, বরং অনেক শান্ত, আপনার কাছে প্রার্থনা, মঁসিয়, আমার এই স্বচ্ছ মানসিকতাকে, গভীরতাকে অন্তত একবার হলেও ধন্যবাদ জানান।

আমি চিঠিটার ১০২ খানা কপি করে ১০২ খানা খামে ভরে ফেলি এবং খামের ওপর ১০২ জন ফরাসী লেখকের নাম ঠিকানা লিখি। শেষে এইসব খাম টেবিলের ড্রয়ারে ছ-খানা টিকিট-বইয়ের সঙ্গে রেখে দিই।

এই কাজটার পরে, আমি দু-সপ্তাহ খুব কমই ঘর থেকে বার হই। কারণ তখন আমি নিজেকে এমনভাবে ঘরে বন্দী করে রাখি যাতে আমি আমার অপরাধের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারি। আয়নায়, যে আয়নায় নিত্য নিজের মুখ দেখি, খেয়াল করি উত্তেজনার আনন্দে দিন-দিন কেমন করে মুখের

চেহারা পালটে যাচ্ছে। চোখ দুটো বড় হয়ে গেছে, এমন বড় যেন সমগ্র মুখ-খানাকেই গ্রাস করে ফেলতে চাইছে। চশমার পেছনে তাদের মনে হয় কী ঘন কালো ও সংবেদনশীল। কাচের পেছনে তাদের আমি গ্রহের মতন অনবরত ঘুরিয়ে চলেছি। মনে হয় এই সুন্দর চোখজোড়া কোনও শিল্পীর অথবা আততায়ীর। অথচ কোনও বড় অঘটন বা দুর্ঘটনার পর মানুষের চোখ কেমন পালটে যায় তাও ভালভাবে লক্ষ্য করেছি। আমি একবার দুটি মিষ্টি মেয়ের ফোটো দেখি, মেয়েদুটির গৃহকর্ত্রীদের তাদের বাড়ির ভৃত্যরা খুন করে সর্বস্ব লুঠ করে পালিয়ে যায়। সেই ভয়াবহ ঘটনার আগে ও পরে আমি মেয়েদুটির মুখ খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখেছিলাম। মনে আছে, ওই ঘটনার আগে মেয়েদুটির মিষ্টি মুখ যেন ছিটছিট জামার কলারের উপর ফুটন্ত দুটি লাজুক ফুল। দুটি মুখেই সুস্বাস্থ্য ও রুচির স্পষ্ট ছাপ। তা ছাড়া, তাদের চুলও এত সুন্দর ঢেউ-খেলানো যে মনে হয় কোনও উন্নত মানের খাঁজকাটা যন্ত্রই বোধহয় এমন সুন্দর ঢেউ ও মিল আনতে পারে। চুলের মিল ছাড়াও, তাদের জামার কলার ও ফোটো-গ্রাফারের দিকে একভাবে তাকিয়ে থাকার ভঙ্গি থেকে বোঝাই যায় যে, এরা দুই বোন। একই পরিবার থেকে এদের রক্ত ও উৎস।

সেই মিষ্টি মুখও দুর্ঘটনার পরে কেমন আগুনের মতন জ্বলে ওঠে। দেখলেই মনে হয় ফাঁসির আসামী। সেইরকমই দুজনের মুখের ভাষা, দুজনের মুখেই চামড়ার কদর্য ভাঁজ ও ক্ষত, এই ভাঁজ ক্ষত ভয় ও ঘৃণা থেকে এমনভাবে তাদের মুখে তৈরী হয় যেন বন্যপশু ধারাল নখের থাবা দিয়ে কুৎসিতভাবে আঁচড়ে দিয়েছে। আর সেই কালো চোখ, নিষ্প্রাণ কালো চোখগুলি—আমারই মতনই প্রাণহীন এবং মৃত। এত মিল থাকা সত্ত্বেও মুখ দুটিতে তখন আর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের মতন তারা সেই পৈশাচিক ঘটনার বিবরণ চোখে-মুখে ফুটিয়ে তোলে। ঘটনাটির পর আমি ভাবি,—"এইই যথেষ্ট, একটি অপরাধের জন্য এটাই ভাল উদাহরণ যেখানে দুটি অনাথ শিশুর মুখের চেহারা কেমন বদলে যায়, আর আমিও আশা করতে পারিনি একটা অপরাধ থেকে আমার ভিতরেও এক সুন্দর পরিকল্পনা জন্ম নিতে পারে।" এই ঘটনাটি আমার ভেতর এমন কাজ করে যে মানুষের নোংরামি, তাদের কুৎসিত সব আচরণ সম্বন্ধে আমার যাবতীয় ধ্যান-ধারণা ওলট-পালট হয়ে যায়,······ এ এমন এক অপরাধ যা অপরাধীর জীবনও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়। আমি মনে করি, একজন অপরাধীরও হাতে এমন কিছু সময়-সুযোগ থাকা উচিত যাতে সে ইচ্ছা করলেই নিজের পথ থেকে সরে যেতে পারে, কিন্তু আদতে দেখা যায় সেই পথটি তাদের পেছনে এমন ভাবে থাকে যেন সব কিছুই তখন ফাঁকা, শূন্য। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই ধরনের প্রশ্ন নিজের কাছে নিজেকে করার জন্য আমি বেশ মজা পাই, এবং এইসব প্রশ্নে নিজেকে পিষতে থাকি। আমার সমস্ত পরিকল্পনা নিজের মতন ভেবে ফেলি,

ঠিক করে ফেলি রু ওডেসার ওপরই যেন আমি ফেটে পড়তে পারি। কেননা সেইখান থেকে পালিয়ে যাবার রাস্তা খুঁজে পাব, রাস্তার মানুষজন যখন একে-একে মৃতদেহ তুলে নিতে ব্যস্ত থাকবে আমি তখন তাদের পেছনে ফেলে রেখে সহজেই চম্পট দিতে পারব। ছুটতে ছুটতে বুলেভারের এড্‌গাহ্‌-কুইনেত পার হয়ে খুব দ্রুত রু ডেলামবাহ্‌-এ ঢুকে পড়ব। তারপর তো মাত্র ৩০ সেকেণ্ডের ভিতর আমি বাড়ির দরজায় চলে যাব। অপরদিকে, আমার অনুসরণকারীরা তখনও কিন্তু বুলেভার এড্‌গাহ্‌ কুইনেত্‌-এ পড়ে থাকবে, কেননা আমি যে পথে পালিয়ে যাব সেই পথটি এমনভাবে গুলিয়ে ফেলবে যে আমাকে আবার খুঁজে বার করতে অন্তত এক ঘণ্টা সময় তারা নিয়ে নেবে। এই ফাঁকে আমি আমার ঘরের ভিতর চলে গিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করব এবং যখন টের পাব যে অনুসরণকারীরা আমার বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করেছে তখন রিভলভারে নতুন করে গুলি ভর্তি করে নিজেই নিজের মুখে ছুঁড়তে শুরু করে দেব।

ইদানীং আমি খুবই বিলাসের ভেতর দিয়ে জীবন কাটাতে শুরু করেছি ; রু ভেভিন-এর উপর অবস্থিত এক রেস্তরাঁর মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সেইখানে থাকতে শুরু করেছি, সকালে-বিকালে রুমে খাবার পাঠানোরও ব্যবস্থা হয়েছে। বেয়ারা আমার বন্ধ দরজায় বেল বাজালে আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলি না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দরজা অল্প ফাঁক করলে দেখতে পাই মেঝেতে বেয়ারার রেখে-যাওয়া লম্বা বাস্কেটের ভেতর আমার খাবারের প্লেট থেকে কেমন ধোঁয়া বের হয়।

২৭ অক্টোবর, সেইদিন সন্ধ্যা ৬টায় দেখি, আমার পকেটে আর ১৭ ফ্রাঁ ৫০ সেণ্টিমিয়ে অবশিষ্ট আছে। আমি তখন রিভলভারটি এবং চিঠির প্যাকেটগুলি নিয়ে নিচে নামি। নামার সময় ঘরের দরজা বন্ধ না করেই নেমে আসি, কারণ আমার পরিকল্পিত কাজটি হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি আবার আমার ঘরে খুব দ্রুত ফিরে আসতে পারি। নিচে নামলে খুব একটা সুস্থ বোধ করি না, হাতদুটো ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মাথায় খুব দ্রুতগতিতে রক্ত ওঠানামা করে, আর চোখদুটো এত জ্বলতে শুরু করে যে যন্ত্রণায় শেষ হয়ে যাই। রাস্তায় নামলে, হোটেল ডে ইকলস্‌-এর দিকে তাকিয়ে মনে হয় দোকানটিকে যেন চিনতেই পারি না এমন একটা অবস্থা, অথচ এই দোকান থেকেই পেন্সিল কিনি। বিস্ময়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, "এটা কোন্‌ রাস্তা ?" বুলেভার ডু মত্‌পাহনাস-এ তখন লোকে লোকারণ্য। এদের ভেতর কেউ আমায় ধাক্কা দেয়, চাপ দেয়, কনুই দিয়ে কিংবা কাঁধ দিয়ে সজোরে গুঁতোও মারে—এত ভিড়। আমি ধাক্কা খেতে খেতে এগিয়ে যাই, কারণ আমার শরীরে এত জোর নেই যে এই ভিড়ের ভিতর ঠিক গলে গলে চলে যেতে পারি। একসময় দেখি, জনসমুদ্রের মাঝে আমি কী বীভৎসরকমভাবে একা এবং অসহায়। আচ্ছা, এইসব মানুষ আমাকে যদি

মারতে চায় তবে তারা কেমনভাবে মারবে ! পকেটে রিভলভার থাকার জন্য খুব ভয় পেয়ে যাই। ভাবি, এইসব মানুষ হয়ত বুঝতে পারবে আমার প্যান্টের পকেটে রিভলভার আছে। আর বুঝলেই সকলে আমার দিকে কটাক্ষ হেনে বলে উঠবে, "এই যে ওইখানে · · · এই যে · · · · ·," তাদের মনে থাকবে তীব্র ঘৃণা, এবং নখ দিয়ে আমাকে তখন আঁচড়ে ছিঁড়ে ফেলবে। বেআইনীভাবে মানুষকে হত্যা করা! তারা আমাকে তখন তাদের মাথার ওপর ছুঁড়ে দেবে আর আমি ঠিক একটি পুতুলের মতন তাদের হাতে এসে পড়ব। ফলে, চিন্তা করি পরিকল্পনাটা বাতিল করে পরের দিনের জন্য তুলে রাখলে হয়ত বুদ্ধিমানের মতন কাজ হবে। আমি 'কুপ্‌লে'-তে গিয়ে ১৬ ফ্রাঁ ৮০ সেঁতিমিয়ে খরচ করে খাওয়া-দাওয়া শেষ করি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে টের পাই মাত্র ৭০ সেঁতিমিয়ে অবশিষ্ট, ফলে সেই ৭০ সেঁতিমিয়ে রাস্তার নর্দমায় ছুঁড়ে ফেলি।

তিনদিন একনাগাড়ে আমি একদম না খেয়ে, না ঘুমিয়ে বন্ধ ঘরে পড়ে থাকি। নিজেকে তখন মনে হয় অন্ধ, একটু যে জানলার কাছে যাব কিংবা বাইরের আলো ঘরে আসতে দেব তাও সাহসে কুলোয় না। শেষে, সোমবার দিন, আমার বন্ধ দরজায় কে যেন বেশ বেল বাজায়। সেই শব্দ কানে আসতেই আমি দম বন্ধ করে পড়ে থাকি। এক মিনিট বাদে, আবার বেল বাজতে থাকে। আমি আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটে-হেঁটে দরজার কাছে এসে চাবি লাগাবার ফুটোতে চোখ রাখি। ফুটো দিয়ে দেখতে পাই শুধুমাত্র এক টুকরো কালো কাপড় আর একটি বোতাম। মানুষটি আরও একবার বেল বাজায় এবং শেষে চলে যায়। আমি একদম বুঝতে পারি না কে হতে পারে। রাত্রিবেলায় ঘুমিয়ে পড়লে বেশ কিছু প্রাণবন্ত স্বপ্ন দেখতে পাই, দেখতে পাই পাম গাছ, জলস্রোত, গম্বুজের ওপর লালচে-নীল আকাশ। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় জলের ট্যাপের কাছে এসে জল খেতে থাকি বলে মোটেই তেষ্টা টের পাই না। কিন্তু নিজেকে খুব ক্ষুধার্ত বলে মনে হয়। স্বপ্নে আবার সেই বেশ্যা মেয়েটির চেহারা স্পষ্ট ভেসে ওঠে। তাকে দেখতে পাই একটি বিরাটাকৃতি প্রাসাদের ভেতর, প্রাসাদটি যে-কোনও শহর থেকে [illegible] মাইল দূরে অবস্থিত 'কসেস-নোয়া'-য় আমিই নির্মাণ করি। স্বপ্নে দেখতে পাই, মেয়েটি সম্পূর্ণ নগ্ন এবং আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও মানুষ সেখানে নেই। হাতের রিভলভারে জোর করে তাকে বাধ্য করাই আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে আর চার হাত-পায়ে সামনে ঘুরে বেড়াতে ; অবশেষে তাকে একটি থামের গায়ে বেঁধে আমার সমস্ত পরিকল্পনা, বক্তব্যকে সাধ্যমতন বোঝাবার পর গুলিতে তার শরীর ঝাঁঝরা করে দিই। কিন্তু এইসব স্বপ্ন আমাকে এত সমস্যায় ফেলে দেয় যে তখন স্বস্তি পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। স্বপ্ন ভেঙে গেলে জমাট অন্ধকারের ভিতর চুপচাপ শুয়ে থাকি, মনে হয় মাথাটি কী অসম্ভব হালকা, ফাঁকা। সকাল পাঁচটা বাজলে আমি আসবাবপত্রে ক্যাঁচর-ক্যাঁচর শব্দ করি এই

কারণে যে, এই ঘরটি ছাড়তে হলে আমি সবই বাইরে ফেলে দিতে পারি, শুধু নিজেকে ছাড়া, বাইরের চলন্ত মানুষজনের কাছে নিজেকে হাজির করতে যেন একদম সাহস হয় না।

এক সময় ভাল করে সকাল হয় অথচ আমার আর খিদে পায় না, শুধু ঘামতে থাকি : ঘামে জামা সপ-সপ করতে থাকে। বাইরে দিনের আলোয় সবকিছু ঝলমল করে। আমি মনে মনে ভাবি : "একটি বন্ধ অন্ধকার ঘরে একজন মানুষ পশুর মতন দিন কাটায়। না খেয়ে না ঘুমিয়ে মানুষটি দিব্যি তিনদিন পড়ে থাকে। দরজায় কেউ বেল বাজালে দরজাও খোলে না। অতি শীঘ্র মানুষটি রাস্তায় বেরিয়ে রিভলভার দিয়ে সমস্ত লোকজনকে হত্যা করতে শুরু করবে।"

ফলে, নিজেই নিজেকে কেমন ভয় পেতে শুরু করি। সন্ধ্যা ৬টা বাজলে, আবার আমার খিদে পায়। এদিকে প্রচণ্ড ক্রোধ, ঘৃণায় আমি উন্মাদ হই। হঠাৎ ঘরের সমস্ত আসবাবপত্রে কেমন আঘাত করতে শুরু করি, বাথরুম, রান্নাঘর এবং ঘরের সমস্ত আলো জ্বেলে গলা খুলে গান গাইতে থাকি। তারপর, হাত ধুয়ে রাস্তায় বেরিয়ে যাই। রাস্তায় এসে চিঠিপত্রগুলি একটি চিঠির বাক্সে মাত্র দু-মিনিটের মধ্যে ফেলে দিই। ভেতরে ফেলার সময় দশবার করে চিঠিগুলোকে ধাক্কা দিই যাতে ভালভাবে সেগুলি বাক্সে ঢোকে। ঢোকানোর সময় কয়েকটি খাম কুঁচকেও যায়। শেষে বুলেভার দ্যু মত্‌পাহ্‌নসে ধরে রু ওডেসার দিকে এগিয়ে যাই। বিচিত্র সেই পোশাক-বিক্রেতার কাচের জানলায় কাছে এসে যখন নিজের মুখ দেখতে পাই তখন আমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলি, "আজ রাত্রে।"

রু ওডেসার একটি বাতিস্তম্ভ থেকে কিছুটা দূরে আমি অপেক্ষা করি। দুজন মহিলা এইসময় হাত ধরাধরি করে সামনে দিয়ে হেঁটে যায়।

শান্ত, ধীর-স্থির থাকা সত্ত্বেও শরীরে ঘাম জমে। কিছুক্ষণ বাদে দেখি, তিনজন মানুষ আমার দিকে হেঁটে আসে ; আমি তাদেরও ছেড়ে দিই : আসলে আমার ছজনকে দরকার। তিনজনের ভিতর বাঁ-দিকের জন আমায় দেখে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলে আমি চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিই।

সন্ধ্যা যখন সাতটা পাঁচ, দেখি দুটি মানুষের দল একে অপরের দিকে সজাগ ও তীক্ষ্ণ নজর রেখে বুলেভার এড্‌গাহ্‌ কুইনেত থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের একটি দলে একজন পুরুষ একজন মহিলা দুটি শিশু। পেছনের দলটিতে তিনজন বৃদ্ধা। দল দুটির দিকে তাকিয়ে আমি একটু এগিয়ে যাই। আমাকে এগোতে দেখে প্রথম দলের মহিলাটি যেন বিরক্ত হয়ে ছোট ছেলের হাত নাচাতে শুরু করে। আর পুরুষটি আমাকে দেখে খুব নিচু গলায় টেনে টেনে বলে : "লোকটা ছোটলোক।"

সমস্ত কিছু দেখেটেখে আমার এত হৃদ্‌কম্প হয়, সেই কাঁপুনি যেন আমার দুই বাহুতেও ছড়িয়ে পড়ে। আমি আরও একটু এগিয়ে তাদের মুখোমুখি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। পকেটের ভিতর আমার আঙুল রিভলভারের ট্রিগারের চারপাশে ঘোরাফেরা করতে থাকে।

একসময় হঠাৎ পুরুষটি আমার সামনে লাফিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে বলে ওঠে, "আজ্ঞে।"

আমার মনে পড়ে, আমি যখন বন্ধ ঘরে একলা দিন কাটাই তখন এ ই আমাকে উত্তেজিত করে। অথচ তখন দরজা না খুললে মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যেত। এইসব চিন্তা করতে করতে দেখতে পাই, মানুষগুলি অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমি যান্ত্রিকভাবে তাদের অনুসরণ করি। অথচ আশ্চর্য, এখন এদের গুলি করতেও ইচ্ছে করছে না। মানুষগুলি বুলেভারের জনসমুদ্রে এক-সময় হারিয়ে যায়। আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। ঘড়িতে রাত আটটার শব্দ, নটার শব্দ শুনতে পাই। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রশ্ন করি, "কেন আমি এইসব মানুষকে মারতে চাই যারা আসলে মরার আগেই মৃত," এইসব প্রশ্ন করার পর জোরে জোরে হাসতে থাকি। একটা কুকুর আমার পায়ের কাছে এসে কী যেন শুঁকতে থাকে।

দীর্ঘকায় একজন মানুষ আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে আবার তাকে অনুসরণ করি। মানুষটির জামার কলার এবং ডার্বি টুপির মাঝে জেগে থাকা ঘাড়ের লালচে চামড়ার ভাঁজ স্পষ্ট দেখতে পাই। মানুষটির একটু লাফিয়ে লাফিয়ে চলার অভ্যাস এবং চলার সময় জোরে জোরে শ্বাস ফেলে, চেহারাটিও কেমন কর্কশ। আমি পকেট থেকে রিভলভারটি বার করি: রিভলভারটি কেমন ঠাণ্ডা চকচকে, রিভলভারটিকে দেখে আমার কেন যেন বিরক্তি আসে, ঠিক বুঝতে পারি না এত বিরক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন বস্তুটিকে সবসময় কাছে রেখে দিই। এইসব ভাবতে ভাবতে একবার আমি দীর্ঘকায় মানুষটির ঘাড়, আর একবার হাতে-ধরা বস্তুটিকে দেখতে থাকি। মানুষটির ঘাড়ের কোঁচকানো চামড়া এমন ভাবে জেগে থাকে যেন একটি কদর্য কুৎসিত মুখ আমার দিকে চেয়ে হাসছে। ফলে আমার বিস্ময় লাগে, আমি আবার বিরক্তিতে হাতের রিভলভারটিকে রাস্তার নর্দমায় ফেলে না দিই।

মানুষটি হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে বিরক্ত হয়ে চেয়ে থাকে। আমি ভয়ে পেছনে এসে বলে উঠি, "আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই··· ।"

লোকটা আমার কোনও কথাই শুনতে পায় না। শুধু রিভলভারটি দেখতে থাকে। আমি তবুও অস্বস্তির ভিতর বলে চলি: "···আচ্ছা কীভাবে রু দ্য লা গেটে-তে যেতে হয়?"

পরিষ্কার বুঝতে পারি মানুষটির মুখ কেমন থমথমে, এবং ঠোঁট

কাঁপতে থাকে। আমার কোনও কথার জবাব দেয় না সে। বরং জবাব না দিয়ে নিজের দু-হাত লম্বা করে ছড়িয়ে দেয়। আমি এইসময় আরও কিছুটা পিছনে সরে এসে বলি, "আমি চাই······"

একসময় বুঝি আমি ভয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছি। যদিও আমি ঠিক চাই না, তবুও মানুষটির পেটে পর পর তিনবার গুলি চালাই। গুলি খেয়ে এক অদ্ভুত বোকা চাউনি নিয়ে লোকটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, হাত বাঁ-কাঁধের কাছে ঘুরে যায়। তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়লে, আমি বলতে থাকি, "ছোট-লোক একটা, যাচ্ছেতাই ছোটলোক!"

এই কথা বলতে বলতেই আমি দৌড়নো শুরু করি। দৌড়নোর সময় লুটিয়ে-পড়া মানুষটির কাশির শব্দ কানে আসতে থাকে। তা ছাড়া শুনতে পাই রাস্তার লোকের চিৎকার-চেঁচামেচির শব্দ, পেছনে ছুটে-আসা তাদের পায়ের আওয়াজ। কে যেন আবার বলতে থাকে, "এটা কি মারামারি?" পরক্ষণেই অন্যজনের জবাব কানে আসে। সে চিৎকার করে বলতে থাকে, "খুন! খুন!" কিন্তু এইসব চিৎকার-চেঁচামেচি যে আমার বিষয় হতে পারে, তা বুঝতে পারি না। তবুও তারা আমায় একজন গুন্ডা ভেবে চিৎকার করতে থাকে, এই চিৎকার-চেঁচামেচি আমার কানে এমন ভাবে বাজতে থাকে যেন শৈশবে শোনা দমকলের সাইরেনের শব্দ শুনতে পাই। গুন্ডা তো বটেই কিছুটা হাস্যকরও বটে। আমি খুব জোরে ছুটতে থাকি, সবসময় খেয়াল রাখছিলাম কত তাড়া-তাড়ি আমার পা-দুটো আমাকে সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু পালাবার সময় আমি মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলি, ভুলকে কখনও ক্ষমা করা যায় না, সেই ভুলটি হল, রু ওডেসার দিক দিয়ে বুলেভার এডগাহ্ কুইনেত-এ না গিয়ে আমি বিপরীত দিকের রাস্তা ধরেছি, এই রাস্তাটি বুলেভার দু্য মত্‌পাহ্‌নাসের দিকে চলে গেছে। ভুলটি যখন ধরতে পারি তখন খুব দেরি হয়ে গেছে ঃ আমি ততক্ষণে জনসমুদ্রের ভিতর পড়ে গিয়েছি, ভিড়ের ভেতর সকলেই আমাকে অবাক চোখে দেখছে (আমি এখন সেই মহিলার মুখটি মনে করি যার গাল রুজে রক্তিম, মাথার সবুজ টুপি বকের সাদা পালক দিয়ে সাজানো গোছানো) এবং শুনতে পাই রু ওডেসার মূর্খরা আমার দিকে তাকিয়ে 'খুন' বলে চিৎকার করছে। ভিড়ের ভেতরের একজন হাত দিয়ে আমার কাঁধ ঝাঁকাতে থাকে। আমি বুঝতে পারি আমার মাথা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেছে। ভাবি, এমন ভিড়ের ভিতরে আমি কখনোই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে চাই না। ফলে ভিড়ের ভিতরেই রিভলভার থেকে দু-দুবার গুলি চালাই। গুলির শব্দে সমস্ত মানুষজন ভয়ে, উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে, তারপর যে যেদিকে পারে পালাতে শুরু করে। আমিও সেই সেই ফাঁকে একটি কাফেতে ঢুকে পড়ি। আমাকে পাগলের মতন দৌড়ে ঢুকতে দেখে কাফের পানরত সবাই লাফিয়ে ওঠে, কিন্তু

কেউই ধরতে সাহস পায় না। ফলে, কাফের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় গিয়ে আমি বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিই। এদিকে রিভলভারে মাত্র একটি গুলিই অবশিষ্ট।

কিছুক্ষণ বাথরুমে থাকার পরে বুঝতে পারি দম বন্ধ হয়ে আসছে, মুখ দিয়ে তখন দম নিতে থাকি। অন্য দিকে, বাথরুমের বাইরেটা কী অস্বাভাবিক রকম শান্ত, চুপচাপ। যেন সকলে ইচ্ছা করেই এমন এক পরিবেশ তৈরী করে রেখেছে। আমি চোখের সামনে রিভলভারটি তুলে নলের ছোট গর্তটিকে মন দিয়ে পরীক্ষা করতে থাকি, গর্তটি কেমন গোলাকার ও অন্ধকার ঃ এই অন্ধকার ছোট গোলাকার গর্ত দিয়েই গুলি বেরিয়ে আসতে পারে, বারুদে সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখমুখ পুড়ে যেতে পারে। আমি তাড়াতাড়ি হাতটা নিচে নামিয়ে নিই এবং চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকি। একটু বাদে শুনতে পাই, লোকজনের পায়ের শব্দ, মাটিতে পা ঘষে ঘষে শব্দ করে কে যেন ছুটে আসছে। মানুষগুলি ফিসফিস করে কী সব বলাবলি করে আবার আগের মতন চুপচাপ হয়ে যায়। আমার শ্বাস তখনও জোরে জোরে পড়ছে, এত জোরে যে মনে হয় বাথরুমের ওপার থেকে এই শব্দ সবাই শুনতে পাচ্ছে। এর মধ্যে কে একজন খুব শান্তভাবে দরজায় তালা লাগাবার হাতলে ঠকঠক করতে লাগল। এমনভাবে শব্দ করছে যে মনে হয় মানুষটি আমার রিভলভার থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য দরজার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। একবার ভাবলাম গুলি চালাই—কিন্তু, শেষ গুলিটা তো রেখে দিয়েছি নিজের জন্যে।

এক সময়, সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, "বাইরের লোকগুলো কেন অপেক্ষা করে আছে? আচ্ছা, ওরা যদি হঠাৎ এই বন্ধ দরজাটা সজোরে ধাক্কা মেরে ভেঙে দেয় তবে তো আমি নিজেকে গুলি করার সময় পাব না এবং ওরাও আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরে ফেলবে।" কিন্তু সব দেখেটেখে মনে হয়, বাইরের লোকগুলোর কোনো তাড়াহুড়োই নেই, তারা আমাকে এই পৃথিবীতে সময়মতন মরার সময়টুকু ঠিকই করে দেবে। কিংবা, হয়ত ছোটলোকগুলো ভয় পেয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ বাদে কে একজন বলে উঠল, "ঠিক আছে, শুনুন, দরজাটা খুলে দিন! আমরা কথা দিচ্ছি আপনাকে মারব না।"

বাইরেটা একদম চুপচাপ, শুধু সেই মানুষটাই আবার বলে ওঠে, "আপনি জানেন তো এখান থেকে আপনি পালাতে পারবেন না।"

আমি কথা বললাম না। দম বন্ধ হয়ে আসছিল বলে কষ্ট হচ্ছিল প্রচণ্ড। নিজেকে গুলি করার জন্য যে সাহসের দরকার সেই সাহস আনার জন্য মনে মনে বলতে থাকি, "ওরা আমাকে পেলে, নিশ্চয়ই মারতে শুরু করবে, মেরে দাঁত ভেঙে দেবে, এমনকি চোখও উপড়ে দিতে পারে।" এই সময় কেন যেন হঠাৎ

জানতে ইচ্ছা করল আমার গুলিতে সেই দীর্ঘকায় মানুষটির মৃত্যু হয়েছে কিনা। হয়ত, আমি কেবল সেই দীর্ঘকায় মানুষটিকেই মারতে চাই···অথচ, আমার আর দুটো গুলি বোধ হয় কাউকেই আঘাত করেনি·· হঠাৎ মনে হল, বাথরুমের বাইরে আমার অনুসরণকারীরা কিসের জন্য যেন তৈরী হতে শুরু করেছে, মেঝের উপর কী একটা ভারী জিনিস তারা টানতে থাকে। ভয়ে, আতঙ্কে আমিও রিভলভারের নলটি মুখে ঠেকিয়ে সজোরে ধাক্কা দিতে শুরু করি। অথচ, কিছুতেই গুলি করতে পারি না, যেন ট্রিগারের কাছে আঙুল নিয়ে যেতেই ভয় পাই। আমার চারপাশ তখন অসম্ভব স্তব্ধ হয়ে যায়।

আমিও একসময় রিভলভারটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাথরুমের দরজা খুলে বেরিয়ে আসি।

কল্পনা করুন, কল্পনা মৃত

স্যামুয়েল বেকেট (১৯০৬—)

কোথাও জীবনের কোন চিহ্ন নেই, আপনি বলবেন, মৃত তাতে কি হয়েছে, এখনও কল্পনা বেঁচে আছে। না, বেঁচে নেই, তাই, বেশ তাহলে কল্পনা করুন কল্পনা মৃত। একপলকে একটু দেখা যায় দ্বীপ, জল, হালকা নীল, নীল, তারপর সব অদৃশ্য, এ অবস্থার শেষ নেই, যাক গে। এখনও গোল ঘরটা সাদার মধ্যে পুরো সাদা। ভেতরে যাওয়ার পথ নেই, যান মাপজোপ নিয়ে দেখুন, মেঝে থেকে ধনুকের মতো বাঁকা ছাদের শীর্ষ পর্যন্ত তিন ফুট, ব্যাস তিন ফুট কখ, গঘ সমকোণে দুটি ব্যাস সাদা জমিকে দুই অর্ধবৃত্ত কখগ, খঘক-তে বিভক্ত করেছে। জমির ওপর দুটি সাদা দেহ যে যার অর্ধবৃত্তে শুয়ে আছে। বৃত্তাকার ছাদ সাদা, গোড়া থেকে ১৮ ইঞ্চি উঁচু গোলাকার দেয়ালও সাদা। বেরিয়ে আসুন, একটা সাদামাটা গোলঘর, সাদার মধ্যে সব সাদা হয়ে আছে। আবার ভেতরে গিয়ে ঠুকে দেখুন সবটাই জমাটবাঁধা শক্ত, কল্পনার হাড়ের আংটির মতোই গোলাকার। যে আলোয় সব কিছু এত সাদা তার উৎস চোখে পড়ে না। জমি, দেয়াল, গোলাকার ছাদ, দুটো শরীর সব একই সাদা, উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বল, কোথাও ছায়া পড়ছে না। প্রচণ্ড তাপ, ওপর থেকে সবকিছু তপ্ত কিন্তু দাহ নেই, শরীর দুটো ঘেমে উঠেছে। আবার বেরিয়ে আসুন, পেছনের দিকে, সেই ছোট্ট কাঠামো অদৃশ্য, উঠে পড়ুন, সাদার মধ্যে সব সাদা, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নামুন, ভেতরে ফিরে যান। শূন্যতা, নিস্তব্ধতা, উত্তাপ, শুভ্রতা, দাঁড়ান, আলো কমে যাচ্ছে, জমি, দেয়াল, গোলাকার ছাদ, শরীর সব একসঙ্গে অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে, এরকম প্রায় ২০ সেকেন্ড, ধূসর, আলো নিভে যেতে সব অদৃশ্য। একই সঙ্গে তাপও কমে আসছে। অদ্ভুত মনে হতে পারে, কিন্তু সব কালো হয়ে যাচ্ছে, তাপও নামতে নামতে হয়ত হিমাঙ্কে নেমে আসে। আবার কিছুক্ষণের অপেক্ষা। আবার মেঝে, দেয়াল, গোলছাদ, দেহ দুটি সাদা হয়ে ওঠে, তাপের সঞ্চার হয়, ২০ সেকেন্ডের মতো এরকম, নামতে শুরু করার প্রথম অবস্থায় না পৌঁছনো পর্যন্ত সব ধূসর। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, নামার শেষ আর ওঠার শুরুর মধ্যে বিরতি কম হতে পারে, বেশি সময়েরও হতে

অনুবাদ : সুব্রত সেনগুপ্ত

পারে, ফলে অপেক্ষা কম বা বেশি সময়ের। এই সময় সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ হতে পারে, আবার অন্য স্থান-কালে যা মনে হবে অনন্তকাল, তাও হওয়া সম্ভব। ওঠার শেষ আর নামার শুরু সম্পর্কেও একই কথা খাটে। যতক্ষণই স্থায়ী হক চূড়ান্ত অবস্থাটা কিন্তু একেবারে নিখুঁতভাবে স্থিতিশীল। তবে গোড়ায় তাপের ব্যবহার অদ্ভুত মনে হতে পারে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ওঠা বা নামা যে কোনো অবস্থায় থেমে পড়তে পারে। ফের শুরু বা উল্টোমুখে চলার মধ্যে আবার কম বা বেশি সময়ের বিরতি। যা উঠছিল তা নামতে থাকে। যা নামছিল তা উঠতে থাকে। এই নতুন অবস্থাটা সম্পূর্ণ হতে পারে অথবা পুরো ওঠা বা নামার আগে থেমে পড়তে পারে। ফের চলা বা উল্টো দিকে চলতে শুরু করার আগে আবার অল্পবিস্তর বিরতি। শেষ পর্যন্ত কোনো একটা চূড়ান্ত অবস্থায় না পেঁছনো পর্যন্ত এরকম চলতে থাকে। অগণ্য ছন্দের এই ওঠা-পড়ার পালাবদলের মধ্য দিয়েই সাধারণত পরিবর্তন আসে, সাদা ও তাপ পাল্টে হয় কালো ও ঠাণ্ডা অথবা উল্টোটা ঘটে। ওঠা বা নামার মাঝামাঝি যতক্ষণের বা যে ধরনের বিরতি আসুক তার ফলে কম্পনের পাশাপাশি চূড়ান্ত অবস্থার স্থিতিই বেশি চোখে পড়ে। সেই সময় ছাই বা শিসা বা দুটোর মাঝামাঝি কোনো রঙের মেঝে, দেয়াল, গোল ছাদ, দুটো শরীর কাঁপতে থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, সব মিলিয়ে এই অনিশ্চিত চলা সচরাচর দেখা যায় না। সাধারণত আলো কমতে থাকে আর তার সঙ্গে তাপও নামতে থাকে, মোটামুটি ২০ সেকেণ্ডের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার আর সেই সঙ্গে প্রায় হিমাঙ্কে অবতরণের আগে এই কমা আর নামা অব্যাহত থাকে। তাপ ও শুভ্রতায় ফেরার জন্য চলা সম্পর্কেও এ কথা বলা যায়। এর পরই বেশি দেখা যায়, জ্বরের লক্ষণাক্রান্ত ধূসরতায় একবারও উল্টোমুখে না চলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বিরতিসহ উত্থান ও পতন। কিন্তু যতই অনিশ্চয়তা থাকুক যেন দেরীতে বা তাড়াতাড়ি একটা অস্থায়ী শান্ত অবস্থা ফিরে আসার আশ্বাস পাওয়া যায়, এই মুহূর্তে আনুষঙ্গিক তাপ বা তাপহীনতায় উজ্জ্বল সাদা বা গাঢ় অন্ধকারে পৃথিবী এখনও দীর্ঘস্থায়ী প্রবল আলোড়ন প্রতিরোধ করতে পারে। এদিক থেকে দেখতে গেলে, গভীর শূন্যতার মধ্যে অলৌকিকভাবে পুনরাবিষ্কৃত সেই অনুপস্থিতি আর একইরকম নয়, অন্য কিছুও নেই। বাইরে থেকে সবই আগের মতো, চারপাশের সাদার মধ্যে সাদা মিলে থাকে। সেই ছোট কাঠামোর দেখা পাওয়াও এখন আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু ভেতরে যান, দেখবেন, এখন বিরতিগুলি কম সময়ের, এক আলোড়ন আর দুবার দেখা যাচ্ছে না। আলো আর তাপের সম্পর্ক দেখে মনে হয় দুটোর উৎস এক, উৎসের সন্ধান, অবশ্য এখনও পাওয়া যায়নি। এখনও মেঝের ওপর ত্রিভঙ্গ হয়ে আছে খ দেয়ালের দিকে মাথা, পাছা ক দেয়ালের দিকে, খগ-র মাঝামাঝি

দেয়ালের দিকে হাঁটু, গ ও ক-র মাঝামাঝি দেয়ালের দিকে পায়ের পাতা, যেন কগখ অর্ধবৃত্তে আঁকা শেষ পর্যন্ত এক নারীর সাদা শরীর, চুলের সাদা রঙ একেবারে কাঁচা না হলে মেঝের ধবধবে সাদায় সব হারিয়ে যেত। অন্য অর্ধ-বৃত্তে একইভাবে অঙ্কিত তার সঙ্গী, ক দেয়ালের দিকে মাথা, খ-র দিকে পাছা, ক এবং খ-র দিকে হাঁটু আর পায়ের পাতা ঘ ও খ-র মাঝামাঝি। দুজনেই দুজনের ডান দিকে কাত হয়ে আছে, দুজনেরই পিঠে পিঠ, পাছার দিকে মাথা। ওদের ঠোঁটের কাছে আয়না ধরলে তা বাষ্পে আবছা হয়ে উঠবে। ওদের বাঁ পায়ের হাঁটুর একটু নিচে, ডান হাতে হাতের কনুইয়ের ওপরের অংশ ধরা। উজ্জ্বল সাদা শান্তভাব এখন বিরল, যা দেখা যায় তাও ক্ষণস্থায়ী, আলোড়িত এই আলোয় খুঁটিয়ে দেখা সহজ নয়। ঘাম ও আয়না সত্ত্বেও শুধু বাঁ চোখের জন্যই এদের জড় পদার্থ ভাবা যাচ্ছে না। বারবার দুটো বাঁ চোখ খুলে যাচ্ছে, বন্ধ করা আর খোলার মাঝখানের বিরতির হিসাব করা যায় না, হঠাৎ-হঠাৎ বাঁ চোখ বড় করে অপলক তাকিয়ে থাকা, মানুষের পক্ষে এতক্ষণ পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকা বলতে গেলে অসম্ভব। গোড়ার দিকে ঐ ম্লান নীল যেন এসে বেঁধে, তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। একজনের চোখ বন্ধ হয়ে আসা আর অন্যজনের খুলে যাওয়ার সময় ১০ সেকেণ্ডের মতো মেলে। তা ছাড়া কখনও দুটো চোখ একসঙ্গে খোলা থাকে না। দুজনের একজনও মোটা নয়, রোগাও নয়, আকারে বিশেষ বড় নয় ছোটখাটোও নয়, চোখের দেখায় যতটা বোঝা যায় তাতে মনে হয় দুটো শরীর নিটোল স্বাস্থ্যপূর্ণ। দুটো মুখ যেন অখণ্ড কিছুর দুটো দিক, তাতেও জরুরী কিছুর অভাব আছে বলে মনে হয় না। যার অন্যরকম দেখার অভিজ্ঞতা আছে তাকে এদের সম্পূর্ণ স্থির হয়ে থাকা আর আলোড়িত আলোর বৈপরীত্য, গোড়ার দিকে চমকে দিতে পারে। অবশ্য কল্পনাতীত হাজার ছোট-ছোট লক্ষণ থেকে বোঝা যায় ওরা নিদ্রিত নয়। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে আর কোনো শব্দ নেই, শুধু অস্ফুট আঃ, আর সঙ্গে সঙ্গে শিকারী চোখ থেকে মৃদু কাঁপুনি গোপন করা। ঘামে গলে, ঠাণ্ডায় জমে ওরা ওখানে থাকুক, অন্য কোথাও এর চেয়ে ভাল। না, জীবনের শেষ, অন্য কোথাও কিছু নেই, শুভ্রতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সেই সাদা চিহ্ন আর কখনও খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই, কোনো দিন জানা যাবে না সেরকম বা আরও প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে, চিরকালের গাঢ় অন্ধকারে বা স্থায়ী শুভ্রতার মধ্যে তারা এখনও শায়িত কি না, আর তা না হলে কি করছে ওরা।

ব্যভিচারিণী

জানলাবন্ধ বাসে মাছিটা বেশ কয়েক মিনিট ধরে চক্রাকারে ঘুরছিল। দৃশ্যটা অদ্ভুতই বটে ; ওদিক থেকে এদিক, আর এদিক থেকে ওদিক, ক্লান্ত ডানায় নিঃশব্দে ওটা উড়ছে। একবার দৃষ্টির বাইরে চলে গিয়ে মাছিটা, জানিন দেখল, তার স্বামীর স্থির হাতের ওপর গিয়ে বসেছে। ঠাণ্ডার সময়। এক একটা বালুময় হাওয়ার ঝাপটা যেন আঁচড়ে দিচ্ছিল জানলাগুলোকে, আর কেঁপে কেঁপে উঠছিল মাছি। শীতের ভোরে কৃপণ আলোয় পেটাই ধাতু এবং কল-কব্জার আর্তনাদ তুলে গাড়িটা গড়াচ্ছিল, সামনে পিছনে ঝুঁকছিল। কিন্তু খুব যে এগোচ্ছিল তা নয়। জানিন তার স্বামীর দিকে চোখ ফেরাল। ছোট কপালের ওপর কাঁচাপাকা চুল পাতলা হয়ে এসেছে! মোটাসোটা নাক এবং থলথলে মুখ, মার্সেলকে দেখাচ্ছিল ঠোঁট ফোলান দেবমূর্তির মতো। রাস্তার গর্তে চাকা পড়ামাত্র গায়ে স্বামীর দেহের চাপ অনুভব করতে পারছিল জানিন। তারপরই তার মস্ত শরীরটার ভার ছড়ান দুই পায়ের ওপর আবার ফিরে যাচ্ছিল, আর মার্সেল হয়ে পড়ছিল মূর্তির মত স্থির, উদাসীন, শূন্য-দৃষ্টি। চওড়া লোমহীন হাতদুটি ছাড়া মার্সেলের বাকি শরীরটা যেন নির্জীব। পশমী, লম্বাহাতা গেঞ্জি চলে এসেছে কব্জী ছাড়িয়ে, ফলে হাতদুটো যেন আরও ছোট হয়ে পড়েছে। দুই হাঁটুর ফাঁকে রাখা ক্যানভাসের সুটকেস এত জোরে চেপে ধরেছিল মার্সেল, যে তার হাতদুটো যেন মাছিটার উপস্থিতি, তার থেমে থেমে চলা, কিছুই টের পাচ্ছিল না।

বাতাসের গর্জন হঠাৎ পরিষ্কার বেড়ে গেল। কিচকিচে বালুমেশান কুয়াশা বাসের চারদিকে আরও ঘন হয়ে নামল। মুঠো মুঠো বালি যেন অদৃশ্য কিছু হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছিল বাসটার দিকে। মাছিটা জমে আসা একটা পাখা ঝাঁকালে, টান টান করল পাগুলো, তারপর আবার উড়তে লাগল। বাসের গতি এত কমে এলো যে মনে হল বাস বুঝি থেমেই যাবে। কিন্তু না, বাতাস হঠাৎ পড়ে এলো, কুয়াশাও কেটে গেল একটু, গাড়িও গতিবেগ বাড়াল। ধূলিধূসরিত দিগন্তে জায়গায় জায়গায় আলো ফুটে উঠল। জানলার সামনে এক ঝলক দেখা

অনুবাদ : অরুণ বাগচী

দিয়েই দুতিনটি ক্ষীণতনু সাদাটে তালগাছ, যেন ধাতু কেটে বানানো, মুহূর্তে মিলিয়ে গেল।

"কী দেশ রে বাবা!" বললে মার্সেল।

বাসভর্তি আরব মানুষগুলো ঘুমোবার ভান করছিল। ঢিলেঢালা পোশাকে শরীর ঢাকা। সিটের উপর পা মুড়ে যারা বসেছিল তারা গাড়ির চলার বেগে দুলছিল অন্যদের চেয়ে বেশী। তাদের স্তব্ধতা, তাদের নির্জীব ভাব জানিনের মনটাকে ভারি করে তুলতে লাগল। তার মনে হল ওই সব মূক সহযাত্রীদের সঙ্গে সে যেন কত কাল ধরে চলছে। অথচ মাত্র আজ সকালেই বাস ছেড়েছে সেই স্টেশন থেকে যেখানে এসে রেললাইন শেষ। ঠান্ডা ভোরে ঘণ্টাদুয়েক ধরে বাস চলেছে প্রস্তরাকীর্ণ জনহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে। গোড়ার দিকে অন্তত মালভূমির চেহারা স্পষ্ট হয়ে ছড়িয়েছিল রক্তাভ দিগন্তের দিকে। তারপর ঝোড়ো হাওয়া উঠে সব যেন গ্রাস করে নিল। সেই মুহূর্ত থেকে যাত্রীরা আর কিছুই দেখতে পায়নি। একে একে সবার কথা বন্ধ হয়ে গেল। নিদ্রাহীন এক রাত্রির কোলে বসে তারা যেন চলছিল। গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়া বালির অত্যাচার সামলাতে কেউ ঠোঁট মুছছিল, কেউবা চোখ কচলে নিচ্ছিল।

"জানিন!"—সে চমকে উঠল স্বামীর গলা শুনে। নতুন করে তার মনে হল, আমার মতো ঢ্যাঙা আর শক্তসমর্থ মেয়ের পক্ষে ওই নামটা কত বেমানান। মার্সেল জানতে চাইল তার নমুনা রাখার বাক্সটা কোথায়। পা দিয়ে সিটের নিচের ফাঁকা জায়গাটা পরীক্ষা করতে গিয়ে কী যেন ঠেকল একটা। ওটাই নিশ্চয় বাক্সটা হবে। একটু হাঁসফাঁস না করে নিচু হওয়া তার পক্ষে শক্ত। অথচ স্কুলে জিমনাসটিক্সে প্রথম হত জানিন, দম ছিল অফুরন্ত। বহু বহু দিন আগেকার কথা সেটা? পঁচিশ বছর। তা পঁচিশ বছর এমন কী বেশী সময়? মনে হয় মাত্রই গতকাল যেন তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল, স্বাধীন জীবন যাপন করব না বিয়ে করব। এই গতকালই না তাকে উদ্বিগ্ন হতে হচ্ছিল এই কথা ভেবে যে একলা একলা থেকেই তাকে বুড়ো হতে হবে? না, নিঃসঙ্গ জীবন তাকে কাটাতে হয়নি। আইনের যে ছাত্রটি বরাবরই তাকে সঙ্গ দিতে চেয়েছে, সেই-তো বাসে তার পাশে বসে। শেষপর্যন্ত ওকেই বিয়ে করতে রাজি হল জানিন। মাথায় যদিও মার্সেল তার চেয়ে বেঁটেই হবে। তার চেরা হাসি বা একটু ঠেলে আসা কালো ড্যাবরা চোখও পছন্দসই নয়। কিন্তু এদেশবাসী আর আর ফরাসীদের মতোই জীবনের সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার সাহস মার্সেলের—সেটা ভাল লাগবেই। কোনও কিছু প্রত্যাশামত না ঘটলে, বা কোনও ব্যক্তি হতাশ করলে, মার্সেলের বিষণ্ন ভেঙে-পড়া ভাব, সেটাও ভালবাসে জানিন। সব থেকে বড় কথা হল, ভালবাসা পেতে কার না ভাল লাগে? মার্সেল তাকে ভরিয়ে রেখেছে। নিজস্ব হাজার

প্রয়োজন মেটাবার জন্যই চাই একজন স্ত্রী, সেটা বুঝতে দিয়েও জানিনকে বাস্তব জীবনের মধ্যেই রেখেছে। না, জানিন নিঃসঙ্গ নয়!

জোরালো হর্ন বাজাতে বাজাতে অদৃশ্য সব বাধা ঠেলে বাসটা এগুচ্ছিল। গাড়ির যাত্রীরা অবশ্য সবাই নিথর। জানিনের হঠাৎ খেয়াল হল, মাঝের ফাঁকটুকুর ওধারে যে সিট তাতে একটু কাত হয়ে বসে তার দিকে কেউ একদৃষ্টে চেয়ে আছে। লোকটা আরব নয়। আগে তাকে লক্ষ্য করেনি কেন ভেবে জানিন অবাক হল। লোকটার পরনে সাহারার ফরাসী সেনাদলের পোশাক, মাথায় খসখসে সুতির টুপি। টুপির নিচে বাদামী মুখ, শেয়ালের মুখের মত লম্বা আর সুঁচলো। তার ধূসর চোখ স্থির নজরে জানিনকে পরীক্ষা করছিল, গম্ভীর অপছন্দের ভাব তাতে। হঠাৎ যেন লজ্জা পেয়ে স্বামীর দিকে তাকাল জানিন। আগের মতই মার্সেল সোজা চেয়ে আছে কুয়াশা আর বাতাসের দিকে চোখ মেলে। নিজের কোটের ভেতর আরও আরাম করে গুটিয়ে বসল জানিন। ফরাসী সৈনিকটিকে সে দেখতে পাচ্ছিল কিন্তু। লম্বা আর রোগা। এতই রোগা যে তার আঁট পোশাকের ভিতর লোকটার শরীর শুখনো মুড়মুড়ে কোনও জিনিস দিয়ে তৈরি যেন, বালি আর হাড় মেশান কোনও জিনিস। তারপরই সামনের আরবগুলোর সরু সরু হাত আর রোদেপোড়ো মুখগুলো নজরে এলো। গায়ে তাদের অত জোব্বাটোব্বা, অথচ বসবার জন্য কতটা জায়গা পাচ্ছে। আর ওই একই মাপের সিটে তার স্বামী আর সে, কী রকম ঠাসাঠাসি করে বসতে হচ্ছে তাদের। কোটটা হাঁটুর ওপর টেনে দিলে জানিন। এত কিছু মোটা তো সে নয়, লম্বা এবং ভাল লাগানর মত গোলগাল। একটুখানি মোটা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আজও আছে। পুরুষ মাত্রই যে ভাবে তাকিয়ে দেখে তাকে, তাতেই দিব্যি সে বুঝতে পারে কথাটা। তার ছেলেমানুষিভরা মুখ, উজ্জ্বল সরল চোখ, এসব তার ভারী শরীর সত্ত্বেও চারদিকে উষ্ণ আমন্ত্রণ পাঠায়।

এ-যাত্রায় জানিন যা আশা করেছিল সেসব কিছুই ঘটেনি। মার্সেল যখন বলল, চল আমার সঙ্গে চল, সে আপত্তি তুলেছিল। কিছুদিন থেকেই মার্সেলের মাথায় বেরিয়ে পড়ার প্ল্যানটা ঘুরছিল—সোজা কথায় বলতে গেলে যুদ্ধ শেষ হবার পর ব্যবসাপত্র আবার স্বাভাবিক হওয়া থেকেই ঘুরছিল। আইন পড়া ছেড়েছুড়ে শুখনো জিনিসপত্রের ছোট্ট পৈতৃক ব্যবসাটা চালাতে শুরু করেছিল মার্সেল। যুদ্ধের আগে আয় মন্দ হত না, মোটামুটি ভালভাবেই সংসার চালাতে পেরেছে তারা। সমুদ্রের কাছাকাছি শহরে আস্তানা নেওয়া, তরুণ দম্পতির জীবনে সুখ বস্তুটা তেমন অলভ্য নয়। কিন্তু কায়িক শ্রম মার্সেল ঠিক পছন্দ করে না, ফলে অচিরাৎ বন্ধ হয়ে গেল জানিনকে নিয়ে সমুদ্দুরের ধারে যাওয়া। রবিবার-রবিবার বিকেলে তাদের ছোট গাড়িটা চেপে দুজনে

যেত শহরের বাইরে। বাকি সময় মার্সেল কাটাতে ভালবাসত আধা-আরব আধা-ইয়োরোপীয় অঞ্চলে সার-সার দোকানের মধ্যে তার নিজের দোকান ভর্তি বহুবর্ণ পণ্যসামগ্রীর কাছাকাছি। দোকানের ওপরতলায় তিনকামরার বাড়িতে তাদের বাস। ঘরে 'গ্যালেরি বার্বে' থেকে কেনা আসবাব এবং আরবী পর্দাটর্দা, সুতির ঢাকনি চাদর। ছেলেপুলে হয়নি তাদের। আধখোলা চিকের আড়ালে আলো আঁধারির মধ্যে এতগুলি বছর কেটে গেছে। গ্রীষ্ম-বসন্ত, সমুদ্রসৈকত, দূরে বেড়াতে যাওয়া, আকাশের দিকে চোখ মেলে ধরা—এসব অতীত কাহিনী। ব্যবসা ছাড়া কোনও দিকে আর মন নেই মার্সেলের। টাকা আয় করা ছাড়া আর কিছু তার আবেগকে উদ্দীপ্ত করে না। জানিন বুঝতে পারে, মার্সেলের এই ব্যাপারটা সে ঠিক পছন্দ করে না। কিন্তু কেন করে না সেটা সে বোঝে না। আসলে তারই তো সুবিধে হওয়া উচিত। মার্সেল মোটেই কৃপণ নয়। বেশ উদার, স্ত্রীর বেলা তো বেশী-বেশী করে উদার। "হঠাৎ যদি আমার ভাল-মন্দ কিছু ঘটেই যায়," মার্সেল বলত, "তবু তোমার অভাব কিছু হবে না। সব ব্যবস্থাই করে রেখেছি।" সত্যি কথা বলতে কি, প্রয়োজন মেটাবার সব ব্যবস্থা থাকাই তো ভাল। কিন্তু মোটা দাগের প্রয়োজনের বাইরে আর যা কিছু, সেটার ব্যবস্থা কীভাবে হয়? অনেক দিন বাদে বাদে, হঠাৎ হঠাৎ, এইরকম অস্পষ্ট ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করত' এর মধ্যে সে স্বামীকে হিসাবপত্র রাখতে সাহায্য করত, মাঝেমধ্যে দোকানে গিয়েও স্বামীর বদলে বসত। গরমের সময়টাই বড় কষ্টের। একঘেয়েমির মিষ্ট আবেশ, তারও বারোটা বাজিয়ে ছাড়ে গ্রীষ্মের হলকা।

এর মধ্যে হঠাৎ, দারুণ গরমের মধ্যেই হঠাৎ, যুদ্ধ। মার্সেলের ডাক পড়ল সেনাদলে যোগ দেবার জন্য। আবার স্বাস্থ্যের কারণে সে বাতিল হয়েও গেল। পণ্যসামগ্রীর অভাবে ব্যবসাপত্র শিকেয় উঠল। ফাঁকা রাস্তাঘাট। গরম আর গরম। এসময় সত্যি যদি মার্সেলের ভালমন্দ কিছু হয়ে যায়, তবে জানিনের কী হবে? তার জন্য কোনও ব্যবস্থাই করে যাওয়া এই অবস্থায় তো সম্ভব নয়। তাই বাজারে আবার যখন ছুটামাল আসতে শুরু করল, মার্সেল ভাবল সে নিজেই যাবে উত্তরের মালভূমি অঞ্চলে, যাবে দক্ষিণ দেশে। নিজেই মাল বিক্রি করবে আরব বণিকদের। দালালের সাহায্য নেবে না। মার্সেল স্ত্রীকে সঙ্গে নিতে ইচ্ছুক। জানিন জানত ভ্রমণটা সুখের হবে না। তায় তার নিশ্বাসের কষ্ট। বাড়িতে থেকে যাবার ইচ্ছেই তার ছিল। কিন্তু এমন জেদ তার স্বামীর, সেটা ঠেকাবার মত শক্তি তার কোথায়? তাই, এইখানে এইভাবে বাসের মধ্যে তারা বসে। কিন্তু সত্যি বলতে কি জানিন যা কিছু চিন্তা করেছিল, ঘটছে সব কিছু অন্যরকম। সে গরমে কষ্ট পাবার কথা ভেবেছিল, মাছির দঙ্গলের কথা ভেবেছিল, ভেবেছিল মশলার গন্ধভরা নোংরা সব হোটেলের কথা। কিন্তু এত

ঠাণ্ডা পাবে তা সে ভাবেনি, ভাবেনি কনকনে ঝোড়ো হাওয়ার কথা। প্রায় মেরুবৃত্তের উঁচু ডাঙার মত এই মালভূমি, হিমবাহের মুখে খসে আসা জঞ্জালের মত ওই পাথরের স্তূপ—এসব ছবি তার মনে ছিল না। তালগাছ আর নরম বালির স্বপ্ন সে বাড়ি বসে দেখেছিল। এখানে এসে এখন সে দেখছে মরুভূমি আদৌ সে রকম নয়। পাথর, পাথর, চারদিকে ছড়ান পাথরের টুকরো। আকাশময় কেবলই প্রস্তরচূর্ণ, হিমাক্ত এবং খড়খড়ে। মাটির ওপরও তাই। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শুখনো ঘাস ছাড়া আরও কিছুই গজায় না।

আচমকা বাসটা থেমে গেল। চিৎকার করে ড্রাইভার কিছু বললে, সেই ভাষায় যা সারা জীবন শুনে এসেছে জানিন, কখনও বুঝতে শেখেনি তার একটা শব্দও। "হয়েছেটা কী?" জিজ্ঞেস করলে মার্সেল। ড্রাইভার এবার ফরাসীতেই বললে, "নিশ্চয় বালু ঢুকে কারবুরেটর বন্ধ হয়ে গেছে।" ফলে মার্সেল আর একদফা শাপমন্যি দিলে দেশটাকে। খুব মজা পেয়ে হো-হো হেসে উঠল বাসচালক। জোর দিয়ে বললে যে ব্যাপার কিছুই না, কারবুরেটরটা পরিষ্কার করে দিলেই তো গাড়ি আবার চালু হবে। দরজা খুলতেই জোরাল ঠাণ্ডা বাতাস তোড়ে এসে ঢুকল, যাত্রীদের মুখে লাগল শত সহস্র বালুকণার ঝাপটা। আরবরা সব নিঃশব্দে তাদের নাক গুঁজে দিল মাথা ঢাকা জোব্বার মধ্যে, বসল আরও গুঁড়িসুঁড়ি মেরে। "দরজাটা টেনে দাও," চেঁচিয়ে উঠল মার্সেল। জোরসে হেসে উঠে দরজার কাছে আবার ফিরে এলো ড্রাইভার। ধীরেসুস্থে ড্যাশবোর্ডের তলা থেকে কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে আবার কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল। দরজা যেমন খোলা তেমনই রইল। নিশ্বাস ফেলে মার্সেল বলল, "জীবনে লোকটা কোনও ইঞ্জিন দেখেনি। আমি বলছি মিলিয়ে নিও।" জানিন বললে, "আঃ চুপ কর না!" হঠাৎ চমকে উঠল সে। রাস্তার ধারে বাস ঘেঁষে ঢিলে পোশাকে আগাপাশতলা ঢেকে—শুধু দেখা যাচ্ছে তাদের চোখগুলো—স্থির মূর্তির মত এক সারি আগন্তুক। মুখে কথা নেই, মাটি ফুঁড়ে উঠেছে যেন, তারা স্থির দৃষ্টিতে দেখছিল বাসের যাত্রীদের। মার্সেল বললে, "ভেড়া চড়ায় ওরা।"

বাসের মধ্যে নিশ্ছিদ্র নীরবতা। মাথা নিচু করে যাত্রীরা সবাই যেন একমনে শুনছিল সীমাহীন মালভূমির ওপর খোলা হাওয়ার কণ্ঠস্বর। জানিন হঠাৎই লক্ষ করল, বাসের মধ্যে মালপত্র নেই বললেই চলে। রেলপথের শেষ স্টেশনটাতে, জানিনের মনে পড়ল, তাদেরই বাক্সপ্যাটরা বাণ্ডিলটাণ্ডিল ড্রাইভারটা তুলে তুলে দিয়েছে বাসের ছাদে। ভিতরের তাক জুড়ে দেখা যাচ্ছে শুধু পাকানো লাঠি আর বাজারের থলে একগাদা। এই দক্ষিণদেশের আরবগুলো, বোঝাই যাচ্ছে, খালি হাতে ঘোরাফেরা করতে অভ্যস্ত।

বেশ ব্যস্তভাবে বাসচালক ফিরে এলো গাড়ির কাছে। তারও আপাদমস্তক

মুড়ি দেওয়া। চোখদুটো শুধু বেরিয়ে আছে আর যেন হাসছে। "এইবার আবার যাত্রা শুরু হবে," তার ঘোষণা শোনা গেল। উঠে দরজা বন্ধ করে দিতেই বাতাসের গোঙানি থেমে গেল, জোর হয়ে উঠল জানলার গায়ে বালিবৃষ্টির শব্দ। ইঞ্জিন খকখক কেশে চুপ মেরে গেল। অনেকক্ষণ বোতাম টেপাটেপির পর আবার মোটর স্টার্ট নিলে। অ্যাকসিলারেটরের ওপর চাপ দিয়ে ড্রাইভার দৌড় বাড়িয়ে নিল। হেঁচকি তুলে আবার চলতে লাগল বাসটা। গাঁওয়ার রাখালগুলোর মধ্য থেকে কেউ একজন হাত তুলল, তারপরই কুয়াশা ঢেকে দিল সবকিছু। মুহূর্তের মধ্যে বাস আবার নাচতে নাচতে চলা শুরু করল। কী খারাপ সব রাস্তা রে বাবা! আরবগুলো সব আবার হেলছে আর দুলছে। সব সত্ত্বেও চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছিল জানিনের। হঠাৎ তার সামনে—লজেন্সভর্তি হলুদ বাক্স। শেয়ালমুখো সৈন্যটা হাসছিল। ইতস্তত করে জানিন লজেন্স নিলে একটা, ধন্যবাদ দিলে তাকে। শেয়ালমুখো বাক্স ফিরিয়ে নিয়ে পকেটে পুরলে, গিলে ফেললে হাসিটাও। চোখ মেলে ধরলে সোজা, রাস্তার দিকে। মার্সেলের দিকে ফিরে জানিন দেখতে পেল তার মাংসল ঘাড়, আর কিছু নয়। জানলা দিয়ে বাইরে মার্সেল দেখছিল রাস্তার দুধারে খাড়া জমি, বাঁধের মত। কুয়াশা আরও ঘন হয়ে উঠছে তার পাশ থেকে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাত্রার পর ক্লান্তি যখন বাসের ভিতরে সব জীবনস্পন্দন স্তব্ধ করে এনেছে, তখন বাইরে হঠাৎ বিষম হট্টগোল শোনা গেল। ঢিলে জোব্বা পরা একদল বাচ্চা লাট্টুর মত ঘুরছে, লাফাচ্ছে, হাততালি দিতে দিতে বাসের সঙ্গে ছুটছে। বাসটা ততক্ষণে লম্বা রাস্তা ধরে চলা শুরু করেছে, দুদিকে নিচু নিচু বাড়ি, মরুদ্যানে ঢুকছে ওরা। বাতাস তখনও বেশ জোরাল, তবে দুদিকে দেওয়াল বালুবর্ষণ ঠেকিয়ে নিচ্ছিল। আলোও ফুটে উঠল বালির বাধা না পেয়ে। আকাশ তখনও মেঘে ঢাকা। চেঁচামেচির মাঝে, বিরাট ক্যাঁ-য়্যাঁ-য়্যাঁচ্ আওয়াজ তুলে ব্রেক কষে বাসটা অবশেষে থামল রোদে-পোড়া মাটির তৈরি গাড়িবারান্দাওলা হোটেলের সামনে। নোংরা জানলা হোটেলটার। জানিন বেরিয়ে এলো, রাস্তায় পা দিয়ে একটু টলেও গেল। বাড়ির মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল পাতলা, হলুদ রঙ্, ছোট গম্বুজ একটা। বাঁ দিকে তালগাছের সার শুরু হয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছিল সেই দিকে যায়, কিন্তু যদিও ঘড়ি অনুযায়ী এখন দুপুর, তবু কী ঠাণ্ডা কী ঠাণ্ডা! বাতাস তাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। মার্সেলের দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে জানিন দেখল সেই ফরাসী সৈন্যটা আসছে তার দিকে। আশা করেছিল, হয়তো হাসবে তাকে দেখে, অথবা স্যালুট করবে। কিন্তু তার দিকে একবারও না তাকিয়ে চলে গেল। মার্সেল ব্যস্ত ছিল, কী করে বাসের মাথা থেকে মালভর্তি কাল ট্রাঙ্কটা তাড়াতাড়ি নামান যায়। কাজটা সোজা নয়। মালপত্র সরানর দায়িত্ব একলা ড্রাইভারের। সে বেচারা বাসের

ছাদে দাঁড়িয়ে চারদিকে জমা ঢিলে পোশাকের ভিড় সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। জানিনও দাঁড়িয়ে ছিল। চারদিকে হাড়চামড়াসার মুখ, তাদের গলা থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে তাকে যেন ঘিরে ফেলতে চাইছে। হঠাৎই জানিন টের পেল কতখানি ক্লান্ত সে। মার্সেলকে বলল, "আমি ভিতরে যাচ্ছি।" মার্সেল তখন ধৈর্য হারিয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশে চেঁচাচ্ছে।

হোটেলে ঢুকল জানিন। রোগা, স্বল্পভাষী, ফরাসী ম্যানেজার অভ্যর্থনা জানাল। নিয়ে গেল তাকে তেতলার বারান্দায়, যেখান থেকে সামনের রাস্তা দেখা যায়। পেঁৗছে দিল ঘরে, যার মধ্যে মাত্রই এক লোহার খাট, সাদা এনামেল করা চেয়ার, পোশাকের খোলা আলমারি, শস্তা পর্দার পিছনে মুখ ধোবার জায়গা যার ওপর মিহি বালির স্তর। দরজা ভেজিয়ে ম্যানেজার চলে যেতে জানিন অনুভব করল ঠাণ্ডা যেন চুনকাম করা নিরাভরণ দেওয়াল ফুঁড়ে চলে আসছে। কোথায় হাতের ব্যাগ রাখবে, কোথায় নিজেকে রাখবে, সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। হয় তাকে শুয়ে পড়তে হয়, না হলে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। যাই করুক, ঠাণ্ডায় হিহি কাঁপতেই হবে। ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জানিন। তাকিয়ে রইল ছাদের কাছাকাছি ছোট জানলামত একটা ফোকর দিয়ে। অপেক্ষা করছিল সে, কিন্তু কীসের জন্য তা তার জানা ছিল না। সে ঠাহর করতে পারছিল শুধু তার একাকিত্ব, হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডা, আর বুকের কাছে বিষম ভারী একটা বোঝা। আসলে স্বপ্নের মত করে কিছু সে দেখছিল। রাস্তার আওয়াজ, মার্সেলের চিৎকার আর বকুনি, তার কানে ঠিক ঢুকছিল না। বরং সেই ফোকরের ভিতর দিয়ে সে শুনছিল এক নদীর শব্দ, তাল গাছের মধ্য দিয়ে হাওয়া বয়ে গিয়ে যে শব্দ উঠছিল, তার মনে হচ্ছিল খুবই কাছে এসে গেছে সব কিছু। তারপরে যেন বাতাসের জোর বাড়ল, জলের মৃদু মর্মর পরিণত হল ঢেউয়ের গর্জনে। জানিন কল্পনা করতে পারছিল, এই দেওয়ালগুলোর ওপারেই এক-সমুদ্র তালগাছ হু-হু বাতাসে ডানা মেলছে। খাড়া এবং নমনীয় গাছের রাশি। এসব মোটেই তার প্রত্যাশামত ঘটছে না। তবু ওই অদৃশ্য তরঙ্গগুলি তার ক্লান্ত দৃষ্টিকে যেন জুড়িয়ে দিল। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভারী শরীরের দুপাশে ঝুলছে লম্বা হাতদুটি। একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে। পুরুষ্টু তার জানু বেয়ে ঠাণ্ডার স্রোত উঠে আসছে। ওই ঋজু অথচ নমনীয় তালগাছ-গুলোর কথা সে ভাবছিল। ভাবছিল তার নিজের কথা। একদা কেমন মেয়ে সে ছিল। এই সেদিনও।

সাফসুতরো হয়ে ওরা নিচে খাবারঘরে নেমে এলো। ফাঁকা দেওয়ালে উট, খেজুর গাছ, এসব আঁকা। পিছনে ধ্যাবড়া করে গোলাপি আর ল্যাভেণ্ডার রঙ। অল্প আলো ঢুকছে বাহারে জানলা দিয়ে। হোটেল ম্যানেজারকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কথা কিছু জিজ্ঞেস করলে মার্সেল। তারপর এক বয়স্ক

আরব, পোশাকের ওপর যুদ্ধে গিয়ে বীরত্ব দেখাবার চিহ্ন ঝুলছে, তাদের খাবার পরিবেশন করলে। অন্যমনস্ক মার্সেল তার রুটিটাকে ছোট ছোট টুকরো বানিয়ে ফেলল। বউকে জল খেতে দিল না। "জল ফোটান হয়নি। মদ খাও।" জানিন খুশি হল না তাতে, মদ খেলে বড্ড ঘুম পায়। তাছাড়া খাবারের তালিকায় ছিল শুয়োরের মাংস। "ওরা শুয়োর খায় না, কারণ কোরানের মানা। কোরান যাই বলুক, ভাল করে সেদ্ধ করে নিয়ে খেলে মোটেই শরীর খারাপ করে না। কী করে রাঁধতে হয়, আমরা ফরাসীরা সেটা জানি। এত কী চিন্তা করছ তুমি?" জানিন মোটেই কোনও কিছু নিয়ে ভাবছিল না। অন্তত রাঁধুনীদের সঙ্গে পয়গম্বরদের যুদ্ধে কে হারল কে জিতল তা নিয়ে তো নয়ই! আসলে তাকে একটু তাড়াহুড়ো করতে হবে। পরদিন সকালেই তারা আরও দক্ষিণদিকে রওনা হবে। এখানকার সব বড়-বড় ব্যাপারিদের সঙ্গে আজ বিকেলেই মার্সেলের কথাবার্তা সেরে নিতে হবে।

মার্সেল বুড়ো আরবটিকে কফির জন্য তাগাদা দিতে লাগল। গম্ভীরমুখে সব শুনে বুড়ো ধীরেসুস্থে বেরিয়ে গেল। মার্সেল হেসে বললে, "এরা সকালবেলাতেও ঢিলে, আবার বিকেলেও যেন হামাগুড়ি দিয়ে কাজ করে।" যাই হোক, কফি এলো শেষ পর্যন্ত। কোনোমতে সেটা গিলে তারা বেরিয়ে গেল ধুলিধুসর রাস্তায়, ঠাণ্ডার মধ্যে। অল্পবয়সী এক আরবকে ডেকে নিল মার্সেল তাকে ট্রাঙ্কটা বইতে সাহায্য করবে বলে। তার আগে কেতামাফিক দরাদরিও করে নিল। এই বিষয়ে আর এক দফা মার্সেলের অভিমত শুনতে হল জানিনকে। যুক্তি অবশ্য তার জোরাল কিছু নয়। মার্সেলের বক্তব্য, ওরা ডবল দাবি করে বসে, যাতে অন্তত সিকি ভাগ মজুরি মেলে। খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে জানিন দুই 'বাক্সবাহীর' পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল। ভারী কোটের নিচে সে একটা পশমী জামা পরে নিয়েছিল। একটু রোগা হতে পারলে যেন ভাল হত। মাংসটা বেশ সেদ্ধ হয়েছিল, মদও খেয়েছিল অল্পই। তবু কী রকম যেন লাগছিল।

একটা ছোট বাগানের পাশ দিয়ে ওরা হাঁটছিল। গাছের গায়ে ধুলো। পথে যে আরব মানুষদের সঙ্গে মুখোমুখি হল, তারা রাস্তা ছেড়ে নেমে গেল বটে, কিন্তু জানিনদের যেন দেখতেই পায়নি, ভাব দেখাল সেরকম। আর তাদের ঢিলেঢালা পোশাক একটু গুছিয়েও নিল। জানিনের মনে হল, এখানকার মানুষ যারা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে আছে, তাদেরও ভাবভঙ্গীতে যে মর্যাদার প্রকাশ, তার নিজ শহরের আরবদের মধ্যে তা মেলে না। বড় ট্রাঙ্কটার পিছনে পিছনে যাচ্ছিল বলে ভিড়ের মধ্যেও তার সামনেটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। মাটির প্রাকার, তার গায়ে ফোটান তোরণ পেরিয়ে জানিনরা এসে পড়ল একটা ছোট স্কোয়ারের মত জায়গায়। সেখানেও ওই একই ধরনের গাছ। স্কোয়ারের অন্য কোণেও

গাছের সারি। ওইখানে চত্বরটা সবচেয়ে চওড়া। পাশাপাশি বেশ কয়েকটা সাজান-গোছান দোকান। তারা অবশ্য প্রথমেই ওদিকে না গিয়ে স্কোয়ারের মাঝখানে একটা জায়গায় গেল। কামানের গোলার খোলের মতো গড়ন সেই দোকানটার। ঘষা নীল তার রঙ। একটাই মাত্র ঘর, দরজা দিয়ে যতটুকু আলো যায় আলো বলতে ততটুকুই। চকচকে একটা কাঠের পাটাতনের অন্যদিকে সাদা-গোঁফ, বুড়ো এক আরব। ছোট বহুরঙা তিনটে গ্লাসে চা ঢালছিল বুড়ো। কেটলি একবার উঠছে, একবার নামছে। ঘরের অন্ধকার ফুঁড়ে কিছু দেখার আগেই জানিন এবং মার্সেলের নাকে এলো পুদিনার গন্ধমাখা চায়ের আঘ্রাণ। দরজা দেয়ালের অনেকটা জুড়ে ঝুলছে চাদান, কাপ ও ট্রে-র মালা, ছবিঅলা সব পোস্টকার্ড। দরজা ডিঙোতে না ডিঙোতে মার্সেল পেঁছে গেল কাউণ্টারের সামনে। জানিন দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। একটু সরেই একপেশে হয়ে দাঁড়াল, যাতে যেটুকু আলো দোকানে ঢুকছে তাও বন্ধ হয়ে না যায়। সেই মুহূর্তেই সে ঠাহর করতে পারল যে বুড়ো দোকানিটার পিছনে আছে দেয়াল ঘেঁষে রাখা পেটমোটা বস্তার ডাঁই। আর বস্তার ওপর বসে দুটো আরব তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। সাদাকালো কম্বল, শৌখিন কাজ করা চাদর সব ঝুলছে দেওয়াল থেকে। মেঝের ওপর ঠাসাঠাসি বস্তা, আর সুগন্ধী মশলাভরা ছোট ছোট বাক্স। কাউণ্টারের ওপর ঝকঝকে পিতলের দাঁড়িপাল্লা। একটা এত পুরেনো স্কেল যে তার সব দাগ উঠে গেছে। পাশে গাদাকরা মিষ্টি-রুটি। একটা রুটির খসখসে নীল মোড়ক খোলা, মাথা থেকে একটা টুকরো কেটেও নেওয়া হয়েছে। চায়ের গন্ধ ছাপিয়ে তখন নাকে আসছে উল আর মশলার গন্ধ। বুড়ো বণিক তার হাতের কেটলি নামিয়ে রেখে অভিবাদন জানাল মার্সেলদের।

মার্সেল গলা নামিয়ে এবং দ্রুত কথা বলতে শুরু করল। কেনাবেচার সময় ওইভাবে কথা বলাই তার স্বভাব। তারপর ট্রাঙ্ক খুলে সে বের করতে লাগল পশম আর রেশমের সব জিনিস। হাত দিয়ে দাঁড়িপাল্লা আর স্কেল সরিয়ে কাউণ্টারের ওপর সাজাতে লাগল সেগুলি। কথা বলতে বলতে সে উত্তেজিত হল, গলা চড়াল, নার্ভাস হয়ে হাসল জোরে জোরে ; যেন কোনও মহিলা, যে প্রভাবজাল বিস্তার করতে চায়, কিন্তু আত্মবিশ্বাস আগেই হারিয়ে বসে আছে। দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে মার্সেল তার বিক্রেতার ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করছিল। সব শুনে নিয়ে বুড়োটা মাথা নাড়ালে। চায়ের ট্রে এগিয়ে দিলে পিছনে-বসা লোকদুটোর দিকে। তারপর অল্প দু-চারটে কথা বললে, যা শুনে মার্সেলের উৎসাহ উবে গেল। তার জিনিস-টিনিস তুলে নিয়ে ট্রাঙ্কে সাজিয়ে ফেলল সে। কপাল থেকে কল্পিত ঘামের ফোঁটাও মুছে ফেলল। মুটেটাকে ডেকে নিয়ে এবার চলল সার-সার দোকানগুলোর দিকে। প্রথম

দোকানের মালিকটার ভাবসাবও রাজাগজার মত। তবে মার্সেলের অদৃষ্টে কিছু ব্যবসা জুটল। মার্সেল বললে, "ব্যাটারা এমন মেজাজ দেখাচ্ছে যেন দেবতা নেমে এলেন! অবশ্য ওরাও তো ব্যবসায়ী। সবারই সময়টা এখন খারাপ যাচ্ছে।"

কোনও কথা না বলে জানিন তাদের অনুসরণ করতে লাগল। দমকা বাতাস বন্ধ হয়েছে। আকাশও একটু-একটু পরিষ্কার হতে আরম্ভ করেছে। ঘন মেঘের মাঝে মাঝে ফাঁক, সেখান দিয়ে চড়া আলো আসছে। চড়া এবং ঠাণ্ডা। স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে ওরা হাঁটছে সরু রাস্তা দিয়ে। পাশে মাটির দেওয়াল। সেখান থেকে ঝুলছে হতশ্রী গোলাপ। মাঝে মাঝে শুখনো, পোকায় ভরা, বেদানা। বাতাসে ধুলো আর কফির গন্ধ। খড়ির উনুনের ধোঁয়া। পাথর আর ভেড়ার গন্ধে এলাকাটা ভরপুর। দেয়ালের গা কেটে সব দোকান। বেশ দূরে দূরে। জানিন বুঝতে পারছিল তার পা ভারী হয়ে আসছে। কিন্তু তার স্বামীর মন ক্রমেই প্রফুল্ল হয়ে উঠছিল। তার বিক্রি বাড়ছিল, সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা উদারতাও বাড়ছিল। জানিনকে সে 'সোনামণি' বলে ডাকতে শুরু করেছিল। বলছিল যে যাত্রাটা তাহলে মাঠে মারা যাবে না। যন্ত্রচালিতের মত বললে জানিন, "তা তো বটেই। নিজেই সরাসরি মাল বিক্রি করাটাই তো ভাল!"

অন্য একটা পথ ধরে তারা আবার স্কোয়ারের মাঝখানে এসে পেঁছল। বিকেল ফুরোয়-ফুরোয়। আকাশ প্রায় নির্মল হয়ে এসেছে। মার্সেল হাতে হাত ঘষছিল। তাদের সামনে রাখা ট্রাঙ্কটার দিকে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। জানিন বললে, "দেখো দেখো!" স্কোয়ারের অন্য প্রান্ত থেকে লম্বা, রোগা, টগবগে এক আরব আসছে। পরনে আকাশী-নীল ঢিলে পোশাক। পায়ে নরম বাদামী বুটজুতো। হাতে দস্তানা। তার খড়্গ-নাসা তামাটে মুখে গভীর অহঙ্কার। জানিনের মনে হল দিশি লোকদের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ফরাসী অফিসার, যাদের কারও কারও প্রতি কখনও বা মনে মনে একটা আকর্ষণ অনুভব করেছে সে, আর এই আরব মানুষটির মধ্যে কোনই ফারাক খুঁজে পাওয়া যেত না, যদি না সে মাথায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পাগড়ির মত বস্তুটা পরে থাকত। সোজা সে মার্সেলদের দিকেই চলে আসছিল, কিন্তু তাকিয়ে ছিল যেন তাদের ভেদ করে দূরে। হাত থেকে ধীরেসুস্থে একটা দস্তানাও খুলে ফেলল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে মার্সেল বললে—"লোকটার ধারণা ও হল একজন জেনারেল।" কথাটা মিথ্যে নয়, এখানকার মানুষরা সবাই বেশ অহঙ্কারী। অবশ্য এই লোকটা কিছু বাড়াবাড়িই করছিল। চারদিকে এত ফাঁকা জায়গা। অথচ লোকটা সোজা আসছিল ট্রাঙ্কটার দিকেই। যেন দেখতে পাচ্ছিল না বাক্সটাকে। অথবা তাদের কাউকে। দূরত্ব কমতে কমতে আরবটা একেবারে তাদের ওপর এসে পড়ে আর

কি! একেবারে শেষ মুহূর্তে হঠাৎ হাতল ধরে টেনে ট্রাংকটাকে সরিয়ে দিল মার্সেল। যেন কিছুই দেখতে পায়নি এমনভাবে একই ভঙ্গিতে হেঁটে আরব মানুষটি চলে গেল দুর্গের উঁচু প্রাকারের দিকে। জানিন তাকাল স্বামীর দিকে। যুদ্ধে হেরে যাওয়া সৈন্যের মত তার চেহারা। মুখে মার্সেল বললে, "ওদের ধারণা, এখন যা খুশি করার অধিকার ওরা পেয়ে গেছে।" কিছু বললে না জানিন। লোকটার নির্বোধ ঔদ্ধত্যকে ঘৃণা করতে গিয়ে বড় অসুখী বোধ করল সে। ইচ্ছে হচ্ছিল এখুনি কোথাও চলে যায়। নিজের ছোট ফ্ল্যাটের কথা মনে পড়ল তার। হোটেলের সেই হিমশীতল ঘরে ফিরে যাবার কথা মনে হতেই কেমন দমে গেল জানিন। তার মনে পড়ল হোটেলের ম্যানেজার পরামর্শ দিয়েছিল দুর্গের ওপরে বারান্দায় উঠে মরুভূমির দৃশ্য দেখতে। মার্সেলকে কথাটা বলল জানিন। ট্রাংকটা হোটেলে রেখে দিব্যি যাওয়া যেতে পারে। মার্সেল ক্লান্ত বোধ করছিল। তার ইচ্ছে ডিনারের আগে একটু ঘুমিয়ে নেয়। কিন্তু স্ত্রীর আগ্রহ দেখে সে রাজি হয়ে গেল। "ঠিক আছে। যা তুমি বলবে।"

হোটেলের সামনে রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগল জানিন। সাদা আলখাল্লা পরা আরবদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল। একজন মহিলাও সেই ভিড়ে নেই। জানিনের মনে হল একসঙ্গে এতগুলি পুরুষমানুষ সে কখনও দেখেনি। তার দিকে কিন্তু কেউ চেয়েও দেখল না। কেউ কেউ তাকাল বটে, কিন্তু তাদের চোখে জানিন যেন পড়লই না। সরু তামাটে মুখগুলো, যেন সব একই ছাঁচের। বাসের সেই ফরাসী সৈন্য বা দস্তানাপরা আরবটার মুখের মত ধূর্ত এবং গর্বিত। সেই মুখ তারা ফেরাল এক বিদেশিনীর দিকে, কিন্তু তাকে দেখলই না। নিঃশব্দে লঘুচরণে তারা জানিনের চারপাশে চলাফেরা করল। জানিন দাঁড়িয়ে রইল ফোলা পা নিয়ে। তার অস্বস্তি বাড়তে লাগল। তার কোথাও চলে যাবার ইচ্ছে বাড়তে লাগল। "কেন এলাম, কেন এলাম?" ভাবতে ভাবতেই মার্সেল বেরিয়ে এলো।

দুর্গের সিঁড়ি বেয়ে যখন তারা উঠছিল ঘড়িতে তখন বিকেল পাঁচটা। জোরাল হাওয়াটা একেবারে থেমে গেছে। আকাশ পরিষ্কার, নীলাভ সবুজ ফুলের মতই তার রঙ। ঠাণ্ডাটা এখন আরও শুখনো। গালে জ্বলুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল। আদ্দেকটা ওঠবার পর এক আরবের দেখা মিলল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে। মুখে সে বলল, "গাইড চাই?" কিন্তু নড়ল না এক বিন্দু। যেন জানেই কী উত্তর পাবে। সিঁড়িগুলো লম্বা এবং খাড়া। মাঝে মাঝেই বিশ্রাম নেবার জায়গা। যতই ওরা উঠতে লাগল, চারদিকে দৃষ্টিসীমা বেড়ে চলল। ঠাণ্ডা, শুখনো, বিস্তীর্ণতর আলোর মধ্যে ওরা এলো। মরুদ্যানের প্রতিটি শব্দ, বিশুদ্ধ এবং স্পষ্ট হয়ে তাদের কাছে পৌঁছতে লাগল। তাদের ঘিরে দীপ্ত বাতাস তরঙ্গ তুলছিল। সেই তরঙ্গ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল, যেমন তারা এগুচ্ছে

লাগল। যেন তাদের অগ্রগতি আলোকের স্ফটিকে আঘাত করে এমনই এক শব্দতরঙ্গ তুলেছে যা ক্রমাগত বড় হয়ে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আর ওরা যখন ওপরের অলিন্দে এসে দাঁড়াল, ওদের দৃষ্টি হারিয়ে গেল তাল খেজুরের মাথার ওপর দিয়ে বিশাল দিগন্তের দিকে, জানিনের মনে হল সমস্ত আকাশ এক সংক্ষিপ্ত তানে, তীব্র সুরে গেয়ে উঠল। তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল ব্রহ্মময়। তারপর হঠাৎ সব শব্দ স্তব্ধ হল। দাঁড় করিয়ে দিল জানিনকে, সীমাহীন এক বিস্তৃতির মুখোমুখি।

পূর্ব থেকে পশ্চিমে, ধীরভাবে সে চোখ বুলিয়ে গেল নিটোল এক বর্তুলে, কোনও কিছুতে ব্যাহত হল না তার দৃষ্টি। তার নিচে, আরব্য জনপদের নীল আর সাদা সব বারান্দায় চত্বরে কেমন মেশামেশি। এখানে ওখানে টকটকে লাল লঙ্কা শুখোতে দেওয়া কখনকার রোদ্দুরে। একটিও জনমনুষ্য নজরে আসছে না। কিন্তু বাড়ির ভিতরকার আঙিনা থেকে ভাজা কফির গন্ধের পাশাপাশি উঠছে হাসি, কণ্ঠস্বর, দুর্বোধ্য কোনও তাগিদে জমিতে পা ঠোকার শব্দ। দূরে তালকুঞ্জ, ছোট বড় ফাঁকা জায়গায় আর মাটির দেওয়ালের পাশে পাশে। বাতাসে তাদের পাতা ডাল নড়ছে, জানিনরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে সেই বাতাস এসে সাড়া জাগাচ্ছে না। আরও দূরে, সেই দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হালকা হলুদ-বাদামী-ধূসর নুড়ি পাথরের এক সাম্রাজ্য যেখানে জীবনের কোনও চিহ্নই দৃশ্যমান নয়। মরূদ্যান থেকে কিছু দূরে অবশ্য চওড়া কালো কয়েকটা তাঁবু দেখা যাচ্ছিল, পশ্চিমের তালকুঞ্জ ঘেঁষে শুখনো পাথুরে নদীখাতের পাশে। কাছাকাছি স্থাণুর মত একপাল উট। এত দূরে থেকে খুব ছোট্ট খেলনার মত দেখাচ্ছে, ধূসর জমির ওপর কালো হরফে অপরিচিত হস্তাক্ষর যেন, যার অর্থ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। মরুভূমির ওপর বিরাট বিশাল নৈঃশব্দ্য, বিস্তৃত মহাকাশের মতই।

বারান্দার রেলিঙের ওপর সারা শরীরের ভর রেখে জানিন নির্বাক দাঁড়িয়ে। তার সামনে মেলে রাখা শূন্যতার আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছিল না সে। পাশে দাঁড়িয়ে উসখুস করছিল মার্সেল। তার শীত করছিল। সে চাইছিল ফিরে যেতে। এখানে দেখবার আছেটা কী, অ্যাঁ? কিন্তু জানিন—জানিন দিগন্তের দিক থেকে চোখ সরাতেই পারছিল না। দূরে, দক্ষিণ দিগন্ত পেরিয়ে, যেখানে আকাশ আর পৃথিবী মিশেছে এসে বিশুদ্ধ এক সরলরেখায়, সেইখানে কিছু যেন তারই জন্য অপেক্ষা করে আছে! এমন কিছু, যা থেকে এই দীর্ঘ সময় সে বঞ্চিত হয়ে আছে, যে অভাবের বোধ এই মুহূর্তের আগে তার ছিলই না। বিকেল গড়িয়ে আলো সহনীয় কোমল হয়ে এসেছে। স্ফটিকের কাঠিন্য হয়ে উঠছে তরল। একই সঙ্গে, এক রমণীর হৃদয়ে যত গিঁট বেঁধে দিয়েছে এতগুলি বছর, সংসারের অভ্যাস আর একঘেয়েমি, সবই যেন আচমকা

বিনা প্রস্তুতিতে আলগা হয়ে পড়ছে। যাযাবরদের তাঁবুর দিকে সে চেয়ে রইল। ওই লোকগুলোকে সে দেখতে পাচ্ছে না, কালো তাঁবুর মধ্যে কিছুই নড়াচড়া করছে না। তবু ওদের কথাই জানিন ভাবতে পারছে, যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কেই বলতে গেলে ওর কোনও ধারণা ছিল না এতদিন। গৃহহীন ওই লোকগুলো, চেনা পৃথিবীর বাইরে এই বিরাট খোলা মরুভূমি জুড়ে ওদের চলাফেরা। ভাবলে মাথা ঘুরে যায় এমন বিস্তীর্ণ মরুভূমি, হাজার-হাজার মাইল দক্ষিণে নেমে যা শেষ হয়েছে কোন অরণ্যের দরবারে, যেখানে অবশেষে একটা নদী জল বইবার দায় মেটাচ্ছে। সেই আদিকাল থেকে অস্থিমজ্জায় নিরার্দ্র এক পৃথিবীর অন্তহীন অঙ্গনে ওই কয়েকটি মানুষ নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ। ওদের কিছুই নেই, কিন্তু ওরা কারও ক্রীতদাসও নয়। পরম দরিদ্র হয়েও ওরা এক আশ্চর্য জগতের মালিক। জানিন বুঝতে পারল না এই চিন্তাটা কেন তাকে এতখানি সুমিষ্ট বেদনার রসে ভরিয়ে দিচ্ছে, এমন ভাবে যে তার চোখ বুজে আসছে। সে অনুভব করতে পারছিল যে অনন্ত কাল ধরে এই রাজত্বটাই তার পাবার কথা ছিল, কিন্তু কখনই তার তা হয়নি। আর কোনও দিন হবেও না। এই পলায়নপর কয়েকটি লহমা হয়তো তাকে সেই প্রাপ্তি এনে দিল, এনে দিচ্ছে যতক্ষণ সে চোখ মুদে আছে। যতক্ষণ আকাশ স্তব্ধ, আলোর তরঙ্গ গতিহীন, নিচের শহর থেকে সব আওয়াজ যতক্ষণ থেমে আছে। তার মনে হল মহাশূন্যে পৃথিবীটাই যেন থেমে আছে। এই মুহূর্তে কারও বয়স বাড়ছে না, মরবে না কেউ আর। সর্বত্র, এর পর, জীবনধারা রুদ্ধস্রোত। শুধু তার আপন হৃদয় বড় সজীব। সেখানে বসে যন্ত্রণায় কেউ কাঁদছে, বিস্ময়ে ঝরছে কারও চোখের জল।

আলো আবার গতিময় হল। উত্তাপহীন এবং বাধামুক্ত সূর্য চলে পড়ল পশ্চিমের দিকে। ঈষৎ গোলাপী হল ওই দিকের আকাশ। আর পূব দিকে ঘন হতে লাগল ছাইরঙ একটা ঢেউ, দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ার জন্য। সন্ধ্যার প্রথম কুকুরটি ডেকে উঠল। আরও ঠাণ্ডা হয়ে আসা বাতাসে দূরের সেই ডাক ভেসে এলো। হঠাৎই জানিনের খেয়াল হল যে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে! "আর কিছুক্ষণ থাকলে ঠাণ্ডা লেগে দুজনেই মরব।" মার্সেল বলল। "আর বোকামি কোরো না, চলো ফিরে যাই।" বলল বটে, তবে স্ত্রীর হাতটা ধরল যেন সংকোচের সঙ্গে। স্বামীর পিছনে আজ্ঞাবাহী স্ত্রীর মতই জানিন রেলিং ছেড়ে চলে এলো। তেমনই নিশ্চল, বুড়ো আরবটা, সিঁড়ির মুখ থেকে দেখল তাদের নেমে যেতে। জানিন হাঁটছিল, কাউকেই দেখতে পাচ্ছিল না। হঠাৎ ভয়ংকর ক্লান্ত, ঝুঁকে পড়ে অসহ্যভার শরীর টেনে টেনে চলছিল। কিছুক্ষণ আগেকার সেই উদ্দীপনা এখন অবসিত। যে পৃথিবীতে সে প্রবেশ করেছে তার পক্ষে জানিন যেন বড্ড বেশী ঢ্যাঙা, বেশী মোটা, বড় বেশী সাদা তার

চামড়ার রঙ। এই পৃথিবীতে সহজ নীরবতায় চলতে পারে এই শিশু, ওই মেয়েটি, সতর্কচরণ শেয়ালটা। এই পৃথিবীতে এর পর আর তো কিছু করার নেই জানিনের। নিজেকে টেনেটুনে ঘুমের দিকে, মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া?

সত্যি বলতে কী, অনিচ্ছুক পায়েই জানিন এলো রেস্তারাঁয়। হঠাৎই চুপ করে গিয়েছিল মার্সেল। নিজের প্রচণ্ড ক্লান্তি ঘোষণা করা ছাড়া আর তার বলার কিছু ছিল না। ভিতরে ভিতরে জ্বরের ভাব টের পাচ্ছিল জানিন। দুর্বল ভঙ্গিতে লড়াই করছিল সর্দির বিরুদ্ধে। তারপর নিজেকে সে টেনে নিয়ে গেল বিছানায়। মার্সেল এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুই চাইল না স্ত্রীর কাছে। হোটেলের ঘরটাই যেন বন্ধ্যা, নিরুত্তাপ। জানিন অনুভব করছিল, বাইরে থেকে শীত চেপে ধরছে তাকে আর জ্বর উঠে আসছে ভিতর থেকে। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল তার। রক্তস্রোত বইছিল, কিন্তু তার গাটা গরম করে দিতে পারছিল না। একটা ভয় গড়ে উঠল তার মনে। সে পাশ ফিরল, আর লোহার খাটটা তার ভারে মচমচিয়ে উঠল। না, অসুস্থ হয়ে পড়াটা সে চায় না। তার স্বামী ঘুমোচ্ছে; তাকেও ঘুমিয়ে পড়তে হবে; ঘুমোনো বিষম দরকার। জানলার ফাঁক দিয়ে শহরের চাপা সব আওয়াজ আসছিল। আসছিল ভেসে মুসলমানী কাফেগুলো থেকে পুরানো গ্রামোফোনে বাজানো কিঞ্চিৎ অনুনাসিক, ভাসা-ভাসা ভাবে চেনা গান। তাকে ঘুমোতেই হবে। কিন্তু সে গুনে চলেছে কালো কালো তাঁবু। তার চোখের পাতার আড়ালে নিশ্চল উটেরা চরছিল। বিরাট একাকিত্ব পাক খাচ্ছিল তার অন্দরমহলে। কেন এখানে সে এসেছে, বল তো কেন? ওই প্রশ্নটা উদ্যত রেখে ঘুমিয়ে পড়ল জানিন।

একটু বাদেই সে জেগে উঠল। তাকে ঘিরে নিশ্ছিদ্র এক নীরবতা। কিন্তু শহরের উপান্তে নিস্তব্ধ রাত্রি ছিঁড়েখুঁড়ে গলাভাঙা কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করছিল। কেঁপে উঠে জানিন পাশ ফিরতেই ছোঁয়া পেল স্বামীর বলিষ্ঠ শরীরের। আধোঘুমের মধ্যে সে ওই পিঠে মুখ গুঁজে শুল গুটিসুটি মেরে। ঘুমের ওপর ওপর ভাসছিল জানিন, কিছুতেই ডুবে যেতে পারছিল না। স্বামীর পিঠ আঁকড়ে ধরল এমনভাবে যেন ওটাই তার সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। কথা বলছিল সে, কিন্তু মুখে কোনও শব্দ নেই। কথা বলছিল, কিন্তু নিজেই ঠিক শুনতে পাচ্ছিল না কী সে বলছে। মার্সেলের শরীরের উত্তাপ সে টের পাচ্ছিল কেবল। বিশ বছরের ওপর প্রতিটি রাত্রে এইভাবে শুধু তারা দুজনে, স্বামীর উত্তাপে, অসুস্থ অবস্থায় অথবা বেড়াতে গিয়ে, যেমন এইবার····তা ছাড়া বাড়িতে একলা থেকে কী সে করত? বাচ্চাকাচ্চা নেই একটাও। আসলে ওটাই তো তার খামতি, তাই নয় কি? কে জানে! সে মার্সেলের কথা মেনে চলেছে, এই আনন্দে যে, কেউ তাকে চায়। এটা জেনেই জানিন খুশী যে তার

প্রয়োজন আছে। হতে পারে মার্সেল তাকে ভালবাসে না। প্রেম, এমনকি ঘৃণায় ভরপুর হলেও, প্রেমের চেহারাটাই আলাদা। ঠিক কী রকম মুখের চেহারা মার্সেলের? তাদের দেহমিলন ঘটে অন্ধকারে, পরস্পরকে অনুভব করে। কেউ কাউকে না দেখে। এমন কি কোনও মিলন আছে যা দিনের আলোয় স্ফুরিত হয়, যা রাত্রির জন্য নয়? জানিন তা জানে না। সে এটুকু জানে যে মার্সেলের প্রয়োজন আছে তাকে। আর মার্সেলের ওই চাওয়াটাই তার প্রয়োজন। দিনে-রাত্রে ওই চাওয়াটাই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বিশেষত রাত্রে, প্রতি রাত্রে, যখন মার্সেল একা থাকতে চায় না, চায় না বুড়ো হতে বা মরে যেতে। তখন তার মুখের সেই ভাব, যা কখনও কখনও অন্য পুরুষের মুখেও জানিন দেখেছে, সবারই মুখের সেই সাধারণ ভঙ্গি, সব পাগলের যারা জ্ঞানী সেজে থাকে, যতক্ষণ না সেই পাগলামি ছুঁড়ে দেয় তাদের কোনও রমণীদেহের দিকে, অসহায় ভাবে নিমজ্জিত হবার জন্য, বাসনা-কামনা ছাড়াই। সমস্তটাই বড় ভয়ের, একাকিত্ব আর রাত্রি যা তাদের সামনে সাজিয়ে দেয়।

মার্সেল একটু নড়ে উঠল, যেন তার থেকে দূরে সরে যাবে। না, মার্সেল তাকে সত্যি ভালবাসা বাসে না। যতটা সে নয়, তাকেই ভয় পায় মার্সেল। অনেক আগেই আলাদা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল তাদের, আলাদা হয়ে শেষ রাত্রি পর্যন্ত একলাই শোওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একলা কে ঘুমোতে পারে? কিছু পুরুষ পারে, পেশাগত কারণে যাদের আলাদা থাকতে হয়, অথবা দুর্ভাগ্যবশত। যারা প্রতিরাত্রে একই বিছানায় ঘুমোতে যায়, মৃত্যুর মতই। মার্সেল কখনই তা পারত না। বিশেষত মার্সেল, দুর্বল এবং অসহায় এক শিশুর মত সর্বদাই যে যন্ত্রণা পাবে বলে ভীত হয়ে থাকে। জানিনের নিজের ছেলের মতই তার চাহিদা, এই মুহূর্তে যে ভয় পেয়ে কাতরোক্তি করে উঠল। আরও কাছে সরে গেল জানিন, আরও জড়িয়ে শুল, হাত রাখল স্বামীর বুকের ওপর। সেই নামে ডাকল চুপিচুপি, ভালবাসার গোপন সেই নাম ধরে। এখনও মাঝে মাঝেই যে নাম ধরে তারা পরস্পরকে ডাকে। কী বলছে সেটা একেবারেই চিন্তা পর্যন্ত না করে।

হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে জানিন ডাক পাঠাল তার আপন মানুষটিকে। আসলে তারও তো প্রয়োজন ওই পুরুষটিকে, ওই মানুষটির শক্তি খামখেয়াল সব নিয়ে। মরণকে তারও তো ভয়। "যদি ওই ভয়টাকে জয় করতে পারতাম, তাহলে হয়তো সুখশান্তি মিলত"—এইরকম একটা চিন্তা তার মাথায় খেলে যেতেই নামহীন এক বেদনা জানিনকে গ্রাস করল। সরে এলো সে মার্সেলের কাছ থেকে। এইভাবে কিছুকেই কি সে হারিয়ে দিতে পারে? না, না! সুখী সে হতে পারবে না। সত্যি সত্যি মরতে তাকে হবেই। কিন্তু মৃত্যুর আগে মুক্ত হওয়া—সেটা ঘটবে না। বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণার অনুভূতি। বিরাট এক

বোঝা, যে বোঝা সে বিশ বছর ধরে বয়ে চলেছে, তার দম বন্ধ করে দিচ্ছিল। এইবার, এতদিনে তাকে লড়তে হবে। সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের ওপর থেকে হটিয়ে দিতে হবে ওই ভার। মার্সেল থাকুক না থাকুক, অন্যেরা থাকুক যাক, তাকে মুক্তি পেতেই হবে। পুরোপুরি জেগে গিয়ে জানিন বিছানায় উঠে বসল। খুব কাছ থেকে কেউ যেন তাকে ডাকছে। কান পেতে যদিও সে কেবলই শুনতে পেল রাত্রির সীমান্ত থেকে মরূদ্যানের শ্রান্ত অথচ অদম্য কুকুরগুলো ডেকেই চলেছে। অল্প-অল্প বাতাস উঠেছে, আস্তে ঢেউ তুলছে তালকুঞ্জে। বাতাস বইছে দক্ষিণ দিক থেকে, যেখানে মরুভূমি আর রাত্রি চিরন্তন আকাশে গিয়ে মিলেছে। যেখানে জীবন থেমে গেছে। যেখানে কেউ আর বুড়োও হবে না মরবেও না কেউ। তারপর বাতাস যে ঢেউ দিচ্ছিল তা আবার থেমে গেল। যা এতক্ষণ শুনেছে, তা আদৌ শুনেছে কি না সেই সংশয় মনে এলো। একটা নিঃশব্দ আহ্বান অবশ্য জানিন শুনতে পাচ্ছিল। ইচ্ছে করলে ওই আহ্বান থামিয়ে দেওয়া যায়, লক্ষ্য করাও চলে ইচ্ছে হলে। কিন্তু এখুনি, এই মুহূর্তে যদি তাতে সাড়া না দেয় জানিন, তবে আর কখনই ওই ডাকের মানে বোঝা যাবে না। এই মুহূর্তে এখনই—অন্তত ওইটুকু নিশ্চিত সত্য।

আস্তে সে বিছানা ছাড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়াল খাটের পাশে। স্বামীর নিশ্বাস পড়ছে। শুনল। মার্সেল ঘুমোচ্ছে। পরমুহূর্তেই বিছানার উত্তাপ শরীর থেকে চলে গেল। জড়িয়ে ধরল শীত। আস্তে ধীরে পোশাক পরে নিল জানিন। জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে আসা মৃদু আলোতে হাতড়ে হাতড়ে। হাতে জুতো নিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছল। অন্ধকারে চুপ করে একটুখানি দাঁড়াল। তারপর শব্দ না করে দরজাটা খুলল। হাতলে আওয়াজ হতেই সে যেন পাথর হয়ে গেল। ধক্ ধক্ বুকের মধ্যে শব্দ। কানখাড়া রেখে টানটান শরীর দিয়ে সে শুনতে চেষ্টা করল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে হাতলটা পুরো ঘোরাল। অনন্ত-কাল খরচ হয়ে গেল ওই সামান্য কাজে। অবশেষে দরজা খুলে সে বাইরে বের হল। আবার সমান সাবধানতায় আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে। কাঠের গায়ে গাল পেতে সে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। একটু বাদেই শুনতে পেল ঘুমন্ত মার্সেলের নিশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা। মুখ ফেরাতেই পেল হিমশীতল বাতাসের ছোঁয়া। এক দৌড়ে পার হয়ে গেল সে লম্বা বারান্দাটা। বাইরের দোরটাও বন্ধ। খিল খুলছে, সিঁড়ির ওপর ঘুমকাতর চোখে রাত্রির পাহারাদার এসে দাঁড়াল। আরবী ভাষায় কী যেন বললে তাকে। "আমি এখুনি ফিরে আসছি" —বলেই জানিন বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাড়ির ওপর, তালগাছগুলোর ওপর কালো আকাশ থেকে তারার মালা সব ঝুলছে। এখন একেবারে ফাঁকা ছোট রাস্তাটা ধরে জানিন ছুটে চলল দুর্গের দিকে। বাধা দেবার জন্য সূর্য তো আর ছিল না, ফলে ঢালাও ঠাণ্ডা আক্রমণ

করেছে রাত্রিকে। বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়া যেন পুড়িয়ে দিচ্ছিল তার ফুসফুসকে। তবু প্রায় অন্ধের মত অন্ধকারে সে দৌড়তে লাগল। রাস্তার মোড়ে অবশ্য আলোর দেখা মিলল। এঁকেবেঁকে আলোটা নামছিল তার দিকে। দাঁড়িয়ে গেল সে। দেখল আলোটা বাড়ছে। তার পিছনে দেখা যাচ্ছে ঘুরন্ত চাকা। একটু পরে স্পষ্ট হল চলন্ত হালকা সাইকেল আর আরোহীর বিরাট ঢোলা পোশাক। সেই জোব্বার ছোঁয়া লাগল তার শরীরে। তারপর অন্ধকারে তিনটে লাল আলো। তারপর সবই একসঙ্গে মিলিয়ে গেল। আবার দৌড়তে শুরু করল জানিন দুর্গের দিকে। সিঁড়ি দিয়ে আধাআধি ওঠার পর বাতাস এত ঠাণ্ডা, বুক পুড়িয়ে দিচ্ছিল তার। ইচ্ছে হল ওইখানেই থেমে যায়। শরীরের সব শক্তি শেষবারের মত সংগ্রহ করে জানিন উঠে এল ওপরের ছাদে। রেলিংটা চেপে ধরল তার তলপেট। হাঁপাচ্ছিল সে, চোখের সামনে সব ঝাপসা। এতটা দৌড়ে এসেছে, তবু গরম হয়নি শরীর। এখনও কাঁপছিল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। হাঁ করে জোরে জোরে ঠাণ্ডা বাতাস ফুসফুসে ভরে নিচ্ছিল সে। একটু একটু সহজ হয়ে এলো শ্বাসপ্রশ্বাস। কাঁপুনি সত্ত্বেও অল্প একটু উত্তাপ গড়ে উঠল ভিতরে ভিতরে। ধীরে চোখ খুলে জানিন দেখলে সামনে বিস্তৃত উদার অপার সেই রাত্রি।

কেউ নিশ্বাস ফেলছে না, কোনও শব্দ নেই। মাঝে মাঝে কেবল চাপা আওয়াজ, পাথর প্রবল ঠাণ্ডার চাপে গুঁড়ো হয়ে বালুকণায় পরিণত হচ্ছে। জানিনকে ঘিরে রয়েছে বাধাহীন একাকিত্ব আর নিস্তব্ধতা। একটু বাদেই অবশ্য তার মনে হল মাথার ওপর আকাশ ধীরে ধীরে আবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে। শুকনো এবং হিমশীতল রাত্রির বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হাজার-হাজার তারা ক্রমাগত আসছে আর আসছে। তাদের গা থেকে তুষারশলাকা আলগা হয়ে পড়ে যাচ্ছে। দিগন্তে গিয়ে ক্রমেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে সব। ওই ঘূর্ণায়মান আলোকবিন্দু তীব্র আকর্ষণে আটকে রেখেছে জানিনকে। সে নিজেই যেন ওই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেছে। তার সমস্ত সত্তাকে চিহ্নিত এবং প্লাবিত করে দিয়েছে। সেই গভীরে শৈত্য আর কামনা যেন দ্বৈরথে নেমেছে। তার চোখের সামনে একের পর এক তারা ঝরে পড়ে যাচ্ছে, মরুভূমির পাথরের আড়ালে কেউ নিভিয়ে দিচ্ছে তাদের, আর একটু-একটু করে রাত্রির বাসনার কাছে নিরাবরণ হচ্ছে জানিন। ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিল সে। সে ঠাণ্ডা ভুলে গেল, ঝেড়ে ফেলল অন্য মানুষদের দায়ভার, জীবনধারণের পাগলামি আর দমবন্ধ দশা, বেঁচে থাকার দীর্ঘ যন্ত্রণা, আশৈশব লালিত মৃত্যুভীতি। এত বছর ধরে পাগলের মত, উদ্দেশ্যহীন হয়ে পালাতে পালাতে, অবশেষে আজ তার যাত্রায় ইতি। সেই সঙ্গেই কিন্তু সে আবার তার শিকড় খুঁজে পেয়েছে, মৃত্তিকার রস উঠে আসছে দেহে। আর সে কাঁপছে না। চলিষ্ণু আকাশের দিকে সে হাত বাড়াল, তার নিম্নাঙ্গ

চেপে ধরল রেলিংটাকে। সে অপেক্ষা করছিল কখন তার বুক ধড়ফড় করাটা বন্ধ হবে, গভীর শান্তিতে ভরে যাবে দেহমন। নক্ষত্রমণ্ডলীর শেষ তারাগুলি নেমে গেল মরুভূমির দিগন্তরেখার দিকে, নিশ্চল হয়ে গেল সব। তারপর গভীর প্রেমে, অসহ্য ভালবাসায়, রাত্রির জলস্রোত জানিনকে দখল করে নিল পরম যত্নে। আপ্লুত করে দিল ঠাণ্ডার বোধ। দমকে দমকে উঠে আসতে লাগল তার অন্দর মহল থেকে। ভালবাসার অস্ফুট কাতর ধ্বনিভরা জানিনের কণ্ঠ পর্যন্ত এলো সেই ঢেউ। পরমুহূর্তেই সমস্ত আকাশ প্রেমিকের অধিকার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠাণ্ডা মাটিতে পিঠ রেখে শয়ান জানিনের বাধামুক্ত দেহের উপর।

আগেকার মতই সন্তর্পণে ঘরে ফিরে এলো জানিন। মার্সেল তখনও জাগেনি। কিন্তু সে বিছানায় শুয়ে পড়ার পরেই মুখ দিয়ে বাচ্চাদের মত আবদেরে শব্দ করে হঠাৎ উঠে বসল মার্সেল। কথা বলে উঠল, কিন্তু কী বলছে তা বুঝতে পারল না জানিন। আলোটা জ্বালিয়ে দিতে ধাঁধিয়ে গেল জানিনের চোখ। টলতে টলতে সে বেসিনের দিকে গেল। বোতল থেকে পরিশুদ্ধ জল খেল অনেকখানি। আবার চাদরের তলে ঢুকতে গিয়ে, খাটে একটা হাঁটু পেতে, থমকে গেল মার্সেল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল স্ত্রীর দিকে। কিছুই সে বুঝতে পারছিল না। ফুলে ফুলে কাঁদছিল জানিন। কিছুতেই নিজেকে থামাতে পারছিল না। মুখে সে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল—"কিছু না গো, কিছুই হয়নি আমার!"

নীলরঙের ফুলের তোড়া

অকতাভিও পাজ (১৯১৪-   )

আমি ঘেমে জেগে উঠলাম। লাল ইটের মেজে থেকে একরকম গরম হাওয়া বইছিলো। একটা ধূসর রঙের প্রজাপতি হলুদ আলোর চতুর্দিকে বেড়াচ্ছিলো ঘুরে। আমি হ্যামক থেকে উঠে এমনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, যাতে বিচ্ছুর ওপর আমার খালি পা-টা না পড়ে। বিচ্ছুটা পরিষ্কার হাওয়া-বাতাস চাচ্ছিলো। আমি আমার খুদে জানলায় দাঁড়িয়ে একটু ফাঁকা বাতাস চাচ্ছিলাম। গাঁয়ের বাতাস। যে-কেউ ঐ জানলায় দাঁড়িয়ে একটু হাওয়া চাইতে পারতো, মেয়েলি হাওয়া, বেশ বড়ো ধরনের মেয়েলি হাওয়া।

আমি কিন্তু করলাম কী, আমি ঘরের মাঝখানে ফিরে এলাম। ফিরে এসে জগ থেকে পুরো জলটা খেয়ে ফেললাম আর তারপর বেসিনের কাছে পেঁছে তোয়ালেটা জলে ভিজোলাম। তারপর ভিজে তোয়ালেটা দিয়ে আমার বুক আর পা আচ্ছা করে মুছে নিলাম। দেখে নিলাম, আর কোনো ছারপোকা আমার জামা-কাপড়ের ভাঁজে আছে কিনা! দেখে, তখন জামাকাপড় পরে নিলাম, সবুজ সিঁড়ি বেয়ে এলাম নেমে।

বোর্ডিং-হাউসের দরোজার মুখে বোর্ডিং-মালিক বসে, একটা কেরোসিন কাঠের টুলের ওপর। লোকটার একটা চোখ পাথরের। ধূমপান করছিলো। হঠাৎই মোটা গলায় জিগ্যেস করলো, 'কোথায় চললে?'

'খুব গুমোট। একটু হাঁটতে যাচ্ছি।'

'বুঝলাম। কিন্তু বাইরে তো সব বন্ধ। মায় রাস্তার বাতি পর্যন্ত। বেরিও না বরং।'

'এক্ষুনি ফিরবো' বিড়বিড়িয়ে বলে আমি হাঁটা দিলাম।

ঘন অন্ধকার। প্রথমে কিছুই ঠাহর করতে পাচ্ছিলাম না। টলমল করে খানিকটা হেঁটে একটা সিগারেট ধরালাম। হঠাৎই কালো মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ উঠলো। চাঁদের আলোয় সামনেই দেখলাম, একটা ভাঙাচোরা দেয়াল। দেয়ালের সাদায় চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। আমি থমকে দাঁড়ালাম।

বাইরে বাতাস আছে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম। পোকামাকড় আর

অনুবাদ : শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পাতায় ভর্তি রাত। ঝিঁঝি পোকারা লম্বা লম্বা ঘাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। আকাশের দিকে তাকালাম: দেখলাম তারারা ক্যাম্প ফেলেছে। আমি ভাবলাম বিশ্বজগৎ শুধুই চিহ্নময়। তারই মধ্যে আমার কাজকর্ম, ঝিঁঝির লাফালাফি, নক্ষত্রের দপদপানি এগুলো হচ্ছে অক্ষর আর যতিচিহ্ন। কী কথা হতে পারে সেটা, যার মধ্যে নিতান্ত এক অক্ষর, এই আমি। কে কথা বলছে? কাকেই বা বলছে? আমি জ্বলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সেটা ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে রাস্তার ওপর পড়লো।

আমি বহুক্ষণ যাবৎ আস্তে আস্তে হেঁটেছি। বেশ ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, এই রাত হলো চোখের সাজানো বাগান। রাস্তাটা পার হবার সময়, কাকে যেন পাশের দরজা দিয়ে পথে পড়তে টের পেলাম। ঘুরে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারলাম না। একটু জোরে পা চালালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম কে যেন আমার পিছনে আসছে। তার চটিজুতোর ফটফটানি আমার কানে পৌঁছুলো। আর ঘুরে দেখতে চাইলাম না। বুঝতে পাচ্ছিলাম, সেই চটিজুতো আমার খুব কাছ-বরাবর এসে গেছে। আমি দৌড়তে চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মিষ্টি আওয়াজ শুনলাম, টের পেলাম পিঠে একটা ছুরি ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।

'নড়বেন না মশায়। নড়লে এটা ঢুকে যাবে।'

ঘুরে না দাঁড়িয়েই জিগ্যেস করলাম, 'কী চান?'

'শুধু আপনার চোখদুটো। আর কিছু নয়।'

'আমার চোখ! চোখ দিয়ে কী করবেন? দেখুন আমার কাছে কিছু টাকা আছে। খুব বেশি না হলেও নেহাৎ কম নেই। আমি সব দিয়ে দেবো। আমায় ছেড়ে দিন। দয়া করে মারবেন না।'

'ভয় পাবেন না মশায়। আপনাকে খুন করবো না। শুধু চোখদুটো উপড়ে নেবো।'

'কিন্তু কেন? আপনি আমার চোখদুটো চাচ্ছেন কেন?'

'আমার প্রেমিকার এই শখ। সে চোখের একটা নীলরঙের ফুলের তোড়া চায়! আর এখানে নীল চোখ পাওয়া যে কঠিন!'

'কিন্তু আমারটা তো তাহলে চলবে না, আমার চোখ তো বাদামি।'

'আমাকে ঢপ দিচ্ছেন? আমি জানি আপনারটা সাক্ষাৎ নীল।'

'আমিও তোমার মতো মানুষ, আমায় খুন কোরো না। বদলে বহু জিনিস দেবো।'

'আমার সঙ্গে সাধুসন্তের মতো ব্যবহার কোরো না। ঘুরে দাঁড়াও বলছি।'

আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। খুব ছোট হালকা-পলকা চেহারা। এক হাত দিয়ে গালের একটা পাশ ঢেকেছে। অন্য হাতে একটা দিশি ছুরি চাঁদের

আলোয় চকচক করে উঠলো।

'তোমার মুখটা দেখি।'

আমি নিজেই দেশলাই জ্বালিয়ে, কাঠিটা মুখের কাছাকাছি ধরলাম। উজ্জ্বলতায় চোখ টেরা হয়ে গেলো। সে শক্তহাতে আমার চোখের পাতা খুললো। খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলো না। পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে সে ঝুঁকে পড়লো আমার মুখের ওপর। জ্বলন্ত কাঠিতে আমার আঙুল পুড়ে যেতে, কাঠিটা ফেলে দিলাম। এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ।

'এখন তুমি বুঝলে তো? চোখ দুটো নীল নয়।'

'খুব চালাক, তাই না? আবার দেখি। আরেকটা কাঠি জ্বালাও।'

আমি আর একটা কাঠি জ্বালিয়ে চোখের কাছাকাছি নিয়ে এলাম। জামা টেনে সে ফুঁসে উঠলো, 'হাঁটু মুড়ে বসো।'

আমি বসলাম। একহাতে চুলের মুঠি ধরে, মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিল। ঝুঁকে পড়ে দেখছে। তার হাত থেকে ছুরিটা পড়ে গেলো। আমি আমার চোখ বন্ধ করলাম।

'চোখ খুলে রাখো।' নির্দেশ দিল সে।

খুললাম। আগুনে চোখের পাতা পুড়ে যেতে লাগলো। হঠাৎই সে আমায় ছেড়ে দিল।

'ঠিক আছে। এ দুটো নীল নয়।'

সে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো। দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছিলাম, হাতের মধ্যে মাথা। নিজে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। পড়ে গেলাম। আবার ওঠার চেষ্টা করলাম। উঠে, এই সুনসান রাস্তা দিয়ে ঘণ্টাখানেক দৌড়লাম। পৌঁছুলাম শহরে। বোর্ডিং-হাউসের মালিকটাকে দেখলাম, ঠিক তখনো দরোজার সামনে বসে আছে। বাক্য না কেটে ভিতরে ঢুকে গেলাম। শহর ছাড়লাম ঠিক তার পরদিনই।

পোস্টকার্ড

হাইনরিষ ব্যোল (১৯১৭—   )

যারা আমায় চেনে, তাদের মধ্যে কেউই জানে না বা বুঝতে পারে না, কত যত্ন করে আমি কাগজের টুকরোটা রক্ষা করি। আপাতদৃষ্টিতে যার কোনো দাম নেই। টুকরোটা আমার একটা দিনের স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমায় স্পর্শকাতর করে তোলে। অথচ আমার কোনো সামাজিক প্রতিপত্তি এতে বাড়ে না।

আমি একটা কাপড়ের কলের সহকারী ম্যানেজার। আমি স্পর্শকাতরতার বিরোধিতা করি এবং বারবার চেষ্টা করি এটাকে একটা স্মারক চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করতে। এটা একটা ছোট সাধারণ চতুর্ভুজ কাগজ, আকারে হলেও আকৃতিতে ডাকটিকিট নয়। এটা ডাকটিকিট থেকে সরু এবং লম্বা। যদিও এটা পোস্টঅফিস থেকেই পাওয়া যায় তবু এটা জমানোয় কোনো কৃতিত্ব নেই। কাগজটার চারধার ঘেঁষে উজ্জ্বল লাল দাগ দেওয়া এবং আরেকটা লাল দাগ চতুর্ভুজটাকে ছোট-বড় দুটো ভাগে ভাগ করেছে। এর মধ্যে ছোট খোপে কালো দিয়ে 'R' লেখা আছে। আর বড়টায় কালো দিয়ে লেখা "ডুসেলডর্ফ", আর একটা সংখ্যা। সংখ্যাটা হল ৬৩৪।

কাগজের টুকরোটা ক্রমশ হলুদ আর পাতলা হয়ে গেছে। আমি ঠিক করেছি কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দেব। একটা সাধারণ রেজিস্ট্রেশান স্টীকার, প্রতিদিন একটা পোস্ট অফিসে যা কিনা কয়েক ডজন লাগান হয়।

এখন পর্যন্ত কাগজের টুকরোটা আমায় এমন একদিনের কথা স্মরণ করায়, যা সত্যি ভোলা যায় না। যদিও মন থেকে মুছে ফেলার অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার স্মরণেন্দ্রিয় ঘটনাটাকে পরিষ্কার মনে রেখেছে।

প্রথমত সেই দিনটার কথা ভাবলেই আমি ভ্যানিলা পুডিংয়ের গন্ধ পাই। একটা গরম মিষ্টি ধোঁয়া আমার শোবার ঘরের দরজার তলা দিয়ে ঢুকছিল আর মার কথা মনে হচ্ছিল। আমি মাকে বলেছিলাম ছুটির প্রথমদিন ভ্যানিলা পুডিং করতে আর এও বলেছিলাম, আমি যেন ঘুম থেকে ওঠার সময় পুডিংয়ের গন্ধ পাই।

মূল জার্মান থেকে অনুবাদ : চিরঞ্জয় চক্রবর্তী

তখন সাড়ে দশটা। একটা সিগারেট ধরালাম, বালিশটা খাড়া করে দিয়ে ভাবতে শুরু করলাম—কীভাবে বিকেলটা কাটাব। ঠিক করলাম, সাঁতার কাটতে যাব। খাওয়া-দাওয়ার পরে একটা গাড়ি ধরে সমুদ্রসৈকতে চলে যাব, কিছুক্ষণ সাঁতার কাটব, বই পড়ব, সিগারেট খাব, তারপর সহকর্মী যুবতীর জন্য অপেক্ষা করব। কথা আছে ও পাঁচটার পর সৈকতে আসবে।

রান্নাঘরে মা মাংসকুচি করছিল এবং কুচি করার আওয়াজ বন্ধ হলেই আমি গান শুনতে পাচ্ছিলাম।

মা গাইছে। ভক্তিগীতি—এত ভাল লাগছিল।

তার আগের দিন আমার পরীক্ষার পাশের খবর বেরিয়েছিল। কাপড়ের কারখানায় একটা চাকরি হয়েছিল। চাকরিটায় উন্নতির সুযোগসুবিধাও ছিল। কিন্তু তখন আমি বাড়িতে ছিলাম কারণ দু'সপ্তাহের গরমের ছুটি ছিল। ঘরের বাইরে প্রচণ্ড গরম, আমার কিন্তু গরম ভালই লাগত। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখতাম মাটি থেকে জল বাষ্প হয়ে ওপরে ওঠার সময়ে বায়ুমণ্ডল ইতস্তত নেচে বেড়াচ্ছে, বায়ুমণ্ডল অস্বচ্ছ হচ্ছে, শুয়ে শুয়ে রাস্তার গাছ দেখছিলাম, গাড়ির আওয়াজ শুনছিলাম—হঠাৎ মনে হল এখন জলখাবার খাওয়া উচিত। সঙ্গে সঙ্গে মা'র পায়ের আওয়াজ পেলাম, উঠেছি কি না দেখতে আসছিল। বুঝতে পারছিলাম মা বড় ঘর পেরিয়ে আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল—বাড়িটার কোথাও কোন আওয়াজ ছিল না। 'মা' বলে ডাকতে যাব তখনই দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। মা বাইরের দরজায় গেল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নিচের বাজারের হৈচৈ চিৎকার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মা আর শ্রীমতী কুরৎস দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, উনি আমাদের পাশের ফ্লাটে থাকতেন। ওদের কথার মধ্যেই একজন পুরুষের গলা শুনতে পাচ্ছিলাম, ভদ্রলোক ডাকপিয়ন। যদিও আমি তাকে খুব সামান্যই দেখেছি। ডাকপিয়ন আমাদের বসার ঘরে ঢুকল। মা জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?" তিনি বললেন, "দয়া করে এখানে সই করুন।" কিছুক্ষণ শুনলাম। তারপর ডাকপিয়ন ধন্যবাদ দিয়ে চলে যান। আওয়াজে বুঝতে পেরেছিলাম, মা দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরে গেছে।

কিছুক্ষণ পরেই আমি বিছানা থেকে উঠি এবং কলঘরে যাই। দাড়ি কামাই, বহুক্ষণ ধরে স্নান করি এবং কল বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাই মা কফি গুঁড়ো করছে। অনেকটা রবিবার রবিবার মনে হচ্ছিল, শুধুমাত্র চার্চে যাইনি এই যা।

কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না, কিন্তু হঠাৎ আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কেন হল বলতে পারব না। খুব খারাপ লাগছিল। বেশিক্ষণ আমি কফিগুঁড়োর আওয়াজ পাইনি। গা মুছলাম, প্যান্ট পরলাম, মোজা জুতো

পরলাম, চুল আঁচড়ালাম, তারপর শোবার ঘরে গেলাম। ফুলদানিতে সুন্দর তাজা গোলাপফুল আর আমার প্লেটে লাল এক প্যাকেট সিগারেট।

ঠিক তখনই মা কফির কেটলী হাতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। দেখলাম মা কাঁদছে। মা'র একহাতে কেটলী অন্য হাতে ডাকে আসা চিঠিপত্র। এগিয়ে গিয়ে কেটলীটা নিলাম। চুমু খেয়ে বললাম, "সুপ্রভাত।" আমাকে ভাল করে দেখে মা বলল, "সুপ্রভাত, কাল ঘুম হয়েছিল তো?" বলে হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

আমরা বসলাম। মা কফি ঢালছিল। আমি লাল প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরালাম। হঠাৎ সিগারেট খেতে ইচ্ছে করল না। কফির মধ্যে দুধ আর চিনি দিয়ে নাড়তে নাড়তে মা'র দিকে তাকাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু প্রতিবারই চোখ নামিয়ে নিতে হচ্ছিল। "কোনো চিঠি এসেছে?" প্রশ্নটা অর্থহীন। কারণ মা'র হাতের মধ্যে সমস্ত চিঠিপত্র ছিল। চিঠির স্তূপের সবচেয়ে ওপরে ছিল সেদিনের সংবাদপত্র।

"এসেছে" বলে চিঠির স্তূপ মা আমার দিকে এগিয়ে দিল। আমি সংবাদপত্রটা তুলে নিলাম। এই সময় মা আমার জন্যে রুটিতে মাখন মাখাচ্ছিল। ওপরের পাতায় হেডলাইন দিয়ে, "সীমান্ত-এলাকায় জার্মানদের উপর প্রকাশ্যে অত্যাচার করা হচ্ছে।" সপ্তাহখানেক ধরেই প্রথম পাতায় এরকম খবর ছাপা হচ্ছিল! খবরে বলা হচ্ছিল, "পোলিশ সীমান্তবর্তী এলাকার উদ্বাস্তুরা বাঁচার জন্য জার্মানীর দিকে পালাচ্ছে।"—কাগজটা সরিয়ে রাখলাম। একটা বিজ্ঞাপন-পুস্তিকা নিলাম—পাঠিয়েছে একজন মদব্যবসায়ী। বাবা বেঁচে থাকার সময় তাঁর কাছ থেকে আমরা কয়েকবার মদ কিনেছি। বিজ্ঞাপনে খুব শস্তায় মদ দেবে বলেছে—সরিয়ে রাখলাম।

ইতিমধ্যে মা রুটিতে মাখন মাখিয়ে ফেলেছিল। আমার প্লেটে রেখে বলল, "খেয়ে নাও।" মা নিঃশব্দে কাঁদছিল, আমি কিছুতেই তাকাতে পারছিলাম না। কষ্ট পাচ্ছে এমন কারো দিকে আমি তাকাতে পারি না। কিন্তু এই প্রথম বুঝতে পারলাম, মা'র কষ্ট পাওয়ার কারণ ডাকে আসা চিঠিপত্র। আমি খুব নিশ্চিত এটা ডাক থেকেই হয়েছে। সিগারেটটা নিবিয়ে দিলাম। মাখনরুটিতে একটা কামড় দিয়ে পরের চিঠিটা নিলাম, নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, সবার তলায় একটা পোস্টকার্ড, পোস্টকার্ডের স্ট্যাম্পটা আমি খেয়াল করিনি। সেই ছোট সরু কাগজটা, যেটায় আমার দুর্বলতা আছে। সেটা তখন দেখতে পাইনি। তাই আমি প্রথম চিঠিটা পড়লাম। চিঠিটা এডিকাকা লিখেছিল। বহুদিন সহকারী শিক্ষক থাকার পরে সে প্রধান শিক্ষক হয়েছে। কিন্তু তাঁর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দুর্গম গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে তাঁর উন্নতি খুবই কম হয়েছে, কারণ তাঁর বেলায় স্থানীয় বেতনক্রম মেনে চলা

হচ্ছে এবং তাঁর সন্তানদের হুপিং কাশি হয়েছে। নানা কারণে সে নিজেও দুর্বল বোধ করে—সে না বুঝলেও আমরা বুঝতাম সে কেন এসবকে ঘৃণা করে। অনেকেই করত।

যখন আমি পোস্টকার্ডটা পড়ব বলে হাত বাড়িয়েছি, দেখি জায়গায় নেই। মা পড়ছে। আমি কফিতে চিনি নাড়লাম। অর্ধেক খাওয়া মাখনরুটির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাবার মৃত্যুতে মা সব কিছু ভুলে কেঁদেছিল—এটা কোনোদিন ভুলতে পারব না এবং তখন আমি মাকে সান্ত্বনা দেবার কথা ভাবিইনি। অসংখ্য চিন্তা তখন তাঁর কাছ থেকে আমায় দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

মাখনরুটি খাওয়ার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। কারণ হঠাৎ মনে হল মা আমার জন্য কষ্ট পাচ্ছে। মা কিছু বলল, শুনতে পেলাম না। আমার হাতে পোস্টকার্ডটা দিল এবং তখনই আমি রেজিস্ট্রেশান স্টীকারটা দেখলাম। সেই লাল বর্ডার দেওয়া চতুর্ভুজ, যেটা আরেকটা লাল দাগ দিয়ে দুভাগ করা। তার মধ্যে ছোটটায় কালো দিয়ে বড় করে লেখা 'R', অন্য চতুর্ভুজে লেখা 'ডুসেলডর্ফ' এবং ৬৩৪। এমনিতে পোস্টকার্ডটা খুব সাধারণ, আমার নামে লেখা এবং পিছনে লেখা ছিল "ব্রুনো স্নাইডার, আপনাকে ৫, ৮, ৩৯-এ আডেনব্রুকের শ্লিফেনব্যারাকে আট সপ্তাহের মিলিটারী প্রশিক্ষণের জন্য উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে।" ব্রুনো স্নাইডার, তারিখ এবং আডেনব্রুক শব্দগুলো টাইপ করা, বাকিটা ছাপানো। শেষে দুর্বোধ্য স্বাক্ষর এবং ছাপানো একটা শব্দ 'মেজর'।

আজকে বুঝি, তখন মেজরের ঐ দুর্বোধ্য স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল না, যা একটা ছোট্ট মেশিন সহজেই ছেপে দিতে পারত। শুধুমাত্র আয়তাকার ঐ স্টীকারটার জন্যই আমার মাকে সই করে নিতে হয়েছিল।

আমি মা'র হাতটা ধরে বলেছিলাম, "ভাবনার কী আছে, মাত্র তো আট সপ্তাহ।" মা খুব শান্তভাবে বলেছিল, "আমি জানি।" বলেছিলাম মাত্র তো আট সপ্তাহ এবং জানতাম মিথ্যা কথা বলছি, মা কাঁদছিল, বলেছিল, "সত্যি তো, কী আর এমন বেশি দিন।" আমরা দুজনেই মিথ্যে কথা বলেছিলাম এবং একে অপরকে প্রবঞ্চনা করেছিলাম। জানতাম না কেন মিথ্যা বলছি—অথচ মিথ্যা বলছি এটা বুঝতে পারছিলাম।

রুটিমাখন তোলার সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল আজ বাদে আর তিনদিন আছে। সেদিন বেলা দশটায় আমি এখান থেকে তিনশো মাইল দূরে থাকবো। খারাপ লাগছিল। রুটি ফেলে উঠে পড়লাম। মাকেও কিছু বললাম না। নিজের ঘরে গেলাম। লেখার টেবিলের কাছে দাঁড়ালাম, ড্রয়ার খুললাম, আবার বন্ধ করলাম। চারিদিক তাকালাম, বুঝতে পারলাম কিছু-একটা ঘটছে। কিন্তু কী ঘটছে বুঝতে পারলাম না। এই ঘর আর আমার থাকবে না। মনে হচ্ছিল আমার কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অথচ আজ বুঝি সেদিন

কত অর্থহীন কাজ করেছিলাম। চিঠির বাক্স কিংবা বই আঁতিপাতি করে খোঁজার কোনো দরকার ছিল না। কারণ আমি জানতাম কী করতে চলেছি। তাই দ্রুত সুটকেস গোছাতে শুরু করলাম। শার্ট, প্যান্ট, তোয়ালে এবং মোজা নিলাম এবং বাথরুমে গেলাম দাড়ি কামানোর জিনিসগুলো আনতে। মা তখনও খাওয়ার টেবিলে বসেছিল। তখন আর কাঁদছিল না। প্লেটে আমার অর্ধেক-খাওয়া রুটি, কাপে কিছু কারিও ছিল। মা'র সামনে এসে বসেছিলাম, গীসেলবাথ্কে ফোন করতে যাচ্ছি। কখন যেতে হবে এসব জানতে হবে।

ঠিক বারোটায় গীসেলবাথ্-এর কাছ থেকে ফিরে এলাম। আমাদের সামনের ঘরটা ঝলসানো মাংস আর কোহন ফুলের গন্ধে ভরে গেছিল। দেখলাম মা আমাদের ছোট্ট আইসক্রীম মেশিনটায় দেওয়ার জন্য থলিতে করে বরফ ভাঙছে।

সেদিন রাত ৮টায় আমার ট্রেন আর পরদিন ৬টায় আডেনব্রুক পেঁছে যাওয়ার কথা। হেঁটে গেলে স্টেশন মাত্র পনেরো মিনিট। তা সত্ত্বেও বাড়ি থেকে তিনটের সময় বেরিয়ে পড়েছিলাম। মা জানত না আডেনব্রুকে পেঁছতে কতক্ষণ লাগে—তাই মিথ্যে কথা বলে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

শেষ তিন ঘণ্টা যখন বাড়িতে ছিলাম, মনে হয় যতদিন ঐ বাড়িতে বাস করেছি তার থেকেও দীর্ঘ সময় ঐ তিন ঘণ্টা। আমি জানি না আমরা দুজনে কী করেছিলাম। আমাদের কোনো খিদে ছিল না। তবু মা তাড়াতাড়ি মাংস, কোহনফুল, আলুগুলো আর ভ্যানিলা পুডিং রান্নাঘর থেকে নিয়ে এসেছিল। তখন আমরা প্রাতরাশের কফি খেলাম। কফি পটে থাকার জন্যে তখনো গরম ছিল। আমি একটা সিগারেট ধরিয়েছিলাম। তখন বারবার একজোড়া কথাই বলেছি আমরা। আমি বলেছি 'আট সপ্তাহ' আর মা বলেছে, 'হ্যাঁ, আমি জানি।' কিন্তু মা তারপর একটুও কাঁদেনি। তিন ঘণ্টা ধরে দুজনে মিথ্যে কথা বলেছি, আমি ব্যাপারটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। তারপর মা আশীর্বাদ করল, দু-গালে চুমু খেল এবং আমি যখন সামনের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এলাম, জানি মা তখন কাঁদছিল।

তখন ছুটির সময়। তাই স্টেশনে খুব ভিড়। চারিদিকে লোক আর লোক—প্রত্যেকেই সুখী সূর্যের আলোয় নিজেকে সুখী ভাবছিল। আমি একটা বীয়ার নিয়ে প্রতীক্ষালয়ে বসেছিলাম এবং প্রায় সাড়ে-তিনটে নাগাদ সিদ্ধান্ত নিলাম সেই সুন্দরী বান্ধবীকে ফোন করব।

যখন ডায়াল করছিলাম, নিকেলের চাকতিটা বারবার নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছিল, এবং প্রথম পাঁচবারই আমি ভেবেছিলাম ওকে ফোনে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যেই ষষ্ঠবার করেছি—অমনি ওর গলা শুনতে পেলাম, "কে বলছেন?" মুহূর্তের জন্য আমি স্তব্ধ হয়েছিলাম। তারপর খুব আস্তে আস্তে বলেছিলাম—"ব্রুনো"—একটু থেমে আবার বলেছিলাম, "তুমি কি আসতে পারো? আমাকে

যেতে হচ্ছে—সেনাবিভাগে।"

ও জিজ্ঞাসা করেছিল, "এখনই ?"

"হ্যাঁ।"

ও কিছু ভাবছিল, চুপচাপ ছিল, টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে শুনতে পাচ্ছিলাম কারা যেন সম্ভবত আইসক্রীম কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করছে। "শোনো," ও বলল, "আমি কি স্টেশনে আসব ?" বললাম, "হ্যাঁ।"

ও স্টেশনে এল খুব তাড়াতাড়ি।

দশ বছর হয়ে গেল ওকে নিয়ে ঘর করছি। তবু নিশ্চিত হতে পারি না, সেদিনের টেলিফোনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা উচিত কি না। সবচেয়ে বড় কথা ওদের অফিসে আমার জন্য একটা চাকরি ঠিক করে রেখেছিল। আমি ফিরে আসার পরে ও আমার হারিয়ে-যাওয়া সোনালী স্বপ্নে নতুন রঙ দিয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে সেই একমাত্র যাকে আমার আজকের উন্নতির জন্য ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

সেদিন আমি যতক্ষণ তার সঙ্গে থাকতে পারতাম, ততক্ষণ থাকলাম না। আমরা সিনেমায় গিয়েছিলাম, ফাঁকা অন্ধকার, দমবন্ধ সিনেমা হলের গরমে আমি ওকে চুমু খেয়েছিলাম। যদিও এমন-কিছু অনুভব করিনি, তবু ঘন ঘন চুমু খেয়েছিলাম। আটটার আগে স্টেশনে যাওয়ার কোনো দরকার ছিল না। তবু ৬টার সময় স্টেশনে গিয়েছিলাম। প্লাটফর্মে আবার চুমু খেলাম। তারপর পূর্বদিকে যাওয়ার গাড়িতে উঠে পড়লাম।

সেই থেকে আমি সমুদ্র-সৈকতের দিকে তাকাতে পারি না। কী রকম একটা কষ্ট হয়। সূর্য, জল আর উল্লাসভরা মানুষগুলো—আমার কাছে কেমন বিসদৃশ মনে হয়। তার থেকে বর্ষার দিনে ধীরে ধীরে শহরের পথে হাঁটতে ভাল লাগে, কোনো-কোনো সময়ে সিনেমাতেও যাই, সেখানে আমার পাশে চুমু খাওয়ার মতো কেউ থাকে না। এই অফিসে আমার উন্নতির সম্ভাবনা শেষ হয়নি। আমি ডিরেক্টর হতে পারি। সম্ভবত হব এবং সেটা খুব সাধারণ নিয়মেই হবে। অনেকেই ভাবতে পারে আমি কোম্পানীর খুব অনুগত এবং কোম্পানীর অনেক বড় কাজ আমার দ্বারা হবে। আসলে আমি মোটেই অনুগত নই বা কোনোরকম বড় কাজ করার ইচ্ছেও আমার নেই।

মাঝে মাঝে সবকিছু ভুলে আমি ছোট স্টীকারটার কথা ভাবি, যেটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। প্রতি গ্রীষ্মে যখন নতুন-নতুন কর্মচারী যোগ্যতাসূচক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমার কাছে আসে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য, তখন আমাকে একটা বক্তৃতা দিতে হয়। সেই বক্তৃতায় "উন্নতির সুযোগ" এই শব্দদুটো বছরের পর বছর একইভাবে ব্যবহার করতে হয় আমাকে।

সমুদ্রবেলা

আলাঁ রোব্-গ্রিয়ে (১৯২২-)

তিনটি ছেলেমেয়ে সমুদ্রবেলা ধরে সোজা হাঁটছে। পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে তারা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। কমবেশী তারা মাথায় সমান, বয়সেও সমান বোধ হয়, বছর-বারোর মত হবে তারা। তবে মাঝে যে আছে সে অন্য দুজনের চেয়ে সামান্য ছোটই হবে।

এই ছেলেমেয়ে-তিনটি ছাড়া লম্বা বেলাভূমিটি লাগাতার ফাঁকা পড়ে। এক ফালি সমুদ্রতীর, চওড়ায় মোটামুটি বড়সড়, বালু দিয়ে সমান করে ঢাকা। এখানে-ওখানে বড়-বড় পাথর বা গর্ত নেই। বেলাভূমিটির একদিকে পাহাড়ের খাড়াই চুড়ো, তাকালে মনে হয় টপকানো যাবে না, অন্যদিকে সমুদ্র। দুইয়ের মধ্যিখানে বেলাভূমিটি সামান্য গড়ানো।

দিনটি ভারি ঝকঝকে। সূর্যের তীক্ষ্ন খাড়া আলোয় ঝলমল করছে হলুদ বালুরাশি। আকাশে ছিটেফোঁটা মেঘ নেই, বাতাসও নেই। নীল শান্ত জল। খোলামেলা সমুদ্রে স্ফীতি নেই কোথাও। বেলাভূমিটি দিগন্ত পর্যন্ত চোখে পড়ে।

নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে আচমকা একটি করে ঢেউ, সব সময়ে সেই একই ঢেউ, তীর থেকে কয়েক গজ দূরে উদ্ভব হয়ে হঠাৎ তেজি হয়ে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ ভেঙে পড়ে, সব সময় একই রেখা অনুসরণ করে আসে। দেখলে ধারণা হয় না যে জলের প্রবাহ আছে। আবার মন্দার টানে ফিরে যায়। বরং মনে হয় সমগ্র ক্রীড়াচক্রটি একই জায়গায় ফের অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জলোচ্ছ্বাসের টানে প্রথমে তীরের কাছে জল একটু নেমে যায়, তারপর নুড়ি-পাথরগুলো ঝিরঝির শব্দে আন্দোলিত করে ঢেউটি একটু পেছিয়ে গিয়ে ভাঙে এবং সাদা ফেনা হয়ে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। তীর থেকে যতটুকু জায়গা ছেড়ে এসেছিল সেটুকু আবার দখল করে। কখনও-কখনও ঢেউ আর একটু উঁচু হয়ে এসে কয়েক ইঞ্চি বাড়তি জমি ভিজিয়ে দেয়।

সব কিছু ফের শান্ত হয়। তখন কোমল ও নীল সমুদ্র হলুদ বালুরাশির নির্দিষ্ট রেখা বরাবর থেমে থাকে। ছেলেমেয়ে-তিনটি সমুদ্রতীর ধরে পাশাপাশি

অনুবাদ : অমল দত্ত

হেঁটে যায়। সোনালী ছেলেমেয়ে-তিনটি, বালুর মত রং, চামড়া তাদের আর একটু কালো, চুল সামান্য হাল্‌কা, একই রকম পোশাক তাদের। তারা পরেছে রং-ওঠা লিনেনের মোটা কাপড় দিয়ে তৈরি খাটো প্যাণ্ট আর জামা। একে অন্যের হাত ধরে পাশাপাশি একই সরল রেখায় হেঁটে চলেছে। সমুদ্র এবং পাহাড়চুড়ো থেকে সমদূরত্বে একটু বা জলের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে তারা। খাড়া সূর্য মাথার ওপরে। তাই পায়ের কাছে ছায়াটুকু পড়েনি।

পাহাড় থেকে জল পর্যন্ত তাদের সামনে সোনারংয়ের সাগরবেলাটি অক্ষত ও কোমল। ছেলেমেয়েরা কোনোদিকে না ফিরে একে অন্যের হাত ধরে সমান গতিতে চুপচাপ চলে যাচ্ছে। তাদের পেছনে খালি পায়ের ছাপসুদ্ধ রেখা তিনটি চলে আসছে। সমান মাপের পায়ের ছাপগুলো বেশ গভীর ও নিখুঁত হয়ে কেটে বসেছে।

তাদের সামনে একঝাঁক সমুদ্র-পাখি ঢেউয়ের কোল ঘেঁষে হেঁটে চলেছে। ছেলেমেয়েদের থেকে একশো গজ দূরে দিয়ে তারাও একই দিকে চলেছে। কিন্তু পাখিগুলো গুটিগুটি করে পা ফেলছে বলে ছেলেমেয়েরা তাদের ধরে ফেলবে। সমুদ্র তারার মত কুচি-কুচি পায়ের ছাপ মুছে ফেলছে যখন তখন কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েদের পায়ের ছাপগুলো ভেজা-ভেজা বালুতে লিপির মত লেখা হয়ে থাকছে, আর তাদের পেছনে রেখা-তিনটিও বড় হয়ে আসছে।

ছাপগুলো সমান গভীর, প্রায় এক ইঞ্চির মত। পায়ের ধার ভেঙে অথবা আঙুলের ডগা বা গোড়ালির চাপে ছাপগুলো বিকৃত হয়নি। দেখে মনে হচ্ছে জমিপৃষ্ঠ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসছে।

একদিকে রেখা-তিনটি আরো লম্বা হয়ে আসছে আর অন্যদিকে তারা ক্রমে সরু হয়ে আস্তে আস্তে একটি রেখায় গিয়ে মিশেছে। এভাবে বেলাভূমি লম্বালম্বি দুভাগে ভাগ হয়েছে এবং দূরে সূক্ষ্ম যান্ত্রিক গতির সৃষ্টি করে রেখাটি শেষ হচ্ছে। দুটি পায়ের ওঠানামা টিক-টিক করে সময়কে যেন চিহ্নিত করছে।

খালি পায়েরা আরো এগিয়ে গেলে তারা পাখিদের কাছাকাছি এসে যায়। চটপট তারা বেলাভূমি পার হয়ে যাচ্ছে বলে পাখিদের সঙ্গে দূরত্ব আগের চেয়ে দ্রুত কমে আসছে। শিগগিরই পাখিরা তাদের থেকে আর মাত্র কয়েক পা দূরে থাকবে···।

শেষ পর্যন্ত যখন ছেলেমেয়েরা পাখিদের ঝাঁক ধরে ফেলল বলে মনে হচ্ছে ঠিক তখনই পাখিরা ঝটপট ডানা মেলে আচমকা উড়ে যায় প্রথমে এক, তারপর দুই, তারপরে দল··: দলের সাদা ও ধূসর রংয়ের সব পাখি উড়ে গিয়ে সমুদ্রের ওপর একটা বাঁকা রেখার ছবি তৈরি করে ফের বালুতে নেমে আসে। এবং একই দিকে মুখ করে ঢেউয়ের কোল ঘেঁষে যখন হাঁটা শুরু করে,

তখন তারা আবার ছেলেমেয়েদের থেকে একশো গজ দূরে।

এতটা দূর থেকে জলের নড়াচড়া চোখে ঠেকে না, কিন্তু প্রতি দশ সেকেণ্ড পর-পর ঢেউ-ভাঙা ফেনা রোদে চিকচিক করে জলের রং হঠাৎ বদলে দেয়।

অক্ষত সাগরবেলায় নিজেদের গমনচিহ্ন, ডান দিকে ছোট-ছোট ঢেউয়ের খেলা, সামনে পাখিদের ওড়াফেরা বা হাঁটাচলা, সব কিছু উপেক্ষা করে সমান গতিতে দ্রুত পায়ে হাত ধরাধরি করে সোনালী ছেলেমেয়ে-তিনটি এগিয়ে চলেছে।

রোদে-পোড়া মুখ-তিনটে চুলের চেয়েও কালো হয়ে একই রকম ঠেকছে। তাদের মুখভাব একই রকম গম্ভীর চিন্তাযুক্ত ও একটু উদ্বেগপূর্ণ। তাদের গঠনও একই রকম, যদিও এটা ফুটে ওঠে যে তাদের তিনজনের দুজন ছেলে একজন মেয়ে। মেয়েটির চুল সামান্য লম্বা, একটু বেশি কোঁকড়ানো এবং শরীর আর একটু কোমল। কিন্তু পোশাক-আশাক একই রকম। খাটো প্যাণ্ট আর গায়ে জামা। নীল লিনেনের মোটা কাপড় দিয়ে তৈরি। নীল রংটি অদৃশ্যমান।

একেবারে ডান দিকে সমুদ্রের সব থেকে কাছে মেয়েটি। তার বাঁয়ে চলছে দুজনের মধ্যে ছোট যে ছেলেটি। আর অন্যজন মাথায় যে মেয়েটির সমান সে আছে পাহাড়চুড়োর সব চেয়ে কাছে।

সামনে চোখ যত দূর যায়, হলুদ ও মসৃণ বালুরাশি। বাঁয়ে বাদামী-পাহাড়ের দেয়াল খাড়া উঠেছে, পাহাড় ডিঙিয়ে কোনো রাস্তা চলে গেছে কি না দেখা যায় না। ডানদিকে দিগন্ত পর্যন্ত সবটুকুই নীল আর নিশ্চল। সমুদ্রের সমতল পৃষ্ঠে আচমকা এক-একটি ঢেউ ভেঙে গিয়ে সাদা ফেনা হয়ে ছুটে যায়।

দশ সেকেণ্ড পরে জলোচ্ছ্বাসের টানে নুড়িতে আবার ঝিরঝির শব্দ ওঠে, এবং তীরের জল আগের মত ডেকে যায়।

ঢেউটি ভাঙে, সাদা ফেনা তখন ঢেউয়ের তল ধরে গড়িয়ে যায় এবং ছেড়ে আসা ইঞ্চি-কয়েক জমি আবার গিয়ে দখল করে। আসন্ন নীরবতার মধ্যে অনেক দূর থেকে এক সুরে বাঁধা ঘণ্টাধ্বনি শান্ত বাতাসে ভেসে আসে।

ছোট ছেলেটি বলল, "এটা হয়তো প্রথম ঘণ্টা নয়, কেননা আগেরটা যদি আমরা না শুনে থাকি।"

"বাজলে আমরা একই রকম শুনে থাকতাম," পাশের ছেলেটি বলল।

কিন্তু তারা তাদের হাঁটার গতি পালটালো না। তারা চলে গেলে তাদের পেছনে ছটি খালি পায়ের ছাপ তেমনই পড়ে থাকল।

"আমরা আগে এত পাশাপাশি ছিলাম না," মেয়েটি বলল।

এক মুহূর্ত পরে পাহাড়চুড়োর দিক থেকে বড় ছেলেটি বলল, "আমরা

এখনো অনেকটা দূরে আছি।"

তিনজন চুপচাপ হেঁটে চলল।

শান্ত বাতাসে ঘণ্টাধ্বনি আবার বেজে না ওঠা পর্যন্ত তারা চুপচাপ ছিল। ঘণ্টার শব্দ আবারও অস্পষ্ট ভেসে এল। দুজনের মধ্যে বড় ছেলেটি বলল, "ঘণ্টা পড়ছে।" অন্যজন উত্তর দিল না।

তারা পাখিদের কাছে আসতেই পাখির দল ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল। প্রথমে এক, তারপর দুই, তারপরে দশ······

সম্পূর্ণ ঝাঁকটি বালুতে নেমে এসে সমুদ্রতীর ধরে আবার হেঁটে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েদের থেকে একশো গজ সামনে তারা।

সমুদ্র নক্ষত্রের মত পাখিদের কুচি-কুচি পায়ের ছাপ মুছে ফেলছে। ওদিকে ছেলেমেয়েরা যারা পাহাড়চূড়োর ধার দিয়ে হাঁটছিল তারা তাদের পায়ের গভীর ছাপ ফেলে চলেছে। লাইন-তিনটি তীরের সমান্তরালে লম্বা হয়ে চলেছে।

ডানদিকের সমতলে নিশ্চল সমুদ্র আগের মতোই একই জায়গায় রয়েছে. আর একই ভঙ্গিতে ছোট্ট ঢেউটি এসে আছড়ে পড়ছে।

শিশুর কাঁথা

লোকটা সবসময় ব্যস্ত। এমন কি আজ রাতেও তাঁকে ছুটে যেতে হল একটা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখতে। আর বেচারা টোশিকো, স্বামী যদি এমন করে, কি আর করা, একা একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি চলে এল। যখন কোন মহিলা একজন অভিনেতাকে, আকর্ষণীয় অভিনেতাকে বিয়ে করে তখন তার আশা করার ব্যাপারগুলো কমে যেতে বাধ্য। স্বামীর সঙ্গে সন্ধেটা কাটাবে এমন চাওয়াটা ভীষণ বোকামি এটা বুঝতেও তার সময় লেগেছে। এবং এখন লোকটি জানে কি নিঃসঙ্গ এবং নিঃশেষ টোশিকো বাড়িতে ফিরে যাবে, যে বাড়িটা সাজানো রয়েছে আসবাবপত্রে চাপ চাপ শূন্যতা নিয়ে।

ছেলেবেলা থেকেই টোশিকোর স্বভাব একটু অন্যরকম। বড় স্পর্শকাতর সে। মাত্রাটা বেশীর দিকে। তাই থেকে চিন্তা করা স্বভাবে এসে গেছে। চিন্তাটা অবশ্যই দুশ্চিন্তার দিকে। আর ক্রমাগত দুশ্চিন্তার জন্যেই তার ওজন তেমন বাড়েনি। ফলে এখন যুবতী অবস্থাতে তাকে দেখে রক্তমাংসের বলে মনে হয় না, বরং স্বচ্ছ ছবির মত বললে কাছাকাছি হবে।

একটু আগে সন্ধে নাগাদ সে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে নাইট ক্লাবে গিয়েছিল। একটি বিশেষ ঘটনার জন্যে স্বামী বন্ধুদের আপ্যায়ন করছিলেন তখন। সেই আমেরিকান ধাঁচের স্যুটে বসে সিগারেট পানরত স্বামীকে তার প্রায় অচেনা মনে হচ্ছিল। 'গল্পটা দারুণ।' হাত-পা নেড়ে স্বামী জমিয়ে এমন স্বরে বলছিলেন যাতে পাশের ঘর থেকে ভেসে-আসা নাচের বাজনার শব্দ চাপা পড়ে, 'নার্সটি আমাদের বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্যে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে হাজির হল। সবচেয়ে প্রথমে আমার নজর পড়ল তার পেটের ওপর। প্রকাণ্ড বললে কম বলা হয়, যেন একটা বালিশ বেঁধে রেখেছে ওর কিমোনোর তলায়। আমি আর অবাক হলাম না। যখন দেখলাম আমরা সবাই মিলে যা খাই ও তার চেয়ে বেশী খেল। সে এইভাবে থালা চাটছিল,' স্বামী অবিকল নকল করে সেটা দেখালেন। 'গত পরশু আমরা বাচ্চাটার ঘর থেকে গোঙানি এবং কাতরানি ভেসে আসতে শুনলাম। আমরা ছুটে গেলাম সেখানে। নার্সটি

অনুবাদ : সমরেশ মজুমদার

মাটিতে পড়ে দুহাতে পেট চেপে ছটফট করছে। তার কিছু দূরে বেবিকটে শুয়ে আমাদের বাচ্চাটা সমানে চিৎকার করে কাঁদছে। দৃশ্যটা দারুণ।'

'তাহলে শেষ পর্যন্ত রহস্যের সমাধান হল?' স্বামীর এক অভিনেতা-বন্ধু প্রশ্নটি করলেন।

'সত্যিই তাই। এতবড় চমক আমার জীবনে আমি পাইনি। আমি সময় নষ্ট না করে নার্সটিকে মেঝে থেকে তুলে কম্বল বিছিয়ে শুইয়ে দিলাম। সারাক্ষণ মেয়েটি একটা আহত শুয়োরের মত চেঁচিয়ে গেল। ডাক্তার এসে পেঁছানোর আগেই শিশুটি পৃথিবীতে এসে গেল। অবশ্য তার ফলে আমাদের ঘরে রক্তের বন্যা ছুটল।'

'এটা আমি আগেই ভেবেছিলাম।' একজন শ্রোতা বিজ্ঞের মত মন্তব্য করতে সারা ঘর হাসিতে ভরে উঠল। টোশিকো নির্বাক। তার স্বামী সেই ভয়ংকর ঘটনাটা এমন ভঙ্গীতে বর্ণনা করছেন যেন এর চেয়ে মজার ব্যাপার আর কিছু হয় না এবং সেটা দেখবার সুযোগ পাওয়াটা ভাগ্যের কথা। সে দুচোখ মুহূর্তের জন্যে বন্ধ করতেই একটি নবজাত শিশুকে তার সামনে শুয়ে থাকতে দেখল। শিশুটির কম্পিত শরীর রক্তাক্ত কাগজে মোড়া অবস্থায় কাঠের মেঝেতে পড়ে আছে। টোশিকো নিশ্চিন্ত যে ডক্টর অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে তাঁর কাজ করেছেন। যে মা একটি জারজ সন্তান প্রসব করেছে বলে তার ধারণা তার প্রতি তিনি সম্মান দেখাতে চান না বলেই বোধহয় সহকারীকে নির্দেশ দিয়েছেন বাচ্চাটাকে খবরের কাগজে মুড়ে ফেলতে। এইরকম চিকিৎসায় অবহেলা টোশিকোকে পীড়িত করেছিল। কোন রকমে ওই বিরক্তিকর পরিবেশকে উপেক্ষা করে সে তার নিজের আলমারি থেকে নতুন ফ্লানেল বের করে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে একটা আরামকেদারায় শুইয়ে দিয়েছিল।

অবশ্য এইসব ঘটনা ঘটেছিল ওর স্বামী সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর। টোশিকো তাকে কিছুই বলেনি। ভয় ছিল স্বামীকে বললে সে খুব নরম, ভাবপ্রবণ ইত্যাদি ঠাট্টা শুনতে হবে যদিও ওই দৃশ্যটি তার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। আজ রাত্রে, এখন, যখন তার স্বামী বন্ধুদের সঙ্গে মজা করে গল্প করছেন এবং ওপাশে জাজ বাজছে তখন চুপচাপ সে ওই ঘটনাটা ভেবে যাচ্ছিল। সে নিশ্চিত কখনও বাচ্চাটার পড়ে-থাকা দৃশ্যটাকে ভুলতে পারবে না। নোংরা খবরের কাগজে মোড়া অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে বাচ্চাটা —একটা কসাইয়ের দোকানের দৃশ্য যেন। নিজের জীবনটা যেহেতু নিটোল আরামে কেটেছে তাই টোশিকো ওই পিতৃপরিচয়হীন শিশুটির দুরবস্থা সহজেই অনুভব করতে পারছিল।

আমি একমাত্র মানুষ যে ওই ঘটনাটির জন্য লজ্জিত বোধ করছি, এই রকম চিন্তা টোশিকোর মাথায় এল। ওর মায়ের পক্ষে জানা সম্ভব নয়, বাচ্চাটার তো

বোধই নেই যে সে খবরের কাগজে মোড়া অবস্থায় পড়ে ছিল। শুধু আমাকেই সারাজীবন ওই ভয়ংকর দৃশ্যটাকে মনে রাখতে হবে। যখন শিশুটি বড় হবে এবং তার জন্মবৃত্তান্ত জানতে চাইবে তখন আমি যদি নীরব থাকি তাহলে কেউ তাকে ব্যাপারটা শোনাতে পারবে না। আশ্চর্যের ব্যাপার আমার মধ্যে এমন অপরাধ-বোধ আসছে। হাজার হোক, এই আমিই তো ওকে মেঝে থেকে তুলে নতুন ফ্লানেলে মুড়ে আরামকেদারায় শুইয়ে দিয়েছি যেখানে ও ঘুমোতে পেরেছে স্বচ্ছন্দে।

নাইট ক্লাব থেকে বেরিয়ে ওর স্বামী ট্যাক্সি ডাকলে টোশিকো তাতে উঠল। বাইরে থেকে ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্বামী ড্রাইভারকে বললেন, 'ভদ্র-মহিলাকে আশিগোমে পৌঁছে দাও।' জানলা দিয়ে টোশিকো ওর স্বামীর হাসিমুখ দেখতে পেল। হাসলে স্বামীর সুগঠিত দাঁত দেখতে পাওয়া যায়। ট্যাক্সির সিটে হেলান দিয়ে ওর মনে হল তাদের জীবনযাত্রা খুব সহজ খুব স্বাভাবিক। এই চিন্তাটাই তাকে দুঃখিত করল। তার মাথায় যেসব ভাবনা আসে তা তার পক্ষে কথায় বোঝানো অসম্ভব। ট্যাক্সির পেছনের দরজা দিয়ে সে শেষবার স্বামীর দিকে তাকাল। তিনি তাঁর গাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। এবং তারপরেই তিনি জনারণ্যে হারিয়ে গেলেন।

ট্যাক্সিটা চলছিল! রাস্তার দুপাশে প্রচুর বার এবং তারপরে একটা থিয়েটার যার সামনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে প্রচুর লোক গল্পবাজি করছে। যদিও নাটক এখনই শেষ হয়েছে তবু এর মধ্যেই থিয়েটারের বাইরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। টোশিকো চোখ বন্ধ করল। যদি বা বাচ্চাটা তার জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল না হয়ে বড় হয় তবু সে সম্মানিত নাগরিক হতে পারবে না—টোশিকো ভাবছিল। ভাবনাটা তার মাথায় রেলগাড়ির কামরার মত ছুটে যাচ্ছিল আজ। ওই নোংরা রক্তাক্ত খবরের কাগজটাই যেন ওর সারজীবনের প্রতীক হয়ে থাকবে। কিন্তু কেন আমি ওর জন্যে এত ভাবছি? এর কারণ কি আমি আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিব্রত? ধরা যাক কুড়ি বছর পরে যখন আমাদের ছেলেটি একটি সুস্থ শিক্ষিত যুবক হবে তখন একদিন ভাগ্য-চক্রে ওর সঙ্গে সেই বাচ্চাটার দেখা হয়ে গেল যার বয়সও তখন কুড়ি হবে। এবং ধরা যাক, সেই যুবকটি যদি আমার ছেলের পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয় ।

এখন এপ্রিল মাসের একটি উষ্ণ রাত কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনা টোশিকোকে ক্রমশ শীতল করে তুলছিল। ট্যাক্সির সিটে বসে তার শরীরে একটা কাঁপুনি এল।

না। যখন সেই সময় আসবে তখন আমি আমার ছেলের জায়গাটা নেব। টোশিকো নিজেকেই বলল। আমি ওই যুবকটির কাছে গিয়ে সরাসরি তার জন্মবৃত্তান্ত শোনাব—সেই নোংরা খবরের কাগজ থেকে নতুন ফ্লানেল সব। কুড়ি

বছর পর আমার বয়স তো তেতাল্লিশ হবে।

কুড়ি বছর পরে ওই হতভাগ্য ছেলেটির কষ্ট আরও বাড়বে। হতাশা এবং দারিদ্র্যের শিকার হবে সে। ওই রকম জন্ম যার সে আর কি হতে পারে? পথেঘাটে ঘুরে জীবন কাটবে বাপ-মাকে ক্রমাগত গালাগাল দিয়ে। সন্দেহ নেই টোশিকো শেষ পর্যন্ত এইসব চিন্তার পরিণতিতে সুখ অনুভব করল। ক্রমাগত সে নিজেকে যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছিল। ব্রিটিশ এমব্যাসির সামনে দিয়ে ট্যাক্সিটা পেরিয়ে গেল। সেখানেই বিখ্যাত চেরিগাছের সারি তাদের সমস্ত পবিত্রতা নিয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎই টোশিকো ঠিক করল অন্ধকার রাত্রে ওই ফুলগুলোকে দেখবে। তার মত ম্রিয়মাণ এবং শান্ত মেয়ের পক্ষে এটা মোটেই স্বাভাবিক আচরণ নয় কিন্তু ওই মানসিক অবস্থায় সে বাড়িতে ফিরে যেতে চাইল না। সেই রাত্রে সবরকমের দুঃসাহসিক ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছিল।

সে রাস্তাটা পার হল। একটা ছিপছিপে একক শরীর অন্ধকারে হেঁটে যাচ্ছিল। আজকের রাত্রে যেন সমস্ত পার্কটা চেরিগাছের ফুলে ছেয়ে গিয়েছিল। শান্ত মেঘার্ত আকাশের তলায় সাদা চেরি ফুলেরা যেন জমাট অথচ চুপচাপ জনতার মত। গাছগুলোর মধ্যে তার বেঁধে যেসব কাগজের লণ্ঠন ঝোলানো ছিল তা নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বদলে লাল হলুদ সবুজ ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ জ্বলছে। এখন রাত দশটা এবং ফুল দেখার কোন দর্শক নেই।

খবরের কাগজগুলো, টোশিকোর চিন্তা আবার ফিরে গেল সেখানে। রক্ত-মাখা খবরের কাগজ। যদি কোন মানুষ এই গল্প শোনে, এবং জানতে পারে সে নিজে ওই ভাবে জন্মেছে তাহলে তার জীবনটাই ছারখার হয়ে যাবে। আমাকে সারাজীবন এই সত্যটা গোপন রাখতে হবে, একটি মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন যার সঙ্গে জড়িত, সে ভাবল।

চিন্তায় ডুবে টোশিকো পার্কে হেঁটে যাচ্ছিল। যারা আজও পার্কে ছিল তারা বেশীর ভাগই ছিল যুগলে এবং কেউ টোশিকোর দিকে লক্ষ্য করছিল না। সে দেখল দুটো মানুষ পাথরের বেঞ্চে বসে ফুলের দিকে না তাকিয়ে জলের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে আছে। জল তখন গভীর কালো এবং ছায়ায় আচ্ছন্ন। টোশিকো পার্কের বাঁধানো পথে হাঁটছিল। ফুলেরা তার মাথার ওপর নুয়ে এসেছে।

একটা পাথরের বেঞ্চিতে, একটু নির্জনে, সে একটা বিবর্ণ কিছু দেখতে পেল। প্রথমে মনে হয়েছিল চেরিফুলের গুচ্ছ, অথবা কারো ভুলে ফেলে যাওয়া কাপড়। কাছাকাছি হতে সে দেখল একটি মানুষের শরীর শুয়ে আছে। সে ভাবল লোকটা বোধহয় সেই রকমের মাতাল যারা এখানে-ওখানে শুয়ে থাকে। কাছা-কাছি এসে সে চমকে উঠল। শরীরটি খবরের কাগজে মোড়া তাই সাদা দেখাচ্ছিল। মাতালদের মত অবশ্যই নয়। বেঞ্চির পাশে দাঁড়িয়ে সে শরীরটির দিকে তাকাল। খয়েরি পোশাক পরে লোকটি খবরের কাগজে ঢাকা অবস্থায়

শুয়ে ছিল। বসন্ত আসার পর এটাই তার স্বাভাবিক আস্তানা। লোকটার লম্বা চুলের দিকে টোশিকো তাকাল। এই ঘুমন্ত খবরের কাগজে মোড়া মানুষটির দিকে তাকিয়ে তার সেই মেঝেতে পড়ে থাকা শিশুটির কথা মনে পড়ল।

টোশিকোর মনে হল তার সব ভয় সত্যি হয়েছে। অন্ধকারে লোকটির বিবর্ণ কপাল একটি যুবকের মনে হল যা দারিদ্র্য ও সংগ্রামের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত। লোকটার খাঁকি পোশাক এবং মোজাহীন জুতো দেখতে টোশিকোর ওর মুখ দেখার ইচ্ছে হল। বেঞ্চির মাথায় পাশে গিয়ে সে নিচে তাকাল। লোকটার হাতের আড়ালে মুখ কিন্তু লোকটা যে যুবক তা বোঝা গেল। তার পুরু ভুরু এবং খাড়া নাক, মস্ত ঠোটে যৌবন স্পষ্ট। আরও মুখ নামাল সে। নিস্তব্ধ রাত্রে যুবক চোখ মেলল। একটি তরুণীকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে চট করে উঠে বসল। তারপরেই একটি শক্তিশালী হাত টোশিকোর কবজি ধরে টানল। একটুও ভয় পেল না টোশিকো, ছাড়াবার কোন চেষ্টা করল না। এক মুহূর্তেই তার মনে হল কুড়িটা বছর পার হয়ে গেছে।

ওই রাজকীয় প্রাসাদের চেরি ফুলের বাগানে তখন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার এবং অনন্ত স্তব্ধতা নেমেছে।

তিরিশ

গ্যুণ্টর গ্রাস (১৯২৭-)

ওহো! তাহলে আমার পলায়ন, আমার চম্পট। ওটা তো এখনও বলা হয়নি আপনাকে। ভিটলারের দোষারোপ, অভিযোগ, গঞ্জনার ধার বাড়াতেই আমাকে পালাতে হল। আমি নিজেকে বললাম, চম্পট দিতে হলে প্রথমে একটা গন্তব্য স্থির করা দরকার। ওহে অস্কার, কোথায়ই বা পালাবে তুমি? রাজনৈতিক বাধা, তথাকথিত লৌহযবনিকা, আমার পূর্বমুখী হওয়ায় বাদ সাধল। আমার ঠাকুমা আন্না কোলজাইচেকের চারটি ঘাঘরার উদ্দেশেও ছুটে পালানো গেল না, যদিও কাশুবীয় আলুর ক্ষেতে আজও তাঁর সেই ঘাঘরা রক্ষণাত্মকভাবে ওড়াউড়ি করছে এবং যদিও আমি নিজেই নিজেকে শুনিয়েছিলাম যে, যদি পালাতেই হয় তবে আমার পিতামহীর ঘাঘরা একমাত্র কার্যকর গন্তব্যস্থল।

কথায় কথায় জানিয়ে রাখি: আজ আমি তিরিশে পা দিলাম। তিরিশ বছর বয়সে কারও পক্ষে পলায়নের মতো গম্ভীর বিষয়ে বালকোচিত নয়, পুরুষোচিত ভাবে আলোচনায় নামা দরকার। তিরিশটা মোমবাতিতে সাজানো কেকটা আনতে আনতে মারিয়া বলল: "তোমার তিরিশ হল আজ, অস্কার। এখন তোমার ঘটে একটু বুদ্ধি হওয়া দরকার।"

ক্লেপ, আমার বন্ধু ক্লেপ, বরাবরের মতোই আমাকে কতকগুলো জ্যাজ রেকর্ড দিল আর পাঁচ-পাঁচটা দেশলাইয়ের বাক্স ফুরিয়ে কেকের তিরিশটা মোমবাতি জ্বালল: "তিরিশে জীবন শুরু," বলল ক্লেপ। ও নিজে ঊনত্রিশ।

যা হোক, ভিটলার, আমার বন্ধু গটফ্রিড, যে কিনা আমার হৃদয়ের নিকটতম, আমাকে মিষ্টি দিল, আমার খাটের শিকগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে আওড়াতে লাগল: "যিশুর যখন ত্রিশ হল তিনি বেরিয়ে পড়ে নিজের চারধারে শিষ্যবর্গ জোগাড় করে ফেললেন।"

ভিটলারের বরাবরের পছন্দ আমার সব ব্যাপারকে ভজঘট করে তোলা। আমার বয়স যেহেতু তিরিশ ও চায় যে আমি খাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে শিষ্য জোগাড় করতে লাগি। ইতিমধ্যে আমার উকিল এলেন হাতে একটা কাগজ নাচাতে নাচাতে আর মুখে বাহবা ধ্বনিত করতে করতে। আমার খাটের ডাণ্ডায়

অনুবাদ: শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

ওঁর নাইলনের টুপিটা ঝুলিয়ে তিনি আমার প্রায় জন্মদিনের অভ্যাগত সকলের উদ্দেশে ঘোষণা করতে লাগলেন ঃ "কী সৌভাগ্যজনক এক সংযোগ! আজ আমার মক্কেল তাঁর ত্রিংশতি জন্মদিবস উদ্‌যাপন করছেন আর আজই আমি খবর পেলাম যে রিং ফিঙ্গার মামলাটি আবার নতুন করে শুরু করা হচ্ছে। একটা নতুন সূত্র আবিষ্কার হয়েছে। সিস্টার বিয়্যাটা, ওর বন্ধু, আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে··"

ঠিক যা ভয় করে আসছিলাম এতগুলো বছর, যবে থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি ঃ যে ওরা আসল খুনীকে পাকড়াও করবে, কেসটা নতুন করে চালু করবে, আমাকে খালাস দেবে, পাগলের হাসপাতাল থেকে আমাকে মুক্ত করবে, আমার সুন্দর বিছানাটা কেড়ে নেবে, আমাকে ঠাণ্ডার মধ্যে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেবে, বাতাস আর বৃষ্টির মধ্যে, আর ত্রিশ বছরের অস্কারকে বাধ্য করবে তার নিজের চারপাশে, তার ঢাকের চারধারে শিষ্য পরিবৃত হয়ে গেড়ে বসতে।

তো আপাতভাবে সিস্টার বিয়্যাটাই আমার সিস্টার ডরোথিকে খুন করেছিল হিংসের সবুজ আগুনে জ্বলে-পুড়ে।

আপনার হয়তো খেয়াল আছে। নাকি? দুই নার্সের মাঝখানে ছিলেন এই ডক্টর হেবনার—পরিস্থিতিটা সিনেমার মতো জীবনেও খুব প্রচলিত। বিশ্রী কাণ্ড ঃ বিয়্যাটা প্রেমে পড়েছিল ডাঃ হেবনারের। ডাঃ হেবনার প্রেমে পড়েছিলেন ডরোথির। আর ডরোথি কারোই প্রেমে পড়েনি যদি না পড়ে থাকে নিভৃতে, লুকিয়ে ছোট্ট অস্কারের। হেবনার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ডরোথি ওর দেখভাল করছিল কারণ ওঁকে রাখা হয়েছিল ওর সেকশানে। সিস্টার বিয়্যাটার সেটা সহ্য হয়নি। সে ডরোথিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এক পাক হণ্টন দিতে নিয়ে গেল গেরেশহাইমের যবের ক্ষেতের দিকে আর সেখানেই ওকে সাবড়ে দিল। ফলে বিয়্যাটার সুযোগ এসে গেল ডাঃ হেবনারের সেবা-শুশ্রূষা করার। তবে মনে হয় সে ডাক্তারের সেবা করেছিল খুবই যত্ন নিয়ে, বিশেষ ভাবে, এতখানি বিশেষত্ব নিয়ে যে তিনি আর ভাল হয়ে উঠলেন না। ঠিক উল্টোটাই হল। সম্ভবত প্রেমে পাগলি নার্সটা নিজেকে বুঝিয়েছিল ঃ যত ও অসুস্থ থাকে ততদিনই ও আমার। ও কি ডাক্তারকে একটু বাড়তি ওষুধ খাইয়েছিল? নাকি ভুল ওষুধ? সে যাই হোক ডাঃ হেবনার মারা পড়লেন। কিন্তু আদালতে জবানবন্দীতে সিস্টার বিয়্যাটা অতিরিক্ত ওষুধ বা ভুল ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে কিছুই বলল না, আর একটা শব্দও উচ্চারণ করল না যবের ক্ষেতে ডরোথিকে নিয়ে বেড়ানো নিয়ে। আর অস্কার, সে অনুরূপ ভাবে একটি কথাও কবুল করেনি, কিন্তু বোয়মে একটা দুষ্টু আঙুল গলিয়ে বসেছিল, তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হল যবের ক্ষেতের অপরাধের। কিন্তু অস্কার পুরোপুরি তার অপরাধের ভাগী নয় এই বিচারে তাকে পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল এক মানসিক রোগের

হাসপাতালে। তবে সে যাই হোক, তাকে শাস্তি দিয়ে মানসিক হাসপাতালে পাঠাবার আগেই অস্কার পগার পার হল কারণ আমি চেয়েছিলাম আমার পলায়ন দিয়ে বন্ধু গটফ্রিডের অভিযোগের মূল্য বাড়িতে দিতে।

সেই পলায়নের সময় আমার বয়স ছিল আঠাশ। কয়েক ঘণ্টা আগে তিরিশটা মোমবাতি গলে গলে, চুইয়ে চুইয়ে পড়ে চলছিল আমার জন্মদিনের কেকের ওপর। আমার পলায়নের দিনটাও ছিল সেপ্টেম্বরে, যেমন আজ। কন্যারাশিতে জন্ম হয়েছিল আমার। এই মুহূর্তে অবিশ্যি আমি আমার চম্পটের কাহিনী শোনাচ্ছি, আলোর বাতির নিচে আমার জন্মবৃত্তান্ত নয়।

তা যেমনটি বলছিলাম, পূর্বের পথ, ঠাকুমার দিকের রাস্তাটা আমার বন্ধই ছিল। ফলে, আজকালকার আর সকলের মতো আমাকে পাড়ি দিতে হল পশ্চিমেই। আমি বললাম নিজেকে, অস্কার, যদি রাজনীতির দুর্বোধ্য পন্থা ঠাকুমার কাছে যাওয়ার পথটা তোমার রোধ করে তো তোমার ঠাকুর্দার কাছে গিয়ে পড়তে কী অসুবিধে? যিনি নাকি থাকেন এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলোতে। আমেরিকাকে করো তোমার গন্তব্য : আর দেখি তুমি কতদূর গিয়ে পৌঁছোও।

আমেরিকায় আমার ঠাকুর্দা কোলজাইচেকের কথাটা যখন আমার মনে এল তখনও আমার চোখ দুটো বন্ধ আর গেরেশহাইমের কাছে সেই ক্ষেতে গরুটা আমার গা চেটে যাচ্ছে। তখন নিশ্চয়ই সাতটা-টাতটা বাজে আর আমি নিজেকে বললাম : "দোকান খোলে আটটায়।" হাসতে হাসতে গরুটার কাছে আমার ঢাকটা ফেলে আমি দৌড় দিলাম আর মনে মনে বলতে থাকলাম : গটফ্রিড খুব ক্লান্ত। আটটা কিংবা সাড়ে আটটার আগে ও পুলিশে যাবে বলে মনে হয় না। কাজেই সময়ের দিক থেকে যে একটু এগিয়ে আছ তার সুযোগ নাও। গেরেশ-হাইমের ওই ঘুমন্ত পল্লীতে টেলিফোন করে একটা ট্যাক্সি জোগাড় করতে আমার দশ মিনিট চলে গেল। ট্যাক্সিতে চলে গেলাম সেণ্ট্রাল স্টেশন। যেতে যেতে আমার টাকাপয়সা গুনতে লাগলাম; বেশ ক'বার আমাকে গোড়া থেকে গোনা শুরু করতে হল কারণ আমি কিছুতেই হাসি চাপতে পারছিলাম না, গমকে গমকে বেরিয়ে আসছিল প্রত্যূষের তরতাজা হাসির হাওয়া। তারপর আমি পাতা উল্টে দেখতে পেলাম যে আমার পাসপোর্টে ওয়েস্ট কনসার্ট ব্যুরোর দাক্ষিণ্যে ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটো ভিসাও আছে। ডঃ ডশের বরাবরের আশা ছিল যে ঢাকী অস্কার একদিন না একদিন ওই দেশগুলি ভ্রমণে সম্মত হবে।

বাঃ! বেশ! আমি বলে উঠলাম, তাহলে প্যারিসেই পালানো যাক, কাজটা দেখতে-শুনতে ভালই হবে, যদি ঘটেও যায় সিনেমার পর্দায়, যখন গ্যাব্যাঁ পাইপ ফুঁকতে ফুঁকতে আমার পিছু নেবেন, সারাক্ষণ আমার প্রতি সহৃদয়তা ও সহানুভূতি দেখিয়ে। কিন্তু আমার ভূমিকায় নামবেন কে? চ্যাপলিন?

পিকাসো ? আমার পলায়নের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাসতে হাসতে আমি তখনও আমার ঈষৎ ভাঁজ-পড়া ট্রাউজারের থাইয়ের কাছটায় চাপড় মেরে যাচ্ছিলাম যখন গাড়ির চালক আমার কাছে সাত ডয়েশ মার্ক চেয়ে বসল। আমি ভাড়া মিটিয়ে স্টেশনের রেস্তোরাঁয় প্রাতরাশ খেয়ে নিলাম। আমার নরম-সেদ্ধ ডিমের পাশে ট্রেনের টাইমটেবলটা ছড়িয়ে পেতে একটা উপযুক্ত ট্রেন স্থির করলাম। প্রাতরাশের পরেও সময় ছিল কিছু বিদেশী মুদ্রা সংগ্রহের আর একটা ছোট্ট, চমৎকার চামড়ার সুটকেস কেনার। ইয়ুলিখর স্ট্রাসে নিজের মুখ দেখানোয় ভয় থাকায় আমি সুটকেস ভরে ফেললাম দামী কিন্তু বেঢপ সাইজের সব শার্টে, একটা হাল্কা সবুজ পায়জামা, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট হেনাতেনায়। একটা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনলাম এবং খুব শিগগির নিজেকে আবিষ্কার করলাম একটা আরামদায়ক, গদিমোড়া, জানালা-ঘেঁষা এক প্রথম শ্রেণীর সিটে, আর দেখলাম যে কোনও রকম কায়িক শ্রম ব্যতিরেকেই দিব্যি ভাগলবা হচ্ছি। গদিগুলো আমাকে চিন্তায় মদত দিল। ট্রেনটা যখন রওনা দিল, আমার পলায়নের সূচনা করে, অন্ধকার ইতিউতি চাইতে লাগল ভয় পাবার মতো কোথাও কিছু খুঁজে বার করতে ; কারণ যথেষ্ট কারণবশতই আমি আমাকে বোঝালাম ঃ তুমি ভয় ছাড়া পলায়নের কথা উচ্চারণই করতে পারো না। অথচ অন্ধকার, তুমি কিসের থেকে ভয় পাবে ? পালিয়ে গিয়ে তোমার লাভটা কোথায় যখন জানই যে পুলিশ তোমাকে নিঙড়ে প্রত্যুষের কিছুটা তরতাজা হাসি বৈ আর কিছুই বার করতে পারবে না ?

আজ আমার তিরিশ হল ; পলায়ন এবং বিচার আমার পিছনে পড়ে আছে, কিন্তু পালাতে পালাতে ভয়ের প্রসঙ্গ তুলে সেই যে ভয় ভেতরে গেঁথে দিয়েছিলাম তা আজও আমার সঙ্গে আছে।

সেটা কি রেল লাইনের ছন্দিত ঝাঁকুনি, নাকি ট্রেনেরই ঝনঝনানির জন্যই ? ধীরে ধীরে গানটা তৈরি হয়ে উঠেছিল, এবং আখেনের সামান্য আগে আমি সেটির সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠলাম। একঘেয়ে শব্দ। আমি যতই প্রথম শ্রেণীর গদিতে সেঁধিয়ে যাচ্ছিলাম ততই যেন শব্দগুলো আমাকে পেয়ে বসছিল। আখেন পেরোবার পরও—আমরা সাড়ে দশটায় পেরিয়ে গেলাম দেশের সীমান্ত—তার। আমার সঙ্গে থেকে গেল, বরং ক্রমশ স্পষ্ট আর ভয়ংকর হয়ে উঠতে থাকল, এবং আমি খুশিই হলাম যখন কাস্টমসের লোকরা এসে বিষয়টা বদলে দিল। ওরা আমার নাম বা পাসপোর্টের চেয়ে বেশি কৌতূহল দেখাল আমার কুঁজে আর আমি নিজেকে বলতে থাকলাম ঃ ওহ, ওই ভিটলার ! ওই কুঁড়ের বাদশাটা। এগারোটা বাজতে চলল এখানে আর ওই হতভাগা এখনও বগলে বোয়মটা নিয়ে পুলিশের কাছে গিয়ে উঠতে পারল না। ইদিকে আমি ওরই খাতিরে সাতসকালে উঠে পিট্টান দিতে ব্যস্ত, সারাক্ষণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কী করে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া মনের ভেতর যাতে কিনা পলায়নের একটা

উদ্দেশ্য অন্তত খাড়া করা যায়। বেলজিয়াম এলো। উঃফ্! কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম রে বাবা যখন রেললাইন থেকে গান গজিয়ে উঠল ঃ

কোথায় ডাকিনী, আলকাতরা মাখা ?

এই সে মাগী, বেজায় কালা

হা হা হা……

আজ আমি ত্রিশ। আমার নতুন করে বিচার হবে এবং সম্ভবত খালাস পেয়ে যাব। আমাকে ধরে বার করে দেবে রাস্তায় আর সর্বত্র আমার কানে বাজবে, ট্রেনে বাসে সর্বত্র, ওই এক শব্দগুচ্ছ ঃ কোথায় ডাকিনী, আলকাতরা মাখা ? এই সে মাগী, বেজায় কালা, হা হা হা…

বেশ পরিচ্ছন্ন যাত্রা হল আমার, যদিও প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কায় ছিলাম এই বুঝি কালা ডাকিনী চড়াও হল আমার ওপর। পুরো কমপার্টমেন্টটাই আমার একার হয়ে গিয়েছিল যদিও মাগী হয়তো ঠিক পাশেরটাতেই হাজির ছিল। আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হল বেলজিয়ান কাস্টমস ইন্সপেক্টরের, তারপর ফরাসি ইন্সপেক্টরের, আর তারই মধ্যে মধ্যে আমি ঘুমে হেলে পড়ছিলাম প্রায়, অবশেষে জেগে উঠলাম একটা ছোট্ট কান্না দিয়ে। ডাকিনীকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টায় ডুসেলডর্ফের প্ল্যাটফর্ম থেকে কেনা 'ডের স্পিগল'-এর পাতা ওল্টাতে লাগলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম কী চমৎকার ভাবেই না লোকগুলো জায়গা মতো পৌঁছে যায়, সব খবরাখবর পেয়ে যায়। আমি তারই মধ্যে আমার ম্যানেজার ডঃ ডশেরও একটা খবর পেয়ে গেলাম। ওয়েস্ট কনসার্ট ব্যুরোর ডঃ ডশের খবরে জানাচ্ছে, যা আমি আগের থেকেই জানি, যে ঢাকী অস্কারই ডশ এজেন্সির খুঁটি এবং আসল শিল্পী—আমার একটা ভাল ফটোও ছেপেছে। আর খুঁটি অস্কার মনের পর্দায় স্পষ্ট দেখতে পেল আমার গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্ট কনসার্ট ব্যুরোর অবশ্যম্ভাবী পতন।

জীবনে কখনও আমি কালা ডাকিনীকে ডরাইনি। পালাবার সময়টায়, যখন আমি ভয় পেতেই চাইছিলাম, মাগীটা আমার চামড়ার নিচে সুড়সুড়িয়ে ঢুকে পড়ল। আর সেখানেই সে থেকে গেছে আজ অবধি, আমার এই তিরিশ বছরে পা দেওয়া অব্দি, যদিও বেশির ভাগ সময়টা সে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। নানান রকম আকার ধরে ডাকিনী। যেমন, কখনো-সখনো 'গ্যয়টে' নামটা দেখা বা শোনা মাত্র আমি ভয়ে ডাক ছেড়ে কেঁদে বিছানার তলায় লুকোতে ছুটি। শৈশব থেকেই আমি যতটা পেরেছি চেষ্টা করেছি কবিকুলমণিকে পড়ে ওঁর, কিন্তু ওঁর ওই অভ্রংলিহ প্রশান্তি দেখলেই আমার হাড়ে কাঁপুনি ধরে। আর আজও, যখন তিনি আর সেই আগের মতো জ্যোতিষ্মান আর মাগীয় নেই, কিন্তু এক কালা ডাকিনীর বেশে যে-কোনও রাসপুটিনের চেয়ে ঢের গুণ ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক আমার কাছে, যখন তিনি আমার খাটের শিকের ফাঁক দিয়ে আমার দিকে জ্বলজ্বল

করে তাকান আর জিজ্ঞেস করেন, আমার এই ত্রিংশতি জন্মদিনের লগ্নে ঃ "কোথায় ডাকিনী, আলকাতরা মাখা ?'—আমি ভয়ে টানটান হয়ে যাই।

হা হা হা করে হেসে উঠল ট্রেনটা পলাতক অন্ধকারকে প্যারিসের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে। আমি ততক্ষণে আন্তর্জাতিক পুলিশের খপ্পরে পড়ব বলে ধরে নিয়েছি ট্রেন যখন ঢুকতে শুরু করেছে পূর্বের স্টেশনে, ফরাসিতে যাকে বলে গার দ্যু নর্। কিন্তু সেখানে কেউই আমার অপেক্ষায় ছিল না, কেবল একজন কুলি এতখানি স্বস্তিদায়ক ভাবে লাল ওয়াইনের গন্ধ ছাড়ছিল যে আমি আমার সমস্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে কালা ডাইনি বলে ভেবে নিতে পারলাম না। আমি ওকে আমার স্যুটকেসটা দিলাম এবং ও সেটা গেটের বাইরে কয়েক ফুট দূরে অবধি টেনে নিয়ে গেল। আমি নিজেকে বলতে থাকলাম, পুলিশ এবং ডাইনি সম্ভাত প্ল্যাটফর্ম টিকিট কিনে পয়সা নষ্ট করার পক্ষপাতী নয়, ওরা তোমাকে গ্রেপ্তার করলে গেটের বাইরেই করবে। কাজেই তুমি বেরিয়ে যাওয়ার আগে স্যুটকেসটা জোগাড় করে নাও। কিন্তু সেখানেও পুলিশ এসে আমাকে ভারমুক্ত করল না ; নিজেকেই সেটা টানাটানি করে নিয়ে যেতে হল মেট্রো অব্দি।

আমি আর মেট্রোর ওই প্রসিদ্ধ গন্ধের ব্যাপারে বিশদ করে কিছু বলতে যাব না। সম্প্রতি কোথায় পড়লাম যেন ওই গন্ধকে ওরা বদলে পারফিউমের মতো সুগন্ধি করে তুলেছে এবং কেউ চাইলে সেটা গায়ে স্প্রে করে নিতেও পারে। মেট্রোও দেখি কালা ডাইনি নিয়ে প্রশ্ন করে যাচ্ছে, যদিও তার ছন্দ রেললাইনের ছন্দের থেকে বেশ আলাদা। আর আরও একটা ব্যাপার আমি নজর করলাম ঃ কামরার অন্য যাত্রীরাও তার ভয়ে ততটাই তটস্থ যতটা কিনা আমি, কারণ ওদের দেখছিলাম ভয়ে গা দিয়ে ঘাম ছুটছে। আমার ইচ্ছে ছিল ততক্ষণ পাতাল রেলে চড়াও থাকা যতক্ষণ না প্লাস দিতালি পৌঁছুচ্ছি, যেখান থেকে আবার ট্যাক্সি ধরে ওলি বিমানবন্দরে যাওয়ার ইচ্ছে। যদি পূর্বের স্টেশনে ধরা পড়লামই না তাহলে বিশ্ববিখ্যাত ওলি এয়ারপোর্টে ধরা পড়লেও তো মন্দ হয় না—যদি ডাইনি সেখানে এক সুন্দরী বিমান সেবিকা সেজেই উপনীত হয় ; এবং সেভাবে সেখানে ধরা পড়াটা রীতিমত মনোগ্রাহী ব্যাপার হবে। আমাকে ট্রেন বদলাতে হচ্ছিল মাত্র একটাই, আর আমার বেশ আহ্লাদই হচ্ছিল যে আমার স্যুটকেসটার ওজনও বিশেষ ছিল না। মেট্রো আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল দক্ষিণে, আর আমি ভাবলাম ঃ কোথায় নামবে তুমি, অন্ধকার ? হায় কপাল ! এক দিনে কতখানি কী যে ঘটে যেতে পারে। আজ সকালেই গেরেশহাইমের অদূরে একটা গাই তোমায় চেটে দিল, তুমি নির্ভীক এবং আনন্দিতই ছিলে, আর এখন তুমি প্যারিসে—আর জানো না কোথায় তুমি নামবে, কোথায় আসবে সেই ডাইনি, কালো ও ভয়ঙ্করী, তোমার সন্ধানে। প্লাস দিতালিতে ? নাকি পোর্ৎ না আসা অবধি অপেক্ষা করতে হবে ?

আমি নেমে পড়লাম পোর্তের এক স্টেশন আগে, মেজ' ব্র'শ-এ ; মাথায় শুধু একটাই ভাবনা—ওদের ভাবা উচিত যে আমি ভাবছি যে ওরা পোর্তে আছে আমার অপেক্ষায়। কিন্তু ডাইনিটা তো জানে আমি কী ভাবছি আর ওরাই বা কী ভাবছে। তা ছাড়া আমার ততক্ষণে বিরক্তি ধরে গেছে। আমার পলায়ন আর ওই পলায়নের জন্য চাগিয়ে তোলা ভয় আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছে। বিমান বন্দরে যাওয়ার সব বাসনা উবে গেছে অস্কারের ; এই মুহূর্তে ওর্লি'র চেয়ে মেজ' ব্র'শকে ওর ঢের বেশ মৌলিক জায়গা বলে মনে হল। ভাবনাটা ওর ঠিকও ছিল। কারণ বিশেষ এই মেট্রো স্টেশনটিতে একটা বৈদ্যুতিক সিঁড়ি, এস্ক্যালেটর ছিল। আমি ভাবলাম যে, একটা এস্ক্যালেটর হয়তো আমার মধ্যে একটি দুটি উন্নত অনুভূতির উদ্রেক করতে পারে এবং সিঁড়িটির ঝনঝনানি হয়তো ডাইনির পক্ষেও অনুকূল ধ্বনি হতে পারে—'এই সে ডাইনি কালা পাজি, হা হা হা'।

অস্কার বেশ ফাঁপরে পড়েছে। ওর পলায়নের ইতি হতে চলেছে, আর সেই সঙ্গে ওর কাহিনীরও। মেজ' ব্র'শ মেট্রোর এস্ক্যালেটর কি যথেষ্ট উঁচু, খাড়া আর প্রতীকী হবে যাতে কিনা তা ওর স্মৃতিকথার ওপর একটা যবনিকাপাত ঘটাতে পারে?

কিন্তু আমার ত্রিংশ জন্মদিনটাও তো আছে। যেসব লোকের ধারণা যে একটা এস্ক্যালেটর বড্ড বেশি আওয়াজ করে এবং যারা কালা ডাইনি হতে ভীত নয় তাদের সবাইকে আমি আমার ত্রিংশতি জন্মদিনটা একটা বিকল্প সমাপ্তি হিসেবে উপহার দিলাম। কারণ সমস্ত জন্মদিনের মধ্যে ত্রিংশতি জন্মদিনটাই কি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়? এই সংখ্যাটিতে 'তিন' আছে এবং তাতে 'ষাট'-এর আভাস ও ছায়া আছে, যার ফলে ষাট ব্যাপারটা বাড়তি ব্যাপারে দাঁড়িয়ে যায়ঃ আজ সকালে যখন আমার জন্মদিনের কেকের ওপর তিরিশটা মোমবাতি জ্বলছিল আমি হয়তো আনন্দ ও আবেগে কেঁদে ফেলতে পারতাম, কিন্তু মারিয়ার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে আমার লজ্জা করছিলঃ তিরিশ বছর বয়সে তোমার কাঁদার অধিকারও চলে যায়।

যে মুহূর্তে আমি এস্ক্যালেটরের প্রথম ধাপিতে পা দিলাম—যদি এস্ক্যালে-টরেরও প্রথম ধাপ বলে কিছু থেকে থাকে—এবং সেটা চলতে থাকল ঊর্ধ্বপানে আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম। ভয় থাকা সত্ত্বেও কিংবা ওই ভয়ের দরুনই আমি হেসে ফেললাম। ধীরে ধীরে এস্ক্যালেটর খাড়াভাবে ওপরে উঠতে থাকল—আর সেখানেই ওরা অপেক্ষায়। তখনও হাতে কিছুটা সময় আধখানা সিগারেট ফোঁকার। আমার দু' ধাপ ওপরে গোটা দুই প্রেমিকযুগল খেলাধুলি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমার এক ধাপ নিচে একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা যাঁকে হঠাৎ দেখে বিনা কারণেই প্রায় সন্দেহ করে বসলাম ডাইনি হিসেবে। ওঁর টুপিতে ফলের

মতো সব কাজ করা। ধূমপান করতে করতে আমি জব্বর চিন্তায় মশগুল হতে চেষ্টা চালালাম, যেসব চিন্তা উদিত হওয়া উচিত এস্ক্যালেটরে দাঁড়ানো অবস্থায়। অস্কার হল গিয়ে নরক থেকে নিষ্ক্রমণের পথে দান্তে ; আর ওপরে, এস্ক্যালেটরের ডগায় 'ডের স্পিগল'-এর সেই সব তৎপর রিপোর্টাররা তার প্রতীক্ষায়। "তাহলে দান্তে," তারা জিজ্ঞেস করল, "কেমন দেখলেন নিচেটায় ?" তারপর আমি হলাম গ্যয়টে, কবিকুলমণি, আর রিপোর্টাররা আমায় জিজ্ঞেস করল জননীদের কাছে আমার সফর কীরকম হল। কিন্তু আমি তখন কবিদের নিয়ে বিরক্ত হয়ে আছি আর নিজেকে বললাম ঃ ওপরে 'ডের স্পিগল'-এর কোনও সাংবাদিক বা পকেটে ব্যাজ নিয়ে ঘোরা কোনও গোয়েন্দা আমার অপেক্ষায় নেই। আছে তো ও-ই আছে, ডাইনি। 'এই সে ডাইনি দুষ্টু কালা, হা হা হা!'

মাকন্দোয় বৃষ্টি, ইসাবেলের স্বগতোক্তি

গাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কেজ (১৯২৮-)

জ্যৈষ্ঠ মাসের সেই দিনটা ছিল রবিবার। আগের দিন শনিবারের রাত্তিরটা গরমে, ঘামে প্রায় দমবন্ধ অবস্থায় কেটেছে। কিন্তু রবিবার সকাল হতে, বাতাসে একটা শীতের মতো আমেজ আসতে, খুশিতে মনটা আমাদের ভরে উঠেছিল। ভাবতেই পারিনি রবিবার সকাল থেকেই বৃষ্টি নামবে। সবে গির্জার প্রার্থনা-সভা সেরে, রোদ্দুরের তাপ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে হাতের ছোট ছাতা-গুলোকে খুলেছি, অমনি এক দঙ্গল পাগলী বুনো হাতির মতো সবকিছু লণ্ড-ভণ্ড করে ছুটে এল একটা ঝড়। কালবৈশাখির ঝড়ের মতো সে ছিল কালো, কর্কশ। আমার পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল—"মনে হচ্ছে এটা বান আসার হাওয়া।" জানি না কেন, আমি কিন্তু আগে থেকেই সেটা আঁচ করেছিলাম। যখন গির্জার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছিলাম, তখন হঠাৎ আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল, মনে হচ্ছিল আমি যেন একটা কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল মাটির ওপরে পা রেখে চলেছি। আশপাশের মানুষরা ধুলোবালির ঝড় থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে এক হাতে মাথার টুপি চেপে অন্য হাতে মুখ আড়াল করে দৌড়ে পালাচ্ছিল পাশের বাড়িগুলোয় আশ্রয় নিতে। ধূসর কালো আকাশকে দেখে মনে হচ্ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগের চটচটে গা আর বিরাট ডানাওয়ালা প্রাণী, যে তার ডানাগুলোকে আমাদের মাথার মাত্র এক হাত ওপর থেকে জোরে জোরে ঝাপটাচ্ছিল।

সকালের বাকি সময়টা আমি আর সৎমা বসেছিলাম বারান্দায়। তীব্র উত্তাপে দগ্ধ, শুকনো গরমের দিনগুলোর সাক্ষী হিসাবে, যে সব ছোট-বড় নানান মাপের মাটির টবে রাখা গাছগুলো ছিল, সেগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল ওদের দাবানলে দগ্ধ হওয়ার দিনগুলো শেষ হল। সারাটা গ্রীষ্মের লেলিহান চুল্লিতে দগ্ধপ্রায় মাটি আজ শান্তি পেল। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে মিশেছিল চিরহরিৎ সুগন্ধি গুল্মের গন্ধ। ছড়িয়ে পড়েছিল বাতাসে, আনন্দে মন আমার ভরে উঠেছিল। শুধু কি সুগন্ধ, গাছপালাগুলো যেন পুনর্জন্ম লাভ করলো, তাদের সজীব সতেজ প্রাণ-চঞ্চলতায়। বিশ্বপ্রকৃতি

অনুবাদ: ভবানীপ্রসাদ দত্ত

পুলকিত হয়ে উঠেছিল, যে খুশির ছোঁয়াচ এসে লেগেছিল আমাদের সকলেরই মনে।

দুপুরে খেতে বসে বাবা বললেন, "বৈশাখের শেষে, জ্যৈষ্ঠের প্রথমে যদি বৃষ্টি নামে তবে সেটা প্রকৃতির পক্ষে সুলক্ষণ, সময়টা ভালো যাবে—।" নূতন ঋতুর দীপ্তিময় উজ্জ্বলতার স্পর্শ এসে লেগেছিল আমার সৎমার মুখে। উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ! ঠিক তাই, প্রভু যীশুর পবিত্র বাণীতে আমি তাই শুনেছি—।" শুনে বাবা সামান্য হেসেছিলেন। সেদিন বারান্দার ধারে বসে আধবোজা চোখে বৃষ্টি দেখতে দেখতে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে তিনি দুপুরের খাওয়া সারলেন। বাবার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছিল, তিনি যেন জেগে ঘুমিয়ে কোনো স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন।

চারদিকের শান্ত পরিবেশের মধ্যে অপরাহ্নে ট্রেনে চড়ে যেতে যদি মুষলধারে বৃষ্টি নামে, তখন মনে হয় যেন কোনো জলপ্রপাতের শব্দ শুনছি। ঠিক তেমনি একটা শব্দ করে সারাটা বিকেল ধরে একটানা একসুরে বৃষ্টি পড়ল। বুঝতে না পারলেও অনুভব করছিলাম, বৃষ্টির জোরালো ছাটগুলো অন্তঃস্থলকে স্পর্শ করছে।

সোমবারের সকালে, সামনের খোলা চত্বরটা থেকে ছুটে-আসা ছুঁচ-ফোটানো ঠাণ্ডা হাওয়ার হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য ঘরের দরজা জানলাগুলো যখন বন্ধ করতে শুরু করলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, প্রবল এই বৃষ্টির তোড়ের কাছে, আমাদের বোধশক্তিগুলো আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছে। চারপাশে সবকিছুই প্রায় তখন জলে-ডুবুডুবু অবস্থায়। সকালটা ভাল করে দেখা দিতেই, আমি আর সৎমা দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম বাগানের অবস্থাটা দেখার জন্যে। কিছুক্ষণ আগে যে মাটিকে দেখেছিলাম রুপোর মতো চকচকে কঠিন, এখন সে শস্তাদরের সাবানের মতো ফেনিল, পিচ্ছিল। ফুলের টবগুলো থেকে জল উপছিয়ে কর্দমাক্ত মাটিতে পড়ছে। সেদিকে তাকিয়ে সৎমা বললেন, "সারা রাত ধরে যা জল ওরা চেয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি পেল—।" যাঁকে গতকাল দেখেছিলাম আনন্দে উৎফুল্ল আজ তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম তিনি ক্লান্তিতে শিথিল। মাত্র একটা রাতের বৃষ্টির জল তাঁকে নিঙড়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বললাম, "তুমি ঠিকই বলেছিলে, গতকালই উচিত ছিল ফুল আর সুগন্ধি গাছের টবগুলোকে চাকরদের দিয়ে বারান্দায় তুলে এনে রাখা, অন্তত বৃষ্টির তেজটা না কমা পর্যন্ত—।" বলে বৃষ্টির দিকে তাকালাম, মনে হল সে এক বিরাট বটগাছের মতো হয়ে লাফিয়ে আরো একটা বিরাট বটগাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

রবিবারের সকালে বারান্দার যেখানটায় বাবাকে বসে থাকতে দেখেছিলাম সেখানটা ছেড়ে তিনি আর কোথাও নড়েননি। অবিশ্রাম বৃষ্টি সম্বন্ধে কোনো

কথা না তুলে তিনি শুধু বললেন, "মনে হচ্ছে সারা রাত ভালো ঘুম হয়নি ; তাই সকালে উঠতেই কোমরের ব্যথাটা আবার কষ্ট দিচ্ছে—।" কথাটা শেষ করেই সামনের চেয়ারটায় পা-দুটোকে ছড়িয়ে, শূন্য দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। অন্ধকার নামতে, খাবারের থালাটা তাঁর টেবিলের ওপর রাখতেই, দু-হাত দিয়ে সেটা সরিয়ে বললেন, "মেঘের যা অবস্থা, পরিষ্কার হওয়ার লক্ষণ তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না—।" তখনই মনে পড়ল গ্রীষ্মের সেই তাপদগ্ধ দিনগুলোর কথা। মনে পড়ল ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমে, গায়ের জামাগুলো ঘামে ভিজে চপচপ করতে থাকে। যখন দুপুরগুলো তাদের সময়টাকে হারিয়ে ফেলে, আর আমরা গরমে ঘেমে সন্ত্রস্ত নিদ্রায় মৃতের মতো আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে থাকি, এমনকি সময়ের ভারে গায়ের জামাগুলো পর্যন্ত প্রাণহীন হয়ে শরীরের সঙ্গে লেপটে থাকে। তখন মনে হত যেন কোনো ক্রমবর্ধমান, অনুজ্জ্বল নিষ্প্রভ মৃতপ্রায় একটা অহমিকা অনেক চেষ্টা করেও সময়ের নৌকা ডিঙিয়ে পারে এসে পেঁছতে পারছে না। দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল ছাত আর দেয়ালের সন্ধিস্থলে, দেখলাম বৃষ্টির জলে ভিজে জোড়গুলো ফুলে, ফেঁপে উঠেছে।

আমার 'মা'-র লাগানো যুঁইফুলের গাছগুলো, বৃষ্টির জলের তোড়ের কাছে হার স্বীকার করে মাথা নুইয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছিল, ওরা যেন মা'র স্মৃতিচারণে স্তব্ধ, মগ্ন। সামনে বাগানের রিক্ততা এই প্রথম আমাকে স্পর্শ করলো। বাগানটার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, সবকিছুই যেন অসীম শূন্যতায় ভরে গেছে। বাবাকে দেখছিলাম, দোলনা-চেয়ারটায় নিজের শরীরটাকে ছড়িয়ে, উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। কি বিষণ্নতা সেই দৃষ্টিতে, দেখে মনে হচ্ছিল এই ঘোর বর্ষণের গোলকধাঁধার পরিমাপ করার জন্যে তিনি যেন গভীর চিন্তামগ্ন। ভরা ভাদ্রের রাতগুলোর কথা মনে এলেই, আমার মনে হত একটা শুকনো অক্ষরেখার ওপরে দাঁড়িয়ে ঘূর্ণায়মান মাটির শব্দ শুনছি। যেন সহস্র বছর ধরে তৈলহীন শুকনো সুতোকাটা কলের আওয়াজের মতো ক্যাঁচক্যাঁচে একটা শব্দ। বুঝতে পারছিলাম, বিপন্ন এক বিষণ্নতার মাঝে আমি ডুব দিয়েছি।

রবিবারের মতো সোমবার সারাটা দিন মুষলধারে বৃষ্টি হল। শুধুমাত্র জলপ্রপাতের সুরটাই একটু পালটেছিল। মনের সব তেতোটুকু গিয়ে মিশেছিল জলের সঙ্গে! মনে হচ্ছিল, আমরা একটা ঘটনার মুখোমুখি হতে চলেছি! রাত্রি নেমে আসার অনেক আগেই অন্ধকার নেমে এল। পাশ থে[illegible]কে বলে উঠলো, "ওঃ। এই একঘেয়ে বৃষ্টি আর সহ্য করা যাচ্ছে না—।" না তাকিয়েও বুঝতে পেরেছিলাম, ওটা মার্তিনের গলার আওয়াজ। আঁচ করেছিলাম, আমার পাশের চেয়ারটাতেই ও বসে আছে। ওর গলার আওয়াজটার কোনো পরিবর্তনই

হয়নি, তেমনিই ভয়ংকর কঠিন আর ঠাণ্ডা। যা দিয়ে একটা বিষণ্ণ পৌষের প্রত্যূষে ও স্বীকৃত হয়েছিল আমার আইনতসিদ্ধ স্বামী হিসেবে। তারপর পাঁচটা মাস কেটে গেছে, এখন ওর সন্তান আমার গর্ভে। সেই মার্তিন আজ আমার পাশে বসে অবিশ্রাম এই বৃষ্টির ধারাকে একঘেয়ে, ক্লান্তিকর বলে আমায় বোঝাতে চাইছে। উত্তর দিলাম, "আমার কিন্তু একটুও একঘেয়ে লাগছে না। বরং সামনের বাগানটার রিক্ত অবস্থা দেখে মনটা আমার দুঃখে ভেঙে যাচ্ছে। কেবলই মনে হচ্ছে যদি ফুলের টবগুলো সময়মত সরিয়ে এনে আমাদের মতো একটা নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতে পারতাম—" বলে, পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখলাম মার্তিন নেই। অন্ধকার থেকে পরিচিত সেই কণ্ঠস্বর আবার ভেসে এল—"মনে হয় না, এই বৃষ্টি আর কোনোদিন থামবে—।" এবারও ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, পাশের চেয়ারে মার্তিন নেই।

মঙ্গলবার সকালে বারান্দায় দাঁড়াতে প্রথমেই দৃষ্টিটা গিয়ে পড়লো একটা গরুর ওপর। বৃষ্টিভেজা নরম আঠালো কাদামাটির ভেতরে সে তার সামনের পায়ের খুরদুটোকে ঢুকিয়ে মাথা নিচু করে না-বসা, না-শোওয়া অবস্থায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছিল ও এক অবাধ্য বিপ্লবীর মতো, পিচ্ছিল, এঁটেল কাদার মধ্যে আটকে পড়ে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে অবমানিত ও নিশ্চল এক অবস্থায়। সকালে বাড়ির আদিবাসী চাকরগুলো লাঠি, পাথর ইত্যাদির সাহায্যে ওকে স্থানচ্যুত করার বহু চেষ্টা করল, কিন্তু অবিশ্বাস্য রকমের একটা অনুত্তেজিত অচঞ্চল অবস্থায় ও ওর নিজস্ব জায়গাটুকু ছেড়ে এক পা-ও সরলো না। বরং অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে তার বিরাট মাথাটা নিচু করে লৌহ-কঠিন অবস্থায় সে দাঁড়িয়ে রইল। সারাটা দিন ধরে বাড়ির আদিবাসী ওই চাকরগুলো ওকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল যতক্ষণ না আমার বাবার গম্ভীর গলার আওয়াজ ওকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গর্জন করে উঠেছিল—"ওকে তোমরা আর বিরক্ত কোরো না, সময় হলে ও যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ঠিক চলে যাবে—।"

মৃতদেহের ওপর ঢেকে-দেওয়া চাদরগুলো যেমন করে মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে রাখে, মঙ্গলবার সূর্যাস্তের পরে বৃষ্টিটা ঘন হয়ে এসে ঠিক তেমনি করে আঁকড়ে ধরে আমাদের বুকের ওপরে সজোরে আঘাত করছিল। সকালের ঠাণ্ডা ভাবটা কেটে গিয়ে একটা ভ্যাপসা স্যাঁতসেঁতে অবস্থা দেখা দিল। জ্বর হলে যেমন শীত-শীত করে। দিনের তাপটাও ছিল কতকটা সেইরকম। না-গরম, না-ঠাণ্ডা। ঠিক করতে পারছিলাম না, গায়ের জামাটা খুলে রাখলে শরীরটা ঠাণ্ডা হবে কি না, না খুললেও চলে যাবে, যদিও এদিকে জুতোর ভেতরে পা-দুটো ঘামে ভিজে যাচ্ছিল। প্রথম দিনের মতো বৃষ্টিতে যদিও আর কোনো আকর্ষণীয় কিছু ছিল না, তবু আমরা সবাই তার দিকে তাকিয়ে বারান্দায় বসে ছিলাম।

প্রাণহীন এক স্থিতাবস্থার মধ্যে এসে আমরা পৌঁছেছিলাম। এমনকি বৃষ্টি পড়ার আওয়াজটাও আমাদের কানে এসে লাগছিল না। যেমন রাতে স্বপ্নে দেখা কোনো আগন্তুক জিভের ডগায় যে স্বাদটা রেখে চলে যায়। সামনের ঘন কুয়াশায় আবৃত নিঃসঙ্গ সূর্যের বিষণ্ণ আলোয় গাছের ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছিল, তেমনই একটা স্বাদ পাচ্ছি। সপ্তাহের প্রতিটি মঙ্গলবারের মতো ভেবেছিলাম, সেন্ট জেরিমোর গির্জা থেকে অন্ধ যমজ সেই মেয়ে দুটি তাদের বেসুরো গলায়, বিষাদঘন সুরে, সরল কথায় ভরা গানগুলো শুনিয়ে ভিক্ষে চাইতে আসবে। ওদের গান শুনতে শুনতে দারুণ রোমাঞ্চ জাগতো শরীরে। কেন জানি না এই ঘন বর্ষণের দিনে আমার মনে হয়েছিল, ওরা এসেছে। আমাদের বাড়ির কোনো এক অজানা নিরাপদ কোণে হয়ত ওরা জড়সড় হয়ে বসে আছে। বৃষ্টি থামলেই বেরিয়ে আসবে ওদের গান শোনানোর জন্য। কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বলছিল, "আজ এই দুর্যোগের দিনে গান শোনাতে ওরা আর বাইরে বেরুবে না।" আজ আসবে না সেই ভিখারিনী, যে প্রতি মঙ্গলবারে, আমাদের দুপুরের খাওয়ার শেষে এসে উপস্থিত হয়ে অনন্ত সুরভিত লেবু গাছের রস ভিক্ষা চায়।

সময়ের কোনো হিসাবই আর আমরা রাখতে পারিনি। তাই সেদিন দুপুরে খাওয়ার ব্যাপারটা আমরা সবাই প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত সৎমা যখন একবাটি বিস্বাদ সুপের সঙ্গে একটুকরো বাসি রুটি এনে দিলেন তখনই খাওয়ার কথাটা মনে পড়ল। সোমবার সূর্যাস্তের পর থেকে কিছুই যে খাইনি। সেটা আমাদের মনেও হয়নি। সময় যেন তার সমস্ত রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে আমাদের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। একনাগাড়ে মুষলধাবার এই বৃষ্টির সঙ্গে প্রকৃতির প্রলয় মিশে আমাদের বিমূঢ়, চলৎশক্তিহীন করে দিয়েছিল। অসহায়ভাবে তার কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই আমাদের ছিল না। সন্ধ্যা নামতেই দেখলাম, চত্বরের কাদায় আটক গরুটার দেহে কেমন একটা সজীব চঞ্চলতা দেখা দিয়েছে। তীক্ষ্ম একটা আর্তনাদ করে শরীরের সব শক্তি দিয়ে সে যখনই কাদায় বসা পা-দুটোকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করলো তখনই এঁটেল মাটির গর্তে ওর পা-দুটো আরো গভীর ভাবে ঢুকে গেল। তারপর প্রায় আধঘণ্টা ওর স্থির, নিশ্চল শরীরটার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, ও বোধহয় মৃত। বোধহয় জীবন সম্বন্ধে ওর মাত্রাধিক্য সচেতনতার জন্যে শরীরটাকে মাটিতে নুইয়ে দিতে পারছে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম, একটা ভাবগম্ভীর স্বর্গীয় অনুষ্ঠানের মতো, মহৎ-মর্যাদার সঙ্গে ও ওর নিজের শরীরের ভারের কাছে আত্মসমর্পণ করে মাটিতে নুয়ে পড়ল। পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলো, "দেখলে তো! ও শুধু যতটুকু পেরেছে ততটুকু শরীরই মাটিতে নুইয়ে দিয়েছে—।" ফিরে তাকাতেই

দেখলাম মঙ্গলবারের সেই ভিখারিনী ঝড়বৃষ্টি সবকিছু উপেক্ষা করে এসেছে লেবু গাছের রসের ভিক্ষা চাইতে।

মুষলধারের এই বৃষ্টিটা হয়তো আমার গা-সওয়া হয়ে যেত যদি না শোবার ঘরে ঢুকে দেখতে পেতাম টেবিলগুলোকে দেয়ালের ধারে জড় করে এনে তার ওপরে বাড়ির আসবাবপত্র রেখে দেয়ালকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। রণক্ষেত্রে শত্রুর গোলাবর্ষণ থেকে বাঁচার জন্য যেমন পাঁচিল বানানো হয়, ঠিক তেমনি ভাবেই সারাটা রাত ধরে বাড়ির আসবাবপত্র রান্নাঘরের সামগ্রী সব বাড়ির চারপাশে জড় করে, বাড়িটাকে একটা দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো বানানোর চেষ্টা হয়েছে। এটা দেখেই এক ভয়ংকর শূন্যতা অনুভব করলাম। চারপাশে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা। মনে হল রাত্তিরে নিশ্চয়ই কোনো ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। বাড়ির আদিবাসী চাকরগুলো খালি গায়ে। হাঁটুর ওপরে ওদের প্যাণ্টগুলো তুলে বাড়ির অন্যান্য আসবাবগুলো খাবার ঘরে এনে জড় করতে ব্যস্ত। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, ওরা যেন সেই সব ব্যর্থ বিপ্লবী, যারা পরাজয় জেনেও একটা কোমল নিষ্ঠুরতার সঙ্গে অবিশ্রাম সংগ্রাম করে চলেছে। ওরাও যেন এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টির কাছে অপমানিত, পরাজিত। উদ্দেশ্যহীনভাবে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়ালাম। মনে হচ্ছিল, আমি যেন একটা পশু-চারণের জমি, যেখানে সমুদ্র-শৈবাল আর ছত্রাকের বীজ পোঁতা হয়েছে, যার ওপরে ছাতার মতো রয়েছে নরম ব্যাঙের ছাতা, আর সেই জমিকে উর্বরা করার জন্য সার হিসাবে বর্ষায় পচা গাছপালাকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে শীঘ্রই তারা বেড়ে উঠতে পারে। শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে আমি যখন এই চিন্তায় মগ্ন, ঠিক সেই সময় সৎমা আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলে উঠলেন, "এখন ঋতু-পরিবর্তন হচ্ছে, অমন করে এক জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে বুকে সর্দি বসে যাবে।" তখনই বুঝলাম ঘরের মেঝেয় জমা জল পায়ের গোছা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে এসেছে। বিদ্যুৎচালিত প্রাণহীন এক জলস্রোত সবেগে মেঝের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। বুঝতে পারলাম, বন্যার জল আমাদের বাড়িতেও এসে ঢুকেছে।

বুধবারের দুপুরে মনে হল এখনও সকাল হয়নি। বিকেল তিনটে বাজতেই সময়ের অনেক আগে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিকে সঙ্গী করে রুগ্ন শরীরে রাত্রি নেমে এল। নির্মম এবং অপ্রতিরোধ্য ভঙ্গিতে বৃষ্টি পড়ছিল অবিরাম বাড়ির সামনের চত্বরে। অস্পষ্ট, রুগ্ন অন্ধকারে আদিবাসীদের বিষণ্ণ মুখগুলো প্রমাণ করছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের অক্ষমতাকে। এর কিছু পরেই বাইরের জগৎটার কিছু-কিছু খবর আসতে শুরু করল। কেউ যে খবরগুলো জোগাড় করে বয়ে আনছিল তা ঠিক নয়, বরং সময়ের কাঁধের ওপর ভর করে খবরগুলো তাদের সত্য সরল রূপ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে এসে উপস্থিত হচ্ছিল।

রাস্তায় খোলা বানের জলের প্রবল স্রোতের মধ্যে ভাসছিল বাড়ির আসবাবপত্র, গৃহসামগ্রীর টুকিটাকি কত কি। মনে হচ্ছিল, ওরা যেন ভয়ংকর বিপর্যয়ের ভগ্নাবশেষ, আবর্জনা, বহু দূর থেকে এসেছে। তারই সঙ্গে সুখবরের মতো ভেসে আসছিল মৃত পশুদের দেহ। মহানুভব ঈশ্বরের সদয় তত্ত্বাবধানে, সৌভাগ্যবশত যে ঋতুকে রবিবার সকালে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম, তার আসল রূপ বুঝতে আমাদের দু-দিন সময় লেগেছিল। এই ঘন বর্ষার ক্ষমতার খবরগুলো বুধবার এসে পৌঁছেছিল। খবর এল গির্জা ডুবে গেছে, যে-কোনো সময়ে তা ধসে পড়তে পারে। যাদের কোনো খবরই জানার কথা নয়, তেমনি একজন কেউ বলে উঠলো, "সোমবার ট্রেনটা সেতু পেরুতে পারেনি, মনে হয় বানের জলে রেললাইন ভেসে গেছে।" খবর এল, রোগশয্যায় শুয়ে-থাকা এক রোগিণী জলে ভেসে গেছে। পরদিনই তার মৃতদেহ তারই বাড়ির চত্বরে ভাসতে দেখা গেছে।

এই মহাপ্লাবনের কথা ভেবে আমার ভীষণ ভয় হল। সামনের দোলনা-চেয়ারটার ওপরে পা-দুটো তুলে বসে পড়লাম। সামনের অস্পষ্ট ভেজা অন্ধকারের ভেতর দিয়ে চেষ্টা করছিলাম কোনো পূর্বাভাস পাওয়া যায় কি না! একটা লম্ফকে উঁচু করে ধরে সোজা হয়ে এসে সৎমা আমার দরজার সামনে দাঁড়ালেন। অস্বাভাবিক এই দুর্যোগে আমার মনের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসেছিল যে তাঁর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, তিনি যেন এই সংসারের এক বিদেহী আত্মা, যদিও তাঁর তেমন কোনো পরিবর্তনই হয়নি। বারান্দায় প্রবাহিত বানের জলকে দু-পায়ে চারপাশে ছেটাতে-ছেটাতে, লম্ফটা উঁচু করে ধরে সোজা, শক্ত হয়ে হেঁটে এসে তিনি আমার সামনে দাঁড়ালেন। "এবার আমাদের প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনা জানানোর সময় এসেছে।" শুকনো, ভাঁজ-পড়া চামড়ায় ঢাকা তাঁর মুখটার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, তিনি যেন সোজা কবর থেকে উঠে এসেছেন। তাঁর শরীরটার কোথাও যেন মানবীয় পদার্থ বলে কিছু নেই। হাতের জপমালাটা আঙুলের ফাঁকে ধরে, দু-পা আরো এগিয়ে এসে তিনি আবার বললেন, "কবরগুলো সব বানের জলে ভেসে যাওয়ার জন্যে ভেতরের মড়াগুলো জলের ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছে। এবার সময় এসেছে প্রভুকে প্রার্থনা জানানোর।"

সেই রাতে আর ঘুম আসেনি, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ পচা মড়ার তীব্র একটা গন্ধ পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম বিছানায়। আমার পাশে মার্তিন তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি পাচ্ছ না? একটা গন্ধ পাচ্ছ না—?" ঘুম জড়ানো গলায় ও আমায় জিজ্ঞেস করলো, "গন্ধ? কিসের গন্ধ—?" বললাম, "কেন ওই পচা মড়ার গন্ধটা? নিশ্চয়ই রাস্তা থেকে বানের জলে ভেসে এসে পচা মড়াগুলো

আমাদের বাড়ির চত্বরে ভাসছে—।" বলতে বলতে আতঙ্কে আমার দম বন্ধ হয়ে এল। তন্দ্রাচ্ছন্ন, কর্কশ গলায় মার্তিন চেঁচিয়ে উঠে বলল, "যত সব আজে বাজে চিন্তা, পেটে বাচ্চা এলে মেয়েরা এ-সময় এই সব চিন্তাই করে থাকে।"

বৃহস্পতিবার সকাল হতেই গন্ধটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। মনে হল, বহু দূরে কোথাও গন্ধটা হারিয়ে গেছে। সময় সম্বন্ধে নানান চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করে ছিল, তারাও সব কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, আজকের এই বৃহস্পতিবারের পরে আর কোনো বৃহস্পতিবারই নেই। যেটাকে আজ বৃহস্পতিবার বলে মনে হচ্ছে, সেটা যেন একতাল গভীর কাদার মতো। থাকে দু-হাত দিয়ে সরিয়ে শুক্রবারকে খুঁজে আনতে হবে। নারী আর পুরুষের মধ্যেও কোনো প্রভেদ দেখলাম না। বাবা, সৎমা, আদিবাসী চাকরগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল, ওরা সব ভিজে, স্যাঁতসেঁতে হয়ে ফুলে উঠেছে, আর ফোলা-ফোলা শরীরগুলো নিয়ে ওরা যেন শীতের এক জলাভূমিতে চলাফেরা করছে। হঠাৎ বাবা আমায় বললেন, "তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাকো, ওখান থেকে সরে অন্য কোথাও যেও না—।" বাবার গলার স্বরটা আমি কিন্তু কান দিয়ে শুনতে পাইনি, মনে হল বহু দূরের কোনো অসমতল জমির ওপর দিয়ে সেটা ভেসে এসে আমাকে স্পর্শ করছে। সত্যি কথা বলতে কি, তখন একমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় ছাড়া আর কোনো ইন্দ্রিয়ই কাজ করছিল না। স্পর্শেন্দ্রিয়ই ছিল একমাত্র সজীব ও সক্রিয়।

দুর্যোগের মধ্যে বেরিয়ে গিয়ে বাবা আর ফিরে আসেননি। হয়ত ওই ঝড়-বাতাসে তিনি কোথাও হারিয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন অন্ধকার নামতেই সৎমাকে অনুরোধ করলাম, আমার সঙ্গে শুতে যেতে। সে রাতে ভালো করে ঘুমিয়ে-ছিলাম। পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে দেখলাম, বাইরের আবহাওয়ায় না আছে কোনো রঙ, না কোনো গন্ধ বা তাপ। সামনের চেয়ারটায় বসতে গিয়ে বুঝেছিলাম, ঘুমটা আমার সম্পূর্ণ ভাঙেনি, শরীরের কোনো-কোনো অংশ তখনও যেন ঘুমিয়ে রয়েছে। ঠিক সেই সময় ট্রেনের বাঁশির আওয়াজটা কানে এল। মনে হল ঝড়জলের মধ্যে বিপন্ন একটা ট্রেন বিষণ্ণ সুরে বাঁশি বাজাতে বাজাতে ছুটে চলেছে। মনে মনে বললাম, "নিশ্চয়ই দূরের আকাশটা কোথাও পরিষ্কার হয়ে গেছে।" কে যেন আমার কথাগুলো শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোথায়?" চোখ খুলে তাকিয়ে আমি বলে উঠলাম, "কে? কে ওখানে?" দেখলাম শীর্ণ হাতটা দেয়ালের ওপর রেখে সৎমা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বললেন, "আমি, আমি!" জিজ্ঞেস করলাম, "আমার আপন মনে বলা কথাগুলো কি তুমি শুনতে পেয়েছিলে?" উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, আমারও মনে হচ্ছে শহরের বাইরের আকাশটা বোধহয় পরিষ্কার হয়ে এসেছে। রেললাইনও বসানো হয়ে গেছে।" কিছুক্ষণ পরেই ট্রেতে করে তিনি আমার জন্য ধোঁয়া-ওঠা গরম এক

প্লেট প্রাতরাশ নিয়ে এলেন। রসুন আর মাখনের গন্ধে ভরা স্যুপ। আমার মনের স্বাভাবিক অবস্থাটা.যে তখনও ফিরে আসেনি, সেটা আমি বুঝতে পারছিলাম। প্রশ্ন করলাম, "এখন কটা বাজে?" শান্ত অথচ পরাজিত স্বরে উত্তর এল, "প্রায় আড়াইটে, মনে হচ্ছে ট্রেনটা সময়মতই যাচ্ছে।" "আড়াইটে? আমি এতক্ষণ ঘুমিয়েছি।" উনি বললেন, "তুমি তো বেশিক্ষণ ঘুমোওনি, এখনও তো তিনটে বাজেনি।" ভয়ে শরীরটা আমার হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠলো। বুঝতে পারছিলাম, গরম-গরম স্যুপের প্লেটটা আমার আঙুল ফসকে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন করলাম, "শুক্রবার, আড়াইটে?" অস্বাভাবিক এক শান্ত সুরে তিনি বললেন, "বৃহস্পতিবার আড়াইটে বাছা, আমরা এখনও বৃহস্পতিবারে—।"

মাঝেমাঝে এমন একটা অবস্থা হয়, যখন আমাদের শরীরের ইন্দ্রিয়গুলো অবশ হয়ে আসে, বোধশক্তি হারিয়ে যায়। আমি অনুরূপ এক অবস্থার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অনেক, অনেক সময় পেরিয়ে যেতে হঠাৎ পাশের ঘর থেকে কার গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। কে যেন বলছে, "এবার বিছানাগুলো এদিকে সরিয়ে আনতে পারো।" গলার আওয়াজে অসুস্থতার লক্ষণ না থাকলেও তাকে কেমন যেন ক্লান্ত, পরাজিত শোনাচ্ছিল! অসুস্থ অবস্থা থেকে, ক্রমে ক্রমে যেমন ভালো হয়ে ওঠে, গলার আওয়াজটাতেও ঠিক তেমনিই কিছু একটা ছিল। তারপরেই শুনতে পেলাম, জমা জলের ওপরে ইট ফেলার আওয়াজ। এতক্ষণ ধরে দিগন্তের দিকে দৃষ্টি রেখে, আমি যে সমান্তরাল হয়ে শুয়ে রয়েছি এটা বোঝার আগেই আমার সমস্ত শরীরটা শক্ত কাঠের মতো হয়ে গেল! অপরিসীম এক শূন্যতার মাঝখানে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। মনে হল এক অক্ষম অবস্থায় পড়ে সবকিছু স্থির, নিশ্চল হয়ে রয়েছে। আর শঙ্কিত. বিচলিত কণ্ঠস্বরগুলো সারা বাড়িতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছে। বুকটা আমার ঠাণ্ডায় জমে পাথরের মতো হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল, আমি মরে গেছি, হায় ঈশ্বর! তাহলে সত্যিই আমি মৃত! বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে আমি চিৎকার করে উঠলাম, "আমি মারা গেছি, আমি মৃত!" পাশ থেকে সেই ঠাণ্ডা, কঠিন মার্তিনের গলা ভেসে এল. "আঃ, চেঁচিয়ো না, বাড়ির সবাই বাইরে, কেউ তোমার চিৎকার শুনতে পাবে না।" তখনই বুঝলাম, আকাশটা তাহলে পরিষ্কার হয়েছে। এরপর যা রইল, সে তো মৃত্যুর মতই মহিমান্বিত, রহস্যময় এক নীরবতা, যে তার নিজের সৌন্দর্যে নিজেই অভিভূত। আশপাশের নানান শব্দের মধ্যেও আমি কিন্তু দীপ্তিমান সেই মহিমাকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সজীব, ক্লান্ত কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে শুনছিলাম বারান্দায় ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা ও ছোটাছুটি। হঠাৎ কোথা থেকে একটা কনকনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়া এসে আমার দরজার ওপরে আছড়ে

পড়ল, দরজার শেকল, হাতল সব ঝনঝন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম, একটা বিশাল দীর্ঘ দেহ, পাকা ফলের মতো বাগানের সামনে ভেজা চত্বরটার ওপরে পড়ে গড়িয়ে গেল। মনে হল যে অশরীরী এতক্ষণ রহস্যময় স্মিত হাসিতে নিজেকে ভরিয়ে রেখে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে যেন তার আসল রূপটিকে প্রকাশ করলো।

সময়ের তালগোলে আমার সব অনুভূতি কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। কোনো বোধই আর আমার মধ্যে কাজ করছিল না। হঠাৎ আমার মনে হতে লাগল—"হায় প্রভু! ওরা সবাই যদি আজ এসে আমাকে তোমার গত রবিবারের প্রার্থনা-সভায় নিয়ে যেতে চায়, সেটা কি এমন কিছু আশ্চর্যের হবে?"

বিচ্ছেদ : এক পর্ব

জন আপডাইক (১৯৩২—)

রিচার্ড মেপল বিস্মিত। এমন কি মৃত্যুও এর চেয়ে খারাপ হতে পারে? ওর স্ত্রী বিছানায় গুটিসুটি হয়ে বসে আছে, ওর মনের ভেতর রয়েছে আত্মহত্যার উত্তেজনা, হতাশায় আচ্ছন্ন, যেন হেরে-যাওয়া এক বিষণ্ণ মানুষ। ফোঁপাতে থাকে, মাঝেমাঝে কথা বলে। ওরা দেড় বছর হল আলাদা থেকেছে, তবুও এর ভেতর হেরফের কিছুই হল না। কোনো নতুন কোষও গড়ে উঠেনি ক্ষতের ভেতর। ওর শরীরে রয়েছে অদৃশ্য বড় এক ক্ষত, চিৎকার করছে, ফিরে এসো।

ক্রমশ বয়স বাড়ছে ; তার মুখের চামড়ায় ভাঁজ, তার চোখের শুকনো জায়গায় জল গড়াতে থাকে, মুখের কোনাগুলোতেও, যেন সে কাঁদবার জন্য নিচু হয়ে ঝুঁকে আছে। যেন তার সৌন্দর্য রিচার্ডের অনুভূতিকে নাড়া দিল। কোনো চিন্তা না করেই জোন তার হাতদুটো আবেগ জমিয়ে কোলের ওপরে রাখে, কালো পশমের স্কার্টের ওপর হাতদুটো ধবধবে সাদা, যোগচর্চা করে তার শরীর বেশ পেলব, বয়স কিছু নিয়ে যেতে পারেনি। সে নিজেকে বেশ টান-টান রেখেছে শোকের ভেতরেও, কামান থেকে যেন গোলা ছুঁড়ে দেবে। ক্ষমা চায়, "আমি দুঃখিত, আমি এ ভাবে ভাবতে চাই না। সব সময়ে হাসিখুশি থাকতে চাই, তুড়ি মেরে সবকিছুকে সাহসের সঙ্গে সহজভাবে নিতে চাই, এসব বড় হাস্যকর। এমন কি ছেলেমেয়েরা—"

"বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা—" রিচার্ড বলে। "তারা খেলার ভাল সঙ্গী।"

"ওহ্, আমি নই?" জোনের স্বরে বৈচিত্র্যের ছায়া নেই, আশা নেই। তার বিচারের ধারায় তাকে সে বেশ উজ্জ্বল করে তোলে। "অন্য কোনো উপায়ে, এ শুধুমাত্র, শুধুমাত্র—।" ত্বকে, রক্তমাংসে চোখের জলে তীক্ষ্ণতা বাড়ে—"কেন আমার নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত নয়—এ কথা প্রতিদিন সকালে জেগে উঠে আওড়াতে থাকি। তুমি জানো না এ কী ধরনের—"

সব সময় জোন যেন ঠিক—রিচার্ড নয়। সে কল্পনা করতে পারবে না, সে ভাবতে পারবে না নদীতে ঝাঁপ দেবার কথা। জল কতটা ঠাণ্ডা, কতটা তার

অনুবাদ : মনোজ চাকলাদার

পশমের স্কার্ট ভারী হতে পারে। শক্তসমর্থ একজন দক্ষ সাঁতারু সে। নদীর গভীরতাও বেশি নয়। রিচার্ড বলে, "বেশ, তুমি জানো আমার অনুভূতিটা কেমন, বছরের পর বছর তোমার পাশে শুয়ে কোনো কিছু ঘটার অপেক্ষা করেছি—"

"জানি, জানি, তুমি হাজারবার এ কথা বলেছ। ভেবেছি একটা-কিছু হয়ে যাবে। অন্তত একবার। কিন্তু দেখ—তর্ক করতে চাই না আমি, এর জন্য অভিযোগ করছি না, শুধুমাত্র, শুধুমাত্র—"

"তুমি শুধু মরতে চাও", বাকিটুকু শেষ করে দেয় রিচার্ড।

জোন মাথা নাড়ে, ফোঁপাতে থাকে। "সকলের কাছে কি অপমানের—ছেলেমেয়েদের কাছেও—।"

তাকে সে বুঝে নিতে থাকে, তার দৃঢ়তাকে প্রশংসা করে, সুষম পরিবেশকেও—সে তার সঙ্গে মরতে চায়। অনুভব করে দেয়ালের নিচের দিকে জোন নিজেকে গুঁজে রেখেছে, গোটানো অবস্থায়, প্রকৃত অর্থে দেয়ালটা ফাঁকা, তার সঙ্গে যেন দেয়াল রয়েছে। সে এর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। তাকে ছেড়ে এতদিন যে জীবন গড়েছে, যে শরীর সে তৈরি করেছে, এই ব্যর্থতা, এ সামান্য প্রচেষ্টা তাকে সুখী করে তোলে। তার সুখ তার শরীর মনে হচ্ছে তুচ্ছ। এই অসুখী জীবন যা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে তাকে তারা পবিত্র বিচ্ছেদ বলে ভাবে। তবু এর থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নেই, কোনো সমাধান নেই। একজন সৈনিক যেমন অন্যায়ের দিকে যেতে বাধ্য হয় সেইরকম বিমূঢ় ভাবে সে এগিয়ে যায়, আচ্ছন্ন হয়ে ইচ্ছেগুলোকে তার দিকে নিয়ে যায়।

"আমার সঙ্গে যখন তুমি ছিলে, তোমাকে বড় হতাশ মনে হত"—জোনকে বলে। তার ভাবনার এ এক সুর।

"জানি, আমি জানি, তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, এর জন্য তোমাকে কিছু বলছি না, শুধু—"

"শুধু কি?" ঝোঁকটা বদলে নিল। তার পা ব্যথা করে; এক পলক হাতের ঘড়ির দিকে তাকায়। তার সময়ও স্থির করা ছিল।

"বুঝেছি।"

"যদি আরো বেশি বুঝতাম"—রিচার্ড বলে। "আমি সম্পূর্ণভাবে স্থবির হয়ে যেতাম।" জোনকে জিজ্ঞেস করে, "আমি কি ভাবে তোমার সাহায্য করতে পারি, কত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারি—"

"তাতে কোনো লাভ হবে না। আমি সে কথা বলছি না—"

রিচার্ড এ কথা বিশ্বাস করে না। কিন্তু এর মধ্যে যে বিশ্বাসযোগ্য সত্যটুকু রয়েছে তা তার বুকের ভেতর জাগে। অ্যাকোয়ারিয়মে রুপোলি টুকরো, মাছ যেমন ছুটে এসে গিলে নেয়, সে-রকম লোভ জাগছে তার। এ খাবারের

স্বাদ হেতো। "তুমি কি বলছ, জো?" জো শব্দটি মিষ্টি অর্থে ব্যবহার করে। 'জো' শব্দটির ভেতর তার কাতর কণ্ঠ বেরিয়ে এল। তার সকল ছল, প্রতারণাগুলো জোড়া দেয়, সেগুলো পরপর সাজানোর চেষ্ট করে, তবু বেড়ে যায়, ছড়িয়ে যায়, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

"তো, তুমি জানো এর অনুভূতিটা কেমন—"

রিচার্ড বলে, "যদি জানতে পারতাম তোমার অনুভূতি, তাহলে ভাল হত। তাহলে এরকম অবস্থায় এসে পড়তাম না। কিন্তু আমাদের তো একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে। এখন, এসো। এভাবে তুমি সকলকে শুধু কষ্ট দিচ্ছ, এমন কি তোমাকেও। তোমার সুন্দর শরীর, ছেলেমেয়ে, টাকা, বাড়ি, বন্ধুবান্ধব —তোমার এসব আছে—একমাত্র আমি—আমি ছাড়া। আমার পরিবর্তে তোমার স্বাধীনতা আছে, মর্যাদা আছে। এর আগে তুমি তা পাওনি। —বলো আমি কি ভুল বলছি—" তার কণ্ঠে অনুনয়ের সুর ফুটে উঠল।

জোনকে হাসতে হল, কক্-কক্ শব্দ বার হয়। ঘটনাটা এমন হল যেন তাকে একটু নতুনভাবে বসিয়ে দিচ্ছে। যেন মোরগের বাসায় তার নড়াচড়া।

রিচার্ড একটু দেরিতে বোঝে। জোন এটা জানে। রিচার্ডকে বেরিয়ে যেতে হবে, তাকে সরে যেতে হবে। সে চেষ্টা করে, "তোমার সামনে এক বিশাল জীবন রয়েছে।" একটু বা সময় নিল, "এ পাপ, মৃত্যুর কথা বলা পাপ। কেন মরবে তুমি? কেন এ রকম ভাবে চলতে থাকবে? আমি এটা ঘৃণা করি। আমার মনে হয় তাড়াতাড়ি সব জোড়া লাগানো দরকার। আমি এখানে এসেছি ছেলেমেয়েদের দেখতে, নিজেকে অপরাধী ভাবতে আসিনি—"

জোন তার দিকে তাকায়। "তুমি এ ব্যাপারে অপরাধী ভেবেছ—।" দুজনেই অপেক্ষা করে। কিসের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে। "খাটের পায়া—" জোন শেষ করে। সবচেয়ে কাছের একটা জিনিস সে টেনে নেয়। দুজনকেই হাসতে হল। হাসতে থাকে দুজনে।